শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

সুধা বসু

বাক্‌-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড

৩৩, কলেজ রো ঃঃ কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১৯৫৯

প্রকাশক
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

উৎসর্গ

অবনীন্দ্র-চিত্রকলার রূপদর্শনের দৃষ্টি যিনি আমাকে দিয়েছিলেন সেই অবনীন্দ্র-সুহৃৎ ও সহযোগী এবং মদীয় পিতৃপ্রতিম আচার্য্য অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-এর পূত স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

নিবেদন

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখবার এই যে আমার দুরূহ চেষ্টা, তা 'বামন হয়ে চাঁদ ধরার' চেষ্টারই মত। তথাপি তা করেছি অন্তরের একান্ত সুতীব্র প্রেরণাতে। দূর অতীতের কোন একদিন দৈনিক খবরের কাগজে, যতদূর মনে পড়ে 'আনন্দবাজার'-এ অবনীন্দ্রনাথের শিবসীমন্তিনী উমা এবং নন্দলাল বসুর শিবের বিষপান ও সতীর দেহত্যাগের পরে শিবের ধ্যানময় রূপ দেখে আমার বালিকা মন বিমুগ্ধ হয়ে তাদের গভীরভাবকে যে মনের মণিকোঠায় ধরে রেখেছিল, উত্তরকালে তাই আমাকে ভারত-কলার ইতিহাস অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করেছিল।

একদা অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্রশৈলীর নানা নিদর্শনের প্রতিলিপি 'প্রবাসী'-র পাতায় নিয়মিত দেখে দেখে আমি হয়েছিলাম তার গুণমুগ্ধ ভক্ত। অপরিণত বুদ্ধি ও চিত্র-রচনায় রীতিমত শিক্ষার অভাব নিয়েই আমি সে-সকল ছবির অনেক কপিও করেছিলাম।

এইভাবে দিন এগিয়ে যেতে যেতে কলেজী শিক্ষার অবসানে, সৌভাগ্যক্রমে, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস ও সৌন্দর্য্য-সাধনার মর্ম্মরহস্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভের পরম সুযোগ পেলাম আচার্য্য অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী-র (ও. সি. গাঙ্গুলী) কাছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্প-ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে আধুনিক চিত্রকলার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করারও যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথকে দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম মাত্র দু-বার। তাও তাঁর জীবনের শেষলগ্নে। তবে আচার্য্য অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের মুখে দিনের পর দিন অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শুনে শুনে আমি তাঁর একটি রূপচ্ছবি ও আন্তরবৈভবের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছিলাম। শিল্পাচার্য্য সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের প্রাণ-খোলা বলিষ্ঠ বর্ণনাতে পেয়েছিলাম মানুষ অবনীন্দ্রনাথ ব্যতীত শিল্পী, স্নেহশীল গুরু, সুরসিক আলাপচারী, বদান্য-পুরুষ ও আত্মভোলা এক রূপ-সাধকের সন্ধান। তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে না জেনেও, যেন জেনেছিলাম ঢের বেশী। মন আমার শ্রদ্ধাপ্লুত হয়েছিল গভীরভাবে। তৎসঙ্গে তাঁর শিল্পকৃতি ও সাহিত্য-সম্ভার অনুশীলন করে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগের মাত্রা সীমাহীন হয়ে ওঠে। তার ফলে এই রচনা কেবল শুষ্ক ইতিহাস না হয়ে যাতে অবনীন্দ্রসত্তার প্রতি মমত্ববোধসম্পন্ন ও আবেগমথিত একটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রকৃত গভীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হয়ে ওঠে সেই চেষ্টাই করেছি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তাকে আমার সীমিত শক্তির দ্বারাই আলোচনা

করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় আর একটি যে বৃহৎ সত্তা, অর্থাৎ সাহিত্যিক সত্তা, তাকে আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে সাহস পাইনি। রঙ-তুলিতে লেখা ছবিকে সামান্য বুঝতে পারি, কিন্তু তাঁর অক্ষরের ভাষায় যে ছবি ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করার শক্তি ও অধিকার আমার নেই। আশা করি সাহিত্যরসিক পাঠকগণ আমার এই অক্ষমতাকে মার্জনা করবেন।

শিল্পাচার্য্যের 'চিঠিপত্র' নিয়ে একটি অধ্যায় আমি যোজনা করেছি বটে, কিন্তু তা বস্তুতঃই অসম্পূর্ণ। তিনি অধিকাংশ চিঠি লিখতেন চিত্রাঙ্কন করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেরকম চিঠির সন্ধান আমি সামান্যই পেয়েছি। শিল্পীগুরুর জ্যেষ্ঠা কন্যা উমা দেবী ও বিশ্বরূপ বসু এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় মুদ্রিত পত্রগুচ্ছ যোগ্য উপাদানের কাজ করেছে। বারাণসীর স্বনামধন্য কলাবিদ রায় কৃষ্ণদাসজী কয়েকটি চিঠি ও ছবির ফটোগ্রাফ (ক্ষিতীন্দ্র মজুমদারের প্রতিকৃতি) ব্যবহার করতে দিয়ে তাঁর প্রতি আমার স্বাভাবিক শ্রদ্ধাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁকে বিনম্র কৃতজ্ঞতা ও প্রণতি জ্ঞাপন করছি।

আমার ক্ষুদ্র শক্তিকে আমি যথার্থভাবে এই কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেছি এবং সত্যনিষ্ঠা ও তাঁর চিত্রকলার যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ পরিচয় সহকারে কাজটি সম্পন্ন করার প্রয়াস করেছি। কিন্তু কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারিনি। অবনীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়নে আমার অক্ষমতা প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করেছে। আশা করি আমার পরবর্তী গবেষকগণ ও অবনীন্দ্র-চিত্রের সত্য অনুরাগীরা আমার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে এগিয়ে আসবেন।

প্রকৃত উচ্চমানের গবেষণার ক্ষেত্রে নানা অন্তরায়ের মধ্যেও আমি যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছি বিভিন্ন সহৃদয় গুণীজন ও অনেক প্রতিষ্ঠান থাকে। তাঁদের সকলের কাছে আমি চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ।

শিল্পগুরুর মৌলিক চিত্র অনুশীলন করার সুযোগ যাঁরা আমাকে দিয়েছেন, তাঁরা হলেন অবনীন্দ্র-দুহিতা শ্রীযুক্তা উমা দেবী, সর্বশ্রী শোভনলাল গাঙ্গুলী, বিশ্বরূপ বসু, গৌরী ভঞ্জ, যমুনা সেন, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ঠাকুর। ছবি দেখার আরও সুযোগ পেয়েছি রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনস্থ কলাভবন ও রবীন্দ্রভবন, বারাণসীর ভারত-কলাভবন এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম-এ।

পুস্তকাদি ও পুরাতন পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করতে যেখানে সাহায্য পেয়েছি

এবং যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরী, আর্ট কলেজের গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতনের কলাভবন ও রবীন্দ্রভবনের গ্রন্থাগার, শিল্পী ইন্দু রক্ষিত, শ্রীঅমল মিত্র ও শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। এঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্লক দিয়ে পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম। দক্ষিণের বারান্দায় চিত্রাঙ্কনরত অবনীন্দ্রনাথ ও শিশু চিত্রের ব্লক দিয়েছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ডিরেক্টর মহোদয় দিয়েছেন ওমর খৈয়ামের ব্লকটি। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

দেশের ও বিদেশের যে সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন হয়েছে তার লেখকদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। স্বয়ং শিল্পাচার্য্যের লেখা থেকেও প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এবং উদ্ধৃতির সংখ্যাও যথেষ্ট। বক্তব্যকে প্রামাণিক করার জন্য অন্যান্য উদ্ধৃতির সংখ্যাও কিছু বেশী হয়েছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ বিষয়টি উপলব্ধি করে তা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

আর একটি বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেবার আছে। তা হচ্ছে যে অবনীন্দ্রনাথ গ্রন্থাদি অলঙ্কৃত করার জন্য যে সকল চিত্রাঙ্কন করেছিলেন তার বিষয়বস্তুর আখ্যান, কাব্য-কথা প্রভৃতির উল্লেখনা হয়ত কারোর কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হবে। তৎপ্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, অবনীন্দ্রনাথ কোন্ বিষয় অবলম্বনে কোন্ চিত্রটি এঁকেছিলেন, কবিগুরুর কোন্ কোন্ কবিতার তিনি চিত্ররূপ দিয়েছিলেন তা আজ প্রায় অজ্ঞাত। তা মোটামুটি উদ্ধার করে ও সংগ্রহ করে রাখার উদ্দেশ্যেই এই অতিরিক্ত শ্রম ও ব্যয়ভার বহন করা হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের দুই প্রধান শিষ্য শৈলেন দে ও ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার আমাকে মৌখিকভাবে শিল্পীগুরু সম্বন্ধে অনেক কথা জানবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে তথ্যসমূহ শৈলেন দে-র মুখে শোনার অবকাশ পেয়েছিলাম। এঁরা দু'জনই আজ লোকান্তরিত। তাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-প্রণতি জ্ঞাপন করছি।

যিনি (ও সি. গাঙ্গুলী) প্রাণঢালা উৎসাহ, বইপত্র, ফটোগ্রাফ ও ব্লক (নির্ব্বাসিত যক্ষ ও আলমগীর) দিয়ে আমাকে এই কাজে উৎসাহিত করেছিলেন, তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর শারীরিক সুস্থতা ও স্বাভাবিক অবস্থায় পুস্তকখানি রচনা করতে পারলে তাঁর নির্দেশ-উপদেশে এটি হয়ত সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন এবং আরও সুন্দর হতে পারতো।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হয়নি। বেদনাহত চিত্তে, সশ্রদ্ধ প্রণতিসহ বইটি আমি তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ বোধ করছি।

আরও দু'জন খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক ও অবনীন্দ্র-চিত্রানুরাগী আমাকে এই কাজে উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভূপতিমোহন মজুমদার ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরাও আজ আমাদের মধ্যে নেই। পুস্তকখানি প্রকাশনের প্রাক্কালে আমি সেকথা স্মরণ করে তাঁদের প্রতি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

প্রসঙ্গতঃ আলোচনার বিষয় যে, কোন সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ সময়কালে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়। কালের কষ্টিপাথরেই তার যথার্থ মূল্যায়ন হয়। অধুনা অবনীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কেও তর্কবিতর্ক উঠছে। বিভিন্ন 'Ism' ও আধুনিক মতবাদ সমূহের ফলে তাঁর প্রবর্ত্তিত চিত্রশৈলীর রস-রহস্য উপলব্ধির চেষ্টা ও অবকাশ ক্রমশঃই ক্ষীয়মাণ। তা সত্ত্বেও স্বল্প এবং অক্ষম আলোচনার দ্বারাও তাঁর প্রতি এবং তাঁর বিপুল ও বিচিত্র সৃষ্টি-সম্ভারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ক্ষুদ্র চেষ্টা বোধহয় অস্বাভাবিক ও অসমীচীন নয়। অতএব সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু পরিমাণে অন্ততঃ ক্ষমার্হ হবে, এই ভরসায়ই এই দুরূহ কাজে হাত দেয়া হয়েছিল।

এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার মধ্যম ভ্রাতা কল্যাণীয় শিবলাল বসু। তার প্রতি আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ লিপিবদ্ধ রইল। অনুজতুল্য শিল্পী শ্রীগোবিন্দ মোদক প্রচ্ছদ রচনা করে ও অন্যভাবে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাকেও আমি স্নেহসিক্ত শুভেচ্ছা জানাই।

প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্বভার নিয়েছেন 'বাক্-সাহিত্যে'র অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়। তার প্রতি আমার স্নেহ-প্রীতি ও শুভেচ্ছার অন্ত নেই। শ্রীমান্ স্বপনের সমুদয় শুভ চেষ্টা ও শ্রম সাধনা সফল হোক, এই কামনা করি। যাঁর অকৃত্রিম চেষ্টা ও উৎসাহের ফলে প্রকাশক মহোদয় এগিয়ে এসেছেন তাঁকেও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি হলেন অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়। আরও নানাভাবে এবিষয়ে সাহায্য করে তিনি আমাকে চিরঋণী করেছেন। মঙ্গলময় তাঁর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন—এই প্রার্থনা করি।

সুধা বসু

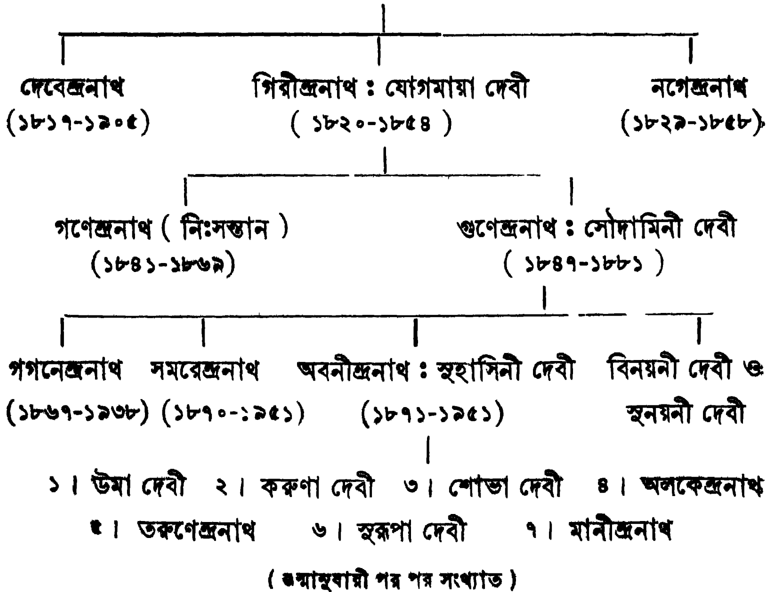
স্বাধীনতা দিবস

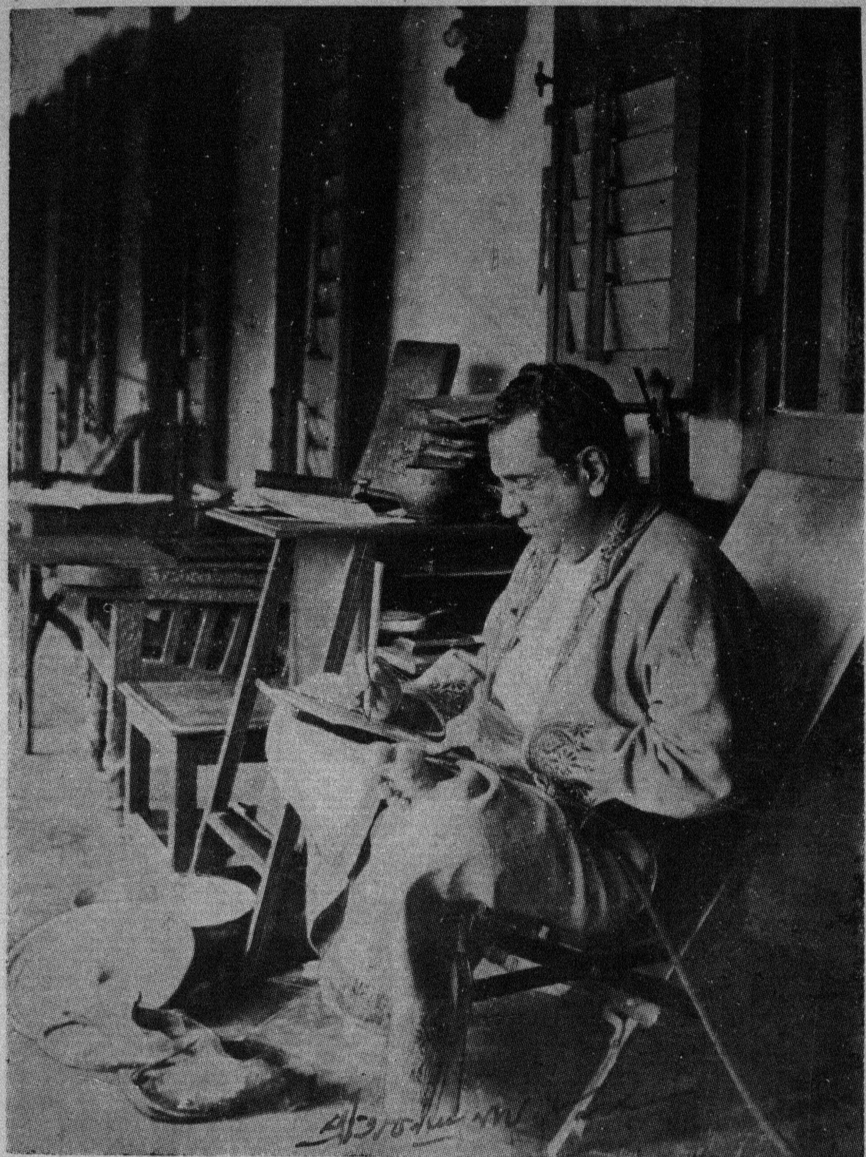
বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

বংশলতা

দ্বারকানাথ ঠাকুর
(১৭৯৪-১৮৪৬)





চিত্রাঙ্কনরত অবনীন্দ্রনাথ

ব্লক : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

শিল্পাচার্য্য
অবনীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

বিপুলা এই পৃথ্বীর বুকে কালের গতি নিরবধি প্রবহমান। নিরন্তর গতির মধ্য দিয়েই কাল পরিণত হয় কালান্তরে। কাল ও কালান্তরের কাহিনীই ইতিহাসের মুখ্য উপাদান। আর সেই ইতিহাস কখনও স্থির, নিশ্চল নয়। তারও গতি আছে, বিবর্ত্তন আছে, প্রসার আছে। সেই প্রসার অতীতকে অবলম্বন করে আরম্ভ হলেও বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে তা সুবিস্তৃত। কেন না, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের রূপ প্রকৃতির সম্ভাবনা ও বিশিষ্টতা থাকে নিহিত! অতএব, এ-কালের বিশেষ ঘটনা ও ভাবধারার মূলটি প্রোথিত আছে সেকালেরই কোন ভাবাদর্শ ও মানস প্রক্রিয়ার মধ্যে।

সমকালীন ভারতবর্ষের কৃষ্টিকলার প্রেক্ষাপটও রচিত হয়েছে অনুরূপ পদ্ধতিতে। ভারতের চারুকলার সুসমৃদ্ধ রূপৈশ্বর্য্যের ইতিহাস অনধিক পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন। নানা বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় তা পল্লবিত হয়েছে যুগ-যুগান্তরের সাধনা, মননসৌকর্য্য ও করণ-কৌশলের মহিমা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে। ভাঙা-গড়া, উৎকর্ষ-অপকর্ষ ও ঔজ্জ্বল্য-নিষ্প্রভতার পালা-পর্য্যায় যে সেখানে চলেনি তা নয়। তাহলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তার গতি-প্রবাহে কখনও বিরতি দেখা যায়নি বা পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। তবে অষ্টাদশ শতকের মধ্যাহ্ন লগ্নে অবস্থা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান মুখে দেশের বুকে ভেদ-বিভেদের স্রোতধারা বহুধা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। সমগ্র সমাজজীবনে এসেছিল নিদারুণ একটা বিচ্ছিন্নতার ভাব। খণ্ড খণ্ড রূপের প্রান্তীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে একটা সংঘর্ষের সূচনাও হয়েছিল কোন কোনও সময়। অতঃপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাব বুদ্ধি এবং ইংরেজী ভাষা আমদানির ফলে এদেশের ধর্ম্মনীতি, আচার পদ্ধতি, শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সাধনায় এল অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সূচনা। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ভারতীয় শিল্প-সাধনা যে চরম সমুন্নতি লাভ করেছিল তা বিদেশী শাসন ও সভ্যতার প্রভাব-প্রকোপে দুঃসহ এক নিম্নগামিতার দিকে চলেছিল এগিয়ে। গোটা জাতীয় জীবনটাই যেন জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে জাতির জীবন-সাধনার সমুদয় পথই হয়েছিল অবরুদ্ধ। তবে সেই অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীতেই জড়তাগ্রস্ত, সুপ্তিমগ্ন ও আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে এসে গেল মহাজাগরণ ক্ষণ। আর বাঙ্গালীর জীবনচেতনাতেই সর্ব্বাগ্রে এসেছিল সেই পরম সুন্দর শুভলগ্নটি। ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে গিয়ে বাঙ্গালী তাঁর জীর্ণ সংস্কার ও স্থবির আদর্শে নতুন এক অনুভূতির আলোড়ন ও আধুনিকতার সঞ্জীবনী স্পর্শ অনুভব করেছিলেন তীব্রভাবে। ক্রমান্বয়ে বঙ্গভূমিই হয়েছিল সারা ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাজাত্যবোধের উৎস স্থল এবং নব উদ্যমের মুখ্যকেন্দ্র। নানাদিকে বিবিধ কর্ম্মনীতি, চিন্তাধারা ও নবীন আদর্শের প্রভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে একটা সংঘর্ষের সূচনাও হয়েছিল। সেই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালী জাতির মনে সঞ্চারিত হয়েছিল অভূতপূর্ব্ব ও বলিষ্ঠ এক জীবনচেতনা।

সেই জীবনচেতনাকে আবার লালন পোষণ করে, প্রাণবন্ত ও সুফলপ্রসূ করে তুলেছিলেন উনবিংশ শতকের আত্মসচেতন ও সুশিক্ষিত এক বাঙ্গালী জনসমাজ। সেই সমাজের যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা যেমন ছিলেন শিক্ষা দীক্ষা ও অর্থ সম্পদে উন্নত ও সমৃদ্ধ, তেমনি তাঁদের মধ্যে হয়েছিল পাশ্চাত্য ও ভারতীয়, দুই সভ্যতা ও আদর্শের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। একদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্ত্তিত ভূমি-ব্যবস্থা ও ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর দৌলতে বাংলা দেশ, বিশেষতঃ কলকাতা শহরে কতিপয় ধনাঢ্য পরিবারের সামাজিক প্রতিপত্তি, বিলাস বৈভবময় জীবনচর্য্যা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আচ্ছন্ন অভিনব ধরনের স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ, অপর দিকে পশ্চিমের আমদানী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও রাজনৈতিক ভাববাদে অনুপ্রাণিত বিশেষ একটি শিক্ষিত মানবগোষ্ঠীর আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে আস্থা ও জাতীয়তা বোধের উন্মেষ দেশ ও সমাজকে দুই ভিন্ন পথে চালিত করতে আরম্ভ করলো।

এর দুই বিপরীতমুখী সভ্যতার সংঘর্ষ-মাধ্যমেই বাংলার জাতীয়জীবনে এসেছিল নবজাগৃতির মহালগ্ন। সেই নবজাগৃতির প্রধান হোতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, বিরাট ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দেশের শিক্ষানীতি, ধর্ম্মাদর্শ ও সমাজজীবনে সম্পূর্ণ নতুন এক চিন্তাধারা ও মহৎ আদর্শের বাণী বহন করে এনেছিল। তিনি দেশ ও জাতিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেবার জন্য ও নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও সমাজচিন্তায় অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন সঞ্চার করে তাকে জনমানসে প্রতিফলিত করতে প্রয়াসী হন। বাংলার মানুষের মন থেকে কুসংস্কারের মোহজাল ছিন্ন করে তিনি নতুনতর জীবনজিজ্ঞাসা জাগ্রত করতে প্রবৃত্ত হন

নানা দুরূহ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে। পরবর্ত্তীকালে তাঁর আরব্ধ কার্য্যাবলী ও তাঁর জীবনসাধনার ধারা দ্রুত সাফল্য ও সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছিল এদেশে আরও অনেক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, স্বদেশপ্রেমী শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারকগণের শুভ আবির্ভাবের ফলে। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই বঙ্গভূমিতে নবজাগরণের পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনের কাজ সফল ও সার্থক হয়ে উঠেছিল। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে হয়েছিল তার অবারিত প্রতিফলন। আর অনতিবিলম্বে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র।

ঘোর সুপ্তিভঙ্গের পরে যে সকল মানুষ ও পরিবার গোষ্ঠী দেশ ও জাতির অগ্রগমনে সহায়তা করেছিলেন, তাদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অবদানও অসামান্য।

রাজা রামমোহন রায় জাতীয়জীবনে নতুন যুগের ও আধুনিকতার যে নবদিগন্ত প্রসারিত করেছিলেন, তার পূর্ণতা ও প্রসারতা সাধনে একটি বিষয় তখনও যথার্থ প্রয়োজনীয়রূপে বিবেচিত হয়নি। ধর্ম্মের নতুন রূপ দেখা দিল; বাংলা ভাষা, সাহিত্য কাব্য ও নাটক নতুন পথ কেটে এগিয়ে চললো দ্রুত তালে, জাতি স্বদেশপ্রেমে হোল উদ্বুদ্ধ। কিন্তু পেছনে পড়ে রইল শিল্পকলার মহান্ ঐতিহ্য ও সুন্দরের সাধনা।

ভারতের সুপ্রাচীন, সুউন্নত ও অতি মার্জ্জিত মহিমাব্যঞ্জক চারুকলার দুর্দম প্রবাহ তখন যুগ যুগ সঞ্চিত ভাবরাশিকে হারিয়ে অবক্ষয়ের মোহনা মুখে ধাবিত। ভারতীয় চিত্রকলার শেষ ক্ষীণ ধারা সমূহ তখন নিঃশেষিত প্রায়। ১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে ঘাড়োয়ালের প্রসিদ্ধ চিত্রকার মোলারামের দেহান্তরের পরে ধারাবাহিক চিত্রচর্চ্চার রীতিতে ছেদ পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দেশজ প্রাণবন্ত চিত্র-সাধনার পথে আর কোন সুযোগ্য উত্তরসাধকের সন্ধান পাওয়া যায়নি তখন।

ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাশ্চাত্য কলাপদ্ধতির শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল পুরোদমে এবং তা সরকারী উদ্যোগ ও উৎসাহে। অতএব, বিদেশের বাস্তববাদী রীতির প্রকোপে মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রশৈলী সমূহের পক্ষে স্বমহিমায় আত্মরক্ষা করা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকা সকল সম্ভাবনার বাইরে চলে গেল। দিন যেতে যেতে এগিয়ে এল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সন্ধ্যালগ্ন।

ভারতের ললিতকলার অবহেলিত রাজ্যে নব অরুণোদয়ের পূর্ব্বাভাস অনুভব করলেন দেশের কলালক্ষ্মী। আর তখন দেশ ও জাতি নবযুগের নবীন

সাধনার পথে আর একটি মুক্তিকামী সুযোগ্য পথিকের আবির্ভাব অপেক্ষায় ছিলেন উন্মুখ হয়ে। কারণ 'সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালায়' তখনও জাতীয় শিল্পকে যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃত আয়োজন আরম্ভ হয়নি। ভারতকলালক্ষ্মী তাঁর এযুগের বরপুত্রের জন্য তখনও প্রতীক্ষাকাতর। রামমোহনের পুণ্য আবির্ভাব (১৭৭২ খৃঃ) থেকে শুভারম্ভ করে বঙ্গভূমিতে শতাব্দীব্যাপী যে আরও কত শত মহামানবের পবিত্র জন্মক্ষণের পালা এসেছিল তার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছিল পুরো একটি শতক অন্তে। আর তা আজ থেকে এক শতাব্দীকাল পূর্ব্বে।

সেদিনটি বাংলা ১২৭৮ সনের ২৩শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথি, (ইং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট) বেলা বারোটা বেজে এগার মিনিট। এমন সময়ে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীর ৫নং আবাসে একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব হোল। সেদিনের সেই জন্মলগ্নটি ছিল অত্যন্ত শুভ। ভারতের কৃষ্টিকলার ইতিহাসে সেই দিনটির কথা চিরকালের মত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—এমনই একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল সেই পুণ্যলগ্নে। নবজাত শিশু, ছোট্ট একটুখানি। কিন্তু তার নামটি হয়ে গেল বিরাট—অবনীন্দ্রনাথ। ছোট্ট করে, আদর করে সকলে বলতেন, 'অবন', 'অবু'। তিনিই ভাবীকালের শিল্পগুরু, ভারতীয় চিত্রকলার মুক্তিদাতা, শিশু-সাহিত্য ও রসসমৃদ্ধ কলা-সাহিত্যের অদ্বিতীয় রচয়িতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছোট্ট অবনের দুটি বড়ো দাদা ছিলেন। তাঁরা হলেন, গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথও ছিলেন চিত্রপটে রূপকথার রাজ্য রচনায়—রূপ, অরূপ ও নৈরূপ্যের মিলন-সাধনে এবং ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে নির্ম্মল হাসি ও বিমল আনন্দের প্রস্রবণ-সৃষ্টিতে অদ্বিতীয় শিল্পকার। এঁদের দুটি ছোট বোন ছিলেন বিনয়নী ও সুনয়নী দেবী। সুনয়নী দেবীও ছিলেন চিত্র রচনায় স্বয়ংসিদ্ধ শিল্পী। তাঁর শিক্ষাবিহীন স্বতোৎসারিত ও স্বকপোলকল্পিত চিত্ররাজি বাংলার চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি নতুন ও স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছে। এঁরা তিন শিল্পী ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য ও অদ্বিতীয়। পূর্ব্বসূরী ও উত্তরসাধক কারোর সঙ্গে এঁদের কোনও মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায় না। কাউকে অনুকরণ-অনুকৃতির কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা এঁদের জীবনে দেখা যায়নি। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররীতি ছাত্র শিষ্য পরম্পরায় ধারাবহ হয়ে বিস্তীর্ণ হয়েছিল দিগ্‌দিগন্তরে। কিন্তু তাঁকে কেউ সঠিক অনুকরণ করতে সক্ষম হননি।

এঁদের পাশের বাড়ীতেই ছিলেন কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতির রাজার রাজা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খুড়ো-ভাইপো।

এঁরা তুজনেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধর। দ্বারকানাথের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ। গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ হলেন গুণেন্দ্রনাথেরই কনিষ্ঠ পুত্র। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ অবনের 'রবি-কা'। যেমন নিকট সম্পর্ক, তেমনি তুজনার মধ্যে গভীর ও সুমিষ্ট ভাব-ভালবাসা। দিন যেতে যেতে সে সম্পর্ক কেবল খুড়ো-ভাইপোর স্নেহ-শ্রদ্ধার সূত্রেই গ্রথিত থাকেনি, ক্রমশঃ তা সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির জ্ঞাতিত্ব ও ঐকাত্ম্যের দৃঢ়বন্ধনে আরও বেশী করে বাঁধা পড়লো সেই-তুটি নবীন প্রাণ ও তরুণ মন। পারিবারিক সম্পর্কের ঢের উপরে চলে গেলেন তাঁরা।

অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ঠিক দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের শুভ আবির্ভাব। তাঁর দীপ্ত প্রতিভার যাতুস্পর্শে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, রূপ-রস, আনন্দ, ছন্দ ও নৃত্যের এক বিরাট আজানা রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল সকলের জন্য, সারা বিশ্বের জন্য। দশ বছর পরে জন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে পাশের বাড়ীতে যাঁর আবির্ভাব ঘটলো, তিনি এলেন রঙ-রেখা, রূপ-রস ও ভাব-কল্পনার সাতমহলা একটি রহস্যপুরীর চাবি হাতে নিয়ে। তাঁর ভাগ্যলিপিতে লেখা হয়েছিল যে, দিনে দিনে, মাসে বর্ষে তিনি বেড়ে উঠবেন, আর খুলে দেবেন সেই রূপমহলার প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দ্বার। দিনে দিনে তিনি এগিয়ে চলবেন রূপ-রসের অজানা জগতের দিকে। সেখানে যুগ যুগ সঞ্চিত মণিরত্নরাজিকে তিনি খুঁজে বের করবেন। জীর্ণ পুরোনো যা, তাকে নতুন আলোকে করবেন উদ্ভাসিত, প্রাণহীনে করবেন প্রাণসঞ্চার। লুপ্ত ও অবহেলিত ভারতশিল্পকে তিনি আধুনিক ভাবরসের কন্দর-নিঃসৃত নির্ঝরিণীর মুক্তধারায় করাবেন মুক্তিস্নান। ভারতের শিল্পদেবতা তাঁর ললাট-লিপিতে আরও লিখে দিয়েছিলেন যে, তিনি ভগীরথের মত সে যুগের ভারতীয় চিত্রকলার মৃতপ্রায় ক্ষীণস্রোতা মন্দাকিনীতে নতুন জোয়ার এনে তাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করাবেন বঙ্গবাসীর পেলব, কোমল, সরস হৃদয়পটে। বাংলার মানুষের রূপতৃষ্ণা মিটবে। ক্রমে সারা ভারত এগিয়ে আসবে সেই রূপসুধা পান করতে। বিদেশের রসিকজনও মুগ্ধ হবেন সেই রূপ-রসের অসীম স্রোতধারার অবাধ গতি দেখে।

ভাগ্যবিধাতার বিধান বিফল হয়নি। সফল হয়েছে পুরোপুরি। রূপ-সাধক অবনীন্দ্রনাথের রঙ্-রেখার বিশাল সাম্রাজ্য, রূপতত্ত্ব ব্যাখ্যানের অমূল্য ভাণ্ডার বাঙ্গালীর তথা সারা ভারতের গৌরব।

রূপকলার অসীম রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশের আগে শিশু অবনীন্দ্রনাথ, বালক অবনীন্দ্রনাথ যে গৃহরাজ্যে বাস করেছেন, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, কত শত অনন্ত পথে যে তাঁর শৈশব-কল্পনার বিকাশ হয়েছিল তার অবদান তাঁর শিল্পী-জীবনে অতি অসামান্য! শৈশবের দিনগুলির মধ্যেই তাঁর ভাবীকালের জীবনচেতনা ও শিল্পী-জীবনের গোড়ার কথা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনা, জীবনযাত্রার প্রতিটি নিয়মকানুন ও বাড়ীর গোটা আবহাওয়া ও সমগ্র পরিবেশ-পরিমণ্ডল তাঁর মনে গভীর কল্পনার জাল বুনতে শুরু করেছিল সেই কবে কোন শিশুকালে!

তিনি জন্মেছিলেন সব-কিছুকে বিশেষভাবে দেখার চোখ নিয়ে, অর্থাৎ দিগন্তপ্রসারী সৌন্দর্য-দৃষ্টি ও রূপ দেখার ত্রিনয়ন নিয়ে। তিনি আরও নিয়ে এসেছিলেন সমুদ্রের মত অতল গভীর ভাবরাশি ও হৃদয়-সংবেদন, আকাশের মত উদার মন, আর ক্ষ্যাপার মত খুঁজে বেড়াবার নিরলস চেষ্টা। সারা জীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন। কি খুঁজেছেন তিনি? খুঁজেছেন রূপের মধ্যে অরূপ, সীমার মধ্যে অসীম, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট ও তুচ্ছের মধ্যে অমূল্য সম্পদ। তাইতো তাঁর তুলিকায় রূপ পেয়েছে সামান্য, অসামান্য, ছোট বড়, আপন পর সব কিছু। সেখানে দেবতা মানুষ, পশু-পাখী, গাছপালা, পাহাড়, সমুদ্র, বন-জঙ্গল সমস্ত কিছুর সমান স্থান, সমান অধিকার। তাঁর শিল্পালয়ে খড়কুটো, ভাঙ্গাচোরা জিনিসেরও ছিল কত আদর ও কদর! সেখানে জাতি-ধর্ম্ম, দেশী-বিদেশীর কোন সমস্যা ছিল না। তিনি দেশ-বিদেশে, প্রাচীন-নবীন সকলের কাছ থেকেই শিল্পাদর্শ, শিল্প-ভাবনা, রূপায়ণ রীতির শিক্ষা ও পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কারোর কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি! সকলকে জেনে বুঝে, তাদের আদর্শ ও রহস্যকে উপলব্ধি করে নিজের ভাব-ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেছেন, কিন্তু নিজের আদর্শ ও আত্মসত্তাকে কখনও ক্ষুণ্ন করেন নি।

তাঁর স্বকীয়তা এত দৃঢ়মূল ছিল যে, শিল্পী-জীবনে নানা দেশী-বিদেশী আঙ্গিক-শৈলীর অনুসন্ধান ও অনুশীলন তিনি করেছেন বটে এবং তার রসনির্য্যাস পান করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে, কিন্তু তাতে কখনও বিহ্বল হননি। তিনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন দেশজ শিল্পের রূপমোহে। তাঁর মন কানায় কানায় ভরে

উঠেছিল সেই শিশুকালের সব অভিজ্ঞতা, বাড়ীর পরিবেশ-প্রসূত জীবনছন্দ, পারিবারিক আনন্দ-বেদনার সুর-লহরীতে। দাস-দাসী পরিবৃত শিশু-জীবনের দিনগুলি, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতা, বাগানবাড়ীর প্রাকৃতিক শোভা, গৃহকক্ষের আসবাবপত্র, চিত্রপট, পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপই তাঁর ভবিষ্যৎ শিল্পী-জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ়রূপে গড়ে তুলেছিল। পরবর্ত্তীকালে সেই মজবুত ভিতের উপর তিনি ক্রমশঃ রঙ্‌-তুলি, ভাব-কল্পনা, ভাষা-ছন্দ ও আঙ্গিক-পদ্ধতির বিচিত্রসম্ভার জড় করে, সৃষ্টি করলেন সুমহান এক শিল্পসৌধ, রূপ-রসের সাতমহলা প্রাসাদ।

শিশু অবন বাড়ীর ঘরে-বাইরে যেদিকে তাকান এক-একটি ছবি ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। উত্তরের ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বেড়া ঘেরা সবুজ চত্বর। সেদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, সুষমা ও কল্পনা। চাঁদ ওঠে সেদিকে, সূর্য্য ওঠে সেদিকে, মস্ত বটগাছের আড়াল দিয়ে। পুকুর জলে দিনরাত পড়ে আলোছায়ায় মায়া। দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে ঘুঘু, আর কাঠ-ঠোক্‌রা থেকে থেকে। ময়ূর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, রাজহংস দেয় সাঁতার, ফোহারাতে জল ছোটে সকাল বিকেল। সারস ধরে নাচ বাদলার দিনে, ঝড়-বাতাসে নারকেল গাছের সারি দোল খায়।"[১]

এ কি ছবি নয়? বাড়ীর পাশে প্রকৃতির পটে তিনি এই সকল ছবি দেখেছিলেন শিশুকালে।

ঠাকুরবাড়ীর চিরাগত নিয়মে অবনীন্দ্রনাথও মানুষ হয়েছিলেন দাসদাসীর হাতে। প্রথমে পদ্মদাসী, তারপরে চাকর রামলাল। পদ্মদাসীর কোলেই তিনি শিশুকাল কাটিয়েছেন। তার হাতে খেয়েছেন, তার সঙ্গে খেলা করে, তার মুখে ঘুমপাড়ানি গান শুনে ঘুমিয়ে পড়তেন প্রতিদিন। 'রাতের অন্ধকারের মতো কালো' ছিল সে দাসীর চেহারা। রাতে ঘুম পাড়ানোর সময় শিশু অবনীন্দ্রনাথ অন্ধকারে তাকে দেখতে পেতেন না, কেবল ছোঁয়াটি অনুভব করতেন। পদ্মদাসীর চেহারাকে তিনি বলেছেন, 'আগুনে ঝলসানো পদ্মফুল'। দাসী প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন—

"একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিলো আমার দাসী—সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াতো কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকতো সে। দেখতে

১. আপন কথা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৩০

পেতেম না তাকে, শুধু ছোঁয়া পেতেম থেকে থেকে। কোনো কোনো দিন অনেক রাতে সে জেগে বসে চাল ভাজা কট্‌কট্‌ চিবোতো, আর তালপাতার পাখা নিয়ে মশা তাড়াতো। শুধু শব্দে জানতেম এটা। আমি জেগে আছি জানলে দাসী চুপি চুপি মশারি তুলে একটুখানি নারকেল নাড়ু অন্ধকারেই মুখে গুঁজে দিতো। নিত্য খোরাকের উপরি পাওনা ছিলো এই নাড়ু।"[১]

ছেলেবেলার কত কথা, কত ছবি তিনি ধরে রেখেছিলেন তাঁর স্মৃতিপটে। শিল্পী-জীবনে তা আবার কত শত রূপে নতুন করে দেখা দিয়েছিল; কত অনন্তপথে সে শৈশব-কল্পনার মুহূর্ত্তগুলি বিকশিত হয়েছিল।

খুব ছোট বয়সেই মনের মধ্যে একটা 'ছবি, ছবি' ভাব তিনি অনুভব করতেন। কর্ম্মময়, উৎসবমুখর বাঁড়ীর অন্দরমহল, বাইরের মহল, তারও বাইরে রাস্তা ঘাটে কতো সাজের, 'গাড়ি ঘোড়া' দেখে দেখে তাঁর মনে হোত যে অবিশ্রান্ত চলন্ত ছবি। তিনি দেখতেন, "সব ছবিগুলো নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ, ছেদ নেই, ভেদ নেই, টানা চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যের একটা অফুরন্ত স্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্ত লীলা।"[২]

বাড়ীর উত্তর দিকের খড়খড়ি টেনে দেখতেন বাইরের জগতকে। বাইরে বেরোবার মত বয়স হয়নি, হুকুমও ছিল না। তিনি দেখতেন, "বাড়ীঘর, গাছ—এরই নিচে একটা ময়লা সবুজ টান, তারপর আবার ছবি। ছাগল, মুরগী, হাঁস, খাটিয়া, বিচালির গাদা, খানিকটা চাকার আঁচড়—কাটা রাস্তা—তারপর আবার সবুজ টান। এমনি একটা করে খড়খড়ির ফাঁক, আর একটা করে কাঠের পাটা—এরই উপর সব ছবি ও না-ছবিকে দু'ভাগ করে একটা সরু দাঁড়ি—খবরের কাগজের দুটো কলমের মাঝের রেখার মতোই সোজা—যেটা টানলে হয় ছবি, চাপলে হয় বন্ধ ছবি দেখা।"[৩]

এইভাবে তিনি ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র কেবল ছবি দেখতে পেতেন। অন্দর-মহলে বন্দী-জীবন তাঁর শিশুমনকে সর্ব্বদা বাইরের দিকে টানতো। জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সব দিকের দৃশ্য দেখতেন আর ছবির মত মনের পটে ধরে রাখতেন। দূরে থেকে ফাঁক দিয়ে দেখার কথায় তিনি বলেছেন—

"পূবের ক'টা জানালার ফাঁকে দেখা দেয়—খাল পারের নারকেল গাছের সারি, তার উপরে চাঁদ উঠছে—যেন কানা-ভাঙা সোনার একটা আবখোরার টুকরো।

---

১. ২. ৩. আপন কথা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৭, ৩৩, ৩৪

পশ্চিমের খোলা জানালায় দেখা যাচ্ছে সেকালের সওদাগরী জাহাজের মাস্তুলগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় করে দাঁড়িয়ে। উত্তরে সেকালের শহর ও বাড়ির অরণ্য একটা।"[১]

একটু বড় হতে অবনীন্দ্রনাথের ভার পড়েছিল চাকর রামলালের উপর। তখন একটু একটু করে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় শুরু হোল। কিন্তু নিজেদের বাড়ীর বাইরের মহলের সঙ্গে পরিচয় হতে এবং কর্ত্তাদের আসর, আলাপ-আলোচনা, তাঁদের কর্ম্মমুখর দিনগুলির কিনারা পেতে অনেক সময় লেগেছিল। সুতরাং খানিক জানা ও না-জানার পালা-পর্য্যায়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনে কৈশোর-কল্পনা অভিনবত্ব লাভের অবকাশ পেয়েছিল প্রচুর পরিমাণে।

অন্দরে বন্দী অবস্থার মধ্যে বাড়ীর একখানি ঘর তাঁর কাছে একটি যাদুঘর বা চিত্রশালার মত হয়েছিল। সেখানে যা কিছু ছিল সবই তাঁর শিশুমনে কল্পনার খোরাক জুগিয়েছিল, তাঁর ভাবীকালের শিল্পী-জীবনের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল, এবং ভিত গড়ে দিয়েছিল। ঘরটি তাঁর ছোট পিসীমার।

ঘরে আবদ্ধ তাঁর হাঁপিয়ে ওঠা মুক্তি-পাগল মন নিঃশ্বাস ফেলার জায়গাটি বেছে নিয়েছিল ঠিক শিল্পী জীবন গঠনের উপযোগী। সে ঘরে অনেক ছবি ছিল, 'দেশী ধরনের অয়েলপেণ্টিং।' আরও ছিল, 'কৃষ্ণনগরের কারিগরের গড়া গোষ্ঠলীলার চমৎকার একটি কাচ ঢাকা দৃশ্য। উলে বোনা পাখীর ছবি, উমার তপস্যার ছবি, কৃষ্ণলীলার ছবি, সরোজিনী নাটক ও কাদম্বরীর ছবি।'

এই সকল ছবি দেখে দেখেই তাঁর দিন কেটে যেত। সে-ঘরে আরও অনেক জিনিস ছিল যা তাঁকে অনবরত টানতো। তিনি সেখানে গিয়ে সেই ছবি, খেলনা ও পুতুলের রঙ্ দেখে মেতে উঠতেন, কখনও তার মধ্যে যেন ডুবে যেতেন। ছোট পিসীমার ঘরের পাশেই ছিল তাঁর পিতার পাখীর আসর। পিতা ও পিসীমার যুগ্ম চিড়িয়াখানা সেটি। পাখীর পালকের বর্ণবাহারে ও চিত্র-বিচিত্রের মধ্যে তিনি আপন ঘরে বিশ্ব-প্রকৃতির আর একটি রমণীয় রূপের পরিচয় পেয়েছিলেন নিবিড়ভাবে।

সেই সময়েই বাড়ীর বৈঠকখানাতে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন 'লণ্ডন নিউজের' ছবি। বাঁধানো ভল্যুমের মধ্যে ছিল নানারকম ছবি। তিনি তা নিবিষ্ট মনে বসে দেখতেন।

---

১. আপন কথা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৭২

পদ্মদাসীর হাত থেকে রামলালের জিম্মায় এসে বালক অবনীন্দ্রনাথ অনেকখানি স্বাধীনতা ও খোলা জীবন পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু কড়া শাসনের কিছু কম্‌তি ছিল না। তাহলেও চাকরের শাসন নজর এড়িয়ে অবনের দুষ্টুমি চলতো অনেক সময়।

একদিন তাঁর কি খেয়াল হোল বুড়ো দারোয়ান মনোহর সিং-এর লম্বা সাদা দাড়িতে একবার হাত দিয়ে দেখতে হবে। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। দারোয়ান রেগে খুন। পরে রামলালের হুকুমে দারোয়ানের কাছে অবনকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। এই রকম কত যে দুষ্টুমি তিনি করতেন তার হিসেব ছিল না। তার ফলে লেখাপড়ার দিকে মন বড় যেত না। নিজের উৎসাহে স্কুলে যাবার কোন বালাই ছিল না। জোরজার করে, ধরে-বেঁধে পাল্‌কিতে চড়িয়ে দরজা বন্ধ করে তবে তাঁকে স্কুলে পাঠানো হোত। স্কুলটি নর্মাল স্কুল। বাড়ী থেকে বেশী দূরেও নয়। জোড়াসাঁকোতেই চিৎপুর রোডে, হরেন শীলের বাড়ীর কাছে।

স্কুলের কিছুই ভালো লাগতো না তাঁর। কিন্তু একটি জিনিস তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। স্কুলের হেডমাষ্টার গোপালবাবুর ঘরে কাচের আলমারিতে একটি খেলনা জাহাজ এবং আরও কয়েকটি নানা আকারের শঙ্খ, সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি সব সাজানো ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি সেই আলমারির সামনে গিয়ে সেগুলি দেখতেন। কিন্তু কিছুতেই স্কুলে থাকতে তাঁর মন চাইতো না। তাঁর শিশুমন বিকেল হতে না হতে বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো। আরও ব্যস্ত হতেন তিনি বাড়ী ফিরে সেই বাগানে ছুটে যাবার জন্য—যেখানে প্রজাপতি উড়ছে, কাঁচপোকা পান্নার টুকরোর মত দেয়ালের গায়ে লেগে রয়েছে, পোষা কাঠবেড়ালি তাঁর জন্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। গাড়ী আসতে কোনও দিন দেরি হলে হেঁটে, না হয়তো চাকরের কাঁধে চড়েই ফিরে আসতেন বাড়ীতে।

ছেলেবেলায় স্কুলে যাবার অনিচ্ছা প্রসঙ্গে তিনি পরিণত বয়সে লিখেছেন—

"আমি জানিনে এখনকার ছেলে পড়াবার প্রথা, ঠিক তখনকার চেয়ে কতটা বদলেছে; তবে ইস্কুলের ছেলেদের ধরন-ধারণ দেখে তখনকার সঙ্গে এখনকার একটা বিশেষ তফাৎ আমি লক্ষ্য করি। এখন দেখি সব বাড়ির ছেলেগুলি বিনা আপত্তিতে ভালোমানুষের মতো শেলেট আর রাশ রাশ বই বহে, ঠিক টাইম মতোই স্কুলে চলছে।...

কিন্তু সেকালে দেখেছি দশটার আগে থেকেই ঘরে ঘরে এক আধটা ছেলের কান্না আর আপত্তিজনক চীৎকার উঠতো। আমার পক্ষে তো এ ঘটনা নিত্যকার ছিল বল্লেই হয়—আমি মাটি কামড়ে পড়ে আছি, আর চাকর আমায় মাটির বুক থেকে হিড়্‌হিড়্‌ কোরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে ইস্কুল-গাড়ীতে তুলছে।”[১]

অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রথম হাতে খড়িও হয়েছিল সেই নর্মাল স্কুলেই। তিনি বলেছেন, “একটি মেটে কুঁজো, একটি ছোট গ্লাস, ছবির হাতেখড়ি আমার এই দুটি দিয়ে।”

ড্রইং মাস্টার ছিলেন সাতকড়িবাবু। মোটা কাগজে আঁকা বড় সাইজের মেটে কুঁজো ও গ্লাসের ছবি টাঙিয়ে দিয়ে তিনি ছাত্রদের তা দেখে দেখে আঁকতে বলতেন। অবনীন্দ্রনাথ তা গোড়াতে এঁকে তুলতে পারতেন না। ভুলু নামে যে ছাত্রটির সঙ্গে তিনি এক সঙ্গে যাওয়া-আসা করতেন, তার কাছে শিখে নিলেন কুঁজো ও গ্লাস আঁকার কায়দাটা। সেই আঁকার কাজ শিখে তাঁর কি আনন্দ! সুযোগ পেলেই কুঁজো আর গ্লাস আঁকতেন তিনি। কুঁজোর মুখের গোল লাইনটি টানতে গিয়ে মনটি যেন তাঁর কুঁজোর মধ্যেই ডুব দিতে চাইতো। কিন্তু স্কুলের পড়ায় আর কিছুতেই মন বসতো না তাঁর।

তখনকার কালে শিক্ষকগণ ও পণ্ডিত মশায়রা অনেক ছাত্রের কাছেই ছিলেন ভয়ের কারণ। অবনীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সেও সেই ভয়াল স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। নর্মাল স্কুলের লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতের কথা বলতে গিয়ে তখনও যেন ভয় পেতেন। তিনি জোড়া বেত নিয়ে বসে ঢুলতেন, আর ছেলেদের পড়াতেন। পণ্ডিত মশায়ের কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“চেহারা তাঁর ঠিক যেন মা দুর্গার অসুর। মস্ত বড় মাথা, কালো কুচকুচে গায়ের রঙ্‌, বোয়াল মাছের মত চোখ দুটো লাল টক্‌টক্ করছে। তাঁর কাছে পড়ব কি? যতক্ষণ ক্লাশে থাকি শিশুমন কাঁপে বলির পাঁঠার মত।”[২]

কিছুদিন যেতেই অবনীন্দ্রনাথ স্কুল ছাড়লেন একটি অদ্ভুত ঘটনার ফলে। বয়স তখন তাঁর আট বছর। ইংরেজী ভাষার মাস্টার মশায়ের সঙ্গে ‘পুডিং’-এর উচ্চারণ নিয়ে বালক ছাত্রের মতভেদ হোল স্কুল ছাড়ার প্রধান কারণ।

---

১. উনো দুনো—ভারতী : ফাল্গুন, ১৩২৬

২. জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৬

শিক্ষক বললেন, 'পাড্ডিং'। ছাত্র শুধরে দিয়ে বলে উঠলো, 'পুডিং'। একদিকে মাস্টার মশায়ের ছাত্রকে দিয়ে 'পাড্ডিং' বলাবার অদম্য চেষ্টা, অন্যদিকে ছাত্রটির জিদ। প্রতিদিন ছাত্রটি বাড়ীতে যা খান তার নাম ভুল হতে পারে না। এই বিশ্বাসে তার মুখে 'পুডিং' আর 'পাডিং' হোল না। ফলে প্রথম শাস্তি হোল ছুটির পরে একঘণ্টা কন্‌ফাইন্‌মেণ্ট। ছুটি হতে ছাত্ররা যে যার বাড়ী চলে গেল। অবনীন্দ্রনাথ কেবল স্কুলের জেলখানায় আরও এক ঘণ্টা বন্দী। বাইরে রামলাল গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছে। মাস্টার মশাই এলেন ছাত্রকে দিয়ে 'পাডিং' বলাতে। ছেলের তখনও সেই জিদ, বললেন 'পুডিং'। এবারে শিক্ষক ছাত্রের কচি হাত দুটোকে টানা পাখার দড়িতে বেঁধে সপাসপ্ বেত চালালেন তাঁর পিঠে। কিন্তু 'পুডিং' আর 'পাডিং' হোল না।

দেরি করে বাড়ী ফিরলেন অবন। ছোট পিসীমা জানতে চাইলেন, এত দেরি কেন। রামলালের মুখে সব শুনে সকলে তো অবাক্! বালকের পিতা পরদিন থেকেই স্কুলে যেতে তাঁকে বারণ করে দিলেন। পুত্রও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই করে পুডিং-এর কল্যাণে তাঁকে আর স্কুলে যেতে হয়নি। বাড়ীতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছিল।

গৃহশিক্ষক ব্যতীত পিতাও তাঁকে পড়াতেন মাঝে মাঝে। পরীক্ষাও নিতেন তিনি। একবার বাংলার ইতিহাসের পরীক্ষায় দাদাদের হারিয়ে দিয়ে পিতার কাছে পুরস্কারও পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই ইতিহাস বই পড়ে শেখা নয়। বাবামশায়ের মুখে শুনে শেখা। নয় দশ বছর বয়সে তিনি আবার ভর্ত্তি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের স্কুলে। তখন কিছুদিন আবার লেখাপড়ার চর্চ্চা হয়েছিল। নানা বিষয় নিয়ে কিছু কবিতা লেখা ও ছবি আঁকার কাজও চলেছিল সে-সময়। তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলেও পড়েছিলেন কিছুদিন। কিন্তু তাঁর শিল্পীমন কোনও স্কুলের গণ্ডিতে, বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে রাজী হয়নি। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার আগেই শেষবারের মত তিনি স্কুল ছেড়ে চলে আসেন।

তখন একটি ছোট কবিতা লিখেছিলেন। হেড্‌মাষ্টারের কাছে সেটি খুব প্রশংসা পেয়েছিল। কবিতাটি হোল—

"এস মা হৃদয়ে বসো,
হৃদির আঁধার নাশো।
দয়া করো আমারে মা,
আমি ক্ষুদ্র প্রাণী।"[১]

প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ নিজের পাঠ্যজীবনের স্মৃতি মন্থন করে লিখেছিলেন—

"এই দেখ না কবে যে Entrance পড়িয়াছি (পাশ কাটাইয়াছি) তাহার সঠিক হিসাব আমার নাই। তার একটা সুস্পষ্ট ছবি মনে আছে—সে বৎসর দুরন্ত গরম, morning class হইতেছে,—Head Master মহাশয়ের দাড়ি নড়িতেছে কি নড়িতেছে না—আর আমি বেঞ্চে বসিয়া গোলদীঘির স্থির জলে চাহিয়া আছি—বইখানার দিকে নয়।"[২]

পড়াশোনায় মন ছিল না, দুষ্টুমিতে ছিলেন তিনি পাকাপোক্ত। তবে সে দুষ্টুমির মধ্যে প্রকাশ পেত তাঁর সহজাত সৌন্দর্য্যবোধ, রঙের খেলার প্রতি তীব্র আকর্ষণ। তাঁর ছোট পিসীমার আফিং-এর কৌটোটি ছিল খুব সুন্দর। সেটি গোপনে সরিয়ে ফেলেছিলেন একদিন। বাড়ীর দোতলার বারান্দায় জল-ভরা বড় বড় টবে থাকতো সব লাল মাছ। মাছগুলি খেলে বেড়াত। দেখে অবন খুব আনন্দ পেতেন। একদিন তাঁর কি খেয়াল হোল মাছগুলি লাল, তাহলে জল লাল হলে আরও ভাল হবে। দুপুরবেলায় সকলের অজানতে কিশোর অবন কোথা থেকে কিছু লাল রঙ্‌ এনে মাছের টবেতে গুলে দিলেন। জল বেশ লাল হয়ে গেল বটে, কিন্তু কয়েকটি মাছের প্রাণবায়ুও চলে গেল। মাছ ক'টি জলের উপর ভেসে উঠতে বাড়ীসুদ্ধ হৈচৈ পড়ে গেল। সেদিনও ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। সেই জল রঙ্‌ করার পেছনেও ছিল তাঁর বর্ণবাহার ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগ।

অবনীন্দ্রনাথের পিতার ছিল পাখী পোষার শখ। খাঁচার পাখী দেখে দেখে বালক অবন আনন্দ পেতেন খুব। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভাল লাগতো তাঁর সেগুলিকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিতে পারলে। কিন্তু সাহসে

---

১. উনোদুনো ভারতী : ফাল্গুন, ১৩২৬

২. দুইদিক—ভারতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

কুলোত না। অবশেষে একদিন পাখীপ্রিয় এক ফিরিঙ্গী ছোকরাকে ধরে তাকে দিয়ে খাঁচার দরজা দিলেন খুলে। ফিরিঙ্গীটি অবনীন্দ্রনাথের পিতার কাছেই আসতো শ্রীরামপুর থেকে। খাঁচা খুলে দিতেই বনের পাখী উড়ে গেল বনে। অনেক চেষ্টা করেও তাদের আর ধরা গেল না। ফিরিঙ্গীও সেই সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ধরা পড়েছিলেন। খাঁচার পাখীকে মুক্তিদানের মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর সেই বিদ্যালয়ের আবদ্ধ জীবন থেকে একদা মুক্তিলাভের চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত। স্বাধীন মুক্ত-জীবনের প্রতি আগ্রহ।

তাঁর ছেলেবেলার আর একটি ভাল লাগার ব্যাপারেও দেখা যায় মহৎ শিল্পপ্রেরণার ইঙ্গিত। তা হোল সব জিনিসের ভেতরে কি আছে তা দেখার ইচ্ছে ও চেষ্টা। আস্ত জিনিসকে ভেঙ্গেচুরে দেখতেন তার মধ্যে কি আছে। তিনি নিজেই একথা বলেছেন—

"সবচেয়ে আমার ভালো লাগতো ভেতরে কি আছে তাই দেখতে। সব জিনিসেরই ভেতরে কী আছে তাই দেখবার চেষ্টা করতুম। কলের যে সব খেলনা পেতুম, সব দেখতুম খুলে খুলে, ভেতরে কী আছে। কিন্তু খেলনাগুলো আস্ত থাকতো না, ভেঙ্গে যেত একদম্। এখনো আমার ভাল লাগে খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে।"

এই উক্তিটির মধ্যে আছে তাঁর শেষ বয়সের কুটুম-কাটামের মূল প্রেরণার উৎস। জিনিসের ভেতরকার সৌন্দর্য্য ও রহস্য জানার ইচ্ছে ও আগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায় ভবিষ্যৎ জীবনে ভারত-শিল্পের মর্ম্মকথা ও অন্তরসম্পদ জানা ও উদ্ধারের পূর্ব্ব সূচনা।

তাঁর জ্যেঠাইমার ঘরের তাকে সাজানো থাকতো বাহারী রঙ্-এর সব দেবদেবীর মূর্ত্তি। কোনটি নীল কৃষ্ণমূর্ত্তি, কোনটি ধ্যানমগ্ন মহাদেব ও হরপার্ব্বতী। বালক অবন পুতুলগুলি দেখতেন আর খুব আনন্দ পেতেন। মনে মনে ভাবতেন, যদি ওর একটা পাওয়া যেত। অবশেষে একদিন বড়মাকে বলে-কয়ে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি আদায় করলেন। অবনের সেই ভেতর দেখার ইচ্ছের সুযোগ নিয়ে এক দাদা বললেন, ঠাকুরটিকে মাটিতে ফেলে দে, দেখবি, ওর মধ্যে থেকে ঠাকুরের জ্যোতি বেরোবে। আশ্চর্য্য কিছু দেখবার আশায় তিনি পুতুলটিকে ফেলে দিলেন মাটিতে। সেটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। দাদারা একচোট উচ্চ হাসি হাসলেন। আর কিশোর অবনীন্দ্রনাথ কেঁদে আকুল হলেন।

ছেলেবেলাতে নানা দুষ্টুমি করার প্রবণতা থাকলেও ঠাকুরবাড়ীর সাধারণ নিয়মে শিশু ও কিশোরদের জন্য নির্দিষ্ট কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় মানুষ হওয়ার ফলে অবনীন্দ্রনাথের জীবনছন্দও একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু গতি-প্রবাহে চলেছিল এগিয়ে। বিলাসিতা ও বাহুল্যবর্জিত পারিবারিক প্রথা ও পরিবেশ তাঁকে একটি অনবদ্য জীবনাদর্শের অধিকার দিয়েছিল। বাড়ীর বড়দের মহল, বিশেষতঃ তাঁর পিতার সৌখীন মন ও ক্রিয়াকলাপ, বাড়ীতে নানা উৎসব-আনন্দের জোয়ার তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের মূলে অবশ্যই রসসঞ্চার করেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের পিতাও ছিলেন শিল্পী। তিনিও ছবি আঁকতেন। সুতরাং চিত্রবিদ্যা অবনীন্দ্রনাথের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। কিন্তু বালক বয়সে পিতার হাতের ছবি দেখার কৌতূহল থাকলেও মেটানোর কোনও উপায় ছিল না। পিতার ছবি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"বাবা মশায়ের শখ ছিল ছবি আঁকার। জ্যোতিকাকামশায়ও ছবি আঁকতেন ; পোরট্রেট আঁকবার ঝোঁক ছিল তাঁর ; কিন্তু ছবি দেখাতো দূরের কথা, আমরা কি তাঁদের ঘরে ঢুকতে পেরেছি কখনও ?"[১]

অবনীন্দ্রনাথের পিতা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক সঙ্গেই আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন ১৮৬৪ সালে। তখন স্কুলটি ছিল বৌবাজারে। গুণেন্দ্রনাথ সেখানে দু'বছর শিক্ষালাভ করেন। স্কুলটি সে সময় প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ছিল। পরে সরকারী আওতায় চলে যায়। চিত্রাঙ্কন ব্যতীত গুণেন্দ্রনাথের আরও অনেক বিষয়ে শখ ও অনুরাগ ছিল। যেমন, ফটোগ্রাফী, বোটানি, বাগান করা ও পশুপাখী পোষা। অনেকবার তিনি প্রদর্শনীতে ফুল পাঠিয়ে প্রাইজও পেয়েছিলেন। অভিনয় কলায়ও ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। এহেন পিতার পুত্র অবনীন্দ্রনাথ।

ছোট পিসীমার ঘরে সাজানো ছবি দেখে শৈশবে ও কৈশোরে তিনি যে আনন্দ ও বিস্ময় বোধ করেছেন তার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি বাড়ীতে অন্দরমহলের নানা কাজকর্ম ও উৎসব-আনন্দের মধ্যে তিনি শিল্পীমনের যে অনেক খোরাক পেতেন, তাও বলেছেন বার বার। এমন কি পরিণত বয়সে ছবির মধ্যে তিনি অনেক পূর্ব্বস্মৃতি এবং স্বগৃহে দেখা অনেক বিষয় ধরে দিয়েছেন। মা-পিসীমাদের ক্রিয়াকলাপ, সাজসজ্জা ও প্রসাধন থেকে শুরু করে দাসদাসী, চাকরানীদের আনাগোনা, ফিরিওয়ালাদের বেচাকেনা,

বোষ্টমীর গান, চুড়িওয়ালীর চুড়ি পরানো, মেয়েদের খোপার প্যাঁচ—সব কিছুর স্মৃতি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন ভাবীকালে চিত্রপটে ধরে দেবার জন্য।

প্রসাধনরতা (১৯১৪-১৫) ও কনে সাজানোর ছবিতে তাঁর সেই স্মৃতির যে প্রতিফলন হয়েছে তা তিনি নিজেই বলেছেন।[১]

আনন্দ ও সুন্দরের বাল্যস্মৃতি যেমন বড় হয়ে পটে ধরে দিয়েছেন, তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে যে সত্য অনুভূতিগুলি হয়েছিল, যৌবনের শুরুতে ও শেষে যে সুখদুঃখের পালা চলেছিল তারও অনেক চিত্ররূপ পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে। যেমন, 'পদ্মপত্রে শিশির বিন্দু' ছবিখানি। বর্ণ বিন্যাসেও ভাবমূর্ত্তিতে সেটি অতি উচ্চাঙ্গের। এই ছবিখানি ও 'শাজাহানের মৃত্যু' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—"পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সে সব সুখের দিন গেল। তার স্বাদ পাওনি কি ওই নামের ছবিতে আমার।...সুখের স্বপ্ন ভাঙানো যে দাহ সেও সঞ্চিত ছিল অনেক দিন আগে থেকে। সুখের নীড়ে বাসা করেছিলাম, তবেই তো আঁকতে শিখে সে মনের সঞ্চয় ধরেছি সাজাহানের মৃত্যুশয্যা ছবিতে।"[২]

জোড়াসাঁকোর বাড়ীর পরেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের গোড়াপত্তন করতে সহায়তা করেছিল তাঁর পিতার কোন্নগরের বাগান-বাড়ীটি। সেখানে দিনগুলি তাঁর খুব আনন্দে কাটতো। সেখানকার গাছপালা, বাগান, বাড়ী-ঘর, গঙ্গানদীর দৃশ্য, নদীবক্ষে নৌকা, জেলে ডিঙ্গি, পিতার কাছে আগত নানা শ্রেণীর মানুষজন—সবই ছিল তাঁর কাছে কৌতূহলের বিষয়, কল্পনার খোরাক ও আনন্দের উৎস। বাগান-বাড়ীতেই তিনি প্রথম কৈশোরে কুঁড়ে ঘর আঁকতে অভ্যাস করেন। তখন কেবল পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়াই করতেন। অঙ্কনের পালা রীতিমত শুরু হয়নি। তার আগে যা একটু-আধটু আঁকতেন তা বিলিতী ড্রইং বই দেখে। এই বিষয়ে তাঁর বর্ণনা—

"সেই সেবার কোন্নগরে আমি কুঁড়েঘর আঁকতে শিখি। তখন একটু আধটু পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করি, এটা ওটা দাগি। বাগান থেকে দেখা যেত কয়েকটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের চালটা যে গোল হয়ে নেমে এসেছে, তা তখনই লক্ষ্য করি। এর আগে আঁকতুম কুঁড়েঘর—বিলিতি ড্রইং বই-এ যেমন কুঁড়েঘর আঁকে। দাদাদের কাছে শিখেছিলুম এক সময়ে। বাংলা দেশের কুঁড়েঘর কেমন তা সেইবারই জানলুম, আর এ পর্য্যন্ত ভুল হল না।"[৩]

---

১. বিশদ আলোচনা : অধ্যায় তেরো।
২. ৩. জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৫০, ২৫

অবনীন্দ্রনাথ কবে থেকে নিয়মিত চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে ছেলেবেলা থেকেই ছবি দেখা ও আঁকা ছু'দিকেই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। তখন তিনি ছোট ছেলে, তাঁর ছোট পিসেমশাই একবার তাঁকে একটি হাঁসের ছবি দিয়েছিলেন। সেটি তিনি কপি করেন। অনুলিপি প্রস্তুতের কাজ বোধ হয় এইটিই প্রথম। গোড়াতে রঙ্-তুলির কোনও আয়োজন ছিল না। পিতার টেবিল থেকে লাল নীল পেন্সিল এনে আর হলুদ গুলে রঙ্-এর কাজ চালাতেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আরও কিছু অঙ্কনের কাজ চলেছিল; সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় তাঁর একটি বন্ধু ছিল, নাম অনুকূল। তাঁর কাছে প্রথম তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী আঁকতে শেখেন। অনুকূলকে তিনি তাঁর ছবি আঁকার প্রথম গুরু বা মাস্টার বলে বর্ণনা দিয়েছেন।

তাঁর পিতামাতার কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রকে আর্টিস্ট করে তোলার কোনও ইচ্ছে চেষ্টা আদৌ ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"...তাঁদের (পিতামাতা) কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না যে, আমি আর্টিস্ট হই।...ছেলেকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেবার কোন চেষ্টা তাঁরা করেন নি। বাবার শখ ছিল বাগানের, তিনি একখানা মস্ত বাগান তৈরী করেছিলেন। তাঁর মাথায় সব সময় কিছু না কিছু প্ল্যান ঘুরত। পশুপক্ষী ভালবাসতেন তাই তাদের পুষেছিলেন, আমরা ছেলেরা ছিলুম তাদের শামিল হয়ে। গাছপালার মধ্যে ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতুম—কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করিনি। বাবার রং-তুলি, পেনসিল চুরি করে ছবি আঁকতুম। পটুয়া হবার বাসনা, কল্পনা কিছুমাত্র সে সময় ছিল না সে শুধু ছোট ছেলের শখ।"[১]

পিতার বাগানে অবনীন্দ্রনাথ সেই ছোটছেলের শখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। আপন খেয়ালে ছবি আঁকারও অনেক বিষয়বস্তু পেয়েছিলেন সেখানে। বাগানটি ছিল বিচিত্র ফুলে ফলে, পশুতে ও পাখীতে পরিপূর্ণ। ঘরে ঘরে ছিল কারুকার্য্য মণ্ডিত প্রচুর আসবাবপত্র। কাগজ, পেন্সিল ও রঙ্ নিয়ে কিশোর অবনীন্দ্রনাথ এঁকে যেতেন তাদের ছবি।

এইভাবে তাঁর খেয়ালে-খুশীতে ছবির পাতা ভরে উঠছে, কলকাতার বাড়ীতেও মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছেন, বাগানবাড়ীতে গিয়ে আরও আনন্দ

১. স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা ঠাকুর। পৃঃ ৩৭

ও অবাধ মুক্তির মধ্যে ছবি আঁকার পালা চলছে—এমন সময়ে অতি অকালে তাঁর পিতা আকস্মিকভাবে লোকান্তরিত হন পলতার বাগানবাড়ীতে। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে পলতার বাগানের সুখ-দুঃখের প্রভাবও পড়েছিল বহুল পরিমাণে। তখন অবনীন্দ্রনাথ নয় বৎসরের বালক। পিতাকে অকালে হারানোর দুঃখবেদনার অনুভূতি তাঁর কিশোর মনে কি হয়েছিল তা হয়ত সেদিন তিনি নিজেও সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু সেদিন তাঁর মাতৃদেবীর বেশবাসের পরিবর্ত্তন তাঁর কচি মনে যে বেদনা সঞ্চার করেছিল, তা তাঁর সারা জীবনের সমস্ত দিনগুলিকে মথিত করে চলেছিল। সেই ব্যথা-বেদনার স্মৃতি তাঁর চিত্তপটে যেন অক্ষয় হয়ে বসেছিল। পরিণত বয়সে, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে, বিপুল সৃষ্টিশক্তির অধিকার লাভ করেও তিনি তা ভুলতে পারেন নি। সেদিনটির কথা উল্লেখ করে শেষ বয়সে তিনি বলেছেন—

"মা সেদিন থেকে পরলেন শুভ্রবসন। অল্পবয়সে তাঁর এই সাজ পরিবর্ত্তন আমার শিশুমনে কি যে ব্যথার স্পর্শ দিয়েছিল এখনো তা মনের কোণে থেকে গেছে। তারই দরদ মিশিয়ে পরিণত বয়সে একদিন এঁকেছিলুম মায়ের বৈধব্য-মূর্ত্তি।"[১]

---

১. স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা ঠাকুর। পৃঃ ৪৪

॥ ২ ॥

পিতার মৃত্যুর পরে মায়ের স্নেহযত্নে অবনীন্দ্রনাথের দিন কাটছে, সংস্কৃত কলেজে পড়া চলছে; আর বাড়ীতে চলছে চিত্রাঙ্কনের কিছু কিছু কাজ। এমনি করে বয়স হোল তাঁর সতেরো। সেই সতেরো বছর বয়সেই মা তাঁকে বিয়ে দিয়ে সংসারে প্রবেশ করালেন। বিয়ে হোল ১৮৮৯ সালে, সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে। ইনি ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বংশজাত ভুজগেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। কালক্রমে অবনীন্দ্রনাথ চারটি কন্যা ও তিনটি পুত্রের পিতা হয়েছিলেন।[১]

বিয়ের পরেই তিনি পড়া ছেড়ে দিলেন। গান-বাজনা ও চিত্রচর্চ্চায় মেতে উঠলেন। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, "বিয়ের পর থেকেই লেখাপড়া কলেজ-জীবন শেষ হয়ে গেল, এল গান-বাজনা, নাচ দেখবার ঝোঁক; তাই নিয়ে থাকতুম মশগুল হয়ে। তারই সঙ্গে চলতো চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা। এই সময় নানা রকম ভাবালুতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছি। দেখতুম মা অনেক সময় ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন, কিন্তু তাঁর আশীর্ব্বাদে জীবনস্রোত বিপথে যায়নি।"[২]

এইভাবে গান-বাজনা ও চিত্রচর্চ্চার পালা চলেছিল বেশ কয়েক বছর। ওদিকে অবনীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হতে চললো। তখন তাঁর ভেতরে যেন তাগিদ এল যে বাস্তবিক একটা নিয়ম মত রীতি-পদ্ধতিতে চিত্রবিদ্যা শেখা দরকার। ছবি আঁকা ও তা শেখার কাজকে তিনি খুব সহজ মনে করতেন না। নিজের সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন যে, কষ্ট করেই তাঁকে ছবি আঁকা শিখতে হয়েছিল। বলেছেন—

"কি কষ্ট করে যে আমি ছবি আঁকা শিখেছি। তোমাদের মতন নয়, দিব্যি আরামের ঘর, কয়েক ঘণ্টা গিয়ে বসলুম, কিছু করলুম, মাষ্টার মশায় ভুলটুল শুধরে দিয়ে গেলেন।"[৩]

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তো অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন শুরু হয়েছিল। প্রথমে নর্মাল স্কুলে কুঁজো গ্লাস আঁকলেন। তারপরে সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় এঁকেছিলেন লক্ষ্মী সরস্বতীর ছবি। আর এদিকে বাড়ীতেও বেশ একটা

১. এই পুস্তকের শেষভাগে বংশলতা দ্রষ্টব্য।
২. স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা ঠাকুর। পৃঃ ৪৬
৩. জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১১৪

ছৈবিক আবহাওয়া চলছিল তখন। তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ সেণ্টজেভিয়ার্সে 'রীতিমত ছবি আঁকা শিখতেন, পুরস্কারও পেতেন।' বাড়ীতে তাঁর সত্যদাদা (পিসতুত) তেলরঙ্-এর ছবি আঁকতেন হরিনারায়ণ বাবুর কাছে। গগনেন্দ্রনাথও হরিবাবুর কাছে শিখতেন। তাঁর আর একজন পিসতুত ভাই এই বাড়ীতে বসেই হাতীর দাঁতে ছবি আঁকতেন। জনৈক দিল্লীওয়ালা তাঁকে সেই কাজ শেখাতেন। অবনীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে তা দেখে আসতেন। সেই দিল্লীওয়ালাই হিন্দুমেলাতে দিল্লীর মিনিয়েচার ছবি এনেছিলেন। আর তা দেখে অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে হোত তিনিও সেই রকম ছবি আঁকেন। কিন্তু সেই রকম করে ছবি আঁকা শেখার কোন সুযোগ তখন ছিল না। তবে রঙ্ নিয়ে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

এমনি করে আরও কয়েক বছর কেটে গেল। তারপরে একদিন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হোল যে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণের' ছবি করবেন। তখন তাঁর ছবি আঁকায়ও কিছু দখল হয়েছিল, বয়স ও বুদ্ধির পরিপক্কতারও কিছু অভাব ছিল না। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' অবলম্বনে তিনি ছবি এঁকেছিলেন দু'খানি।

একটি—

"সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,
সাগর সীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত তপন।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ॥
সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়ে লুটি';
করে পদ্মফুল
করে ঢুল-ঢুল,
অলসিত আঁখি সম আধো-আধো ফুটি'॥"

পটের একপাশে লেখা। ছবিটি উপরিভাগে। চিত্রপটে সূর্য্য অস্তাচল-গামী, চন্দ্রকলা জেগে উঠেছে। তার নীচে ডানাওয়ালা একটি পরী মেঘের মধ্য দিয়ে নেমে আসছে। পটের নীচের দিকে কাপড় জড়ানো শায়িত পুরুষমূর্ত্তি। পরীর চেহারা ও ভাবভঙ্গী পদ্মানুগ।

ছবিটি তুলির টানে এক রঙ্-এ অঙ্কিত। অতিশয় কোমল রচনা। বাস্তববাদিতা ও কল্পনার মিশ্রিত রূপ।

'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র দ্বিতীয় চিত্রায়ণ হয়েছিল নিম্নোক্ত কবিতাটি নিয়ে—

"কবির শিয়রে গিয়া ধীরে ধীরে
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।
পরশের বশে,
মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে।
অচেতন চেতন! ঘুমন্ত জাগা
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে কাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা॥
ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনো-মন্দিরে খুলি' দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে দেখিতে
অমনি চকিতে
এল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি।"

ছবিতে কি দিলেন শিল্পী? বিরাট চন্দ্রকলায় ঘেরা দৃশ্যপট। নীচে ঘুমন্ত কবির মাথায় পরী কমলকলিকা ছুঁইয়ে দিচ্ছে। পরীর পেছনে মেঘের মধ্যে অশ্বচালিত রথ আসছে। কবিতাটি লিখে তার মধ্যে একটি উড়ন্ত পরীর হাতে একটি চাবি। ছবিটি পুরোমাত্রায় বাস্তব। একবর্ণা চিত্র। আঙ্গিক, পদ্ধতি ও বিষয়বিন্যাস দুটি ছবিতেই এক প্রকার।

এই চিত্র দু'খানির মধ্যে আছে অবনীন্দ্রনাথের স্বয়ংসিদ্ধ কলারীতির গোড়ার কথা। তদবধি তিনি চিত্রাঙ্কনে পাঠগ্রহণ করার কোনও সুযোগ পাননি। তথাপি তাঁর তুলি ও কল্পনাতে যা সৃষ্টি হয়েছিল তা শিল্পগুণেও রূপচিত্র হিসেবে নিম্নপর্য্যায়ের নয়। বরং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ইউরোপীয় কি ভারতীয়—কোন রীতির সে কথা বড় নয়, বিষয়টির রূপায়ণ, চিত্রায়ণ ও কম্পোজিশনের দিকে ছবি দু'খানি অবনীন্দ্র-নাথের শিল্পীজীবনের সূচনা স্বরূপ ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে আছে।

ছবি দু'খানি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৮ সনের অগ্রহায়ণ ও পৌষ দু'টি সংখ্যায় পরপর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিলিপি হয়েছিল বেশ উচ্চাঙ্গের। মনে হয় মূল ছবির রস তাতে অটুট ছিল। 'বালক' পত্রিকার জন্য ঠাকুর বাড়ীতে একটি লিথোগ্রাফ প্রেস' বসানো হয়েছিল। সম্ভবতঃ সেই প্রেসেই এই ছবি দু'খানি মুদ্রিত হয়েছিল।

শিল্পীর সেই সময়কার স্কেচ ধরনের আরও কয়েকটি রচনা 'সাধনা'তে মুদ্রিত হয়েছিল। তার তিনটি রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার চিত্ররূপ। আর দুটি বিম্ববতীর ছবি। বিম্ববতীর একখানি ছবিতে (রেখাঙ্কন) দর্পণ হাতে দাঁড়ান নারীমূর্ত্তি। দ্বিতীয়টিতে একটি থামের গায়ে এলায়িতদেহা সেই নারীরূপ। কেশজাল, অলঙ্কারভার, বস্ত্র, উড়নি বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত। দাঁড়ান মূর্ত্তিটির পদক্ষেপ অতি সুন্দর।

'বধূ' কবিতার রেখাঙ্কনগুলি 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয় ১২৯৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যাতে। আর বিম্ববতী বেরিয়েছিল ১২৯৯ সনের বৈশাখ মাসে। চিত্রপটে শিল্পীর নামসহি নেই। পত্রিকার সূচীপত্রে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়েছিল।

এই স্কেচগুলি রচনাকালে অবনীন্দ্রনাথের বয়স কুড়ি বছর। কিন্তু তখনও চিত্রবিদ্যা নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। স্বপ্ন-প্রয়াণ, বধূ ও বিম্ববতীর চিত্রায়ণ প্রচেষ্টা দেখে অবনীন্দ্রনাথের 'মেজ-মা' (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) বললেন, "অবন, তোমাকে রীতিমত ছবি আঁকা শিখতে হবে।"

তিনি জোরজার করে তাঁকে যথার্থরূপে চিত্রাঙ্কন কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তখনকার ঠাকুরবাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের প্রতিভা-বিকাশের প্রধান সহায়িকা ও উৎসাহদাত্রী। 'বালক' কাগজের জন্য লিথোগ্রাফ প্রেসের প্রতিষ্ঠাত্রীও তিনিই।

অবনীন্দ্রনাথেরও তখন ইচ্ছে এবং চেষ্টা ছিল যে কি করে রীতিমত ছবি আঁকা শেখা যায়। তখন 'ভারতীয় শিল্প' ও সে বিষয়ে শিক্ষাদাতা বলে কোন কথা কারোর জানা ছিল না। সুতরাং বিলিতী প্রথায় শিক্ষালাভ ব্যতীত 'নান্যঃ পন্থা'। সেই সময় কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন ইতালীয় আর্টিস্ট মিঃ গিলার্ডি। 'মেজ-মা'ই ব্যবস্থা করে দিলেন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করবেন; আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে নয়। মাসে তিনচারটি ক্লাস নিতেন তিনি। প্রতিটি ক্লাসের জন্য কুড়ি টাকা করে দিতে হোত। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অবনীন্দ্র-জননীরও যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। পত্র মাতার অনুমতি নিতে গেলে তিনি বলেছিলেন—

"কোন কাজ তো করছিসনে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছিস্, তা শেখ না। একটা কিছু নিয়ে থাকবি, ভালই তো।"[১]

মাতার এই উক্তির মধ্যে একটা ব্যথা-করুণ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ পুত্র কোন নির্দ্দিষ্ট কাজে বা পড়াশোনায় ব্যাপৃত নন। তিনি আর্টিস্ট হবেন, এমন ইচ্ছে মায়ের মনে না থাকলেও কিছু না করে দিন কাটানোর চেয়ে ঢের ভাল। তখনকার কালে কেন, এই সেদিনও এমন ধারণা ছিল যে, যার কিছু হবে না সেই যাবে আর্ট স্কুলে, আর্ট শিখতে।

মাতার অনুমতি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ওয়েলেস্‌লি পার্কের কাছে গিলার্ডি সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে ছবি আঁকার পাঠ নিতেন। তিনি কোনদিনই আর্টস্কুলে শিক্ষালাভের জন্য যাননি। পরন্তু তাঁর গুরু গিলার্ডি সাহেব আর্ট স্কুলে যে পদে ছিলেন, ভাবীকালে তিনি সেই ভাইসপ্রিন্সিপালের পদেই হয়েছিলেন অধিষ্ঠিত। অবনীন্দ্রনাথের পিতা অবশ্য কিছুদিন আর্টস্কুলে পড়েছিলেন। এই সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"বাবা মশায় আর জ্যোতিকাকা মশায়ের মধ্যে খুব ভাব ছিল। একসঙ্গে তাঁরা আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। আমি যখন আর্ট স্কুলে যাই, সে রেকর্ড খুঁজে বের করি।"[২]

অনেকের ধারণা যে অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন অন্ততঃ আর্ট স্কুলে পড়েছিলেন। এই বিষয়ে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কলাবিদ্ W. G. Archer-ও তাঁর 'India and Modern Art' বইখানিতে একটি ভ্রান্ত মত প্রকাশ করেছেন।

"His equipment was limited to the training he had earlier received at the Government School of Art—a training which had left him a weak draughtsman and given him no feeling for strong design or powerful colour."

পরবর্ত্তীকালে অঙ্কিত অবনীন্দ্রনাথের মুঘল বিষয়ক চিত্র সম্বন্ধে মিঃ আর্চার উক্ত পুস্তকেই লিখেছেন (পৃঃ ৩৪, ৩৫)—

"In other, their basic qualities are those of Calcutta School of Art in which Abanindranath had all along been educated, a School which was still, in all essentials, simply and feebly British."

---

১. ২. জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২০, ৭৭

উক্তিদ্বয় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে বলেছেন—

"হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয় নয়, আমি কোনোকালেই আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইনি।"[১]

মিঃ গিলার্ডির কাছে অবনীন্দ্রনাথ গাছপালা, ডালপাতা থেকে শুরু করে মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনের পদ্ধতিও শিখেছিলেন। তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে শেখাতেন। প্যাষ্টেল ও তেলরঙ্ দুই-এর মাধ্যমেই শিক্ষালাভ হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই ছাত্র অনুভব করলেন যে, তাঁর শিক্ষালাভের কাজ যেন আর এগোচ্ছে না। তেলরঙ্-এর কাজ আরম্ভ করেই তাঁর মন আর ভরলো না। সেই অঙ্কনপদ্ধতি তাঁর অত্যন্ত একঘেয়ে মনে হতে লাগলো। গোড়ার দিকে গাছপালা অঙ্কনে বরং কিছু আনন্দ ও বৈচিত্র্যের স্বাদ পেতেন। কিন্তু তেল রঙ্-এর কাজে 'বাধাগঁতে'র মত ধীরে ধীরে তুলি টানার মধ্যে তিনি কোন রস পেতেন না। উৎসাহও ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে গেল। ছয় মাস মাত্র সেখানে শিক্ষালাভ করে চলে এলেন সেই স্টুডিয়ো ছেড়ে।

ওখানে চিত্রাঙ্কন শিখে অবনীন্দ্রনাথ একটা ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যে, নর্থলাইট ও মডেল না হলে ছবি আঁকা চলে না। আর্টিস্ট হতে হলে সুসজ্জিত স্টুডিয়ো চাই, না হলে তিনি কোথায় বসে ছবি আঁকবেন। বাড়ীর উত্তর দিকের একটি ঘরে অবনীন্দ্রনাথ স্টুডিয়ো সাজালেন। নর্থলাইট, সাউথ লাইট সব ঠিক করে নিয়ে দরজা-জানালা সমস্ত কিছুতে পর্দা খাটালেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। কবিগুরু তখন সবে তাঁর চিত্রাঙ্গদা রচনা শেষ করেছেন। কবি তাঁর শিল্পী ভাইপোকে বললেন, চিত্রাঙ্গদার ছবি করে দিতে হবে। ভাইপো তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি এঁকে ফেললেন কয়েকদিনের মধ্যে। রেখার টানে অঙ্কিত ছবিসহ চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হোল ১২৯৯ সনের ২৮শে ভাদ্র (ইং ১৮৯২)। সচিত্র বইটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন চিত্রশিল্পীকে।[২]

চিত্রাঙ্গদা চিত্রণের প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে প্রেরণা পেয়েছিলেন, তাকে তিনি চিরকালীন অনুপ্রেরণায় করেছিলেন পরিণত। তিনি বলেছেন—

---

১. রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২ শক।

২. বিশদ আলোচনার জন্য সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

"এই হল রবিকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তারপর থেকে এতকাল রবিকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।"[১]

চিত্রাঙ্গদার রেখাচিত্রে নারীমূর্ত্তির দেহরূপ ও সজ্জা অলঙ্করণের সঙ্গে বিম্ববতীর চিত্র দু'খানির মূর্ত্তিকল্পনা ও অনুষঙ্গ বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। একটি বছরের মধ্যেই বিম্ববতী ও চিত্রাঙ্গদার চিত্র অঙ্কনের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদার ছবিও কালিকলমের স্কেচজাতীয়। সুদৃঢ় রেখায় কল্পিত। তবে অতি পরিচ্ছন্ন, বলিষ্ঠ ও ছন্দোময়। শিল্পী ছবিগুলির কাজ শেষ করে লিখেছিলেন—সমাপ্ত, ২৮শে ভাদ্র, ১২৯৮, কটক। তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি চিত্রাঙ্গদার চিত্ররূপ দানকালে কটকে ছিলেন।

চিত্রাঙ্গদার রূপায়ণ ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম আর্ট নিয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। তারপরে সে ঘটনা ঘটেছে বারবার। কবিগুরু শিল্পাচার্য্যকে অনবরত চিত্ররচনার কাজে নানাভাবে উৎসাহ প্রেরণা দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ মিঃ গিলার্ডির কাছে প্যাস্টেলে মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কন আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছিলেন নানাভাবে ও ভঙ্গীতে। বাড়ীতে স্টুডিয়ো তৈরী করে, অনেকেরই প্রতিকৃতি রচনা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ থেকে অক্ষয়বাবু, মতিবাবু (ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারী) সকলেই তাঁর পটে রূপবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৯২-৯৪ সালের মধ্যেই তিনি চিত্রাঙ্গদার ছবি এঁকেছিলেন। আবার প্যাস্টেলে পোরট্রেট আঁকায়ও তখন সিদ্ধহস্ত হন। সেই সময় অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রতিকৃতিখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সেটিকে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের প্রারম্ভে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। সে যুগের চিত্রকলা রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি রাজা রবিবর্ম্মা তখন একবার কলকাতায় এসে ঠাকুরবাড়ীতে গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তখন সবে স্টুডিয়ো তৈরী করে কাজ শুরু করেছেন। রবিবর্ম্মা তাঁর স্টুডিয়োতে গিয়ে সব দেখেশুনে অত্যন্ত খুশী হন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। রবিবর্ম্মা সেদিন

১. জোড়াসাঁকোর ধারে: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২১

বলেছিলেন যে, 'তরুণ শিল্পীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।' আর পরবর্তীকালে বোম্বাই শিল্প-প্রদর্শনীতে তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখে খুশী হয়েছিলেন এবং শিল্পী সম্বন্ধে আরও খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করেন।

রাজা রবিবর্ম্মা ৫৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন, বাংলা ১৩১৩ সনের আশ্বিন মাসে। পরবর্ত্তী পৌষ মাসে অবনীন্দ্রনাথ 'স্বর্গীয় রবিবর্ম্মা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার প্রারম্ভে তিনি লিখেছিলেন—

"...বহুবৎসর হইল, চিত্রবিদ্যায় আমি তখন একজন শিক্ষার্থী মাত্র, সেইসময় একদিন এই জগদ্‌বিখ্যাত চিত্রকর আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; ঘরে না থাকায় আমার সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই। তিনি আমার তখনকার একখানা Sketch দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'It is rather ambitious for the young man,' অর্থাৎ ছোকরার সাহস ত কম নয়। এই তাহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং সম্প্রতি বোম্বাই শিল্প-প্রদর্শনীতে দেশীয় ধরনের আমার কতকগুলি ছবি দেখিয়া আমার সবিশেষ পরিচয় লইতে আমারই কোন বন্ধুকে পত্র লেখেন। সেই তাঁহার সহিত আমার শেষ আলাপ।"

রবিবর্ম্মা দু'বার উত্তর ভারত ভ্রমণে আসেন। একবার ১৮৮৮ সালে; দ্বিতীয়বার ১৮৯৪ সালে। মনে হয় তিনি প্রথমবারেই কলকাতায় এসে অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন। কারণ অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, সে সময় তিনি শিক্ষার্থী মাত্র।

ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কলা-জগতের ভাগ্য নিয়ন্তার সাক্ষাৎ দেখাশোনা, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়নি বটে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই রবিবর্ম্মার প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। রবিবর্ম্মা লোকান্তরিত হওয়ার পরে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার উপসংহারে দেখা যায়—

"চিত্রকর হইতে যে উৎকট শ্রম দরকার একথা অনেকে বোঝে না; রবিবর্ম্মার যে শিল্প এত সুলভে আজ আমাদের ঘরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, সেগুলি উৎপন্ন করিতে রবিবর্ম্মাকে কত নিরাশা কত না উপহাস উপেক্ষা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি আজ যে আনন্দের সৌন্দর্য্যের দান আমাদের জন্য রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেটুকু সংগ্রহ করিতে যে প্রাণপাত করিয়াছেন এবং সেজন্য রবিবর্ম্মা আমাদের কাছে যে চিরস্মরণীয় একথা দুইবার বলিতে হইবে না।"

তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠশিল্পীর উৎসাহ-প্রশংসা লাভ করে তরুণ অবনীন্দ্রনাথ যে আরও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা তো সহজেই অনুমেয়। প্যাস্টেলের কাজে তখন তাঁর হাত বেশ পাকাপোক্ত। কিন্তু মন তাঁর অতৃপ্ত। আরও ভাল করে অয়েলপেন্টিং শেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এলেন খ্যাতনামা ইংরেজ শিল্পী মিঃ সি. এল. পামার।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গিয়ে অয়েলপেন্টিং শেখার কাজে মন দিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। শিক্ষকের নির্দেশে মডেল দেখে তিনি একদিন তু'ঘণ্টায় একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরী করে ফেলেন। সাহেব মাষ্টার তা দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন, 'চমৎকার উতরে গেছে, Passed with credit।' জীবন্ত মডেল দেখেও অঙ্কনের ব্যবস্থা ছিল পামার সাহেবের স্টুডিয়োতে। মাঝে মাঝে কোন গোরাকে আনা হোত মডেল করার জন্য। তরুণ বাঙ্গালী ছাত্র, গুরু ইংরেজ। গোরা মডেল হতে এসে নগ্নদেহ হয়ে বসলে অবনীন্দ্রনাথ খুব মুস্কিলে পড়তেন। মন তাঁর তাতে সায় দিত না।

একদিন মডেল হতে এলেন একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চেহারা আঁকলেন। মহিলাটি ছবিখানি দেখে বললেন, 'টাকা চাইনে, ছবিটি চাই।' গুরু রক্ষা করলেন ছাত্রকে। তিনি মেমকে এক ধমক লাগিয়ে বিদেয় করে দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের তেলরঙ্-এর কাজ শেখা শেষ হতে পামার সাহেব বললেন,•এবারে মানবদেহের অস্থিসংস্থান বা অ্যানাটমি স্টাডি করতে হবে। তাহলে মানুষের মূর্তিচিত্র অঙ্কনের কাজ আরও সুন্দর, আরও নিখুঁত হবে। অতঃপর মিঃ পামার একটি মানুষের মাথার খুলি এনে দিলেন তাঁকে আঁকতে। ছাত্রের তো চক্ষুস্থির। দেখেই তাঁর মনে হোল ওর রোগের বীজ হাওয়ায় ভেসে আসছে। ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে বসলেন, গা ঘিনঘিন করতে লাগলো, শরীর উঠলো অস্থির হয়ে। সেকথা গুরুকে জানাতে তিনি বললেন, 'No, you must do it.' গুরুর আদেশ, অমান্য করা চলে না। কোনও রকমে কাজ শেষ করে তিনি বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভীষণ তেড়ে তাঁর জ্বর এল, ১০৬° ডিগ্রী। পরে তাঁর মা সব বৃত্তান্ত শুনে তখনকার মত ছেলের ছবি আঁকা দিলেন বন্ধ করে। কিন্তু তখনও জলরঙ্-এর কাজ শেখা সম্পূর্ণ হয়নি।

মিঃ পামারের স্টুডিয়োতে যাওয়া বন্ধ করে কিছুদিন তিনি বাড়ীতে বসে জনৈক নরওয়েজিয়ান ভদ্রলোকের কাছে ফরাসী ভাষা শেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পড়ার চেয়ে বেশী চলতো খাতার মার্জিনে মাষ্টারের চেহারার ছবি আঁকা ও স্কেচ করা। সুতরাং ফ্রেঞ্চ পড়া আর তেমন এগোয় নি। শিক্ষকটি এদেশেই মারা যান। অবনীন্দ্রনাথ পরে সেই স্কেচ অবলম্বন করে তাঁর পুরো একখানি প্রতিকৃতি রচনা করেন। বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে সেই মূর্ত্তিচিত্র তিনি নরওয়েতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর আত্মীয়স্বজনকে। তাঁরা সেটি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন।

জলরঙ্-এ হাত পাকানোর জন্য অবনীন্দ্রনাথকে আবার যেতে হয়েছিল মিঃ পামারের কাছে। শেখা হোল জলরঙ্-এর সব করণ-কৌশল। আর মন ডুবে গেল তাঁর নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র-মধ্যে। অবিলম্বে তিনি পুরোমাত্রায় একজন ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে উঠলেন। ইজেল ঘাড়ে করে রঙ্-এর বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এদিকে-ওদিকে। তারপরে চলে গেলেন তিনি মুঙ্গের ভ্রমণে। সেখানে ঘুরে ঘুরে অনেক দৃশ্যচিত্র এঁকেছিলেন। প্রায় ছয়মাস তিনি মুঙ্গেরে কাটান। গঙ্গার তীরে বসে তিনি প্রকৃতির কত বিচিত্র রূপ তুলে ধরলেন পটেতে। বিহার প্রদেশের গ্রামবাসী মানুষ, তাদের চেহারা-চরিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সব স্টাডি করেছিলেন চিত্রপটে সঠিকভাবে রূপদানের জন্য। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৮৯৫ সালের পরের কথা। কারণ তিনি মিঃ পামারের কাছে শিক্ষারত ছিলেন ১৮৯৩ থেকে ৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত।

মিঃ গিলার্ডি থেকে মিঃ পামার পর্য্যন্ত শিক্ষালাভের সময়ে অবনীন্দ্রনাথ যে ধরনের ছবি ও স্কেচ করেছিলেন, তার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। সঠিক কোন নিদর্শনের কথা বলা যায় না। তবে সেই সময় তাঁর রচনাবলীর মধ্যে মানুষের প্রতিকৃতি ও দৃশ্যচিত্রের বিশেষ একটি স্থান ছিল সুনিশ্চিত রূপে। তবে আরও এমন কতকগুলি ছবি ও স্কেচ পাওয়া গিয়েছে যার রচনাকাল নির্ণীত হয়েছে ১৮৮৯-৯৫ পর্য্যন্ত। আর সে সব স্কেচের অঙ্কনরীতি পুরাদস্তর পাশ্চাত্যপন্থী। এবং শিক্ষানবিসি কালের যে রচনা তাও স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। বিষয় হিসেবে তাতে পাওয়া যায়—কলসী কাঁকে নারীর পশ্চাৎ-দৃশ্য, ঝাঁকা মাথায় মেয়ের পার্শ্ব-দৃশ্য (তারিখ লিখিত ১৮৯৫), জলে ভাসমান-নৌকা, বজরা, দুটি মজুরনীর স্কেচ (১৮৯২), সারেঙ্গী বাদক, হাঁস, হরিণ, ভেড়া, নতজানু বালক, একজোড়া নাগরাই চটি, লাঠি

হাতে নীচুভঙ্গীর মানুষ (১৮৯৫), মাথায় হাত রেখে পা ছড়ানো নারীমূর্ত্তি, ছেনি, বাটালি ও হাতুড়ি নিয়ে কর্ম্মরত মিস্ত্রী, ধুধু মাঠে পালকী চলছে, তার পেছনে ঘোড়ার পিঠে মানুষ, দীপ, নারকেল গাছ (১৮৯০)। ১৮৮৯ সালের তারিখ যুক্ত একটি স্কেচে দেখা যায় পাহাড়ের কোলে গাছপালা, আর তার সঙ্গে শিল্পীর স্বরচিত কবিতা।[১] এই স্কেচগুলি দেখে মনে হয় তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষার সময় প্রত্যক্ষ দেখে স্টাডি হিসেবেই তা এঁকেছিলেন।

মিঃ পামারের কাছে শিক্ষালাভ ও তৎসম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের মনোভাব পরে কি রকম হয়েছিল তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্বনামধন্য শিল্পী জে. পি. গাঙ্গুলীর স্মৃতিচারণের মধ্যে। তিনিও ছিলেন পামার সাহেবের ছাত্র। সেদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ ও তিনি সহপাঠী। আবার নিকট আত্মীয়ও বটে। একসঙ্গে পামার সাহেবের কাছে তাঁরা দু'জনে শিক্ষালাভ করলেও পরবর্ত্তী, কালে হয়েছিলেন ভিন্ন পথের পথিক। যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর স্মৃতিচারণেতে দেখা যায়—

"...A foreign artist Mr. Charles Palmer, once a professor at the South Kensington Art School was residing in the vicinity of our house. Promptly we both started taking lessons from him. After a year and half's attendance uncle Aban gave that up too, probably owing to his inherent distaste for the rigid technique of European paintings. I alone was left with Mr. Palmer and stuck to him for many years."[২]

---

১. বর্ণিত স্কেচগুলির অধিকাংশই প্রতিলিপি ও 'ফটোগ্রাফের মাধ্যমে বারাণসীর ভারত কলাভবনে সংরক্ষিত আছে।

২. Visva Bharati Quarterly : May, 1947.

॥ ৩ ॥

পামার সাহেবের কাছে শিক্ষালাভের পর্ব্ব শেষ হোল, অনেক ছবির পট রঙ-রেখায় ভরে উঠলো, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মনের পাতা ভরলো না। তা যেন শূন্য রয়ে গেল। মনে তাঁর নিদারুণ অতৃপ্তি। কি যেন একটা অভাববোধ তাঁর মনকে পীড়িত করে চলেছিল। এমন সময় আকস্মিকভাবে একদিন এল অদ্ভুত এক পরিবর্ত্তনের পালা। অন্তরে যা তিনি চেয়েছিলেন, যা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়েছিল, তা পেয়ে গেলেন নিজেদের বাড়ীতেই। তা হোল মুঘল যুগের সুচিত্রিত একটি পাণ্ডুলিপি পুঁথি। আর তা পাওয়া গিয়েছিল তাঁর প্রপিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের লাইব্রেরীতে।

মুঘল চিত্র কি, কি তার রীতি-পদ্ধতি ও সৌন্দর্য্য-সুষমা, কিছুই জানা ছিল না তাঁর। পুঁথিখানিতে ছিল অনেক ছবি। তাদের কারুকলা ও বর্ণ-বাহার দেখে তিনি অবাক হলেন, আনন্দ ও বিস্ময়ে হলেন বিমুগ্ধ। চিত্রকলার নতুন ও অভিনব একটি অজানা রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হোল তাঁর চোখের সামনে। ভারতীয় চিত্রকলার একটি বিশিষ্ট শাখার রূপবৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার সন্ধান পেলেন তিনি, সেই পুঁথিটির পাতায় পাতায়।

ক্রমে আরও সব নতুন খোরাক এসে জুটলো। অবনীন্দ্রনাথের ছোট দাদামশাই নগেন্দ্রনাথের (দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র) কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। তাঁর চেহারা ছিল অতি সুন্দর। অবনীন্দ্রনাথ বড় হয়ে নানা জায়গায় তাঁর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রের খোঁজ-খবর চালিয়েছিলেন। সেই সময় বিলেত থেকে এক ভদ্রমহিলা, নাম মিসেস্ মার্টিন্‌ডেল তা জানতে পেরে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনিও ছবি আঁকতেন। প্রথম দফে তিনি পাঠালেন অবনীন্দ্র-তনয়ার জন্য বড় একটি বিলিতী পুতুল। তারপরে এল বই-এর পাতার চারিদিকে অঙ্কিত নক্সার নমুনা ও বড়ো বড়ো দশ-বারোখানি ছবি। ছবিগুলি ছিল অত্যন্ত মনোরম। অবনীন্দ্রনাথ তা দেখে তো একেবারে মুগ্ধ ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। সেই বাবদে তিনি মেমসাহেবকে কিছু টাকাও পাঠিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পরে আরও একটি শুভদিন এসেছিল নতুন এক অধ্যায়ের বার্ত্তা বহন করে। অবনীন্দ্রনাথের ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিল্লী

থেকে একখানি পার্শিয়ান ছবির বই এনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তাতে ছিল দিল্লী নগরীর নানা রূপচিত্র। তৎপূর্ব্বে তিনি হিন্দুমেলাতেও দিল্লীর মিনিয়েচার ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেক দিন সেকথা তাঁর মনেও ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ তখন বালক, একবার তাঁর পিতা দিল্লীতে বেড়াতে যান। তখন তিনি পিতাকে লিখেছিলেন আগ্রা-দিল্লীর ছবি আনতে। পিতা ফিরে এসে কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে একটি কাগজের তাড়া দিলেন। খুলে দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে দিল্লী ও আগ্রার কতকগুলি পটচিত্র। সাদা কাগজে কালীঘাট ও লক্ষ্নৌ-এর পটের মত হাতে আঁকা আগ্রা-দিল্লীর ছবি। কয়েক দিন নাড়াচাড়া করে বালক অবনীন্দ্রনাথ তা হারিয়ে ফেললেন। বালক বয়সে তিনি ছবিগুলির সঠিক মূল্য বুঝতে পারেন নি। তবে তাঁর মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল; তাঁর অন্তরে তা গেঁথে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথও একবার কিশোর অবনীন্দ্রনাথকে রবিবর্ম্মার কয়েকটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু ভগ্নীপতির উপহারটি ও মিসেস মার্টিনডেল-এর প্রেরিত বইখানির নক্সা তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল। দুটি ভিন্নদেশীয় পুরাতন চিত্রমধ্যে তিনি যেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের সন্ধান পেলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, দুই দেশের প্রাচীন চিত্রকলার গোড়ার কথা এক। দিল্লীর চিত্র সমন্বিত বইটি সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে দস্তুরমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"··সে যে কি আনন্দ, সেই সময় 'সাধনা'তে আমার ওই ইন্দ্রসভার বইখানির বর্ণনা দিয়ে 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' বলে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন, চারদিকে তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।"[১]

প্রপিতামহের লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত মুঘল চিত্র ও ভগ্নিপতির প্রদত্ত পারসীক চিত্রই তাঁকে অধিকতর ভাবে করেছিল অনুপ্রাণিত। তিনি নতুন পথে, নবভাবে চিত্ররচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। পারসীক চিত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলশ্রুতি দেখা গেল, গায়ক ও বাদকের রেখাচিত্রে (১৮৯৯?)। চিত্রখানির পরিকল্পনা, বিষয় বিন্যাস ও দেহভঙ্গীতে পারসীক প্রভাব সুস্পষ্ট। ফুল, লতা-পাতা ও পোশাক-পরিচ্ছদে আবার ভারতীয় রীতি প্রযুক্ত করার চেষ্টা দেখা

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২৪

যায়। তার ফলে এই রেখাচিত্রটির মধ্যে শিল্পীর পারসীক কলায় বিমুগ্ধচিত্ত ও স্বদেশের শিল্প সম্বন্ধে সচেতন মনের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

এরপরে তিনি ক্রমশঃ পাশ্চাত্য প্রথায় চিত্রাঙ্কন বর্জন করে ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্র-লক্ষণার অনুবর্ত্তী হয়ে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, আঁকবেন কি? দেশীয় শিল্পরীতির পথ খুজে পেলেন, কিন্তু কি বিষয় তিনি চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলবেন, তা নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন! সেই সমস্যারও সমাধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে নিয়ে তার চিত্ররূপ দান করা হোক। অর্থাৎ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দেবার কথাই তিনি বলেছিলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায় যে বৈষ্ণব কবিতাটি সর্ব্বপ্রথম রূপ লাভ করেছিল, সেটি গোবিন্দ-দাসের রচিত শ্রীমতীর অভিসারের পদ। শিল্পী চিত্রপটের উপরিভাগে ও নীচে দু'ভাগ করে কবিতাটি চমৎকার এক অক্ষর পদ্ধতিতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে গোবিন্দদাসের ভণিতা রয়েছে। বস্তুতঃই পদটি গোবিন্দদাসের; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণেতে ওটিকে চণ্ডীদাসের পদ বলে'ছন। তার ফলে নানা প্রবন্ধ ও পুস্তকে তা স্থায়ীভাবে চণ্ডীদাসের রচনা হিসেবে স্থান লাভ করেছে। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রটির নাম দিয়েছেন 'শুক্লাভিসার'। চিত্রায়িত ও পটে উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের পদটি :

পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিমকর হিমকরু বন্দ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন করু ঝাঁপ॥
সখি হেরি চমক মোহে নাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল যাই॥
পরিহারি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাই দলই।
কণ্টক বাটে কতিহু নাই টলই॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাঁহা নবীন সুলেহ॥

দেশী মতে ছবি হোল বটে, কিন্তু মন তাঁর তৃপ্ত হোল না। হিমের রাতে ধবলিত বসনে শ্রীমতী অভিসারে চলেছেন। কিন্তু শিল্পীর নিজেরই মনে হোল, "দেশী রাধিকা হল না, সে হল যেন মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের রাতে ছেড়ে দিয়েছি।"[১]

চিত্রপটের পরিবেশ ও বস্ত্র-বিন্যাসেও বিদেশী প্রভাব পড়েছিল প্রভূত পরিমাণে। বিলিতী বুক্ ইলাসট্রেশনের রীতিতে কবিতাটি পটের দু'দিকে ভাগ করে দিয়ে মাঝখানে ছবি। গাছপালা ও উদ্ভিজ্জ নক্সাদি পাশ্চাত্য প্রথায় কল্পিত।

মনের মত ছবি হোল না। অবনীন্দ্রনাথ খুব মুষড়ে পড়লেন। তবে অনতিবিলম্বে আবার তাঁর মনে দৃঢ় সংকল্প এল, 'দেশী টেক্‌নিক্ শিখতে হবে।' সুতরাং পুনরায় কাজে লেগে গেলেন। ছবিতে সোনা লাগানোর কাজ শিখলেন তিনি রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাড়ীতে এক মিস্ত্রী ফ্রেমের কাজ করতো তার কাছে। নানা উপায়ে সবরকম দেশী-বিদেশী টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, আর তাঁর আত্মবিশ্বাসের সীমা রইল না। আবার বৈষ্ণব পদাবলীর চিত্রায়ণে ব্যাপৃত হলেন এবং সোনা-রূপার তবক লাগিয়ে কৃষ্ণলীলার এক সিরিজ ছবি এঁকে ফেললেন কয়েক দিনের মধ্যে। তা সংখ্যায় দাঁড়াল কুড়িখানা।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সেই চিত্রের কোন কোনটির তিনি দ্বিতীয় সংস্করণও করেছিলেন স্বহস্তেই। প্রথম পর্ব্বের কৃষ্ণলীলা সিরিজের চিত্র রচনা আরম্ভ হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে, আর সমাপ্তি ঘটেছিল রাধাকৃষ্ণের মিলন দৃশ্যে। চিত্রায়িত বিষয়সমূহ এই—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শিশুকৃষ্ণ, গোচারণ, গোধূলিতে শ্রীকৃষ্ণের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, পুষ্পরাধা, নৌবিহার, দানলীলা, মিলন-পথে, ঝুলন, রাসনৃত্য, রাধার প্রতীক্ষা, রাধার ক্রোধ ও মান, বসন্তউৎসব, বিদায়, নিরালায় রাধিকা, মথুরায় রাজা কৃষ্ণ, প্রেমবার্ত্তা, অভ্যর্থনার আয়োজন ও মিলন।

এই সিরিজের ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্ররীতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন। আবহমণ্ডল, পরিবেশ, মূর্ত্তিরূপায়ণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুর কল্পনা ভারতীয়। কিন্তু গাছপালা, আকাশ, মাটি, ক্ষেত্র প্রভৃতি রূপায়ণে তখনও তিনি বিদেশী রীতির দ্বারা চালিত হয়েছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ

১. জোড়াসাঁকোর ধারে: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২৪

দেশীয় প্রথায় কল্পিত। তাহলেও রেখার মাধ্যমে বস্ত্র বিন্যাস ও তার ভাঁজ-খাঁজ আনয়নে দেশীয় পন্থা গ্রহণ করেন নি। স্থানে স্থানে আলোছায়ার দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য মধ্যেও তাঁর পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষার ছাপ হয়েছে প্রতিফলিত। মূর্ত্তিরচনাও একটা বাঁধা-ধরা নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে দুর্ব্বলতার ছাপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় পদ্ধতির রেখাপ্রধান সবল সজীব দেহরূপ রচনার কৌশল তখনও অনায়ত্ত। যাবতীয় মূর্ত্তি, নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে ক্ষীণতনু (slender figure)। তার ফলে সমগ্ররূপে একটা দুর্ব্বল ভাব হয়েছে প্রস্ফুট। ফর্ম বা আকৃতি নিজস্ব বিশিষ্টতা লাভ করেনি এই চিত্রাবলীর মধ্যে। মূর্ত্তিরূপায়ণ ও ভাবভঙ্গী যেন একটা ছকে বাঁধা পদ্ধতিতে চলেছিল। চিত্রগুলি বর্ণাঢ্য এবং বস্তু সমাবেশ ত্রুটীহীন ও জমজমাট রূপের। তাহলেও মূর্ত্তিগুলির দেহরূপে দুর্ব্বলতার প্রকাশ হওয়াতে চিত্রপটে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না। ফলে রসসৃষ্টি বিঘ্নিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিতার চিত্তহারী, রসসঞ্চারী স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন এ চিত্রে নেই।

শিল্পী নিজেও এই ছবিগুলি এঁকে তৃপ্তিলাভ করেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। ছবিগুলি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

"সেই পদ্ধতি (ভারতীয়) আয়ত্ত করার জন্য তখন উঠে পড়ে কৃষ্ণচরিত আঁকতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, তাতে মনের তৃপ্তি হয়নি।...শুধু রূপ নিয়ে আর কতদিন চলবে? প্রাণ কই? মন বললে, আমি কি করতে পারি, আমার কি দেবার আছে? ভিতর থেকে সাড়া পেলুম, সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" (স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা ঠাকুর। পৃঃ ৬৮)

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু একটি বিষয়ে বিশেষ সার্থকতার ছাপ রেখেছিলেন সেই শুভারম্ভের রচনাবলীতে। তা হচ্ছে চিত্রে স্থাপত্যসংস্থান ও তার গঠনপদ্ধতি এবং বর্ণপ্রয়োগে সামঞ্জস্যবোধ। কৃষ্ণলীলার চিত্রগুচ্ছে স্থাপত্যকল্পনায় অবনীন্দ্রনাথ সিদ্ধশিল্পী, (finished artist)। স্থাপত্য—তা পাকা বাড়ী হোক, আর খড়ের চালা ঘরই হোক, তার রঙ, রেখা, নক্সা, পরিকল্পনা, গঠনভঙ্গী সব নিখুঁত, সুন্দর ও পরিপাটি। পটের গায়ে ফাঁকে ফাঁকে সোনার জলের টান ও আখর ছবিতে অনেকখানি নতুনত্ব ও অভিনবত্ব এনে দিয়েছে।

আঙ্গিক-রীতি ও রূপ রচনায় কিছু ত্রুটী বা দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হলেও, এই চিত্র সিরিজ ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে একটি অমূল্য অধ্যায় রচনা করেছে। মধ্যযুগে ভারতীয় রীতিতে রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রে কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ হয়েছে অজস্রধারায়। আর তা সীমাহীন, সংখ্যাহীন। তারপর

যুগ পরিবর্ত্তনে, ভারতের কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পালাবদলে ও বিলিতী চিত্র পদ্ধতির বহুল প্রচলনের ফলে দেশজ সেই চিত্রধারার প্রবাহ যায় ক্ষীণ হয়ে। সেই ক্ষীণস্রোতা শিল্পধারায় অবনীন্দ্রনাথ নতুন প্রবাহ এনে তাকে নবীনতায় সঞ্জীবিত করবার প্রয়াস-পথে পদক্ষেপের যে স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্যই আজ বড় কথা। রঙ, রেখা ও আঙ্গিক-পদ্ধতির উপরে গিয়ে তা আজ ঐতিহাসিক নিদর্শন।

ভাবরস প্রকাশের দিকে ছবিগুলি খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও এবং শিল্পী নিজেও কিছুটা অতৃপ্তি অনুভব করলেও, তা রচনাকালে কিন্তু তিনি আত্মহারা হয়ে রূপের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে কাজ করে চলেছিলেন। একথা অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন চিত্রাঙ্কনে বারে বারে যে ব্যর্থতা এসেছিল এবং পুনঃ পুনঃ সেই ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই যে তাঁকে সাফল্যের শিখরে উঠতে হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে। জীবনের শেষবেলাতে পূর্ব্বস্মৃতিমন্থনকালে বলেছেন যে, তিনি জীবনে দু'বার মাত্র আত্মভোলা হয়ে চরম আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন চিত্ররচনার সময়। একবার প্রথমপর্ব্বে কৃষ্ণলীলা অঙ্কনের সময়, আর দ্বিতীয়বার মাতৃবিয়োগের পরে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে মায়ের মূর্ত্তিচিত্র রচনার সময়। এই দুইটি আনন্দময় রসঘন মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"কেন বলি যে আমার আর্টের বেলায় ক্রমাগত ব্যর্থতা? কি দুঃখ যে আমি পেয়েছি আমার ছবির জীবনে। যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে, তার কতটুকু আমি আমার ছবিতে দিতে পেরেছি? যে রঙ, যে রূপ, রস মনে থাকত, চোখে ভাসত, যখন দেখতুম তার সিকি ভাগও দিতে পারলুম না, তখনকার মনের অবস্থা, মনের বেদনা অবর্ণনীয়। চিরকালটা এই দুঃখের সঙ্গে যুঝে এসেছি। ছবিতে আনন্দ আর কতটুকু পেয়েছি। শুধু দু'বার আমার জীবনে আনন্দময় ভাব এসেছিল, দু'বার আমি নিজেকে ভুলে বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম। ছবিতে ও আমাতে কোন তফাত ছিল না—আত্মহারা হয়ে ছবি এঁকেছি। একবার হয়েছিল আমার কৃষ্ণচরিত্রের ছবিগুলি যখন আঁকি। সারা মন প্রাণ আমার কৃষ্ণের ছবিতে ভরে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই চারিদিকে ছবি দেখি আর কাগজে হাত ছোঁয়ালেই ফস ফস করে ছবি বেরয়; কিছু ভাবতে হয় না, যা করছি তাই এক-একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে। তখন কৃষ্ণের সব বয়সের লীলার ছবি দেখতে পেতুম, প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি রঙ্ সমেত। সেই ভাব আমার আর এল না।

আর একবার এসেছিল কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। সেবারে হচ্ছে মার আবির্ভাব, মৃত্যুর পর।"[১]

প্রথম প্রচেষ্টায় রাধাকৃষ্ণ সিরিজের কয়েকখানি ছবি এঁকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় শিল্পগুরু মিঃ পামারকে দেখাতে নিয়ে যান। তিনি ছবিগুলি দেখে ছাত্রকে প্রশংসা করে উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেকথা জানা যায় অবনীন্দ্রনাথের আত্মীয় ও সহপাঠী প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী প্রকাশ গাঙ্গুলীর বর্ণনাতে। তিনি লিখেছিলেন—

"One day uncle Aban brought to Mr. Palmer several miniature paintings of Krishnalila (Life of Lord Krishna) done in colourful Indian style. Mr. Palmer praised them heartily and said, 'Mr. Tagore, I should strongly advise you to proceed in this line and produce more pictures of similar nature. These pictures have a character of their own. You require no studies from life any more. I shall be greatly pleased to see your work from time to time.'[২]"

চিত্রগুলি রচনার সময়ে কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে একটি কঠিন পরীক্ষা ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ কৃষ্ণলীলা নিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছেন। তিনি ছবিতে মশগুল। এমন সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অন্যতম প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা ও পরম বৈষ্ণবভক্ত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় জানতে পারলেন যে, ঠাকুরবাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথ নতুন ধরনে কৃষ্ণলীলার ছবি করেছেন। খবরটি শুনেই তিনি চলে এলেন সেখানে সেই ছবি দেখার আগ্রহ নিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ বাড়ীর নীচের তলার একটি ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে তখন ছবি আঁকছিলেন। ঘোষ মহাশয় এসে আত্মপরিচয় দিয়ে শিল্পীকে বললেন, "তুমি কৃষ্ণের ছবি আঁকছ, তাই শুনে দেখতে এলুম।"

অবনীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে তাঁকে ঘরে বসিয়ে একটি একটি করে সমস্ত ছবি দেখালেন। ছবিগুলি দেখে পরিশেষে তিনি মন্তব্য করলেন,

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৩০-৩১

২. Visva Bharati Quarterly : May, 1942.

"হুঁ, কি এঁকেছ তুমি? একি রাধাকৃষ্ণের ছবি? লম্বা লম্বা সরু সরু হাত-পা যেন কাঠখোট্টাই—এই কি গড়ন? রাধার হাত হবে নিটোল, নধর তাঁর শরীর। জান না তাঁর রূপবর্ণনা?"

এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। শিল্পী তখনকার মত একটু অপ্রস্তুত ও বিস্মিত হলেও বিচলিত হননি। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ছবিগুলি দেখেছিলেন ভক্তের চোখ দিয়ে। আর অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণের রূপদান করেছিলেন শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখে ও শিল্পীর মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাইতো ভক্তপ্রবর হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। চিত্রপটে তিনি তাঁর ধ্যানের ধন শ্যামল সুন্দর মুরলীধারীকে খুঁজে পেলেন না। পরন্তু শিল্পী তাঁর এক ছাত্রকে ধ্যান করে দুর্গামূর্ত্তি আঁকতে বারণ করে চোখ খুলে দেখে শুনে নিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, চোখ খুলে দেখলেই ছবি আঁকতে পারবেন ছাত্র। 'যোগীর ধ্যানে ও শিল্পীর ধ্যানে এইখানেই তফাত।' অবনীন্দ্রনাথ এই মতটি ব্যক্ত করেছিলেন একদিন তরুণ শিক্ষার্থী ও ভাবীকালের খ্যাতনামা বিপ্লবী বারীন ঘোষকে তাঁর নির্দেশ-উপদেশ দান কালে।

অবনীন্দ্রনাথ নিজ জীবন দিয়ে এই সত্য, এই আদর্শ উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে। একবার তাঁর কি খেয়াল হোল নির্জনে ছাদে বসে চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভগবানকে ডাকবেন। কাজেও তা করলেন। কিন্তু একদিন সেই ধ্যানে বসে তিনি অনুভব করলেন, কে যেন কানের কাছে বলছে, 'কি দেখ্ছিস চোখ বুজে, চোখ খুলে দেখ।'

চমকে উঠে তিনি দেখলেন, সামনে আকাশ লাল টকটক্ করছে, সূর্য্যোদয় হচ্ছে। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে সৃষ্টিকর্ত্তার সেই প্রভা চোখ মেলে না দেখে তিনি কেন চোখ বুজে তাঁকে খুঁজতে চেষ্টা করছেন। সেই দিন তিনি আরও বুঝলেন যে তাঁর রাস্তা ওটি নয়, চোখ বুজে ঈশ্বরকে দেখতে চাওয়া ভুল। শিল্পী জীবনভোর তাঁকে দু'চোখ খুলে দেখবেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি চোখ খুলেই সব দেখেছেন। সেই দেখা জগতের রূপকে তিনি মনের মাধুরী-লহরীতে সিক্ত করে, হৃদয়ের উত্তাপে জারিয়ে নিয়ে, নব নব অভিনব রূপ রচনা করেছেন। প্রকৃতির রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর রূপ-অরূপের চিত্রায়ণে কালি ছিল, কলম ছিল, আরও ছিল মন। সুতরাং বাহির ও অন্তর দুই-এরই সমান স্থান। আগে বাহির পরে অন্তর। তিনি বলেছেন—

"কালি কলম মন, লেখে তিনজন। ছবিটি আঁকি, তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি। সেই ছবিটি হয় মাস্টার-পিস্।"

তাঁর মতে অন্তর ও বাহির, চোখ ও মন—দুই একসঙ্গে কাজ করলেও আবার দ্বন্দ্ব-বিরোধও আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "চোখ যত জিনিস দেখছে সে বড় কথা নয়। কিন্তু সব কি আর মনে ধরছে, সেইগুলিই কাজে আসছে আমাদের ছবিতে।"

আবার বললেন, "চোখে মনে ঝগড়া—মন বলে, 'চোখ তুমি ধরে রাখতে পারো না।' চোখ বলে, 'নিজের মনকে না বুঝে আমায় দোষো কেন?'।"

চোখ ও মনের এই দ্বন্দ্ব-ঝগড়া তিনি অনুভব করতেন। আবার তা মিটিয়ে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে বিচিত্র ও অতুলনীয় রূপের রাজ্য সৃষ্টি করেছেন।

মহাত্মা শিশিরকুমারের বিরূপ মন্তব্য শুনে তিনি দমেন নি। ছবি আঁকা চলতে লাগলো পুরোদমে। কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ শেষ হতে তিনি আঁকলেন বেতালপঞ্চবিংশতির ছবি। তারপরে ধরলেন বুদ্ধচরিত। এক-একটি বই ধরেন, আর ছবির পর ছবি আঁকেন। এক-একখানি বই-এর ছবি সংখ্যায় দাঁড়িয়েছিল কুড়ি-পঁচিশখানা। সেই সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি আমি দেখতে পাই—তার রূপ, তার রেখা, যায় প্রত্যেক রঙের শেড্ পর্য্যন্ত।...ছবিতে আমার তখন মন-প্রাণ ভরপুর, হাত লাগাতেই এক-একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে।"[১]

কৃষ্ণলীলার চিত্র সম্বন্ধে লম্বা লম্বা হাত-পা, কাঠখোট্টাই গড়ন ইত্যাদি যে সকল মন্তব্য তাঁকে শুনতে হয়েছিল ভক্তিমান দর্শকের কাছে, তা কিন্তু পরবর্ত্তী কালের সমালোচকদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে অনেকবার। অথচ তিনি কিছুদিনের মধ্যেই চিত্রাঙ্কনে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রতিদিন কত নতুন ও অভিনব রূপ করেছেন রচনা। কোন একঘেয়েমি বা গতানুগতিকতার প্রশ্ন ছিল না সেখানে।

ভারতের কাব্য-সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনীর চিত্রই তিনি প্রথম পর্য্যায়ে এঁকেছিলেন, কিন্তু আঙ্গিক-পদ্ধতিতে তা নবীনতা ও নতুন পথের সন্ধান

১. জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২৫

দিয়েছিল। প্রতিটি চিত্রের বিষয়বস্তু যেমন স্বতন্ত্র, ভাব-ভাষা ও পরিকল্পনাও তেমনি ভিন্ন। ঋতুসংহারের কয়েকখানি চিত্র ব্যতীত অন্যান্য চিত্রপটে মূর্ত্তিকল্পনা ও পরিবেশ-পরিমণ্ডল রচনায় তিনি সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারা ও করণ-কৌশলের ছাপ রেখে এগিয়ে চলেছিলেন। কৃষ্ণলীলার চিত্রায়ণ অন্তে শিল্পীর মনে যে অতৃপ্তির সঞ্চার হয়েছিল, তার ফলেই তিনি নতুন নতুন চিত্রাঙ্কনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

গিলার্ডি-পামারের ছাত্ররূপে এবং তার পূর্বে যা এঁকেছিলেন, তা ছিল বাস্তবধর্ম্মী। আশেপাশে যা দেখেছেন তারাই প্রতিফলন হোত ছবিতে। নিজের মনের অতলে ডুব দিয়ে রূপানুসন্ধান তিনি তখনও করেন নি। অতঃপর ভারতীয় অর্থাৎ নিজস্ব ভাব-ভাবনা ও রীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইরের জগতে দেখা অভিজ্ঞতার উপরে স্থান দিলেন অন্তরের উপলব্ধিকে। সমাজ সচেতনতা, বাস্তব জীবনবোধকে পুরো অস্বীকার না করলেও, তাঁর প্রথমপর্ব্বের স্বকীয় ধারার চিত্রাবলীতে রূপ, আকার, ভাবভঙ্গী প্রভৃতিতে কিছু পরিমাণে অন্ততঃ অপার্থিব ও অলৌকিক কিছু যোজনার চেষ্টা দেখা যায়।

দেশজ রীতিতে চিত্র-সাধনায় নিরত হয়ে তিনি সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারত তথা প্রাচ্য দেশের চিত্রাবলীর মূল রহস্য নিহিত আছে গঠনভঙ্গী ও কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু আরও গভীরে প্রবেশ করে বুঝেছিলেন যে রঙ্ ও রেখার মিলন ও তাৎপর্য্য অনেক ক্ষেত্রে গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে। তখন দুই-এরই গুরুত্ব সমান। আবার কখনও এক অপরকে ছাপিয়ে ওঠে। তিনি তাঁর চিত্র চিন্তা ও ক্রিয়া-কৌশলের মধ্য দিয়ে এবং প্রাচ্যদেশীয় নানা শিল্পরীতি অনুশীলন করে শিল্পী-জীবনের গোড়াতে এবিষয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তার লিপিবদ্ধ রূপ পাওয়া যায় প্রতিমা ঠাকুর কৃত 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে। সেই পঙ্‌ক্তিগুলি হোল—

"লাইনই হল আকৃতির বন্ধন—এই রেখার বেষ্টনে প্রকৃতি বিচিত্র নক্সা তৈরী করেছে, কিন্তু যেখানে অ্যাবস্‌ট্রাক্ট আইডিয়া বা ভাবরাজ্যের কথা এসে পড়ে সেখানে লাইন আর এগোতে পারে না। তখন রঙ্-এর অসীমতার মধ্যে তাঁকে ডুব দিতেই হয়। এই দেখ না পারসীয়ান আর্ট চীনে আর্টের কাছ ঘেঁষে চলে গেছে কিন্তু চীনে আর্টের বিশিষ্টতা দেখ রেখার সীমাকে ছাড়িয়ে রঙ্-এর নিবিড়তা ও মনের প্রসারের মধ্যে ডুব মেরেছে। ছবিতে রেখা যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তখন তার তাৎপর্য্য সীমার দ্বারা পরিমিত।

কিন্তু যখন তার নির্দেশ অজানা অচেনা বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, তখন রঙিন রূপ তার আঁকতেই হয়। আমার বিশ্বাস অজন্তার ছবি প্রাচীনকালে রঙ্-প্রধান ছিল। এখন সময়ের গতিতে রঙ্ খসে পড়েছে, কোথাও বা ফিকে হয়ে গেছে, তাই লাইনগুলো প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাব প্রধান ছবি আঁকতে হলে রঙ্-এর আঙ্গিক আয়ত্ত না করে উপায় নেই।"

রঙ-রেখা সম্বন্ধে তাঁর এই গবেষণা ও উপলব্ধি তাঁর সমগ্র শিল্পী-জীবন ও কর্ম্ম-প্রণালীকে করেছে প্রভাবিত। তাঁর সমুদয় রচনা পর্য্যালোচনা করলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাবে যে, বুদ্ধিদীপ্ত ছবিগুলি রেখাপ্রধান, রেখার কারিগরি ও সৌকুমার্য্য সেখানে বিচিত্র-পথগামী; আর ভাবপ্রধান চিত্র-রাজিতে রঙের মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি অসীম অনন্ত পথে। তাঁর রঙ-রেখার সার্থক সাধনা ও ভাবকল্পনার অসীমতা তাঁকে দিনে দিনে চিত্র-রচনার এমন এক উত্তুঙ্গ সাফল্য-শিখরে তুলে দিয়েছিল যার তুলনা মেলে না। সেখানে বলতে হয়, 'তোমারি তুলনা তুমি।' প্রখ্যাত কলাবিদ ও সমালোচক ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে একটি কথা বারবার বলেছেন যে, তিনি হলেন বস্তুতঃই রঙ্-রেখার যাদুকর।

সেই বাস্তব ও আদর্শের মিলনে রেখাপ্রধান নিজস্ব রীতির চিত্র-সাধনার প্রারম্ভিক পর্য্যায় চলেছিল তাঁর ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত। তৎকালে অঙ্কিত বুদ্ধচরিত ও বেতালপঞ্চবিংশতির ছবি ক্রমশঃ স্বকীয় বিশিষ্টতা প্রকাশের দিকে এগিয়ে চলেছিল। তবে তখনও 'অবনীন্দ্র-রীতি' বলতে যা বোঝায় তা দানা বেঁধে ওঠেনি। প্রকৃত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তা সমুজ্জ্বল হয়নি।

এই সময় অঙ্কিত 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' চিত্রখানির বিষয় বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম উপাখ্যান থেকে গৃহীত। বাংলা ১৩০৯ সনের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ছবিটি মুদ্রিত হয় একবর্ণের প্রতিলিপিতে। তৎপূর্ব্বে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বুদ্ধ সুজাতা'। ছবি দুইটি সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র মন্তব্য হোল—

"অবনীন্দ্রবাবু এই দৃশ্যের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। তাঁহার অঙ্কিত মূল ছবি দুইখানি নানা বর্ণে রঞ্জিত। এইজন্য আমাদের প্রদত্ত প্রতিলিপি হইতে চিত্রকরের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। হ্যাভেল সাহেব গত অক্টোবর মাসের স্টুডিয়োতে অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রসমূহ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, 'অবনীন্দ্রবাবু মোগল শাসনকালের

ভারতীয় চিত্রকরগণের শিল্পে নিজ প্রতিভা বিকাশের উপযোগী উপাদান পাইয়াছেন।' কিন্তু তা বলিয়া তিনি বিলোপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্কন-রীতি বিশেষের অনুকারী নহেন। অর্থাৎ তাঁহার প্রতিভায় স্বাতন্ত্র্য আছে। হ্যাভেল সাহেব আরও লিখিয়াছেন—

"...While he is as yet far from achieving the marvellous certainty of line and the daintiness of finish found in the best Mogul work, there are a poetic charm and sentiment in the treatment of the old world stories he delights to illustrate which are peculiarly his own."

বুদ্ধচরিত থেকে তিনি সেই সময় এঁকেছিলেন দু'খানি ছবি—বুদ্ধের জন্ম ও বুদ্ধ সুজাতা। প্রথম ছবিটি পরে ভগিনী নিবেদিতার 'Foot Falls of Indian History' বইটির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল ত্রিবর্ণী প্রতিলিপিতে। এটির বিষয়-বিন্যাস, বর্ণসুষমা ও অঙ্কন-ভঙ্গিমা কৃষ্ণলীলা চিত্রাবলীর সমতুল্য। মনে হয়, তিনি কৃষ্ণলীলার ছবি ও এটি একই সময়ে এঁকেছিলেন।

কিন্তু 'বুদ্ধ সুজাতা' চিত্রখানিতে কিছু স্বতন্ত্র ভাব লক্ষণীয়। বিশাল বোধিবৃক্ষ ও তার জটাজাল দ্বারা ছবির পটভূমিকা হয়েছে রচিত। বৃক্ষ রূপায়ণে ও আলোছায়ার দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য সৃষ্টিতে তিনি তখনও পাশ্চাত্য প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পটের নিম্নভাগে যে গাছপালা তাও বাস্তবানুগ রীতির প্রভাবমুক্ত নয়। বুদ্ধদেব ও সুজাতার দেহরূপে ও পোশাক পরিচ্ছদে ভারতীয়ত্ব হয়েছে আরোপিত। সুজাতার মূর্ত্তিতে তিনি ভারতীয় রূপসাধনায় সাফল্যের সূচনা দেখিয়েছেন নিঃসন্দেহে। দেহরূপ রচনায় দেশজ ও জাতীয় বিশিষ্টতা প্রস্ফুট হলেও, ভাব প্রকাশনায় সম্যক সিদ্ধিলাভ হয়নি। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্যে ও অজন্তার চিত্রে বুদ্ধমূর্ত্তি অতীব ভাবসমৃদ্ধ ও অলৌকিক রূপলাবণ্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায় বুদ্ধের প্রথম রূপাকৃতি কিন্তু তার অনুগামী নয়। তাকে বলা যায় সেই প্রাচীন আদর্শের ভিত্তিতে নবরূপায়ণ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। নতুন চিন্তা, স্বকীয় ভাবাদর্শ, নিজস্ব ধারার রূপকল্পনা। এই চিত্রেও তিনি স্থানে স্থানে সোনার জলের রেখা দিয়েছেন এঁকে।

ছবিখানি নিয়ে নানা দিকে নানা আলোচনা ও মন্তব্য হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ছবিখানির ফ্রেমের নীচে লিখেছিলেন, Edwin Arnold-এর কাব্যময় বুদ্ধ-জীবনী 'Light of Asia'-র একটি ছত্র।

"So thinking Him divine, Sujata drew trembling nigh."

মিঃ হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতি বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধে এই ছবিখানি সম্বন্ধে লিখেছিলেন ১৯০২ সালে বিলাতের 'স্টুডিয়ো' পত্রিকায়। প্রবন্ধটির শিরোনাম, 'Some Notes on Indian Pictorial Art.'

"Buddha and Sujata illustrates the scene in Edwin Arnold's 'Light of Asia'. Mr. Tagore has expressed the serene dignity and spirituality of Buddha with the same simplicity and depth of feeling he has given to the grace and sweetness of Sujata's adoration."

এর কিছুকাল পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার প্রথম পথিকৃৎ পণ্ডিতপ্রবর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলা ১৩১৩ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'চিত্রকলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ রচিত 'বুদ্ধ ও সুজাতা' চিত্রখানি সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। সেখানে তিনি লিখে-ছিলেন—

"দেশের লোকজন চতুর্দিকে, দেশীয় ভঙ্গী, দেশীয় আচার-ব্যবহার বায়ুর স্তরের ন্যায় আমাদিগকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, অথচ কি আশ্চর্য্য, ছবি আঁকিবার সময় আমরা বিদেশীয় চিত্রগুলিকেই আদর্শ করিয়া থাকি, জীবন্ত মডেলগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'বুদ্ধ ও সুজাতা' ছবি সম্বন্ধে বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে একটা তর্ক উঠিয়াছিল, এই ছবিখানি বিলাতী আর্ট স্টুডিও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—ছবিখানিতে বুদ্ধের কর্ণ সুদীর্ঘ, অঙ্গুলীগুলি একটু সরু, হয়ত দেহতত্ত্বের পরিমাণ সর্ব্ববিষয়ে বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষা করে নাই, এইসব উল্লেখ করিয়া জনৈক বন্ধু চিত্রটির নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর একটি বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—আপনি ভাল করিয়া দেখুন, এই ছবিতে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রশান্ত, নির্বিকার মহাপুরুষের আদর্শ রক্ষা করিয়াছে কিনা, বুদ্ধমূর্ত্তি একটি পরম শান্তির ভাবে স্বর্গীয় শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে কিনা, সুজাতার ভক্তি নম্র বিনয় এবং পরম শ্রদ্ধার নীরব অভিব্যক্তি নেত্র প্রীতিকর হইয়াছে কিনা, এবং সুজাতার উপহার দেব-কল্প মহাত্মার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত সামগ্রীর মত দেখাইতেছে কিনা, এইভাব যদি চিত্রে সুব্যক্ত হইয়া থাকে তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ খুব বিশুদ্ধ নাই বা হইল।

* * * *

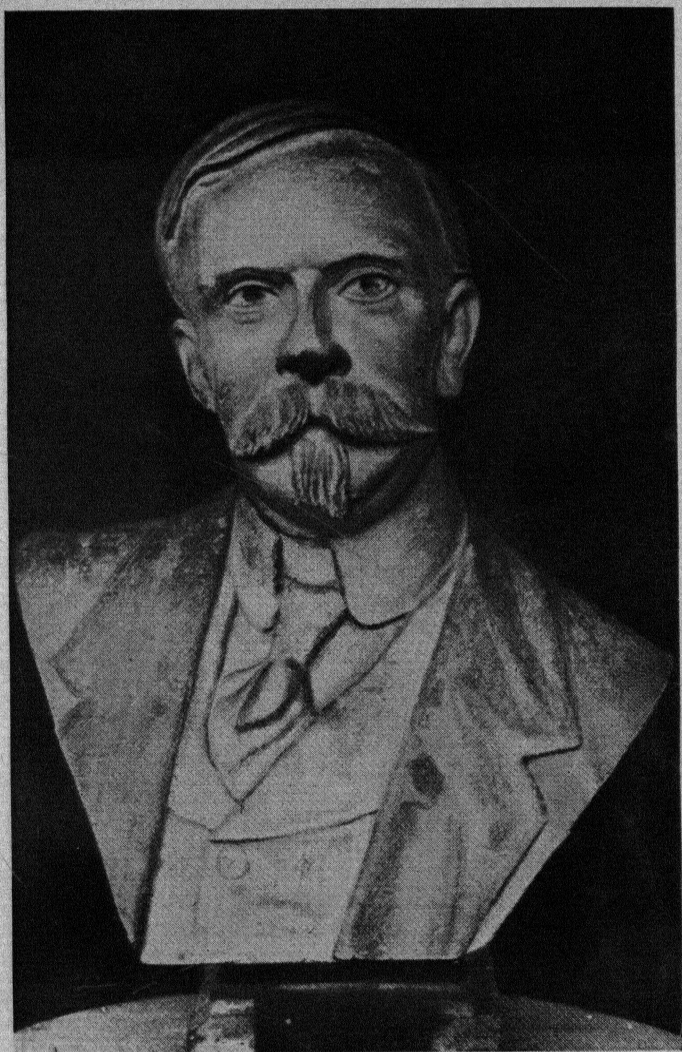
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশুদ্ধি সহজেই চিত্রকরের তুলির আয়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু একটি মহৎভাব তুলির অগ্রে উৎপাদন করা সহজ নহে। প্রাগুক্ত চিত্রে দেশীয় ভক্তের চিরাগত সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রকর অঙ্গ-বিশুদ্ধির নিয়মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন নাই। দেব মন্দিরের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা চিত্রকরের পক্ষেও অনুচিত।"

॥ ৪ ॥

কৃষ্ণচরিত, বুদ্ধচরিত ও বেতালপঞ্চবিংশতির চিত্রাঙ্কন শেষ হতেই কলকাতা শহরে প্লেগ রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। সেই সময়ে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে অবনীন্দ্রনাথের একটি শিশুকন্যা (শোভা) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। শিল্পীর মন তাতে এমন ভেঙ্গে যায় যে, তিনি কিছুকাল আর ছবি আঁকায় মন দিতে পারেন নি। প্লেগের জন্য তাঁরা জোড়াসাঁকোর বাড়ী ছেড়ে চলে যান চৌরঙ্গী পাড়াতে। নতুন বাড়ীতে গিয়ে পাখী পোষেন, ঘুড়ি ওড়ান, এইভাবে দিন চলেছিল অবনীন্দ্রনাথের। ছবি আঁকা প্রায় বন্ধ।

এমন সময়ে তাঁর জীবনে এল এক শুভ-সংযোগ। আর তা কেবল অবনীন্দ্রনাথের জীবনেই আসেনি; এসেছিল সমগ্র ভারতকলার ক্ষেত্রে। ভারতকলাপ্রেমী হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে দেখাশোনা ও পরিচয় হোল অবনীন্দ্রনাথের। এই শুভ-সংযোগও হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের মেজ জ্যেঠাইমার মাধ্যমে। মিঃ হ্যাভেল ইংলণ্ড থেকে প্রথম কর্ম্মভার নিয়ে আসেন মাদ্রাজ কলাশিক্ষালয়ে। অতঃপর কলকাতায় আর্টস্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এখানে আগমনের কিছুকাল পরে তিনি অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানার সুযোগ পান। তিনি শুনেছিলেন যে, ঠাকুর-বাড়ীতে কে একজন দেশী স্টাইলে চিত্রচর্চ্চা করছেন। সেই আর্টিস্টের খবর নেবার জন্যই তিনি অবনীন্দ্রনাথের মেজ-মার কাছে গিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলা সিরিজের ছবির কাজ শুরু করেছেন এবং দেশী মতে চিত্রাঙ্কনে তাঁর মনে অনেকখানি আগ্রহ-প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মিঃ হ্যাভেল এখানে এসে প্রথমেই অনুভব করলেন যে, কলকাতার সরকারী আর্টস্কুলে দেশীয় চিত্রকলার চর্চ্চা অনুশীলনের কোন আয়োজন-ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্যালারীতে ভারতকলার নিদর্শন সংরক্ষণের প্রথা ছিল না। অবশ্য কারুশিল্পের নমুনা কিছু স্থান পেয়েছিল। সুতরাং প্রারম্ভেই তিনি আর্টস্কুলে ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা বিভাগ গঠন ও ভারত শিল্পের নমুনা-নিদর্শন সংগ্রহ কাজের পরিকল্পনা করলেন, কিন্তু সে কল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কিছু বিলম্ব ঘটেছিল। কারণ ১৯০২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০৩-এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বছর তিনি স্বদেশ ইংলণ্ডে ছুটিতে কাটিয়ে আসেন। সেখানে থেকেও তিনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্র



ই. বি. হ্যাভেল



নির্ব্বাসিত যক্ষ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং বিলাতের 'স্টুডিয়ো' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তার প্রচার করতে সচেষ্ট হন।

প্রথম দৃষ্টিতেই হ্যাভেল অনুভব করেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথই হলেন ভারতের নবযুগের নতুন চিত্রপদ্ধতির প্রকৃত স্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাঁকে প্রচুর উৎসাহ-প্রেরণা দিয়ে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে দেবার জন্য নানা চেষ্টা করেন। তৎপূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ সে রকম উৎসাহদাতা, প্রেরণাকারী ও উচ্চজ্ঞানের সমঝদার পাননি। ১৯০২ সালে 'স্টুডিয়ো'তে হ্যাভেল লিখিত প্রবন্ধের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল পাঁচখানি। যেমন, অন্দর মহলে, বুদ্ধ ও সুজাতা, পথিক ও পদ্ম, রাজকুমারীর পদ্ম এবং অভিসারিকা। এই পাঁচটি ছবিতে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র চেষ্টার প্রথম পর্য্যায় এবং তাঁর প্রবর্ত্তিত নব্যরীতির অগ্রগতি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ ও সুজাতার বর্ণ-বিন্যাস পদ্ধতি অভিসারিকা চিত্রে গিয়ে অনেকখানি অভিনবত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রকাশ করছে। সুজাতার রূপারোপের মধ্য দিয়েই অবনীন্দ্রনাথ নিজস্বতা প্রকাশের দিকে এগিয়ে চলেন। অভিসারিকার চিত্রে তা আরও পরিণতির স্বাক্ষর রেখেছে।

অভিসারিকা ছবিটি নানা ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছিল। যেমন, 'In the Dark Night' এবং 'মেঘাবৃত রজনীতে প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে'। অভিসারিকা ব্যতীত আরও তিন-চারটি ছবি অবনীন্দ্রনাথ ঋতুসংহারের বিষয় নিয়ে এঁকেছিলেন। এই চিত্রগুচ্ছ অঙ্কনের কাজ তিনি করেছিলেন ১৯০২ সালের মধ্যে। কারণ ১৯০২ সালে তা 'স্টুডিয়ো'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তৎপরে বাংলা ১৩১৪ সনে 'অভিসারিকা' 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়।

'প্রবাসী'র চিত্র-পরিচিতিতে লেখা হয়েছিল—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত যে চিত্রখানি (অভিসার) আমরা এবার প্রকাশ করিলাম, তাহার বিষয় কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষা বর্ণন হইতে গৃহীত। ছবিখানি মুখাবয়ব, অঙ্গভঙ্গি, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সর্ব্ব-বিষয়েই ভারতীয়।"

ঋতুসংহারের শ্লোকটির বাংলা রূপ এই—

"শ্রান্তিবিহীন ডাকছে মেঘ, গর্জনে তার নাইক শেষ
আঁধার রাতে আজ পরাল গাঢ় অন্ধকারের বেশ।
পথের রেখা কোথাও নাহি, ক্ষণপ্রভা ক্ষণেক জ্বলে—
—অভিসারিকা যতেক নারী সেই আলোকে আজকে চলে।"

চিত্রখানি সম্বন্ধে হ্যাভেলের মন্তব্য—

"Mr. Tagore obviously suggests a *Pompeian* motif, he has contrived to give it a distinctive note by the sincere Indian feeling he brings to all his works."

চিত্রপটের নারীমূর্ত্তির মুখাবয়ব 'সুজাতা'র মুখের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। টাইপটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। পোশাক-পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী ধরনের। শিল্পী সম্ভবতঃ মুঙ্গের ভ্রমণকালে এই ধরনের শাড়ী-ওড়না প্রভৃতি স্টাডি করেছিলেন। সেই রূপস্মৃতি বোধ হয় নানা রূপে ও ভঙ্গীতে তাঁর প্রথমপর্বের অনেক চিত্রে স্থান পেয়েছিল। তবে তা পুরো বাস্তবানুগ নয়। তিনি জনসমাজ থেকে উপাদান ও আদল সংগ্রহ করলেও, তাঁকে স্বকীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা রূপান্তরিত করেই চিত্রে আরোপ করেছেন। এই চিত্রে যদিও ভারতীয় রেখা পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ হয়নি, দেহের ডৌল ও গড়ন রেখান্বিত নয়, বরং কিছু পরিমাণে আলোছায়াপাতে কল্পিত, তাহলেও এর সৌন্দর্য্য-লালিত্যকে অস্বীকার করা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে নারীমূর্ত্তির দেহভঙ্গী ও সচকিত চলার গতি। দেখলেই একটা lyrical quality বা গীতিময়তা অনুভূত হয়। ছবিটির বর্ডার মুঘল-রাজস্থানী চিত্রানুগ। পটের নিম্নাংশে পুষ্প-পত্রালির বিন্যাস মুঘল চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তার অনুকৃতিমাত্র নয়। শিল্পীর নামসহি তখন থেকে পারসীক অক্ষরের দিকে ঝুঁকেছিল। পটখানির নীচের দিকে পুরোনো ছাঁদের অক্ষরে লিখিত হয়েছিল কালিদাসের শ্লোকাংশ, "অভীক্ষ্ণ মুচ্চৈধ্বর্নতা পয়োমুচা···।"

মোটামুটিভাবে ছবিটিতে নানা রীতির পরীক্ষা প্রচেষ্টার ছাপ দেখা গেলেও একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি তখন নিজের পথ ও পন্থা তৈরী করে এগিয়ে চলেছিলেন নিঃসন্দেহে। অভিসারিকার চঞ্চলচকিত পদক্ষেপের মধ্যে শিল্পীর স্বকীয় চিন্তাপন্থায় দ্রুত পথযাত্রার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান।

ঋতুসংহারের গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুর চিত্রদ্বয়ে ভারতের মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনুপ্রেরণা ও আভাস লক্ষণীয়। মনুষ্যমূর্ত্তি ও পোশাক-পরিচ্ছদ উত্তর-ভারতীয় চালের। এখানেও কারুকার্য্য সমন্বিত বর্ডার। তবে সে নক্‌শা শিল্পীর নিজস্ব। পরিবেশ ও আসবাবপত্র রচনায়ও মৌলিকত্বের প্রকাশ দেখা যায়। সোনার ব্যবহার হয়েছে এবং তা ওজন রক্ষা করেই প্রযুক্ত হয়েছে। বসন্ত চিত্রখানি ঋতুসংহারের বসন্ত বর্ণনের একাদশ শ্লোকের রূপচিত্র মনে হয়। আবার উনত্রিশ শ্লোকে বর্ণিত গাছপালা ও ফুলের বাহারের সঙ্গেও মিল

পাওয়া যায়। বসন্ত সমাগমে প্রকৃতিও যেমন উৎফুল্লা ও মনোরমা হয়ে ওঠেন, চিত্রপটেও সেই রূপটি হয়েছে প্রতিভাত।

আলোচ্য চিত্র-পর্য্যায়ের আর একটি হোল 'পথিক ও পদ্ম'। এই ছবিখানিতে অবনীন্দ্রনাথ রেখাপ্রধান রচনাতে সিদ্ধিলাভের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তবে তখনও তিনি তাঁর পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। ফুলপাতার নক্শাতে সামান্য মুঘলধারার ছাপ দেখা যায়। রেখাঙ্কনকে প্রাধান্য দিলেও পথিকের পোশাক-পরিচ্ছদে ছায়াপাত বিদেশী ভাবানুগ। জামা ও পাগড়ী সমসাময়িক বাংলার জমিদার ও অভিজাত মহলের ফ্যাশন মাফিক কল্পিত। মূর্ত্তি-রূপায়ণ এই চিত্রে নতুন পথ ধরেছিল। দীর্ঘায়ত দেহ, নিছক রেখায় কল্পিত হাত দুটির গঠনভঙ্গী অতি মনোরম। বিষয়টিও যেমন কবিত্বময়, তার রূপায়ণও তেমনি সার্থক।

প্রিয়া রয়েছেন গৃহে, পথিক চলেছেন পথে। পথের পাশে সরোবর থেকে তিনি তুলে নিলেন একটি পদ্ম। পদ্মের সুষমা দেখে দেখে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কিছুকাল। পথচলার বিরতিতে তাঁর মনকে জুড়ে বসলো গৃহকোণে ফেলে আসা প্রিয়ার কথা ও চিন্তা। ছবিটি দেখলে এক পলকে মনে হবে ঊনবিংশ শতকের কোনও অভিজাত বাঙ্গালী পদ্ম হাতে নিয়ে চিন্তামগ্ন। সবুজের খেলা ও মেলাতে লাল জামাজোড়ার মানুষটি আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে হয়েছেন রূপায়িত। ছবিটি সম্বন্ধে হাভেল সাহেবের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"...shows the unconscious grace and naivete of feeling which are so attractive in all Mr. Tagore's composition."

ছবিটি সম্ভবতঃ ঋতুসংহারের এই কবিতাটি অবলম্বনে রচিত—

"প্রিয়ার দুনয়নে পড়িছে আজ মনে সুনীল কমলিনী
নেহারি' আজ,
কনক-আভরণ-মধুর নিক্কণ-নিনাদ-মুখরিত মরালীমাঝ
পশিছে যেন কানে, আকুল করে প্রাণে ; অধর-চারু-শোভা-
বাঁধুলি ফুল
ফুটিল দেখি' হায় স্মরিয়া কান্তায় পথিকজন কাঁদে
প্রণয়াকুল।"[১]

---

১. ঋতুসংহারের শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য ও ভবানী দেবী অনূদিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

'স্টুডিয়ো' পত্রিকায় মুদ্রিত এই ছবিগুলি দেখে 'পায়োনীয়র' পত্রিকা (জানুয়ারী ৩,১৯০৩) মন্তব্য করেছিলেন—

"The representations given in the Studio of this artist's work are very fascinating. They reveal not a trace of English influence···In their naive grace of line, they suggest the art of Japan, but there is no mistaking their Indian origin."

১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনেও কয়েকখানি ছবি এঁকেছিলেন। মিঃ হ্যাভেল তাঁর প্রথম প্রবন্ধে (স্টুডিয়ো, ১৯০২) লিখেছেন—

"Mr Tagore has also executed a very interesting series of illustrations of the Ramayana and he is contemplating another series for the other great Hindu Epic, the Mahabharata."

১৯০৫ সালের মধ্যে তিনি মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের বিষয় নিয়েও দু'খানি চিত্র রচনা করেন। সেই বছরের জুন মাসে মিঃ হ্যাভেল 'ষ্টুডিয়ো' পত্রিকায় আর একটি প্রবন্ধ লিখে ছবি দু'খানি প্রকাশ করেন। বিষয়, নির্ব্বাসিত যক্ষ ও সিদ্ধদ্বয়। প্রথমটির প্রেক্ষাপট নিবিড় বনভূমি। পাহাড়ের উপর মেঘের কোলে গাছপালা নীচে লতাগুল্ম। সব মিলে অদ্ভুত একটা নির্জনতার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বসে বিরহী যক্ষ মেঘমালাকে সম্বোধন করে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে হৃদয়বার্ত্তা প্রেরণে রত। বিরহশীর্ণ দেহ তাঁর। বনময় পরিবেশ। মেঘ ও বৃক্ষদেহ রচনায় পশ্চিমী বাস্তবরীতির প্রভাব পরিদৃশ্যমান। পল্লবরাজি ভারতের আলঙ্কারিক রীতির অনুগামী। যক্ষমূর্ত্তি ভারতীয়। শিল্পী তখনও দোটানার মধ্যে চলেছেন। তাহলেও ক্রমোন্নতির ছাপ সুস্পষ্ট। হ্যাভেল সাহেবও প্রবন্ধের প্রারম্ভে সেকথা বলেছেন—

"The two illustrations of Kalidasa's poem which are given in this number show a considerable advance in technical power, with no loss of the fine poetic expression which was apparent in his early works."

নির্ব্বাসিত যক্ষের ছবিটি সম্বন্ধে তাঁর আর একটি উক্তিও প্রণিধানযোগ্য—

"Though he has considerable realistic truth into his rendering of the mist sweeping through the trees, he has

been faithful to his traditions of fine decorative feeling which the school of Indian painting upholds."

পূর্ব্বমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের রূপচিত্র এই নির্ব্বাসিত যক্ষের ছবি।

"মাসের পর মাস শৈলে করে বাস,
প্রিয়ার বিরহে সে ক্লান্তিহীন,
খসিয়া ভূমি 'পরে সোনার বালা পড়ে,
নিটোল বাহু হোল এমনি ক্ষীণ।
আষাঢ় মাস এল প্রথম দিনে তার
যক্ষ হেরে সেথা গিরির গায়
লেগেছে মেঘ এক ঘেরিয়া সানুদেশ,
দন্তাঘাতে রক্ত গজের প্রায়।"

মেঘদূতের দ্বিতীয় চিত্র 'ঊর্দ্ধ আকাশপথে সিদ্ধমিথুন'। ভারতীয় চিত্রকলায় এই রচনাটি একটি অভূতপূর্ব্ব অবদান। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কোন পূর্ব্ব আদর্শের প্রভাব নেই, কোন অনুকরণ নেই এখানে। শিল্পীর মানসনেত্রে দেখা প্রাচীন ভারতের কোন এক অজানা দিনের সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা। রূপে-রসে, ভাবে-ছন্দে এ-চিত্রে তুলনাহীন। এই ছবিতেও জামাপোশাক, মেঘমালা প্রভৃতি আলোছায়ার দ্বন্দ্বে রচিত। রেখার প্রাধান্য নেই। পাশ্চাত্য রীতির প্রভাব-মুক্তও নয়। তথাপি মূর্ত্তি রূপায়ণ, মৌল আদর্শ, চিত্রের চিৎসত্তা ভারতীয়। এই ছবিটি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার যোগ্য। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হোল মূর্ত্তি দুটির আকাশ-পথে চলার গতি-ভঙ্গী। অদ্ভুত প্রাণময়তা ও ছন্দের প্রকাশ হয়েছে। কোমল তুলিকার টান, পেলব বর্ণিকাভঙ্গ, সুস্নিগ্ধ মধুর রূপ, তাদের ভেসে চলার সহজ স্বচ্ছন্দভাব চোখ ও মনকে যুগপৎ আকৃষ্ট করে।

চিত্রটির কল্পনা মূলে আছে পূর্ব্বমেঘের ৪৫ শ্লোক।

"জাত সে শরবনে
সে দেব ষড়াননে
পূজিয়া সেই পথ হইও পার;
সিদ্ধ বীণা হাতে, আপন প্রিয়া সাথে
ছাড়িবে পথ ভরি' তব আসার।"

১৩১৪ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ছবিটির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় এবং তৎসহ নিম্নোক্ত এই চিত্র-পরিচিতিটি—

"এবারকার প্রবাসীতে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত 'সিদ্ধদ্বন্দ্বে'র ছবির বিষয় কালিদাসের মেঘদূত হইতে গৃহীত। সিদ্ধগণ অতি পবিত্রচেতা দেবজাতীয় জীব। কথিত আছে যে ইঁহারা অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই আটটি সিদ্ধি নামক গুণবিশিষ্ট। সিদ্ধযুগল আকাশপথে যাইতে যাইতে মেঘদর্শনে, পাছে জল লাগিয়া বীণা নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় উৎসুক নেত্রে মেঘের দিকে তাকাইয়াছেন। ইহাই ছবির বিষয়।"

এই ছবিটিকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলাপ্রেমী বিচারপতি স্যার জন উডরফ তাঁর সংগ্রহে স্থান দিয়েছিলেন।

এই ছবি দু'খানি রচনার বেশী কিছুকাল পরে অবনীন্দ্রনাথ আবার মেঘদূতের কবিতা অবলম্বনে দু'খানি চিত্র অঙ্কন করেন। তার একটি হোল 'অলকার প্রাসাদ চত্বরে সঙ্গীতের আসর'। প্রাচীন স্থাপত্য পরিবেশে রেখাপ্রধান রীতিতে চমৎকার আবহমণ্ডল রচিত হয়েছিল। এই চিত্রে তিনি মৌলিক চিন্তা ও আদর্শকে অনেকখানি সার্থক রূপায়ণের দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। পূর্ব্বে আলোচিত সিদ্ধযুগলের চিত্র-কল্পনার সঙ্গে এর পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। রেখারচনা এখানে স্বকীয় বিশিষ্টতার পথ ধরে চলেছিল। তুলির টানে শিল্পীর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। পশ্চাৎপটের সামান্য একফালি প্রাকৃতিক দৃশ্য সঙ্গীতাসরের উপযুক্ত পরিবেশ এনে দিয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ উত্তরমেঘের প্রথম শ্লোকের সার্থক রূপচিত্র ধরে দিয়েছেন এখানে—

"তুলনা করি যদি মিলিবে তব সাথে
প্রাসাদগুলি, ভাই, সে অলকার,—তোমাতে বিদ্যুৎ ললিত নারী সেথা,
ইন্দ্র চাপ তব, চিত্র তার, গীতির সাথে সেথা,
মুরজ বাজি ওঠে, স্নিগ্ধ-গম্ভীর তোমার রব, তোমার বুকে জল,
মণির মেঝে সেথা, উচ্চ তুমি, উঁচু শিখর সব।"

এই চিত্রখানির রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায়নি। তবে ১৯০৭ সালের মধ্যে অঙ্কিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। টেক্‌নিক ও রূপকল্পনার অগ্রগতি দেখে মনে হয় 'নির্ব্বাসিত যক্ষ'-র ঢের পরে এটি রচিত। শিল্পীর চিত্র-সাধনার প্রধান অঙ্গ 'ওয়াশ' প্রবর্ত্তনার আভাস-ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান। অবনীন্দ্র-চিত্রকলার অন্যতম উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী স্যার জন উডরফ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ—'A Modern School of Indian Painting' প্রবন্ধের

সঙ্গে এই ছবিটিও জাপানের 'কোক্কা' পত্রিকায় মুদ্রিত করেছিলেন ১৯০৮ সালে। নামটি সেখানে ভিন্ন—'চন্দ্রালোকিত রাত্রে সঙ্গীতাসর'।

'কোক্কা'য় প্রকাশিত 'চন্দ্রালোকিত রাত্রে সঙ্গীতাসর' সম্বন্ধে জনৈক জাপানী সমালোচক মিঃ কাশাকু হামাদা মন্তব্য করেছিলেন—

"Mr. Tagore's work is impressed by the felicitous grouping of the figures, the chaste tone of the colours and the strong feeling which is revealed amidst the simplicity of the composition."

জাপানী সমালোচক যদিও নির্দিষ্ট একটি ছবির গুণ ব্যাখ্যা মুক্তকণ্ঠেই করেছিলেন, কিন্তু পরে আবার একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "whether the new school is building up a true national art."

তিনি আরও মন্তব্য করেন, "In the paintings of Mr. Tagore and his disciples the technique though excellent as it is in its way is after all of a hybrid character".

এই উক্তির দ্রুত জবাব দিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর সক্রিয় ও উৎসাহী সদস্য মিঃ এডওয়ার্ড থর্নটন। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্র-চিত্রকলার একজন দরদী সমঝদার। তাঁর প্রতিবাদ কলকাতার 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় ১৯০৯ সালের ১০ই জুলাই প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি যা লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ হোল—

"The art of the new school is instinctive and thoroughly representative of India and that it owes nothing to Western examples."

এই সূত্রে 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার নিজস্ব মন্তব্য হোল, "Many will be disposed to agree with Mr. Thornton on this point, but the question which naturally arises is whether Indian artists are not entitled to utilise Western resources and whether it is desirable that they should if they could avoid Western influences."

অবনীন্দ্রনাথ কিভাবে কৃষ্ণলীলার চিত্র থেকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন মিঃ উডরফ 'কোক্কা'য় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে। তিনি সেখানে লিখেছিলেন—

"He has pictured with exquisite grace and a true illumination of bright and fresh colour the life of Krishna and has wonderfully revealed the Indian consciousness by his illustrations latterly more reduced in tone, of the Meghduta of Kalidasa, the Quatrains of Omar Khayyam and the life of the Buddha."

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চ্চার ঊষাকালে রচিত মেঘদূতের তিনখানি চিত্র-মধ্যে অলকাপুরীতে সঙ্গীতাসর-এ উন্নতির চরণচিহ্ন সুস্পষ্ট। অতঃপর শিল্পীর প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে ভাস্বর, ওয়াশ টেকনিকে তিনি যখন চিত্রপটে অভিনবত্ব ও রঙের মায়াজাল রচনায় সিদ্ধপুরুষ, তখন আবার তাঁর তুলি কল্পনায় প্রস্ফুট হয়েছিল মেঘদূতের আর একটি রূপচিত্র। সেটি হোল, 'মহাকালের মন্দিরে'। পূর্ব্বমেঘের ৩৪-৩৫ শ্লোক অবলম্বনে অঙ্কিত।

"যদি সে মহাকাল-সমীপে যাও তুমি
থাকিতে দিবসের আলোক লেশ,
রহিও সেথা, মেঘ, যাবৎ দিবাকর উতরি নাহি যান দৃষ্টিদেশ।
দেবেশ-শূলপাণি, সন্ধ্যা-পূজা-কালে করিয়া গুরুগম্ভীর রব
পটহ সম যদি নিয়ত বাজো তুমি, সফল হবে তব মন্ত্র সব।"
"চরণ তালে তালে মেখলা কথা বলে, কত না সেবিকার ক্লান্তকর
দুলায়ে লীলাভরে চামর মণিময়, সে মণি-আভা পরে উদর পর।
তাদের দেহে লেখা যতেক নখরেখা জুড়াবে পেয়ে তব বিন্দুজল,
ভ্রমর-সারি সম কটাক্ষেরে হানি হেরিবে তোমা তারা গগনতল।"[১]

কাব্যে বর্ণিত বিষয়টি বড়। কিন্তু শিল্পী তার চাক্ষুষ রূপদানে অতি অল্প কথায় ও স্বল্প আয়োজনে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি মন্দিরের আভাস মাত্র। তার স্তম্ভগাত্রে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন মহাকালের মন্দিরে আত্মনিবেদিতা দেবদাসী। তাঁর রূপরচনা বাহুল্যবর্জিত। দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশের দিকে কোন চেষ্টার ছাপ নেই। অতি সাদাসিধে রূপের পোশাক সজ্জা। বর্ণ-প্রয়োগের মধ্যেও ফুটে উঠেছে একটা বিষণ্ণ ভাব। কবিতাটির গাম্ভীর্য্য চিত্রপটেও হয়েছে প্রতিধ্বনিত।

১, মেঘদূতের কবিতাবলী: প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ হতে গৃহীত।

ছবিখানির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯১৮ সাল। কারণ ১৯১৯ সালে সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে এটি স্থান পেয়েছিল। ছবিটি চার্লস্ কেস্টেভেনের সংগ্রহে স্থানলাভ করেছিল। তারপরে ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে 'রূপম্' পত্রিকায় এটি রঙীন প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হয় ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রবন্ধের সঙ্গে। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

"Mr. Tagore's puetical study of Devadasee—the dancer, the dedicated to the temple of Mahakala, is conceived by the imagination of the artist and is not based on any living model···There is a world of suggestion and mystery in the simple and even austere presentation of Mr. Tagore's theme···He has not exhausted and emptied his subject by too much description, but has opened our vision to an infinite and limitless vista of our ideas."

ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে আর একটি শুভলগ্ন এসে যায় অত্যন্ত অভাবিতরূপে। ১৯০২ সালের শেষভাগে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে সেখানে একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। হ্যাভেল সাহেবের ব্যবস্থায় উক্ত প্রদর্শনীতে কলকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্রদেরও কিছু শিল্পসৃষ্টি স্থান পেয়েছিল। তিনি সেইসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথেরও তিনখানি ছবি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, অবনীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে তাঁর মুঘল বিষয়ক চিত্র যা এঁকেছিলেন তা আর্ট স্কুলে কর্মরত অবস্থায়। কিন্তু তা নয়; তিনি আর্ট স্কুলে কর্মপদ লাভ করেন ১৯০৫ সালে। আর দিল্লীর প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯০২-৩ সালে। সেখানে অবনীন্দ্রনাথের তিনখানি মুঘল বিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং তন্মধ্যে 'শাজাহানের অন্তিম অবস্থা' ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছিল। তিনি একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন।

চিত্র ক'টির রচনা ও প্রদর্শনীতে প্রেরণের মূলে হ্যাভেল সাহেব ছিলেন মুখ্য উৎসাহদাতা ও প্রেরণাকারী। তদবধি অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে যাতায়াত শুরু করেন নি। স্বগৃহে বসেই তিনি ছবিগুলি এঁকেছিলেন। এই বিষয়ে শিল্পীর বর্ণনাটি অত্যন্ত করুণ ভাবাপন্ন। তিনি বলেছেন—

"খুব শোকের অবস্থায় মন যখন মুহ্যমান হয়ে রয়েছে, হ্যাভেল সাহেবের কাছ থেকে হুকুম এল একখানা ছবি চাই। দিল্লীর দরবারে একখানা ছবি পাঠাতে হবে। আমি বললুম, 'সাহেব, আমি এখন পারবনা, শোকে আমি

কাতর, এখন কি আমার হাত দিয়ে ছবি বেরুবে?' সাহেব বললেন, 'না, না, এই কাজেই তোমার ওষুধ, এই কাজের মধ্যেই তুমি সান্ত্বনা পাবে।'

সাহেবের কথায় বসলুম তুলি রং নিয়ে, অয়েল কলার দিয়েই ছবি শুরু করা গেল। অয়েল কলারের টেকনিক তখন ভাল করেই আয়ত্ত করেছিলুম। সেই প্রণালীতেই আঁকলুম শাহজাহানের ছবি।"[১]

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখনীয় এই যে, অবনীন্দ্রনাথ দিল্লীর প্রদর্শনীতে পদক লাভ করে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং তদুপলক্ষে বিদেশী শিল্পী ও সমঝদারের কলমে প্রশংসাধন্যও হয়েছিলেন। ঘটনাটি তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি, ভারতের নবীন চিত্র-সাধনায় সিদ্ধির প্রথম ঘোষণাপত্র। প্রদর্শনীর সুবৃহৎ ক্যাটালগে অবনীন্দ্র-চিত্রের প্রশস্তি হয়েছিল মুদ্রিত। ক্যাটালগটি তৈরী করেছিলেন স্যার জর্জ ওয়াট ও মিঃ পার্সী ব্রাউন। অবনীন্দ্রনাথ প্রেরিত তিনখানি ছবির বিষয়: অন্তিম শয্যায় শাজাহান, তাজ নির্ম্মাণ ও বন্দী বাহাদুর শাহ। ক্যাটালগের বিবরণ—

"Three pictures which provoked some considerable criticism and discussion were two oil paintings and one water colour by Abanindra Nath Tagore···The best of the three was no doubt the one entitled 'The last days of Shajehan', and represented two figures in a marble columned Imambara, the one with a very natural turn of the head gazing across the water at the Taj Mahal'. The foreshortening of the head of the figure was one of the most striking parts of the picture."

উপসংহারে লেখা হয়েছে, "Second Prize with Silver medal to Abanindra Nath Tagore of Calcutta for picture entitled Last hours of Shah Jehan."

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটি অত ভাল হয়েছিল কেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"এই ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলাম। 'শাজাহানের মৃত্যু প্রতীক্ষা'তে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম। যখন দিল্লীর দরবার হয়, বড় বড় ও পুরাতন আর্টিস্টদের ছবির প্রদর্শনী সেখানে হবে,

১. স্মৃতিচিত্র: প্রতিমা ঠাকুর। পৃঃ ৭১-৭২

হ্যাভেল সাহেব এই ছবিখানা আর তাজ নির্মাণের ছবি পাঠিয়ে দিলেন দিল্লী দরবারে। আমাকে দিলে বেশ বড় একটা রুপোর মেডেল, ওজনে ভারি ছিল মন্দ নয়। তারপরে যোগেশ কংগ্রেস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল একজিবিশনে সেই ছবি পাঠিয়ে দিল, সেখানে দিল একটা সোনার মেডেল। এই রকম করে তিনচারটে মেডেল পেয়েছি, পরিনি কোনদিন।"[১]

প্রদর্শনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন অয়েল কলারে। কয়েক বছর পরে তিনি আবার ওটিকে ওয়াটার কলারে কপি করেছিলেন। তাঁর মতে দ্বিতীয়খানি আরও ভাল হয়েছিল। কেন না, তিনি তখন ওয়াটার কলারের রহস্য ভালভাবে বুঝে গিয়েছিলেন।[২]

কন্যার মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন শিল্পীকে চিত্র রচনায় যিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তিনি তো তাঁকে পরম আত্মীয়তার বন্ধনে করেছিলেন আবদ্ধ। হ্যাভেল সাহেব কেবল অতীত ভারতের শিল্পৈশ্বর্য্য দেখেই অভিভূত হননি, তিনি সেই শিল্পের একটি মহান্ ভবিষ্যৎ রচনায়ও ব্রতী হয়েছিলেন। ভারতকলার সেই ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁর নব পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে অবনীন্দ্রনাথকে মুখ্য সহযোগী করার সংকল্প করেছিলেন। সুতরাং তিনি অবনীন্দ্রনাথের মেজ-মা'র মাধ্যমে প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁকে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভাইস প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু শিল্পীর মানসিক অবস্থা তখন শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণের অনুকূল ছিল না। পুত্রী বিয়োগের বেদনা-ব্যথায় তখনও তিনি কাতর। তিনি সাহেবকে সেকথা বললেন অকপটে। সাহেব তা শুনে বললেন—

"তুমি করছ কি? You do your work—your work is your only medicine. তুমি তোমার কাজ কর, কাজই তোমার ওষুধ।"

এ যে পরম আত্মীয়ের মত কথা। কিন্তু তাহলে কি হবে। অবনীন্দ্রনাথের সামনে এসে ভিড় করলো নানা দুরূহ সমস্যা। তিনি চাকরী করবেন কি করে? সময় মত অফিসে যেতে হবে। দিনে সাতবার করে তামাক খাওয়ার অভ্যাস। শরীরও তখন ভাল ছিলনা। অসহায়ের মত গিয়ে তিনি মাকে বললেন, "সে আমি পারবনা মা, তুমি যা হয় বল সাহেবকে।"

সাহেব কিন্তু দমলেন না। তাঁর সঙ্কল্পে তিনি অটল।

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২৮

২. স্মৃতিচিত্র: প্রতিমা ঠাকুর। পৃঃ ৭২

অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর চাই-ই। অতএব তিনি অবনীন্দ্র-জননীকে বলে পাঠালেন, "তোমার ছেলের সব ভার আমার। তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব হবে না। দুপুরে আমি তাঁর খাওয়ার ভার নিলাম, তামাক সে যতবার ইচ্ছে খাবে। আমি বলছি, আমি তাঁর শরীর ভালো করে দেব।"

একথা শুনে আর কি করে আপত্তি তুলবেন মা। পুত্রকেও রাজী হতে হোল। কিন্তু আর একটি ভয় এসে মনকে জুড়ে বসলো। ভাবনা হোল, তিনি স্কুলে গিয়ে কি শেখাবেন। নিজে কতটুকু শিখেছেন, কি-ই বা জানেন—এই চিন্তায় পড়লেন। তা শুনেও সাহেব বললেন, "সে আমি দেখব'খন। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তুমি শুধু নিজের কাজ করে যাবে। তুমি কত টাকা মাসে চাও বল।"

অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "সে আর আমি কি বলবো সাহেব, সবইতো তুমি জানো। এও তুমিই জানবে। কি দেবে না দেবে সেও তোমার ইচ্ছা, আমি চাইনে কিছুই।" সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁকে ভাইস প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ করলেন। বেতন ধার্য্য হোল মাসে তিনশ' টাকা। কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৯০৫ সালের ১৫ই আগস্ট।

অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে নেবার জন্য হ্যাভেলের আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র ছিল, গরজ ছিল এত বেশী যে, তিনি নিজ হাতে দরখাস্তের draft করে দিয়েছিলেন। সেটি কপি করে অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে পেশ করেন। দরখাস্তে দিল্লীর প্রদর্শনীতে পদকপ্রাপ্তির কথাও উল্লিখিত হয়েছিল। তা দেখেও বোঝা যায় যে, অবনীন্দ্রনাথের মুঘল-বিষয়ক চিত্র রচনার কাজ আর্ট স্কুলে যোগদানের ঢের আগেই শুরু হয়েছিল। মূল দরখাস্তটির অনুলিপি নিম্নরূপ:

"I beg to apply for the post of Vice-Principal of the Calcutta School of Art—which I understand is now vacant.

As regards my qualifications I have studied European Art under Messrs. Ghilardi and Palmer and subsequently done original work in the Oriental style under the guidance and direction of Mr. Havell. I have not exhibited my work much but when I have, I have been fortunate enough to secure the approbation of critics both Indian and European. I got the Cooch Behar Gold Medal in the Calcutta Industrial Exhibition and the Silver Medal in the Delhi Durbar

Exhibition and Lady Olivant's prize in the Bombay Art Exhibition.

Some of my pictures have also been reproduced in the Studio with favourable comments.

Though I have not taken any University Degree, I have been through a school Course upto the Entrance Standard and afterwards continued my studies at home. I have a fair knowledge of English and Sanskrit and am a writer of some repute in Bengali. I have made a speciality of study the Art literature in English as well as in Sanskrit and Bengali.

I may add in conclusion that I had the good fortune of designing and executing the picture in connection with the Calcutta Ladies' congratulatory address to Lady Curzon on her return to India after illness.

The fact of my being a great grandson of the late Dwarka Nath Tagore will I trust be sufficient to indicate my general respectability and position in Society."[১]

এই দরখাস্ত পেশ করে শুরু হোল অবনীন্দ্রনাথের নতুন জীবন, আপিসী জীবন। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে সময়মত গিয়ে হাজির হলেন আর্ট স্কুলে। কিন্তু সেখানে গিয়েই তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। কি করে তিনি অফিসের কাজ চালাবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, ও বিষয়ে তো কিছুই তাঁর জানা নেই। হ্যাভেল সাহেব তাঁর অবস্থাটা বুঝে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তাঁকে অফিসের কাজ কিছুই করতে হবে না। তার জন্য হেড্‌মাস্টার ও হেড্‌ ক্লার্ক রয়েছেন। তিনি কেবল ছবি আঁকবেন।

প্রথম দিনেই হ্যাভেল সাহেব তাঁর নতুন সহকারী অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন আর্ট গ্যালারী দেখাতে। হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ—অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষ এগিয়ে চলেছেন গ্যালারীর দিকে। তাঁদের পেছনে চলেছে বিরাট

১. ভারতের শিল্প ও আমার কথা : ও. সি. গাঙ্গুলী। পৃঃ ১৪৪-৪৫

দরখাস্তের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। Draftটি অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে দিয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সুহৃদ্ ও. সি. গাঙ্গুলীকে।

হাত পাখা নিয়ে চাপরাসী। সে সমানে হাওয়া করে চলেছে। একেবারে বাদশাহী চাল! বড় সাহেবের হুকুমে আর এক চাপরাসী এসে গ্যালারী ঘরের পর্দা সরিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যা দেখলেন তাতে তিনি কৌতুক অনুভব করলেন। কারণ সেখানে ছিল দু-তিনখানি মাত্র মুঘল ছবি, আর দু-একটি পারসীক চিত্র। তিনি ভাবলেন, এর নাম গ্যালারী! বাস্তবিকই তাই। পাশ্চাত্য রীতির শিল্প-সংগ্রহের প্রতিবাদস্বরূপ হ্যাভেলের এই নতুন সৃষ্টি। সুতরাং তখনও জিনিস সংগ্রহ তেমন কিছু হয়নি। সামান্য ক'টি ছবির মধ্যেই একটি অবনীন্দ্রনাথের মনকে সেদিন বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। ছবিটি একটি বক পাখীর। ছোট্ট একটি ছবি। অবনীন্দ্রনাথ খুব মন দিয়ে ছবিটি দেখছিলেন। হ্যাভেল সাহেব বুকে হাত দিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তিনি পকেট থেকে একটি আতসী কাঁচ বের করে অবনীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বললেন, "এটি দিয়ে দেখ।"

আতসী কাঁচের মধ্য দিয়ে সেই বক পাখীর ছবি, যা অতি বাস্তব চিত্র, পাখীর প্রতিটি পালক, দেহের সব খুঁটিনাটি যেখানে সত্যরূপে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হ্যাভেল সাহেব তাঁর অবস্থা উপলব্ধি করে মনে মনে হাসছিলেন। বাকী ছবি ক'টিও একই ধরনের বাস্তব-প্রবণ মুঘল চিত্র। অবনীন্দ্রনাথ এতদিন যা খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, তার সন্ধান যেন তিনি ওখানে পেয়ে গেলেন। সেই মধ্যযুগীয় ছবির মধ্যে তিনি দেখলেন শিল্পৈশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, সোনারূপার কত বাহার! তা সত্ত্বেও তিনি অনুভব করলেন কিসের যেন অভাব রয়েছে সেই ছবির মধ্যে। অভাব আর কিছুর নয়, অভাব ভাবের। মুঘল শিল্পীরা চিত্রপটে সব দিয়েছেন, রঙ্, রেখা, রূপবৈচিত্র্য কিছুরই অভাব নেই। দিতে পারেন নি তাঁরা শুধু ভাব। অবনীন্দ্রনাথ ভাবলেন যে, তাঁর স্বদেশের এই শিল্পে তো সবই আছে, সবই পাওয়া গেল, কিন্তু যা নেই, যা তাঁর পূর্ব্বসূরীরা (মুঘল চিত্রকররা) দিয়ে যেতে পারেন নি, তা তাকে দিতে হবে।

সেদিন হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথকে যে কাঁচখানি দিয়েছিলেন, সেটিকে তিনি আর হাতছাড়া করেন নি কোনদিন। সেটিকে তিনি বলতেন, "দিব্য চক্ষু।" সেই কাঁচের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতশিল্পের অজানা একটি জগতের রূপ দেখেছিলেন সেদিন। আর্ট স্কুলে কর্ম্মজীবনের প্রথম দিনে সেই ক্ষুদ্র চিত্রশালিকাটি তাঁর জীবনে যেন পরশপাথরের মত কাজ করেছিল। ভাবীকালের ভারতশিল্পের মুক্তিদাতা সেখানে নতুন পথের সন্ধান

পেয়েছিলেন। সেই পথকে তিনি ক্রমান্বয়ে আরও প্রশস্ত করলেন, এগিয়ে নিয়ে গেলেন রূপ-রসের উর্দ্ধলোকে।

অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুলে যোগদান কেবল তাঁর জীবনেই বিপুল পরিবর্ত্তন আনেনি, বিদ্যালয়টির কর্ম্মধারায়ও এনেছিল পরিবর্তনের পালা। আগে থেকেই হ্যাভেল সাহেবকে কেন্দ্র করে আর্ট স্কুলে একটি আর্ট ক্লাব গোছের সংস্থা ছিল। দেশী-বিদেশী শিল্পী ও রসিকজনেরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আর্ট স্কুলে মিলিত হয়ে চারুকলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হতেন। অতঃপর অবনীন্দ্রনাথ কাজে যোগদান করার একমাসের মধ্যেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় কলা-সংসদ'। নানা শ্রেণীর শিল্পীরা হলেন তার মেম্বার। শুভারম্ভেই সংসদের সম্পাদক পদে ব্রতী হলেন অবনীন্দ্রনাথ। চারিদিকের নানা আপত্তি ও সমালোচনা সত্ত্বেও হ্যাভেল সাহেব তাঁর পূর্ব্বকল্পিত ও আরব্ধ কর্ম্মরাজি চালিয়ে গেলেন দ্রুত তালে। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য ও প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর চলার পথ সুগম হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

আর্ট স্কুলের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-শিক্ষা বিষয়ক আদর্শটি মিঃ হ্যাভেল অতি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এইভাবে—

"The process of denationalisation went on for years, and for years our art students were made to spend the best part of their life in fruitless attempts to acquire ideas about an art which they never could or ever would rightly understand. It seems that 30 or 40 years were to valuable to have spent in useless experiments of this sort and the mischief that was done will take another such period if not longer, in undoing. We find few cultural men amongst the art students here. To produce any really good work the art students must be thoroughly conversant with the classical lore of their country. They must have a complete knowledge of its religious and social ideals of the episodes of the Indian epics and history...without knowing the trend of the greatest Indians of the past, their productions are bound to fall short of a high standard."

এই আদর্শ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় মিঃ হ্যাভেল আর্ট স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষাদানের নতুন বিভাগ সৃষ্টি করলেন। একটি দু'টি করে ছাত্র এসে ভর্ত্তি হতে লাগলেন। সর্ব্বাগ্রে এসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। তারপরেই এলেন নন্দলাল বসু ও ক্রমান্বয়ে যোগ দিলেন অসিতকুমার হালদার, শৈলেন দে, সমরেন্দ্র গুপ্ত, হাকিম খান, শমী উজ্জমা, ভেঙ্কটাপ্পা, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং আরও অনেকে। যেমন নতুন গুরু, তেমনি নতুন শিল্পাদর্শ ও অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতি। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্রটি মাত্র ২৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সেই সামান্য কয়েকটি বছরে শিল্পী-জীবনে তিনি অদ্ভুত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অন্যান্য ছাত্ররাও কালক্রমে শিল্পী ও শিক্ষকরূপে স্বনামধন্য ও কৃতিপুরুষ হিসেবে স্থায়ী প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং তাঁর একান্ত নিজস্ব। গুরু ও শিষ্যদের মধ্যে সম্পর্ক হয়েছিল অত্যন্ত মধুর ও ঘনিষ্ঠ এবং আত্মার আত্মীয়ের মত।[১] সেই সুমধুর সম্পর্কের মূল নিহিত ছিল এবং সেই আদর্শের পত্তন হয়েছিল হ্যাভেল সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রেমাভিষিক্ত সম্বন্ধ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তৎসম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তাঁকে (হ্যাভেল) চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি, জ্যেষ্ঠের মত ভক্তি করেছি কি সাধে? তিনিও আমাকে collaborator সহকর্ম্মী বলে ডাকতেন আদর করে; কখনো চেলাও বলেছেন। ছোট ভাই-এর মত ভালোবাসতেন। আমি নন্দলালকে যতখানি ভালোবাসি তার বেশী তিনি আমাকে ভালোবাসতেন।[২]

ছাত্রদের ধরে ধরে তিনি কিছু শেখাতেন না। পথ বাতলে দিতেন মাত্র এবং প্রেরণা যোগাতেন, আর নিজে ছবি এঁকে এঁকে তাঁদের সামনে আদর্শ ধরে দিতেন। তাঁদের তিনি বলতেন, "তোমরা এঁকে যাও, যদি লড়াইয়ে ফতে করতে না পার, তবে এই আমি আছি—ভয় কি?"[৩]

মিঃ হ্যাভেলও তাঁকে বলেছিলেন? "তুমি শুধু ছবি এঁকে যাবে।" তার সুব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ যখন আর্ট স্কুলে বসে ছবি আঁকতেন, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতেন না। আপন মনে ছবি এঁকে যেতেন।

---

১. এই পুস্তকের ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. ৩. জোড়াসাঁকোর ধারে: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১২৬, ১৩০

"মাঝে মাঝে হ্যাভেল সাহেব পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকতেন, পিছন দিক থেকে দেখে যেতেন তিনি কি করছেন।" শিল্পী তখন চৌকি ছেড়ে উঠতে গেলে তিনি ধমক দিতেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ক্লাসরুমেও সেই নিয়ম করেছিলেন। দরজায় লিখে রেখেছিলেন, "তাজিম মাফ।"

স্বদেশী আন্দোলনের যখন ঢেউ চলছে দেশের বুকে, তখনই অবনীন্দ্রনাথ শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওদিকে তাঁদের বাড়ীতেও সেই স্বদেশী ভাবের প্রবাহ এসে গেল। সকলের মনেই তখন স্বদেশীয়ানার তাগিদ ও প্রেরণা। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কোত্থেকে যে সেই 'স্বদেশী হুজুগ' এসেছিল তা কেউ বলতে পারতেন না। সে যেন ভূমিকম্পের পরে সব কিছু নড়েচড়ে যাবার মত অবস্থা! কিন্তু সেই আন্দোলনে এখনকার মত মারামারি ঝগড়াঝাঁটি ছিল না। সকলের মনে ছিল সেই এক ভাবনা যে দেশের জন্য কিছু করতে হবে, দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে।

ঠাকুরবাড়ীতে স্বদেশী ভাবধারার মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাকা।" বাড়ীতে একটি দোকান খোলা হোল—'স্বদেশী ভাণ্ডার'। সেখানে সব দেশী জিনিস বিক্রী হবে, সকলে তা ব্যবহার করবেন। তাছাড়া নানা জায়গায় পল্লীসমিতি প্রতিষ্ঠিত হোল, সেবাসমিতি হোল। চতুর্দ্দিকে আত্মত্যাগের পালা। সকলের মনে ভ্রাতৃভাব।

এল ভূমিকম্পের বছর, নাটোরে প্রাদেশিক কনফারেন্স। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন, কনফারেন্সের কাজ বাংলাভাষায় চলবে। যুবজনরা সব তাঁর দলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন। কিন্তু পূর্ব্ব নিয়মানুসারে প্রবীণরা বাংলাভাষার দিকে মত দিলেন না। নানা তর্ক-বিতর্ক ও গণ্ডগোলের পরে বাংলা ভাষারই জয় হয়েছিল।

নাটোর কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথও গিয়েছিলেন। নাটোরের মহারাজা ছিলেন এঁদের পারিবারিক বন্ধু। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পাখোয়াজ সঙ্গতরত স্কেচ-চিত্রও অঙ্কন করেছিলেন। কনফারেন্সে সমাগত ব্যক্তিদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও খাওয়াদাওয়ার যে এলাহি বন্দোবস্ত হয়েছিল, তা তো শিল্পীকে খুশী করেছিল নিশ্চয়ই। তিনি তার বিশদ বর্ণনাও দিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। তখন ভূমিকম্প হয়ে কি অবস্থা হয়েছিল তাও জানা যায় তাঁরই বর্ণনায়। কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে আরও বাড়তি যা পেয়েছিলেন তার মূল্য শিল্পীর কাছে অনেকখানি। রানী ভবানীর দেশ নাটোর; তা মন্দিরময় এবং প্রাসাদরাজিতে পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথ ঘুরে ঘুরে দেখলেন নাটোরের গ্রাম;

আঁকলেন সমস্ত পুরোনো বাড়ীঘর ও মন্দিরের স্কেচ ও ছবি। গ্রামবাংলার নতুন এক রূপ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কংগ্রেসে সমবেত নেতৃবৃন্দেরও কিছু প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন। নাটোরের মহারাজারও খুব আগ্রহ ছিল অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন ব্যাপারে। তিনি নিজেই শিল্পীকে সঙ্গে করে সর্ব্বত্র নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে ফরমাশ করেও তিনি চিত্রাঙ্কন করাতেন। অবশেষে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে রানী ভবানীর ঘরে। সেখানে ছিল অনেক সুন্দর সব ইটের উপর নক্সা করা ফলক। তা দেখেও শিল্পী অত্যন্ত আনন্দ ও প্রেরণা লাভ করেন।

এরপরেই রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ হাত দিলেন পোশাক-পরিচ্ছদে। দেশীয় পোশাক করতে হবে। একবার রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথরা তিন ভাই পরামর্শ করে একটি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পার্টিতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গিয়ে হাজির হলেন। উপস্থিত সকলে বিরক্ত হলেও প্রকাশ্যে কেউ প্রতিবাদ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ তখন একটি শব্দ সৃষ্টি করলেন, 'ন্যাশনাল ড্রেস' অর্থাৎ যার যার জাতীয় পোশাক। কলকাতায় সেবারে কংগ্রেস, দেশ-বিদেশের কত নেতার ভিড় সেখানে। ঠাকুরবাড়ীর কর্তাদের ইচ্ছে হোল সেই অতিথিদের জন্য একটি পার্টি দেবেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সকলকে জাতীয় পোশাকে আসতে হবে। তিনি নিমন্ত্রণ পত্রে ছাপিয়ে দিলেন, 'All must come in national dress.' তাতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে একটা হইচই পড়ে গিয়েছিল।

এই জাতীয় ভাবধারার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চ্চা নতুন আদর্শে, দেশজ ভাবনায় সঞ্জীবিত হওয়ার আরও অধিকতর অবকাশ লাভ করেছিল। ঘরে ঘরে তখন চরকা কাটা ও তাঁত বোনার কাজ শুরু হয়েছিল। ঠাকুর-বাড়ীও মুখর হয়ে উঠেছিল চরকার ঘরঘরানিতে। অবনীন্দ্র-জননীকে চরকা কাটতে দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁকে দেশ থেকে একটা চরকা আনিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। বাড়ীতে তাঁত বসলো, খটাখট্ শব্দে বাড়ী ভরে গেল। বাগানে সুতা রোদে শুকানো হোত। অবনীন্দ্রনাথের মা গামছা ও ছোট ধুতি বুনে ছেলেদের উপহার দিতেন।

সেই সঙ্গেই হোল রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসব। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে এল বিলিতী বর্জনের পালা। বিলিতী কাপড় জামা দিয়ে বহ্ন্যুৎসব চললো কিছুদিন।

সব যখন দেশী হবে, বিলিতী কিছু থাকবে না, তখন কলাশিল্পই বা বিদেশী ভাবাপন্ন কেন হবে। অবনীন্দ্রনাথও ভাবতে লাগলেন, 'ছবি দেশী মতে

ভাবতে হবে, দেশী মতে দেখতে হবে।' সেই দেশী মতেই তাঁর চিত্রাঙ্কনের কাজ তখন চলছিল পুরোদমে। বিলিতী আর্টের কিছুই তিনি আশেপাশে ও ভাবে ভাবনায় রাখতে চাইলেন না। স্বদেশীযুগে দেশে যে নতুন আবহাওয়া, নতুন চিন্তাধারা এসে গেল, তাকে তিনি বলেছেন 'সুবাতাস'। সেই সুবাতাসে তাঁর ভাবকল্পনার তরণী এগিয়ে চললো তড়িৎগতিতে। তাঁর দেশজ ভাবনা-চিন্তা ও আদর্শ ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগলো ভারতীয় চিত্রকলার গগনপটে।

সেই স্বদেশী আবহাওয়ার সুবাতাসে তাঁর স্বদেশী ভাবনার প্রথম চিত্র সৃষ্টি হোল ভারতমাতার রূপচিত্র। এই ছবিখানি নানাদিকে নতুনত্ব ও বিশেষত্ব নিয়ে রূপ লাভ করেছিল। প্রথমতঃ ভারত-জননীর এই ধরনের রূপকল্পনা পূর্বে কখনও হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এটি অবনীন্দ্রনাথের 'ওয়াশ' পদ্ধতির প্রথম সার্থক সৃষ্টি। রূপারোপ অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে। জননীর হাতে অন্ন-বস্ত্র ও বরাভয়। জনৈক জাপানী আর্টিস্ট এই ছবিটিকে বড় করে একটি পতাকা তৈরী করে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত মূল চিত্রখানির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯০৩-৪ সাল। বাংলা ১৩১৩ সনের ভাদ্র সংখ্যা (১৯০৬) 'প্রবাসী'তে ছবিটির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়। সেই সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার চিত্রটি সম্বন্ধে মতামত ও বর্ণনার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ছবিখানির নামও দিয়েছিলেন তিনি। নিবেদিতার বর্ণনা ও আলোচনার মধ্যে ছবিটির মৌল আদর্শ ও রূপকল্পনার মর্ম্মকথা জানা যায় সুস্পষ্টভাবে। তিনি লিখেছিলেন—

"এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিবার আধুনিক যুগের নববিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া অবনীন্দ্রবাবু এই ছবি আঁকিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও চিত্রপটে তৎকর্ত্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের জিনিস, আকার প্রকারও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্ররেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামণ্ডলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে এশিয়োদ্ভূত কল্পনাজাত মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চারি বাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্নস্বরূপ। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে— ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদামায়ের আত্মাকে, দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপ প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মায়ের মধ্যে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে।

কুহেলিকার মত অস্পষ্ট পদ্মরাজি ও শ্বেত আভা, তাঁহার চারিবাহুও অনন্ত প্রেমেরই মত, তাঁহাকে অতিমানব করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্ব্বদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি পা, তাঁহার খোলা অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না ?—প্রাচীন কালের ঋষিদিগের নিকট বৈদিক উষা যেমন ছিলেন।"

ভগিনী নিবেদিতার নির্দেশ ও অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ 'ভারতমাতা' চিত্রের বৃহদাকার একটি রেখানুকৃতি করে দিয়েছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে। আচার্য্য বসু ছবিখানি তাঁর গৃহকক্ষে রেখেছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে।

আর্ট স্কুলে কার্য্যভার গ্রহণের পরে অবনীন্দ্রনাথকে কিছুদিন নিজের কাজ নিয়ে একাকী দিন কাটাতে হয় সেখানে। কারণ নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিভাগে কোন ছাত্র ছিল না। শূন্য ঘরে বসে তিনি ছবি আঁকতেন ; আর হ্যাভেলের কাছে প্রতিদিন দু-ঘণ্টা করে নিরিবিলিতে ছবি ও মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য, মূল্য এবং ইতিহাসের পাঠ নিতেন। চাপরাসীদের হুকুম দেয়া ছিল যে, তখন কেউ যেন সেখানে গিয়ে বিরক্ত না করেন। এই শিক্ষার জন্যই অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে 'গুরু' বলে উল্লেখ করে লিখেছেন—

"ভাবি সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন করে আমায় যদি না বোঝাতেন ভারতশিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম কয়লাই হয়তো থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচতো না, চোখ ফুটতো না দেশের শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিকে।"[১]

শিক্ষক জীবনের প্রারম্ভেই তিনি ছাত্রদের হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকতে নির্দেশ দিলেন। কারণ তখন দেবদেবীর উৎকৃষ্ট চিত্রের খুব অভাব ছিল। তাঁর প্রথম ছাত্র সুরেন গাঙ্গুলী ও নন্দলাল বসু অল্পদিনের মধ্যেই দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কনে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথের তখন ধারণা ছিল যে, তাঁর নিজের হাতে দেবদেবীর রূপ তত ভাল হয়ে ওঠে না।

শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি আরও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তা হচ্ছে, ছবি আঁকার ব্যাপারটাকে খুব সহজ করে দিতে হবে, যাতে সব ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে অঙ্কনের কাজ করে যেতে পারে।

১. জোড়াসাঁকোর ধারে : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৮০

এই উদ্দেশ্যে তিনি ছাত্রদের উপদেশ-নির্দেশ বেশী না দিয়ে তাঁদের নিয়ে বসে নিজেও কাজ করতেন। তাঁর শিল্পী-জীবনের আর একটি মুখ্য আদর্শ ছিল, 'আর্টকে নিজের করতে হবে, সহজ করতে হবে।'

নতুন ছাত্র এলেই হ্যাভেল বলতেন, 'আঁকো, আঁকাও।' তিনি আরও বলেছিলেন যে, ভালোঘরের ছেলেরা যদি আর্টের দিকে ঝোঁকে, তাহলে পাব্‌লিকের এদিকে নজর পড়বে। তাতে শিল্পীদের প্রতি তাঁরা আস্থাবান হবেন।

দেবদেবীর ছবির পরেই অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল ভারতের পুরাণ-কাহিনী ও রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যানের চিত্ররূপ দানের দিকে। ছাত্রদের তিনি এই সকল বিষয়ে ছবি করতেই উৎসাহ দিতেন বেশী।

দস্তুরমত ক্লাস করে তিনি ছাত্রদের রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-কাব্যের কাহিনী ও আখ্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ছাত্রদের নিয়ে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখতে যেতেন। অবশেষে রজনী পণ্ডিত নামে একজন কথক গোছের পণ্ডিতকে তিনি আর্ট স্কুলে বহাল করেছিলেন ছাত্রদের নিয়মিত প্রাচীন কাব্য-কাহিনী ও পুরাণ গ্রন্থ পড়িয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কৈশোর কালের পণ্ডিত মহাশয়। তিনি প্রতিদিন আর্ট স্কুলে ছাত্রদের যা পড়াতেন তা থেকেই অবনীন্দ্রনাথও তাঁর শিষ্যগণ ছবি আঁকতেন।

এই বিষয়ে হ্যাভেল ব্যতীত আরও একজন ভারত-প্রেমী বিদেশিনী তাঁকে প্রভূত উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি এদেশে এসে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্ম উপলব্ধি করে তাকে মনে-প্রাণে নিজের করে নিয়েছিলেন। সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে তিনি ভারতীয় শিল্পকেও অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন এবং তার উন্নতি-অগ্রগতির পথানুসন্ধানে হয়েছিলেন ব্যাপৃত। মিঃ হ্যাভেলের আদর্শের প্রতিও তাঁর মমত্ববোধ জন্মেছিল। তিনি মাঝে মাঝে আর্ট স্কুল ও তৎসংলগ্ন গ্যালারীতে আসতেন। তখন আর্ট-গ্যালারী নতুন করে নির্মীয়মান। আর্ট স্কুলের দেয়াল থেকে হ্যাভেল সাহেব বড় বড় সব বিদেশী ছবিকে স্থানান্তর করলেন নানা বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও। তিনি গ্যালারী-কক্ষ পূর্ণ করতে প্রয়াসী হলেন ভারতীয় তথা প্রাচ্যশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনের দ্বারা। কলা-নিদর্শনের সংগ্রহ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন হ্যাভেলের প্রধান সহযোগী ও সহায়ক। সেই নতুন সংগ্রহ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখনীয়—

"আর্ট স্কুলের চৌকিতে বসে থাকতুম। কত দেশ-বিদেশ থেকে নানা রকম ব্যাপারী আসত নানা রকম জিনিস নিয়ে। গবর্নমেণ্টের টাকায় আর্ট গ্যালারীর জন্য জিনিস সংগ্রহ করছি, সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটে যাচ্ছে। এই করে আমি চিনেছিলাম দেশের আর্ট। তার উপরে ছিলেন আমার হ্যাভেল গুরু। এদেশের আর্ট বুঝতে এমন ত্রুটি ছিল না।[১]"

ভগিনী নিবেদিতার গভীর আকর্ষণ ছিল আর্ট স্কুলের সেই সংগ্রহের প্রতি। তিনি অবনীন্দ্রনাথের কর্মধারার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এবং সে বিষয়ে উৎসাহ পরামর্শও দান করতেন। তিনি অবনীন্দ্র-শিষ্যদের বলতেন, ভারতের প্রাচীন কাব্য-কাহিনী থেকে ছবি করতে। বলতেন, সেইসব বিষয় দিয়ে মাথাটাকে বোঝাই করে রাখতে হবে। অবনীন্দ্র-শিষ্যের মধ্যে স্বরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও নন্দলাল বসুর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ হয়েছিল বেশী।

তিনি নিয়মিত আর্ট স্কুলে এসে তাঁদের ছবি দেখতেন ও ভুল-ত্রুটী ধরিয়ে দিতেন।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্র-ধারায়ই ভারতশিল্পের মুক্তিস্নান হবে। আবার এই শিল্প স্বকীয় ভাবে ও রূপে শ্রীমণ্ডিত হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হবে। জাতীয় শিল্পের চর্চার মাধ্যমেই জাতীয় সংস্কৃতি নবীনভাবে ও নবরূপে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

তিনি দেশে-বিদেশে অবনীন্দ্র-চিত্রকলাকে প্রচার করার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত পাঁচখানি ছবি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা-ব্যাখ্যা করেছিলেন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। তাছাড়া আরও লিখেছিলেন নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীদের চিত্র সম্বন্ধে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের চিত্র-প্রদর্শনীর সমালোচনা লিখেছিলেন তিনি একাধিকবার। সদ্যোজাত সেই শিল্পরীতির সাধকদের তিনি প্রকৃত একজন দিশারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

প্রথম দর্শনেই অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতার মহনীয় ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। নিবেদিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনী মূর্তি একটি।' কাদম্বরীর মহাশ্বেতার সঙ্গে তিনি নিবেদিতার চেহারার মিল দেখতে পেতেন।

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ৮০

নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রমুখ অবনীন্দ্র-শিষ্যদের অজন্তায় গিয়ে (১৯০৮) লেডি হ্যারিংহামের সঙ্গে কাজ করার যে সুযোগ হয়েছিল, তার মূলেও ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি উপলব্ধি করিছিলেন যে, তাতে অবনীন্দ্র-শিষ্যদের বিশেষ উপকার হবে। তাঁরা ভারতের প্রাচীন কলাশিল্পের মর্ম-রহস্য উদ্ধার করে নিজেদের সৃষ্টিশক্তিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবেন। অতএব তিনি প্রস্তাব দিলেন, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের অজন্তায় পাঠানো হোক। শিল্পীগুরু রাজী হলেন বটে, কিন্তু মিসেস হ্যারিংহাম জানালেন যে, তিনি বোম্বাই থেকে সহকারী ছাত্র সংগ্রহ করে ফেলেছেন, সুতরাং আর সহকারীর প্রয়োজন নেই। নিবেদিতা কিন্তু দমলেন না। কলকাতার ছাত্ররা উপকৃত হবেন, তা ভেবেই তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অতএব তাঁদের পাঠাতেই হবে। তিনি আবার চিঠি লিখলেন এবং অবনীন্দ্র-নাথকে বললেন—

"খরচপত্র সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে দাও অজন্তায়। এরকম সুযোগ ছেড়ে দেয়া চলবে না।"

চলে গেলেন ছাত্ররা। কিন্তু স্নেহশীল গুরুর আর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁর ভাবনা হোল, পরের ছেলে সব, পাহাড়ে-জঙ্গলে চলে গেল, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে জানা নেই। এই দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটলো তাঁর। তিনি ছুটে গেলেন নিবেদিতার কাছে। অবনীন্দ্রনাথের দুর্ভাবনা ও ব্যাকুলতা দেখে নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ গণেন মহারাজকে দিয়ে খাবার-দাবার ও একটি রান্নার লোক পাঠিয়ে দিলেন অজন্তায়। কয়েক দিন পরে তিনি নিজেও অজন্তায় গিয়েছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও তদীয় পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে। উদ্দেশ্য কলকাতার ছাত্ররা কি রকম কাজ কচ্ছেন, কেমন আছেন, তা স্বচক্ষে দেখার জন্য। এই জাতীয় অকৃত্রিম ভারতপ্রেম ও শিল্পপ্রীতি আজ দুর্লভ।

এইভাবে হ্যাভেলের সুব্যবস্থা, সুপরিচালনা ও ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণায় আর্ট স্কুলে ভারতীয় বিভাগের কর্মধারা এগিয়ে চললো অবাধ গতিতে। গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের তুলিকায় রূপায়িত হতে লাগলো প্রাচীন ভারতের কত কাব্য-কাহিনী ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি। ক্রমে তাঁদের শিল্পকীর্ত্তি আর্ট স্কুলের প্রদর্শনী-কক্ষেও স্থান অধিকার করলো।

গোড়ার দিকেরই কথা। সন-তারিখ অজ্ঞাত। লর্ড কার্জন তখন গভর্ণর জেনারেল। সুতরাং ১৯০৫ সালের মধ্যেই ব্যাপারটা হয়েছিল। হ্যাভেল

সাহেব অবনীন্দ্রনাথের পদ্মাবতী ও বেতাল পঞ্চবিংশতির আরও কয়েকটি ছবি আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন। 'পদ্মাবতী'র ছবিখানির দাম ধরে দেয়া হয়েছিল আশী টাকা। লর্ড কার্জন এলেন সেই প্রদর্শনী দেখতে। 'পদ্মাবতী' দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু দাম কমিয়ে তিনি ষাট টাকা দেবার প্রস্তাব করলেন। ছবি নিয়ে দর-কষাকষি শিল্পীর ধাতে সইল না। তিনি হ্যাভেলকে বললেন, ছবিটি বিনামূল্যেই কার্জনকে দেয়া হোক্। তাঁর পছন্দ হয়েছে, তিনি চেয়েছেন, সেইটিই বড় কথা। টাকার চেয়েও শিল্পীদের কাছে সমঝদারের রসবোধ ও প্রশস্তির মূল্য যে ঢের বেশী, অবনীন্দ্রনাথ তা প্রথম জীবনেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু হ্যাভেল কিছুতেই ছবির দাম কমাতে রাজী হলেন না, কার্জনকেও দিলেন না। অবশেষে অবনীন্দ্রনাথ সব ক'টি ছবি হ্যাভেলকে দিয়ে বললেন, "এই নাও সাহেব, আমার গুরুদক্ষিণা; এগুলি আমি তোমাকে দিলুম।"

সাহেব খুব খুশী হলেন আর বললেন যে, সে ছবি তিনি আর্ট স্কুলের গ্যালারীতে রাখবেন। সেখানেই চিরকাল থাকবে।[১]

আর্ট স্কুলে কর্মরত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটি নতুন কাজে হাত দিয়েছিলেন। অবশ্য তা পরীক্ষামূলক ভাবে। পরে তিনি সে বিষয়ে আর কোন চেষ্টা বা সৃষ্টির নিদর্শন রাখেন নি। নবতর প্রচেষ্টায় তিনি টালির উপরে জয়পুরী ধরনে ফ্রেস্কো চিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন দেশীয় রঙ্-তুলির মাধ্যমে। বিষয়বস্তু পৌরাণিক। মূর্ত্তিকল্পনা, বর্ণপ্রয়োগ ও রচনারীতি তাঁর নিজস্ব ও মৌলিক। একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' (কচ ও দেবযানী) কাব্যের রূপচিত্র। এ কাজের পশ্চাতেও ছিল হ্যাভেলের উৎসাহ-প্রেরণা। তিনি প্রাচীন ভারতের ফ্রেস্কো চিত্রের রীতি-পদ্ধতির পুনঃপ্রচলনের জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ ফলকটি শিল্পীর ভারতীয় রীতিতে প্রথম সৃষ্টি কৃষ্ণলীলার চিত্র-গুচ্ছের সমভাবাপন্ন। কম্পোজিশন বিশেষ ভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট। মূর্ত্তি দুটি,

---

১. এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। কলকাতার আর্ট গ্যালারীতে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের যে কয়েকটি ছবি সংরক্ষিত আছে, তার মধ্যে বেতাল পঞ্চবিংশতির কোন চিত্রপট নেই। সুতরাং মনে হয়, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। এক হতে পারে যে, সুদীর্ঘকাল পরে স্মৃতিচারণকালে অবনীন্দ্রনাথ ছবির বিষয়বস্তু সঠিক স্মরণে আনতে পারেন নি, অথবা হ্যাভেল সে ছবি নিজের কাছেই রেখেছিলেন। আর্ট-গ্যালারীতে যে ক'টি অবনীন্দ্র-চিত্র আছে, তন্মধ্যে ঋতুসংহার এবং মেঘদূতই প্রধান।

গাছপালা, ফুল, লতাপাতা সবকিছু এক সুরে ও ছন্দে গ্রথিত। একটি আর একটির পরিপূরক। রঙ্ অতি উজ্জ্বল ও মনোরম। মূর্ত্তির রূপে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে একটা আদিম অকৃত্রিম সরল ভাব। চোখের দৃষ্টিতেও সে ভাব সুস্পষ্ট। তুলির টান ও রঙের পোঁছ দিয়ে জামা-কাপড়ের ভাজ-খাঁজ অতি জোরালো রূপে রচিত। আর্ট স্কুলে যোগদানের পরেই তিনি এই চিত্র রচনা করেন। এই চিত্রটির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও মনোরম অংশ হোল এর ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ্ এবং তার সঙ্গে বাদামী ও সাদার এই ধরনের সুমধুর সমন্বয় খুব বিরল।

টালির পটে কচ ও দেবযানীর (১৯০৬) রূপও অতি অভিনব ও আকর্ষণীয়। অদ্ভুত এর ভাব-ভাষা, রূপ ও পরিবেশ। কচ ও দেবযানীর চেহারা, ভাবাভিব্যক্তি ও দেহভঙ্গীতে এমন একটা সারল্য-সুষমা প্রস্ফুট হয়েছে, যারে ফলে আখ্যানের সেই প্রাচীন ও পৌরাণিক আবেশটি প্রকট হয়েছে চমৎকার ভাবে। সামান্য দুটি শান্ত স্নিগ্ধ রঙ্ (সম্ভবতঃ কালো আর গেরিমাটি) ও স্বল্প আয়োজনে এমন সরল জীবন ও অকৃত্রিম মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে ছবিটিতে যা উচ্চাঙ্গের কলাকৃতির নিদর্শনই বলা যায়। এই চিত্রের বিশেষ উল্লেখনীয় বিষয় হোল, চিত্রপটে দূরের আভাস সৃষ্টি।

কচ ও দেবযানী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিতর্ক জালে জড়িত। দেবযানী বিস্ময় বিমূঢ়া, খেদতপ্তা। কিন্তু তাঁদের আকার-প্রকারে ও পরিধেয় মধ্যে যে সংযম ও শালীনতা প্রকাশ পেয়েছে, তা মুনি-ঋষি সমাজের আদর্শই রক্ষা করে। ছোট ছোট গাছপালা ও উপলখণ্ডরাজি পটের উপরিভাগে ও নীচে সাজিয়ে শিল্পী চমৎকার দূরাভাস রচনা করেছেন। এই জিনিসটি ভারতীয় চিত্রের একটি মুখ্য বিশিষ্টতা ; Perspective-এর কৌশল এখানে স্বতন্ত্র। এই ভাবে চিত্রপটে দূরের বস্তুভারকে স্তরে স্তরে উঁচুতে স্থাপনা করে অভিনব কৌশলে প্রেক্ষাপটের বিস্তার ও দূরের আভাস আনয়নের রীতি এদেশে খুব প্রাচীন। অবনীন্দ্রনাথ এখানে তা আরও সুকৌশলে, সুমিত পন্থায় ও স্বল্প কথায় যেন ব্যক্ত করেছেন।

এই চিত্রখানির প্রতিলিপি ১৩১৬ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, সেকালীন খ্যাতনামা সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের টীকা-ব্যাখ্যাসহ। তিনি লিখেছিলেন—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ফ্রেস্কো চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্রের উপাখ্যান অনেকেই জানেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বিদায়

অভিশাপ' নামক চমৎকার কাব্যকথাটির উপাখ্যান লইয়াই বিরচিত, তথাপি সংক্ষেপে ইহা বলিতেছি—

দেবাসুরের বহুকাল হইতে যুদ্ধ চলিতেছিল। দেবতার সহিত যুদ্ধে হত অসুরগণকে তাঁদের গুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়া দিতেন। দেবগণ তখনও অমর হন নাই, সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত পাওয়া যায় নাই এবং সুর-গুরু বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না, সুতরাং দেবতার বলক্ষয় হইতে লাগিল। দেবগণ সভা করিয়া রেজল্যুশন পাশ করিলেন যে, অসুরপুরে গিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়া আসা হউক। কিন্তু শুক্রপুরীতে সাহস করিয়া কে যাইবে, এবং শুক্রাচার্য্যই বা শত্রুকে এবিদ্যা শিখাইবেন কেন? বৃহস্পতির পুত্র কচ এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিতে স্বীকার করিলেন। তিনি শত্রুপুরীতে আসিয়া নানাবিধ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া সহস্র বৎসরের কঠোর সাধনায় সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন। এই গুরুগৃহ প্রবাসকালে শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানী কচের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কচ বিদ্যালাভ করিয়া বিদায় লইতে চাহিলে দেবযানী নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া কচকে স্বর্গে ফিরিতে নিষেধ করিলেন। কচ সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধনের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন, তিনি দেবযানীর সকল প্রলোভন প্রত্যাখান করিলেন। তখন ক্রুদ্ধা দেবযানী কচকে বলিলেন—

"—তোমা পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইতে পারিবে না করিতে প্রয়োগ।"

কচ দেবযানীর এই বিদায়-দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। তপঃকৃশ স্বার্থ-ত্যাগী প্রতিজ্ঞাপালনপরায়ণ কচ অভিমানিনী প্রেমার্থিনী দেবযানীকে সান্ত্বনা দিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বিদায় চাহিতেছেন। যিনি রবিবাবুর 'বিদায় অভিশাপ' পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। এই চিত্রখানি অবনীন্দ্রবাবুর একখানি শ্রেষ্ঠ সুন্দর চিত্র। কয়েকটি প্রস্তর-

খণ্ড ও তরুগুল্ম দ্বারা চিত্রের 'পার্সপেক্‌টিভ' বড় চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে।"[১]

'ভারতী' পত্রিকায় ফ্রেস্কো চিত্রটি প্রশংসিত হলেও, তৎকালীন 'সাহিত্য' পত্রিকা চিত্র মধ্যে কোন শিল্পগুণ খুঁজে পায়নি। উক্ত পত্রিকায় চিত্রটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিত হয়েছিল—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'কচ ও দেবযানী' নামক ফ্রেস্কো চিত্রের প্রতিলিপি। চারুবাবু লিখিয়াছেন, 'যিনি রবিবাবুর 'বিদায় অভিশাপ' পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।' আমরা বহুবার 'বিদায় অভিশাপ' পড়িয়াছি এবং কাব্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কচ ও দেবযানী চিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারিলাম না। হয়ত আমরা চাষা, এ চিত্রের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে অক্ষম। কিন্তু পৌরাণিক কচ ও দেবযানীর চিরপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের যে ছবি কল্পনা-পটে মুদ্রিত হইয়া আছে, আলোচ্য চিত্রে তাহার লেশমাত্র নাই। কচ ও দেবযানীর মূর্ত্তি অঙ্কনে চিত্রকর স্বাভাবিক পরিমাপও লঙ্ঘন করিয়াছেন। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলির হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব, বিশেষতঃ অঙ্গুলিগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানো হয় কেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না।"

'প্রবাসী' (ফাল্গুন, ১৩১৮) পত্রিকাতেও কিন্তু ফ্রেস্কো চিত্রটি প্রশংসিত হয়েছিল। বর্ণিত বিষয়বস্তুর কিয়দংশ হোল—

"মহাভারতোক্ত কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান অবলম্বনে এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।…এখানে কচের বিদায়ের দৃশ্যটি চিত্রে পরিকল্পিত হইয়াছে। সহস্র বৎসরের সাধনা-ক্লিষ্ট, দেবযানীর বিচ্ছেদ-কাতর কচ অভিমানিনী দেবযানীর নিকট বিদায় লইতেছেন। এই ভাবটি চিত্রে পরিস্ফুট দেখা যাইতেছে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ নামক কাব্যে বর্ণিত এই কবিত্বময় উপাখ্যানের সহিত এই চিত্রখানি মিলাইয়া দেখিলে পাঠক যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন।"

ফ্রেস্কোপটে তুলি-রঙ্‌-এ কচ ও দেবযানীর আর একটি রেখাচিত্র (কার্টুন) অবনীন্দ্রনাথ করেছিলেন সম্ভবতঃ মূল পরিকল্পনাস্বরূপ। সেই রেখাঙ্কনটিও

---

১. ফ্রেস্কো চিত্রের রাধাকৃষ্ণ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত। কচ দেবযানীর কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের সম্পদ।

কলাকৌশলে এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে কোন অংশে ক্ষীণ নয়। তার মধ্যে স্বতন্ত্র একটা ভাব ও রস হয়েছে সঞ্চারিত। এখানেও কচ ও দেবযানীর আখ্যানের মূল সুর বেশ স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে। রেখা-বিন্যাসের কৌশল উচ্চাঙ্গের।

অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায় আর একটি চিত্র রচিত হয়েছিল সেই প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে, আর তাকে 'কচ ও দেবযানী' নামে আখ্যাত করা হয়েছে। কিন্তু ছবিখানিকে 'দুষ্মন্ত শকুন্তলা' বললেও কিছু ভুল হয় না। কারণ নরমূর্ত্তিটি এই চিত্রে অলঙ্কার পরিহিত, কানে ও গলায় রত্নালঙ্কার। কলসী কাঁখে নারীর পশ্চাতে চকিত হরিণী। জলের ধারে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে মূর্ত্তিদ্বয়ের সমাবেশ। টানির ফলকে অঙ্কিত ফ্রেস্কোর ন্যায় গুণান্বিত নয় এটি। কচের চেহারায় ক্লিষ্টতার ও বয়সাধিক্যের ছাপ, তারুণ্যের কোন চিহ্ন নেই। দেহাবয়বে কিছু দৌর্বল্যের ভাব লক্ষণীয়। দেবযানী সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত বটে, কিন্তু ফ্রেস্কো চিত্রের মত বলিষ্ঠভাব বিশিষ্ট নয়।

ফ্রেস্কো চিত্রের উদ্দেশ্যে তিনি আরও একটি কার্টুন তৈরী করেছিলেন। তার বিষয়বস্তু হোল 'গঙ্গাবতরণে শিবের নৃত্য'। কিন্তু তাকে আর দেয়াল-পটে রূপদান করা হয়নি। পরে ঈশ্বরীপ্রসাদ ও নন্দলাল বসু তা কপি করে বৃহদাকার চিত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের আর একটি ছবি 'রুক্মিণীর পত্র-লিখন'। বিষয়টি পৌরাণিক, কিন্তু পরিবেশ তদনুরূপ কিছু নয়। উত্তর ভারতীয় ধরনের চেহারা ও পোশাক। 'কম্পোজিশনে' কোন আড়ম্বর ও বাহুল্য নেই, সাদা-সিধে রূপের পরিচ্ছন্ন চিত্র। রুক্মিণী ছিলেন বিদর্ভ রাজ-দুহিতা। তাহলেও চিত্রপটে রাজ-ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্ন ও প্রভাব নেই কোথাও। বর্ণ-যোজনা ও কোমল সুরে তার তান-লয়ের গতি অতি সুন্দর ও স্নিগ্ধ। বর্ণ-বিন্যাসই এই চিত্রের প্রাণ। তখনও ওয়াশ পদ্ধতিতে গভীরতা সৃষ্টির কাজ পুরোমাত্রায় আরম্ভ হয়নি। তবে তার আভাস-ইঙ্গিত সূচিত হয়েছে এখানে। রেখার সৌকুমার্য্য বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। আবার স্তিমিত আলো এবং মৃদু ছায়ার স্পর্শ যে লাগেনি তাও নয়। এই পর্য্যায়ের চিত্র রচনা কালে অবনীন্দ্রনাথ কৈশোর ও যৌবনের প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা ও যৌবনোত্তর কালে স্বকীয় রীতির সাধনার সন্ধিক্ষণে দিনযাপন করছিলেন। ছবিখানির মূলে যে আখ্যানের প্রেরণা তার কাব্যরসও উপভোগ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সম্ভবতঃ এই চিত্রের মূল প্রেরণা।

সেখানে অসহায় রুক্মিণী দ্বারকানাথকে পত্রে যা লিখেছিলেন তা যেন আবার তিনি অবনীন্দ্র-চিত্রে রূপবদ্ধ হয়ে লিখছেন—

"শুনি নিত্য ঋষিমুখে, ঋষিকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব পদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চির দাসীতব,—
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি কালে!
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে,
না পারে আঙ্গুলকুল ধরিতে লেখনী;
কাঁপে হিয়া থর থরে! না জানি কি করি;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ—কাহিনী!
শুন তুমি, দয়া সিন্ধু! হয়ে তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে।"

রুক্মিণীর পত্র-লিখনের আগে কি পরে সঠিক জানা যায় না। তাহলেও ছবিখানি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের রচনা। আর এটি ১৯০৫-৬ সালের পূর্বে অঙ্কিত এবং ১৯০৩ সালের রচনা বলে বিদিত। নাম 'দীপাবলি' বা 'দীপান্বিতা'। বিষয়টি অতি সাধারণ, কিন্তু শিল্প-লক্ষণায় ও বর্ণ-বৈভবে অতীব উচ্চাঙ্গের। একটি তরুণী বাঁ-হাতে পদ্মগুচ্ছ ও ডান হাতে জলন্ত শিখাসমন্বিত দীপ নিয়ে ভীরু পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। সিঁড়ি সম্ভবতঃ গঙ্গার ঘাটের। ক্ষেত্রপট, নদী, আকাশ সব একাকার; সোপান শ্রেণীর ক্ষীণ আভাস মাত্র। মেঘাবৃত গগনে সন্ধ্যাসমাগমের ক্ষীণ আলোক-খেলা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান। গোটা পটখানি নীল ও কালোর আভায় মগ্ন। তার মধ্যে দিনের শেষ আলোয় শ্বেত মেঘপুঞ্জ ও তরুণীর দেহ-রূপ, জামা ও উড়নি এবং পদ্মপুষ্প এক ঝলক আলো এনে দিয়েছে। শাড়ীর রঙ গাঢ় নীল। তদুপরি কিছু highlight-এর প্রয়োগ এবং দীপশিখার আলো তরুণীর ঘাগরায় পড়ে চমৎকার effect সৃষ্টি করেছে।

মূর্ত্তি-কল্পনা ও বেশভূষা সুজাতা ও অভিসারিকা চিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এই ছবিখানির মুখ্য বৈশিষ্ট্য হোল, বর্ণ-মিশ্রণের মাধ্যমে রহস্যঘন প্রাকৃতিক রূপরচনা। বাদামী রঙ্-এর বর্ডার বন্ধনে চিত্রটি আরও মনোরম হয়েছে। মুঘল চিত্রানুগ প্রথায় বর্ডারে সোনালী রঙ্-এর বিচ্ছুরণ এই আধুনিক ছবিতে কিছুটা অভিনবত্বও এনে দিয়েছে।

ছবিটি প্রথম অভিনন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছিল স্যার জন্ উডরফের লেখনীতে। তিনি ১৯০৮ সালে জাপানের প্রসিদ্ধ কলা-পত্রিকা 'কোক্কা'য় কলকাতায় সদ্যোজাত আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে, সেই সঙ্গে এই চিত্রটি এবং ঋতুসংহারের 'সঙ্গীতের আসর' রঙীন প্রতিলিপিতে মুদ্রিত করেন। বিলাতের 'স্টুডিয়ো' পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রাবলীর পরে অবনীন্দ্র-চিত্রের সেই হোল দ্বিতীয়বার বিশ্ব-পরিক্রমা।

প্রায় ঐ সময়েই ছবিখানির প্রতিলিপি 'প্রবাসী' পত্রিকায়ও মুদ্রিত হয়েছিল ১৩১৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে। চিত্র-পরিচিতি খুব সংক্ষিপ্ত হোলেও বিশেষ অনুধাবন যোগ্য—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'দীপান্বিতা' চিত্র অতি সুন্দর ও নানা ভাবোদ্দীপক হইয়াছে। অয়ি ভারতের মাতৃ-দেবিগণ, কবে তোমরা অমাবস্যার অন্ধকারের মত অজ্ঞানতা, ভীরুতা ও স্বার্থান্ধতার অন্ধকার দূর করিবে?"

আর্ট স্কুলে কর্মভার গ্রহণ (১৯০৫) অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে বিশেষ একটি পরিবর্তনের সূচনা করেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে কি পরে তা সঠিক জানা না গেলেও, তাঁর চিত্র-সাধনায় সেই সময়কে ঘিরে আব একটি নতুনতর এবং বিশেষ জোরালো ভাবের পরিবর্তন-প্রভাব এসেছিল অবারিত ছন্দে। তা হচ্ছে জাপানী শিল্পীদের সঙ্গে সুপরিচয় ও তাদের সঙ্গে ভাবধারা বিনিময়ের অবকাশ।

জাপানের প্রখ্যাত কলাবিদ মনীষী কাকুজো ওকাকুরা ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন দু'বার। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ওকাকুরা শেষবার যখন এসেছিলেন, তখন যাবার সময় বলে যান যে, তিনি জাপানে ফিরে গিয়ে ওখানকার দু' একটি আর্টিস্টকে এদেশে পাঠিয়ে দেবেন। উদ্দেশ্য, তাঁরা এদেশ দেখবেন, নিজেরা ছবি আঁকবেন, আর অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের অঙ্কন পদ্ধতি নিরীক্ষণ করবেন ও ভাবের আদান-প্রদান চালিয়ে যাবেন। তাতে উভয়পক্ষের উপকার হবে। তিনি ফিরে গিয়ে দু'জন আর্টিস্টকে

পাঠিয়েছিলেন এখানে। তাঁরা হলেন হিশিদাও টাইকান। খুবই অল্প বয়স ছিল তাঁদের। অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

"টাইকানের তবু একটু মুখ চোখের কাঠ কাঠ গড়ন ছিল, এক রকম লাগত বেশ; হিশিদা ছিল একেবারে কচি, ছোট্টখাট্ট ছেলেটি। তার মুখখানি দেখলে কে বলবে যে এ ছেলে; ঠিক যেন একটি জাপানী মেয়ে, ছেলের বেশে, প্যাণ্ট কোট্ পরা; আপেলের মত লাল টুক্টুক্ করছে দুটি গাল, কাচের মত কালো চোখ, মিষ্টি মুখের ভাবখানি। আমি ঠাট্টা করে বলতুম, 'তুমি হলে মিসেস্ টাইকান।' শুনে তাঁরা দুজনেই হেসে অস্থির হতেন।"

তাঁরা এলেন, ব্যবস্থা হোল তাঁরা ভারতের শিল্পাদর্শ বুঝে নেবেন। আর কলকাতার শিল্পীরা দেখবেন জাপানী চিত্রকলার আংশিক আঙ্গিক-পদ্ধতি কি প্রকার। কাজেও হয়েছিল তাই।

কিন্তু তাঁরা যে কবে এসেছিলেন এবং কতদিন কলকাতা শহরে ছিলেন, তা সঠিক জানার অন্তরায় অনেক। অথচ তা অজ্ঞাত থাকলে অবনীন্দ্র-চিত্র পদ্ধতির ক্রম-বিবর্ত্তনের প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হয় না।

প্রথম অন্তরায়, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণকালে সন-তারিখের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে চলেন নি। অবাধ মুক্তগতিতে স্মৃতিমন্থন করে গেছেন নিজের খেয়াল-খুশি মত। দিন-তারিখের সমস্যা এনে তাঁর স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত বর্ণনাকে ব্যহত করেন নি। তার ফলে তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। অবনীন্দ্র-চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ও এবিষয়ে চেষ্টা করে সফল হননি। তিনি লিখেছেন—

"Information concerning Abanindra Nath upto the year 1900, I have tried to obtain from the artist himself. Unfortunately, he was not able to mention anything definite either about the date of his going to Gilhardi, or when he met E. B. Havell or the date of the visit of Taikwan and Hiside to his home."[১]

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানী চিত্রকলা ও চিত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল ১৯০১-২ সালে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

---

১. Visva Bharati Quarterly (May, 1942) P. 123

ও. সি. গাঙ্গুলী সম্পাদিত 'রূপম্' পত্রিকায় জাপান থেকে আগত শিল্পীদের সম্বন্ধে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (Oct, 1921 & April, 1922)। 'রূপম্' সম্পাদক শেষোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন—

"Two Japanese artists who came to India in 1900 immediately before the Russo-Japanese war." এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণেতে লিপিবদ্ধ কয়েকটি বর্ণনা আলোচনার যোগ্য। তিনি একজায়গায় বলেছেন যে, "ওকাকুরা শেষবার ভারত ভ্রমণ অন্তে দেশে গিয়ে শিল্পীদের এখানে পাঠিয়েছিলেন।" আবার অন্যস্থানে লিখেছেন—

"ওকাকুরা যখন প্রথমবার আসেন এদেশে, যতদূর মনে পড়ে কলকাতায় সুরেনের বাড়িতেই ছিলেন। সেবারে খুব বেশী আলাপ হয়নি তাঁর সঙ্গে।"

তারপরে লিখলেন—

"দ্বিতীয়বার যখন এলেন দশ বছর পরে, তখন আমি আর্টের লাইনে ঢুকেছি। প্রায়ই আমাদের জোড়াসাঁকোর স্টুডিয়োতে বসে শিল্প সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হ'ত। নন্দলালদের তিনি আর্টের ট্রাডিশন অব্‌সার্ভেশন ও ওরিজিন্যালিটি বোঝাতেন তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে।"

সেবারেই ওকাকুরা নন্দলাল বসু ও অন্যান্যদের বলেছিলেন যে, দশ বছর আগে এসে তিনি কলকাতায় আধুনিক আর্ট বলে কিছু দেখেন নি। কিন্তু তখন আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এদেশের আর্ট উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে। আবার দশ বছর পরে এলে তিনি দেখবেন যে, প্রকৃত উন্নতি হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি অর্থাৎ ওকাকুরা আর আসেন নি।

অবনীন্দ্রনাথ 'আর্টের লাইনে ঢোকা'র পরে ওকাকুরা দ্বিতীয়বার এদেশে আসতে পারেন এবং সেবারে দেশে গিয়ে (১৯০০) জাপানী শিল্পীদেরও পাঠাতে পারেন, কিন্তু তখন অবনীন্দ্র-শিষ্যদের সঙ্গে দেখা হতে পারে না। জাপান থেকে আগত শিল্পীদের সম্পর্কে 'রূপম্' পত্রিকার তারিখটি গ্রহণ-যোগ্য। কারণ বিশ বছরের ব্যবধানে বিশেষ ভ্রান্তিকর কিছু লিপিবদ্ধ না হওয়ারই সম্ভাবনা। আবার জীবন সায়াহ্নে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণেতে অসঙ্গতি ও বিস্মৃতি অস্বাভাবিক নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। অনেকের মতে অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতার চিত্র অঙ্কন করেছেন ১৯০২ সালে। আর ছবিটিতে wash-এর কাজ কিছু পরিমাণে লক্ষণীয়। সুতরাং তার আগেই জাপানী চিত্র-রীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তাছাড়া তিনি বলেছেন যে, জনৈক

জাপানী শিল্পী ভারতমাতার ছবিটি বড় করে একটি পতাকা করে দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। তাহলে সে কাজটিও ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের মুখে হয়েছিল। তিনি সেই জাপানী শিল্পীর নামোল্লেখ করেন নি। তিনি আর্ট স্কুলে যোগদানের পরে সেখানেও একজন জাপানী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং জাপান থেকে আগত শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে।

ওকাকুরা বলেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের মত শিল্পী পাঁচশ' বছরে একবারই জন্মগ্রহণ করেন। একথা যখন তিনি বলেছিলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ অবশ্যই পরিপক্ক শিল্পী এবং নিজস্ব পথ ও পদ্ধতিতে কিছু শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা করেছিলেন যা দেখে এই মন্তব্য করেন।

সুতরাং এই ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, ওকাকুরার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল তিনি নিজস্ব পন্থায় চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করার পরে। কিন্তু তখন নন্দলাল বসুর সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে না। নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের পরে কোন এক দিন। অতএব, ওকাকুরা আরও একবার ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন এবং তা নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা আর্ট স্কুলে যোগদানের পরে।

এই বিষয়ে আরও দু'একটি যুক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে। যেমন, অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, জাপানী ধরনে রেশমের উপরে পেন্টিং-এর কাজ শিখে নেওয়ার ভার দেয়া হয়েছিল লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে। অবনীন্দ্রনাথ নিজে সিল্ক পেন্টিং-এ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি একটি-দুটি মাত্র ছবি করেছিলেন সিল্কের পটে।

অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে এনে হ্যাভেল সাহেব তাঁর সহকারী হিসেবে সর্ব্বাগ্রে যাঁকে কর্ম্মভার দিয়েছিলেন, তিনি হলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ। ইনি ছিলেন পাটনা কলমে অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ চিত্রকার। ঈশ্বরীপ্রসাদ ১৯০৫ সালের আগে আর্ট স্কুলে যোগদান করেন নি। সুতরাং তিনি জাপানী শিল্পীদের কাছে কাজ শিখেছিলেন ১৯০৫ সালের পরে। আরও হতে পারে যে, ঈশ্বরী-প্রসাদের সঙ্গে হয়ত অবনীন্দ্রনাথের যোগাযোগ পূর্ব্বে থেকেই ছিল। অতএব জাপানী শিল্পীরা প্রথমে এলে তিনি ঈশ্বরীপ্রসাদকে সিল্ক পেন্টিং শিখে নিতে বলেছিলেন।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত করলে বোধ হয় অসঙ্গত

হবে না যে, জাপান থেকে প্রথম যে দু'জন শিল্পী এসেছিলেন, তাঁরা ১৯০১-২ সালের পূর্ব্বেই আসেন। আর তখন থেকেই অবনীন্দ্রনাথের 'জলে ধোয়া' (wash) রীতিও একটু-একটু করে তাঁর চিত্রে স্থান পেতে থাকে।

জাপান থেকে তৃতীয় যে কুশলী কলাকারটি কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি কাত্সুতা। তাঁর ভারতে আগমন সম্বন্ধে সঠিক জানা যায়—ও. সি. গাঙ্গুলীর প্রবন্ধে (রূপম্: অক্টোবর, ১৯২১)। সেখানে তিনি 'A Group of Apsaras by a Japanese Artist'-এ লিখেছেন—

"A gifted Japanese artist, Mr. Yoshio Katsuta came to India in the year 1907 and stayed over a year." এ কথাও স্পষ্ট জানা যায় যে, হিশিদা ও টাইকান স্বদেশে ফিরে যাবার কিছুকাল পরে কাত্সুতা এদেশে আসেন।

হিশিদা টাইকানের কলকাতায় অবস্থান ও চিত্রাঙ্কন বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের 'স্মৃতিকথা'য় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এঁরা দু'জনেই সুরেন ঠাকুরের বালিগঞ্জের বাড়ীতে থাকতেন। তাঁরা শহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অনবরত স্কেচ্ করতেন। টাইকান অনেক সময় অবনীন্দ্রনাথের গাড়ীতে যাতায়াত করতেন। তখন রাস্তার এ-পাশে ও-পাশে তাকিয়ে দেখে হাতের তেলোতে আঙ্গুল বোলাতেন। অবনীন্দ্রনাথ জানতে চাইলে বলতেন, ফর্মটাকে মনে ধরিয়ে নিচ্ছেন। টাইকান ছিলেন তৎকালীন জাপানের একজন খ্যাতনামা শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিয়োতে বসে তাঁরা দু'জনেই ছবি আঁকতেন। তাঁদের ছবির প্রদর্শনী হোত এবং কিছু কিছু বিক্রীও হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ অনেক সময় ফরমাশ করেও তাঁদের দিয়ে ছবি করাতেন। হিশিদার অঙ্কিত সরস্বতী এবং পরবর্ত্তীকালে আগত ভোকোইয়ামার কালীর ছবি খুব ভাল হয়েছিল। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী কিনেছিলেন ছবি দু'খানি। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে টাইকান অতি মনোরম ভঙ্গীতে যে রাসলীলার চিত্র রচনা করেছিলেন সে ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।[১]

জাপানী শিল্পীরা ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি রূপায়নের আদর্শ ও রহস্যকথা বুঝে নিতেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। আর তিনি দেখতেন ওঁরা কি করে চিত্র-কল্পনা করেন, রেখা টানেন, তুলি চালান ও ছবির পট ধুয়ে-ধুয়ে রঙ্ ফুটিয়ে তোলেন।

---

১. এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

টাইকান যেদিন প্রথম সিল্কের উপরে হাল্‌কা কালি দিয়ে ছবি এঁকেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ তা দেখে একেবারে অবাক! 'হাল্‌কা একটু ধোঁয়ার মত— এ আবার কি ধরনের ছবি।' একটা কয়লার টুকরো দিয়ে এঁকে পালক দিয়ে ঝাড়লেন, পরে তুলি দিয়ে একটু হাল্‌কা কালি বুলিয়ে দিতেই ছবি হয়ে গেল। কিন্তু কি চমৎকার ছবি!

টাইকানের কাছেই অবনীন্দ্রনাথ 'লাইন ড্রইং ও কি করে তুলি টানতে হয়' তা শিখেছিলেন। তাঁর কাছেই তিনি প্রথম দেখলেন যে কত 'ধীরে ধীরে' জাপানীরা লাইন টেনে চলেন। তিনি আরও দেখলেন যে, টাইকান খুব জলের ওয়াশ দিয়ে ছবির পটকে ভিজিয়ে নিতেন। তা দেখেই অবনীন্দ্রনাথ ভাবলেন জলে ভিজিয়ে ছবি আঁকলে কেমন হয়। এই ভেবে তিনি গোটা পটটিকেই জলে ডুবিয়ে দিলেন। তার 'এফেক্ট' বেশ ভালই হয়েছিল। সেই থেকেই তাঁর ওয়াশ পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। তবে জাপানী প্রথায় মোটা তুলির সাহায্যে ছবিতে বার বার জল দিয়ে দিয়ে ওয়াশ করা হয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ পুরো ছবিটিকে অনেকবার জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিতেন।

এইভাবে জাপানের শিল্পীদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শ ও আঙ্গিক প্রভৃতির আদান-প্রদান ও বিনিময় চলেছিল। তবে শেষ পর্য্যন্ত জাপানী চিত্রকরগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রতিভার মধ্যে এমন একটি দুরধিগম্য অংশ আছে, যেখানে অন্য কারোর পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে টাইকান বলেছিলেন যে, শিল্পগুরুর অঙ্কনপদ্ধতি আয়ত্ত করা সম্ভব হলেও, তাঁর কল্পনাশক্তির নাগাল পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। তাঁর অদ্ভুত ও অসাধারণ কল্পনাশক্তিকে তিনিই রূপ দিতে পারেন।

অবনীন্দ্রনাথ জাপানী চিত্ররীতি থেকে ওয়াশ পদ্ধতি মূলতঃ গ্রহণ করলেও তিনি যে তাকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার-প্রয়োগ করেছেন তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাতে। তন্মধ্যে একজন হলেন শিল্পীগুরুর জ্যেষ্ঠাকন্যা উমা দেবী। তিনি তাঁর স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

"বাবা ছবি আঁকছেন, আমি পিছনে দাঁড়িয়ে। ছবিখানিকে জলে ডুবিয়ে চেপ্টা তুলি দিয়ে মুছে রোদে দিলেন। রোদ থেকে যখন সেটি তুলে আনলেন, তখন তাঁর মুখ বিষণ্ণ। বললেন, 'যে রঙ্ মনে এসেছিল, হাতে তা বের করতে পারলুম না'।"[১]

১. বাবার কথা : উমা দেবী। পৃঃ ৩৯

কবি জসিমউদ্দীনও অবনীন্দ্রনাথকে ছবির পট জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিতে দেখেছেন। তিনি লিখেছেন—

"তিনি (অবনীন্দ্রনাথ) আরাম-কেদারায় বসিয়া ছবির উপরে রঙ্ লাগাইতে থাকিতেন। মাঝে মাঝে সেই ছবিকে পানির মধ্যে ডুবাইয়া ধুইয়া ফেলিতেন। আবার তাহা শুথাইয়া তাহার উপরে নিপুণ তুলিকায় রঙের উপরে রঙ্ লাগাইয়া যাইতেন।"[১]

চিত্রপটকে জলে ধুয়ে ধুয়ে রঙ্‌কে বসিয়ে চিত্র-রচনার যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তার মধ্যে অবনীন্দ্র-শিল্প আর একটি অভিনব রূপ-প্রকৃতি লাভ করে আধুনিক চিত্রশৈলীতে একটি নবতর দিগ্‌দর্শন করিয়েছিল। 'ওয়াশ টেক্‌নিক' কথাটির প্রবর্ত্তন হয়ে তা চিত্রপটে স্থায়ী আসন লাভ করলো। ক্রমশঃ তা শিক্ষার্থীদের পটেও স্থান পেতে লাগলো।

তবে অবনীন্দ্রনাথ সেই ওয়াশ পদ্ধতিকে কোন বাঁধা-ধরা গতানুগতিক পন্থায় চালান নি। নিজেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন রকমে তার প্রয়োগ করছেন, ছাত্রদেরও তেমনি কোনও বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখেন নি। অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরাজিকে পৃথকভাবে এক-একটি করে পর্য্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, কত স্বতন্ত্রভাবে ও ভিন্ন পন্থায় তিনি এই টেক্‌নিককে কাজে লাগিয়েছিলেন।

যেভাবে যেখানেই তিনি এই রীতির প্রয়োগ করেছেন, তার মৌল ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বর্ণের মায়াজাল, রঙের কুহেলি, স্বপ্নালুভাব, গভীর রহস্য, রোমাণ্টিক পরিবেশ, ছায়াঘন প্রকৃতির রূপ, আলোকোজ্জ্বল সুস্পষ্ট রূপচ্ছটার মধ্যেও অস্পষ্টতা এবং জ্ঞেয় যা তার মধ্যে দুর্জ্ঞেয়ের ভাব সৃষ্টি করা। আর সেই সৃষ্টি-সাধনায় তিনি সফল ও সিদ্ধপুরুষ। প্রতিটি চিত্রে রেখার ছন্দ, রঙ্-এর বৈচিত্র্য, ভাবের আবেশ, বিষয়বস্তু সমাবেশের অপূর্ব্ব কৌশল মিলিত হয়ে যেন ঐকতান সঙ্গীত হয়েছে রচিত। দিনে দিনে, কালে কালে তা ক্রমশঃই পরিণত, পরিপক্ক ও রসভারে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। ছবিকে ধুয়ে ধুয়ে পরতে পরতে রঙ্-এর সুর ধরিয়ে তিনি তাকে এমন করে তুলতেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে একটি নীরব সুরের মূর্চ্ছনা, রূপের অতলে অরূপ ও অপরূপের সৌধ বলে আখ্যাত করা চলে।

১৯০৫-১১ সালের মধ্যে অঙ্কিত তাঁর এমন অনেক উচ্চাঙ্গের চিত্রপটের সন্ধান পাওয়া যায়, যা নিঃসন্দেহে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন

১. ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়ঃ জসীমউদ্দিন। পৃঃ ৫৮

করেছে। সেই সময়ে তিনি আরও কয়েকটি মুঘল বিষয়ক চিত্র রচনা করেন। তন্মধ্যে 'দারার ছিন্নমুণ্ড' শিল্প-সমঝদার ও সমালোচক মহলে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[১]

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্রকলার ক্ষেত্রে তখন আর একটি বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা, ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা সেই নবজাত চিত্ররীতির প্রগতিতে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৯০৮-৯ সাল থেকে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'তে অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় শিষ্যদের ছবি প্রায় নিয়মিত স্থানলাভ করতে থাকে। ওদিকে 'ভারতী'-তেও আধুনিক ছবির প্রতিলিপি মুদ্রণ ও তার টীকা ব্যাখ্যা প্রকাশনার সুব্যবস্থা হয়। এই কয়েকটি সহযোগী ও সহধর্ম্মী পত্রিকার বিপরীত মনোভাব নিয়ে আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা মুদ্রণে উৎসাহী হয়ে উঠলেন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে অবনীন্দ্র-রীতির ছবি ও তার সম্বন্ধে কোন টীকা বা ব্যাখ্যা বেরোলেই পরবর্ত্তী সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকাতে অনিবার্য্যভাবে তার প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হোত। সে সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গী ছিল অতীব তীক্ষ্ণ। অধিকাংশের মধ্যেই থাকত যুক্তিহীন মন্তব্য ও শিল্প-রসবোধের অভাব। 'সাহিত্য' সম্পাদক যে স্বভাবতঃই শিল্পকলার বিরোধী ছিলেন, তা নয়। তিনি জাতীয় ভাবেরও বিরোধী ছিলেন না; বরং অনেক বিষয়ে তিনি প্রখর জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিতেন। দেশীয় ভাব, ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা-প্রীতি ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'সাহিত্য' সম্পাদনার মধ্যে। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে যেন তিনি নতুনত্ব কিছু বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর আলোচনা ও মন্তব্যাদি পড়লে মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় ছাত্রদের চিত্রকলার প্রতি তাঁর যেন সহজাত একটা বিদ্বেষ ও বিমুখী ভাব ছিল। ছবিগুলি পর্য্যালোচনা ও বিশ্লেষণ না করেই যে তিনি কটুভাষায় নিন্দা করতেন তাও মনে হয় না। কারণ অধিকাংশ আলোচনাতেই দেখা যায় যে, তিনি ছবির লক্ষণাবলী ও বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েই আক্রমণ চালাতেন। সময় সময় সে আক্রমণের ভাষা হোত অতি কদর্য্য। আবার অনেক সময় তা উপভোগ্যও যে না হোত তা নয়।

১. এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গ কিন্তু ঐভাবে আক্রান্ত হয়েও ব্যথিত ও বিরক্ত হতেন না। তাঁদের চলার গতি তাতে শ্লথ ও মন্থর হয়নি কখনও। বরং তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও আলোচনার যোগ্য যে, তিনি তাঁর নিজ আদর্শে ছিলেন সর্বদা অবিচল। তাঁর ভাষা ছিল ওজস্বিতা গুণসম্পন্ন। যুক্তিজাল রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। হোক্ না তা অপরের কাছে অযৌক্তিক, তিনি ভাষার চাতুর্য্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তবে ক্ষান্ত হতেন।

অতএব, অবনীন্দ্রনাথকে চিত্র-পথ প্রশস্ত করতে নানাভাবেই অনেক বাধাবন্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি থামেন নি। কষ্ট স্বীকার করে, দুঃখ-বেদনা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই তাঁকে এগিয়ে চলতে হয়েছিল নতুন পথের সন্ধানে।

১৯০৬-৮ সালে অঙ্কিত তাঁর অন্যান্য চিত্রের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'গণেশজননী' ছবিটির। বর্ণ সুষমায় এটি অনন্য। ভারতের মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে শিব-পার্ব্বতী ও পরিবার পরিবৃত দেবাদিদেবের নানা রূপচিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ বিগত দিনের কোনও স্মৃতি বহন না করেই সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গীতে গণেশ ও তাঁর জননীর রূপারোপ করেছেন। এই ছবিখানি অবনীন্দ্র-চিত্রকলায় একটি নতুন পর্য্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

পাহাড়ের কোলে মা দুর্গা লাল টুকটুকে ছোট্ট গণেশকে উঁচুতে তুলে ধরেছেন। মাতৃমূর্ত্তির পরনে লাল রঙ-এর ঘাগরা, উড়নি শ্বেতাভ। গণেশ মালকোচা করে ছোট ধুতি পরিহিত। দেহে নানা আভরণ ভার। বিবিধ বর্ণবাহারে রচিত চিত্র।

এই চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ নারীমূর্ত্তির রূপও মুখমণ্ডলে একটি নতুন ভাব ও গঠনভঙ্গী এনেছেন, যার সঙ্গে পূর্ব্বাঙ্কিত সুজাতা, অভিসারিকা ও দীপবালার কোন সাদৃশ্য নেই। 'গণেশজননী'তে তিনি মুখের যে আকার-প্রকারনতুন করে প্রবর্ত্তন করলেন, তা আবার কিছুদিন চলেছিল বিভিন্ন চিত্রপটে। অতঃপর আবার পরিবর্ত্তন এসেছিল। এইভাবে বিভিন্ন পর্য্যায়ে তাঁর চিত্রে নারীরূপ নতুন নতুন পথে চলে, বিচিত্র সব মুখচ্ছবির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই ছবিটির গাছপালা ও পাহাড়-পর্বত রচনায় শিল্পী তখনও সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করতে পারেন নি। পর্বত ও বৃক্ষরাজি বহুলাংশে বাস্তববাদী। তা'হলেও রচনা-পদ্ধতিটি পূর্ণরূপে ভারতীয়ত্বের প্রতিরূপ এবং আধুনিক চিত্রকলার বিজয়বৈজয়ন্তীর লক্ষণাক্রান্ত।

বাংলা ১৩১৭ সনের চৈত্র সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে 'গণেশজননী' রঙীন প্রতিলিপিতে মুদ্রিত হয়েছিল আকর্ষণীয় পরিচিতি সহ। সেই অংশটি নিম্নরূপ—

"এই চিত্রখানিতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পিত দুর্গা শিশু গণেশকে হাতের উপর দাঁড় করাইয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, গণেশ শুঁড় দিয়া মায়ের আঁচলে বেল পাড়িয়া দিতেছেন। এই পরিকল্পনা কবি-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। গণেশের ক্রীড়াচঞ্চল ভঙ্গী দুর্গার শান্ত ভাবতন্ময় মুখশ্রী এই চিত্রের প্রধান বিষয়; এছাড়া চিত্রের পশ্চাৎ দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে; কৈলাসের উত্তুঙ্গ শিখর পার্শ্বে ছিন্ন মেঘের অন্তরালে খণ্ডচন্দ্র ও ঘনপল্লব তরুরাজির সম্মুখে বিরলপত্র বিল্বশাখা বৈপরীত্য হেতু মনের মধ্যে বিচিত্রভাব সঞ্চার করিয়া দেয়।"

'প্রবাসী'তে প্রতিলিপিখানি ও তার বর্ণনা দেখে 'সাহিত্য' সম্পাদক তাঁর পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাতেই দুরন্ত আক্রমণ চালালেন—

"শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গণেশজননী'র চিত্রখানি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। 'ঘাগরা-পরা গণেশজননী শিশু গণেশকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আর লাল টুকটুকে গণেশ শুঁড়ে গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া 'পালাভক্ষণ' করিবার চেষ্টায় মশগুল। 'অস্থানে পততাং সদৈব মহতামেতাদৃশীস্যাদ্ গতিঃ'— অতএব দেবতা গণেশের জন্য আমাদের দুঃখ নাই। কিন্তু যে সকল চিত্রকর গণেশ তুলিকা-শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া আমাদের প্রাচীন পৌরাণিকী কল্পনাগুলিকে পদদলিত করিতেছেন, তাঁহাদের কি বলিব? এমনতর উদ্ভট, অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক পটকে 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে যদি চা'র পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ উঠে, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ নাচার।"

'গণেশজননী'র মধ্য দিয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের যে পত্তন হয়েছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তার অব্যবহিত পরেই অবনীন্দ্রনাথ আর একটি নবতর চিত্র প্রচেষ্টায় হাত দিয়েছিলেন। তার মধ্যে শিল্পভাবনা, নতুন সৃষ্টি-প্রতিভা প্রতিফলিত হয়েছিল অনন্যসাধারণ কৌশলের ছাপ নিয়ে। সেই সময় তিনি ইংরেজী ভাষায় ওমর খৈয়ামের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ফিটজিরাল্ড-এর একটি বিশেষ সংস্করণের জন্য বারোখানি চিত্রাঙ্কন করেন। চিত্রাবলীসহ বইটি লণ্ডনের স্টুডিয়ো প্রন্থন-বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। ১৯০৮ সালের মধ্যে শিল্পী সেই বারোটি ছবির কাজ সম্পূর্ণ করেন।

কারণ ১৯০৮ সালেই স্যার জন উডরফ 'কোক্কা' পত্রিকায় ওমর খৈয়ামের চিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন।

এই চিত্রগুচ্ছে তাঁর ওয়াশ পদ্ধতি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল। এখানেই অবনীন্দ্র-চিত্রশৈলীর রঙ্-রেখার বুনট, রূপাকৃতি একটা সুনির্দিষ্ট ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়েছিল। রেখার সূক্ষ্মতা ও দৃঢ়তা এখানে শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। রঙ্-এর মায়াজাল বিস্তৃত হয়েছিল অদ্ভুত অভিনবত্ব নিয়ে।

ওমর খৈয়ামের চিত্র যে কেবল তাঁর আঙ্গিক ও করণ-কৌশলের নব-দিগন্ত রচনা করেছিল তা নয়, চিত্র রচনার ক্ষেত্রে পুঁথি-পুস্তক চিত্রায়নের নতুন একটি শাখা প্রবর্ত্তনের কাজ চলেছিল এই কাজের মাধ্যমে। ১৯০৮ থেকে ১৯২০ সাল সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থের ইলাসট্রেশনের জন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে প্রচুর চিত্র অঙ্কন করেছিলেন।[১]

উপর্যুক্ত সময়ে তিনি গ্রন্থ-রঞ্জনের জন্য অনেক চিত্র রচনা করলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে এমন আরও সব ছবি এঁকেছিলেন যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপের ও ভিন্ন রসের। আঙ্গিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন সব ছবিতে কিছু সাদৃশ্যভাব দেখা গেলেও, রূপকল্পনায় ও দৃশ্যপট রচনায় বৈচিত্র্য প্রবাহের শেষ ছিল না, এবং তা অন্তহীন।

আলোচ্য অধ্যায়ের কয়েকটি চিত্রে তাঁর পুরী ভ্রমণের ফলশ্রুতিও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি কোন্ কোন্ সময়ে কতবার পুরী গিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা ও জামাতাকে ছবি এঁকে পুরী থেকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তা'তে দেখা যায় যে, তিনি ১৯০৮, ১৯১০ ও ১৯১১ সালে কিছুদিন করে সেখানে কাটিয়েছিলেন। সেই সময়কার এবং পরবর্ত্তীকালের কিছুসংখ্যক ছবিতে উৎকল দেশের সংস্কৃতি অনুশীলনের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট। নারীদেহের রূপ, অলঙ্কারসমূহ ও পরিধেয়ের রীতি-ভঙ্গীতে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। নর-নারীর মূর্ত্তি রচনায় এমন কয়েকটি লক্ষণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যার ফলে চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে নয়ন-বিমোহন ও রসসমৃদ্ধ হয়েছে। ভারী ভারী গহনা, বলিষ্ঠ চেহারা, কিন্তু ছন্দের অভাব নেই। ওয়াশ পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রগুলির মধ্যে কয়েকখানিতে রঙ্-এর গভীরতা এমন স্তরে উঠেছিল যা অতল রহস্যের বার্তা এনে দেয়। কোন কোনও ছবিতে Wash-এর মধ্যে শ্বেতবর্ণের অবাধ প্রয়োগ চিত্রপটে গভীরতার মধ্যেও একটা স্বচ্ছভাব এনে দিয়েছে।

১. বিশদ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে এই চিত্র পর্য্যালোচনা করা দরকার। তা হচ্ছে যে, পুরী হোক্, রাঁচি হোক্ বা আর যেখানেই হোক্, তিনি কিন্তু সর্বদা সেখানে বসে শুধু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই পটের বুকে ধরে দেননি, এই বিষয়ে তাঁর কর্মধারায় কিছু অনন্যতা ও নিজস্বতা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নানা জায়গা ভ্রমণ করে, চোখ ও মনকে ভরিয়ে নিয়ে আসতেন। তারপর বাড়ী ফিরে, এমন কি কলকাতায় এসে তাদের রূপস্মৃতি দিয়ে চিত্রপট পূর্ণ করে তুলতেন কত নয়নাভিরাম রেখা, বর্ণ ও রূপাবলীতে।

এই প্রসঙ্গে দু'চারখানি ছবির উল্লেখন ও আলোচনা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন, দেবদাসীর চিত্র। পুরীতে গিয়ে তিনি জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে দেখলেন দেবদাসীর নৃত্য। কলকাতায় ফিরে চিত্রে পরিস্ফুট করলেন সেই নৃত্য-ভঙ্গিমার রূপ। সে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ছবিটিতে দেখা যায় নাটমন্দিরে স্তম্ভের সামনে নৃত্যরতা দেবদাসী। তার জামা-কাপড় উৎকল রীতির। মেঝেতে ছড়ানো ফুলের পাপড়ি; পুষ্পার্ঘ্য দানের ইঙ্গিত। আবার চিত্রপটে ভারসাম্য রক্ষারও প্রয়াস। চিত্রাঙ্গিক তখন সুপরিণতির দিকে প্রভূত পরিমাণে এগিয়ে গিয়েছে।

নর্ত্তকীর ডান হাতে বরদমুদ্রা। বর্ণ-বৈশিষ্ট্য ঘোরতর স্বপ্নালু ভাবাবিষ্ট। তার চেহারা দীর্ঘায়ত ও বলিষ্ঠ। দেহরূপ বস্তুতঃই একটু ভারী এবং অলঙ্কার-পত্রও স্থূল গঠনের। গোটা পরিবেশ আবছা ধরনের। তবে মূর্ত্তি ও তার দেহভঙ্গী অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল নয়। ছবিটির মূল প্রেরণা তাঁর নিজের কথাতেই জানা যায়—

"সেবারেই নাচ দেখেছিলুম দেবদাসীর।...এক পাশে একটি মাদল বাজছে, একটি মশাল জ্বলছে, একটি দেবদাসী নাচছে। দেবদাসী নাচের সঙ্গে ঘুরছে-ফিরছে, সঙ্গে সঙ্গে মশালও সেই দিকে ঘুরছে, আলো পড়েছে তার গায়ে।"

সেই মশালের আলোতে উজ্জ্বল দেবদাসীর রূপটিই তিনি স্মৃতিপটে ধরে এনেছিলেন। তবে বর্ণের বিশিষ্টতায় একটা আবছা ভাব ধরেছে।

দেবদাসীর নৃত্যছন্দ তৎক্ষণাৎ যে তিনি চিত্রায়িত করেন নি তার বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি পূর্ব্বস্মৃতি মন্থনকালে। বর্ণনাটি হচ্ছে—

"অভিনয়ে নটীর পূজা দেখে ছবি আঁকো তোমরা। আমি সত্যি-সত্যিই দেবমন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেবদাসীর নৃত্য দেখেছি। চমৎকার ব্যাপার সে। সেইবারেই ফিরে এসে দেবদাসীর ছবি আঁকি।"

১৯১০ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে কি ডিসেম্বরের গোড়াতে ডঃ আনন্দকুমার স্বামী এলাহাবাদের Christian College-এ সচিত্র একটি বক্তৃতা দান করেন। বিষয় ছিল, 'History of Indian Painting.' বক্তৃতার শেষাংশে তিনি নব্য-চিত্ররীতিরও উল্লেখ করেন। তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের বিরহী-যক্ষ, দীপাবলী, বন্দিনী সীতা ও দেবদাসীর চিত্র স্থান পেয়েছিল। বক্তৃতাটির নাতিদীর্ঘ একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল 'দি স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় (১১ ডিসেম্বর, ১৯১০)। সুতরাং দেবদাসী ও বন্দিনী সীতা অবশ্যই ১৯১০ সালের মধ্যে অঙ্কিত হয়েছিল। দেবদাসী সম্ভবতঃ ১৯০৮ সালে তাঁর পুরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাজাত চিত্র। দেবদাসী সম্বন্ধে ডঃ কুমারস্বামীর মন্তব্য হোল—

"...the Devadasi dancing before Jagannath in the shrine of Puri. The only light that fell upon her figure came from between the two pillars and her attitude was that of whole-souled devotion. The beautiful lotus-petals were, in the ecstasy of the dance, seen falling from the hands reminding one of what Mr. Tagore described in some such words—O Lord of the World! Why hast Thou made us, Thy creations, so good and so fair and minute, if we too shall wither away in the next like these beautiful white petals of the lotus flower?

Oh Jaga-Vandhu, why is it that Thou hast made us so lovely to-day, since tomorrow, Thou will throw us into the dust like a fallen flower?"

ওড়িষী টাইপ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আর একখানি চিত্র এঁকেছিলেন যেটি তত সুবিদিত নয়, আর আজ তা লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছবিটি তাঁর কলাকৃতির অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নামটি অতি কাব্যময়, 'আঁখি পাখী ধায়'। যেমন নাম, তেমনি কাব্যধর্ম্মী সৃষ্টি। জনৈক উৎকল রমণী ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে দূরগামী প্রিয়জনকে দেখছেন চোখের পাশে হাত রেখে। প্রিয়জনটি তখন চোখের অন্তরালে চলে গিয়েছেন, কিন্তু উৎকণ্ঠিতা প্রিয়ার আঁখি দুটি তখনও তাকে যেন অনুসরণ করে চলেছে। নারীদেহের ভঙ্গীতে ও চকিত

চাহনিতে ব্যাকুলভাবের গভীরতা ফুটে উঠেছে। বেশবাস, চরণভঙ্গী ও গহনাগাঁটি সব উৎকল দেশীয়। 'টাইপ' সৃষ্টির এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বর্ণিকাভঙ্গ এখানে দেবদাসীর চিত্র অপেক্ষা আরও অধিক গাঢ়তা লাভ করেছে। ফলে চিত্রপটে হৃদয় সংবেদ্য আরও নিবিড়তর হয়েছে।

উৎকল রমণীরূপে মুগ্ধ শিল্পীর আর একটি ছবিও খুব আকর্ষণীয়। নাম 'পুরীর পুরন্ধ্রী'। ১৩২০ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে এর প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছিল। মেয়েটির নাকে আংটি ও নাকছাবি, কপালে টিপ। মাথায় ঘন কেশদাম। ছবিটি জোরালো। এখানেও 'টাইপ' সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার। 'প্রসাধনরতা' ছবিতেও উড়িষ্যার আঞ্চলিক বিশিষ্টতার প্রতিফলন দেখা যায়। এটিও সম্ভবতঃ পুরী ভ্রমণান্তে রচিত। বিষয়-বস্তুতে ও ভাব-ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। তবে রঙ-রেখায় চারুতা ও কারুতায় ছবিটি উচ্চাঙ্গের কলাকৃতি।

অবনীন্দ্রনাথের পুরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতাজাত আর একখানি ছবি 'কাজরী নৃত্য'। এটি রচনার মূল উৎস প্রসঙ্গ শিল্পীর স্বব্যাখ্যানে বিধৃত আছে—

"...আর আঁকি কাজরী ছবিখানি (দেবদাসীর পরে)। তাও দেখেছিলুম পুরীতেই কমিশনারের বাড়ীতে। বাগানে পার্টি, মেঘলা আকাশ, টিপ্-টিপ করে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, কয়েকটা বড় ফুলের গাছ, তার পাশে নাচছিল কয়েকটি ওাড়য়া মেয়ে। কাজরী ছবিখানি পরে তা থেকেই হল।"[১]

চিত্রখানিতে দেখা যায় পত্রলেশহীন একটি বড় গাছের নীচে তিনটি নারী কাজরী নৃত্যে রত। দু'জনার সম্মুখ দৃষ্টি, আর একজনাকে দেখা যায় পশ্চাদ্বর্ত্তিনী। জামা-কাপড়, সাজসজ্জা সাধারণ উৎকল রীতির। আকাশে ঘনঘটা। তিনটি নারীদেহের ভিন্ন ভঙ্গীতে যেমন হয়েছে ছন্দ সৃষ্টি, তেমনি চিত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। সর্ব্বাপেক্ষা সার্থক হয়েছে বর্ণিকাভঙ্গ। জলে ধুয়ে ধুয়ে রঙ্‌কে এমন পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি যে, বর্ষাগমনের পূর্ব্বাভাষ অতি চমৎকার প্রস্ফুট হয়েছে। নারীদেহের গহনাগাটিতে সামান্য সোনার জলের ছোঁয়াচ বেশ একটা ঝিকিমিকি খেলিয়েছে। ঘনমেঘের নীচে যেন বিজুলীর আলো ঠিকরে পড়েছে।

ছবিখানি 'ভারতী' ও 'প্রবাসী' দুটি পত্রিকাতেই মুদ্রিত হয়েছিল। সেই মুদ্রণের পরে 'সাহিত্য' পত্রিকার পাতায় দু'বার ছবিটি কঠোর

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১৪৪

ভাষায় নিন্দিত হয়েছিল। আর তা দুই প্রকারে। অর্থাৎ ভিন্ন ভাষা ও ভঙ্গীতে। বাংলা ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ছবিটি মুদ্রিত হলে পৌষ মাসেই সুরেশ সমাজপতি মহাশয় পুনরপি আক্রমণ চালালেন। তিনি লিখলেন—

"প্রথমেই শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'কাজরী নৃত্য' নামক একখানি চিত্র—কেন না, ইহা চিত্রিত। অবনীন্দ্রবাবুরও গগনবাবুর মত ছবির উপর 'বিদ্রূপবজ্র' হানিবার সাধ হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু 'কাজরী'র গানে, সুরে, নৃত্যে, এমন কি, 'নাম পরশনে তার' মনে যে ছবির উদয় হয়; অবনীন্দ্রনাথের ছবিখানিকে তাহার Caricature বলিয়াই মনে হয়। ইহা যদি Sublime-কে ridicule করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহা সফল হইয়াছে। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' কখন কি ভাব ধরে তাহা আমরা বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কাজরী নাচে বিধাতার কমনীয় সৃষ্টি নারী কি এমন অষ্টাবক্র ভাবধারণ করে? বরের মিছিলের ময়ূরপঙ্খিতে যে নৃত্য এখনও দুর্ভাগ্যক্রমে পথিকের চোখে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথ কি তাহা হইতে model সংগ্রহ করিয়াছেন? পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর বেণী ও পৃষ্ঠে একটু ছবি আঁকা আছে, অবশিষ্ট সম্বন্ধে কি আর বলিব আমি।"

এই ছবিটি সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় তার যে সমালোচনা বের হয় (২৭শে নভেম্বর, ১৯১৩) তাতে দেখা যায়—

"Of Mr. Tagore's pictures his latest productions 'The End of the Journey' and 'Kajri' will undoubtedly call attention, the former for the beauty of its technique and latter for its exquisite poetic charm."

তাঁর পুরী ভ্রমণের ফলশ্রুতি রূপে আরও রচিত হয়েছিল একগুচ্ছ নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র। পুরী থেকে কোণারকের ছবি করেছিলেন তিনি বারোটি, আরও পথযাত্রার ছবি হয়েছিল ছয়টি। এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে পুরীর 'স্থান-চিত্র' এঁকেছিলেন পাঁচখানি। অবনীন্দ্রনাথের মতে ল্যাণ্ডস্কেপ-এর নিখুঁত প্রতিশব্দ হোল স্থান-চিত্র। কোণারকের যাত্রাপথের চিত্রাবলী কালিতে তুলিতে অঙ্কিত।[১]

১. বিশদ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যলীলা বিষয়ক কয়েকখানি ছবির মধ্যেও পুরীর সমুদ্র ও তার তীরবর্তী দৃশ্যের অবতারণা দেখা যায়। একবার পুরীতে অবস্থানকালেও তিনি কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকার চৈতন্য জীবন-চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। চৈতন্য কথার ছবিতেও প্রধান গুণ দেখা যায় বর্ণ-সুষমা ও গতিময়তা। চৈতন্যদেব তাঁর শিষ্য পরিবৃত হয়ে নাম সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হয়ে আছেন যে ছবিতে, তার প্রতিটি মানুষের সঙ্গীতে মগ্নতা, বাদ্যযন্ত্র চালনা ও পথচলায় স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গী এমন সজীব ও প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, যা চলচ্চিত্রের প্রভাব দিয়েছে এনে। মূর্ত্তিকল্পনা, স্থানক পটভূমিকা ইত্যাদি অত্যন্ত রসাবিষ্ট ও বিষয়োপযোগী। ছবিটি দেখলে মনে হয় চৈতন্যদেবের যুগকালকে প্রত্যক্ষ করছি।

এই যে সুন্দর ও সফলরূপে চৈতন্য-চিত্র অঙ্কন, তার মূলেও শিল্পীর সেকাল সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি। চিত্রপটে যে ভাববিহ্বলতা ও প্রেমানন্দে মগ্নতা সার্থকভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে, তার মূলানুসন্ধান করলে শিল্পীর নিজ অনুভাব ও অভিজ্ঞতার কথাই মনে জাগে। একবার কলকাতা থেকে পুরী পৌঁছবার পূর্ব মুহূর্ত্তের আনন্দ-অনুভূতির বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—

"দূরে দেখা দিল জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, দেখে কি আনন্দ! মনে হল এই রকম কি, এর চেয়ে বেশী আনন্দই বুঝি পেয়েছিলেন চৈতন্যদেব, যদিও রেলে যাচ্ছি আমি।"[১]

স্বীয় আনন্দানুভূতির মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের আনন্দের মাত্রা উপলব্ধির যে চেষ্টা তার ফলেই চৈতন্যলীলার চিত্রগুলি অত সার্থক ও সুন্দর হয়েছিল।

বার বার পুরী যাত্রা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে নানাদিকেই পালা পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছিল। পূর্বেও আলোচনা হয়েছে—নারীমূর্ত্তি রচনায় একটা স্থূলতা ও মুখাবয়বের গড়নে একটা নবতর ভাব যেমন এসেছিল একদিকে, অন্য দিকে তেমনি আবার বর্ণ সুষমা আরাও মোলায়েম ও রহস্যঘন হয়ে উঠেছিল। জলেধোয়া পদ্ধতি ক্রমশঃ অধিকতর স্বকীয়তা মণ্ডিত হয়ে গভীরতর মায়াজাল বিস্তারের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

পুরী ভ্রমণের পূর্বে ও পরে তাঁর চিত্র-রচনার ধারা নিত্যই নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। উৎকল সংস্কৃতি অনুশীলনের ফলে তাঁর শিল্পভাবনায় একটি নতুন পর্য্যায় এসেছিল ঠিকই, কিন্তু তা একভাবে, একটানা চলেনি সুদীর্ঘকাল। তাঁর তুলিকায় বহুসংখ্যক ছবি বিশ্লেষণ করলে তাকে

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১৩৪

একটি বিশেষ গণ্ডীতে বা একটি আঙ্গিকসূত্রে গ্রথিত রাখা যায় না। সময়ে সময়ে, বিশেষ ভাব মুহূর্তে হয়ত স্বতন্ত্র ভাব-ভঙ্গী নিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি হোল। কিন্তু তিনি তাতে বেশীদিন আবদ্ধ রইলেন না। আবার কোন নতুন পরীক্ষা প্রচেষ্টায় রত হলেন। সুতরাং সময়কালের সুনির্দিষ্ট পর্য্যায় ভাগ করে তাঁর ছবিকে শ্রেণীবদ্ধ করা বিশেষ দুরূহ কাজ। তবে জীবনের শেষভাগে অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে দু'তিনটি স্পষ্ট স্তর বিভাগ করা যায়। যেমন, আরব্যরজনীর চিত্রাবলী, চণ্ডীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের চিত্র।

কিন্তু তাঁর শিল্পায়নের উষাকাল থেকে মধ্যাহ্ন লগ্ন পর্য্যন্ত যে সকল চিত্র সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মূলে যে ভাব-ভাষা, চিন্তা-চেষ্টা তা সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তুও যেমন ছিল আলাদা তেমনি আঙ্গিক-প্রকরণের মধ্যেও ছিল ভিন্নতা। অতঃপর ১৯১০ সাল থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে শিল্পাচার্য্য যে সকল চিত্র রচনা করেন, তার মধ্যে এই ধরনের অনন্যতা ও বিশিষ্টতা আরও অধিক নজরে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকখানি চিত্র আলোচনার যোগ্য। যেমন, অশোকমহিষী তিষ্যরক্ষিতা, রাধার চিত্রদর্শন, বন্দিনী সীতা, পুষ্পরাধা, পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু, সমুদ্রকন্যা, তুলসীর জন্ম, ষড়দন্ত জাতক প্রভৃতি। এই চিত্রসমূহের পাশেপাশে কিছু সংখ্যক মুঘল বিষয়ক ছবিও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তারও একটির সঙ্গে আর একটির কোনও মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায় না; সমচিন্তার কোনও প্রতিফলন হয়নি কোথাও।

বিশেষভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রথমেই ধরা যাক্ তিষ্যরক্ষিতার চিত্রখানি।

১৯১১ সালের কথা। অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি আঁকলেন। বিষয়বস্তু হোল: মগধের রাজা অশোক বৌদ্ধধর্মানুরাগী। বোধিবৃক্ষ তাঁর প্রাণপ্রিয়। কিন্তু তাঁর মহিষী তিষ্যরক্ষিতার পক্ষে তা অসহ্য। কারণ মহারাজা বোধিবৃক্ষের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী হলে রাণীর প্রতি প্রেম-প্রীতি হ্রাস পেতে পারে। সুতরাং তিনি হয়ে উঠলেন বোধিবৃক্ষের প্রতি ঘোরতর ঈর্ষাপরায়ণা। ক্রোধের বশে তিনি সেটিকে ধ্বংস করার চিন্তায়ও নিমগ্না হয়েছিলেন।

এই চিত্রখানি তন্মুহূর্তের ভাবটি করেছে রূপবদ্ধ। পদ্মচক্রের অলঙ্করণ যুক্ত রেলিং-এর পাশে ঈর্ষাপরায়ণা ও ক্রোধান্বিতা তিষ্যরক্ষিতা। মুখে হাত রেখে গভীর চিন্তায় নিমগ্না। চিন্তার সঙ্গে ক্রোধ, হিংসা ও বিষাদ মিশ্রিত হয়েছে। বোধিবৃক্ষটির সামনেই তিনি দাঁড়ান। বৃক্ষটি ছত্র, বস্ত্র ও মাল্যভূষিত। সামনে সপুষ্প পূর্ণকুম্ভ। দেয়ালে ত্রিরত্ন ও নাগকল। প্রাচীন পরিবেশ

আনয়নে শিল্পী নানা আয়োজন করেছেন। রেলিং ভারহুতের প্রাচীন স্তূপের অনুগামী। বর্ণাঢ্য চিত্র। বর্ণ-বাহারে ও রেখাভঙ্গীতে চিত্রখানি মনোরম। তাহলেও বিষয়টির গুরুত্বের সঙ্গে ভাবের গভীরতা সমতালে চলেনি। ছবিখানি কিন্তু তখন একটা অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়েছিল!

ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী ভারত-ভ্রমণে এসে (১৯১১) দিল্লী থেকে কলকাতায় এলেন। শুধু এলেন না, তাঁরা সরকারী আর্ট স্কুল সংলগ্ন আর্ট গ্যালারী দেখতে যাবেন, স্থির হোল। এই ব্যাপারটি অবনীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথমে যেন একটা সঙ্কট এনে দিয়েছিল। পরে আবার তা তাঁকে গৌরবের শিখরেও তুলে দিয়েছিল।

গবর্নমেণ্ট হাউস থেকে টেলিফোন এল রাজা-রানী যখন আর্ট গ্যালারী দেখতে যাবেন, তখন অবনীন্দ্রনাথকে সেখানে উপস্থিত থেকে রানীর 'স্থাপেরণ' হতে হবে। আর Oriental art সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সে-কথা শুনে তো শিল্পীর মেজাজ গরম হয়ে উঠলো। অভিধান ঘেঁটে তখুনি 'স্থাপেরণ' কথার অর্থটা কি তা দেখে নিলেন। সারা রাত নানা চিন্তা-ভাবনায় নিদ্রাবিহীন কাটলো। কিন্তু উপায় তো কিছু ছিল না। অতএব পরদিন সময় মত 'ধড়াচূড়ো' পরে তিনি আর্ট গ্যালারীতে গিয়ে হাজির হলেন।

গিয়ে দেখেন, রাজা-রানী আসবেন, আয়োজনের অন্ত নেই। সাহেব-সুবোতে ভর্ত্তি চারদিক। সর্বত্র বেশ গোলমাল। বাঙ্গালী সাহেবদের উত্তেজনা যেন আরও বেশী। তাঁদের হাবভাবে হলটি সরগরম আর কি! শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বাইরের কোন চালবোল জানতেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারে বিমুখ ও সঙ্কুচিত চিত্তের মানুষ। অন্তরে অসীম রসের জোয়ার ও অগাধ ভাবরাশি থাকলেও বাইরে সদর্বা তার প্রকাশ হোত না। নিজেকে কোথাও জাহির করতে জানতেন না তিনি। তাই তিনি এক কোণে অতি সঙ্কোচের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা-রানীও এসে পড়লেন। পারিষদের দলও বেশ ভারী। শিল্পী লোকারণ্যের মধ্যে নিজেকে যতই আড়ালে রাখার চেষ্টা করুন না কেন, তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের চোখ এড়াতে পারলেন না। লর্ড ও লেডি হার্ডিঞ্জ ছিলেন অবনীন্দ্র-চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী। লর্ড হার্ডিঞ্জ অবনীন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজা-রানীকে বললেন—

"ইনিই মিঃ টেগোর, বর্তমান যুগের ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট।" ভাইসরয় পরিচয় দিলেন। সুতরাং শিল্পী তখন নিরুপায় হয়ে কোন রকমে হাতখানি

এগিয়ে দিলেন। রাজা-রানী দু'জনেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সম্ভাষণ করলেন এই বলে, "হাউ ডু ইউ ডু, হাউ ডু ইউ ডু?"

সেই সময় নিজের অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমার প্রাণ তখন ধুক্ ধুক্ করতে লেগেছে। বেচারা ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট। এইসব কায়দা-কানুনে একেবারেই অনভ্যস্ত। আমি আমার কোণটার ভিতরে লুকোতে পারলেই বাঁচতুম সে সময়ে। আমার দুঃখ কুইন মেরী বোধ হয় বুঝতে পারলেন, তাই তিনি কথা চালিয়ে আমার সংকোচ ঘুচিয়ে দিলেন।"[১]

রানীর সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথকেও গ্যালারীর প্রতিটি ছবির সামনে দিয়ে ঘুরতে হয়েছিল। দেয়ালে তাঁর তিষ্যরক্ষিতার ছবিটিও ছিল টাঙানো। রাণীর সেই ছবিখানি খুব পছন্দ হয়ে গেল। ছবিটি সম্বন্ধে শিল্পীকে ব্যাখ্যা করেও কিছু বলতে হয়েছিল। গ্যালারী দেখে রাজা-রানী চলে গেলেন। শিল্পীও হাফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন। সন্ধ্যার দিকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলানুরাগী এবং শিল্পীর পরম বন্ধু নর্মান ব্লাণ্ট ঠাকুরবাড়ীতে এসে হাজির হলেন, আর জিজ্ঞেস করলেন—

"হাউ আর ইউ অবনবাবু?" অবনীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, "আর রসিকতায় দরকার নেই। আই অ্যাম ডান ফর্, আমাকে একেবারে সেরে ফেলেছে।"[২]

তার পরদিন গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে সংবাদ এল তিষ্যরক্ষিতার ছবিখানি রানীর জন্য চাই। শিল্পী তা শুনে খুশী মনে, উদার চিত্তে ছবিটি উপহার দিলেন রানীকে। অতএব ছবিটি চলে গেল বিলেতে। তার দু'বছর পরেই অবনীন্দ্রনাথ সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজা ও রানীর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথকে আরও একটি কাজের ভার নিতে হয়েছিল। অর্থাৎ তখনকার প্রয়োজনীয় মঞ্চ ও তোরণ সজ্জিত করবার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর উপরে। ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তিনি অনেক ছবি এঁকে, কারুকার্য্য রচনা করে মঞ্চ ও তোরণকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজা ছয়শত টাকা মূল্যে ছবিগুলি ক্রয় করেন। তাছাড়া মূল কাজের জন্য পরিশ্রমিক বাবদও তিনি অনেক টাকা

১, ২. স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা দেবী। পৃঃ ৮০

পেয়েছিলেন। কিন্তু তার কিছুই তিনি নিজে গ্রহণ করেন নি। সমস্ত টাকাকড়ি তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন সহকারী ছাত্র-শিষ্যদের। অদ্ভুত ছিল তাঁর ছাত্র-প্রীতি!

তিষ্যরক্ষিতার ছবি বিলেতে চলে যাবার পরে ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর যে বাৎসরিক প্রদর্শনী হয়, তার সমালোচনায় 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা এই ছবিটির কথাও উল্লেখ করেছিল (২১শে জানুয়ারী, ১৯১২)। তাতে লিখিত হয়েছিল—

"The work of Abanindra Nath Tagore, the leader of the artistic renaissance in painting, which is now so wellknown and appreciated both in this eountry and in Europe and America needs no recommendation. His work has recently received the high honour of recognition by Her Majesty, the Queen-Empress whose property the original of the sketch, the 'Queen of Asoka' now is."

এই সমালোচনাটিরে শেষাংশ দেখে মনে হয় যে ইংলণ্ডে মূল ছবিটি চলে যাবার পরে শিল্পীর কাছে তার একটি স্কেচ জাতীয় কিছু নিদর্শন ছিল, এবং সেটিই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। কিছুকাল পরে ছবিখানির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় 'প্রবাসী'তে (ফাল্গুন, ১৩২৭)। তৎসহ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত পরিচিতি বস্তুতঃই শিক্ষাপ্রদ। তিনি লেখেন—

"সম্রাট অশোকের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পাটরাণী অসন্ধিমিত্রার মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ রাজা তিষ্যরক্ষিতাকে বিবাহ করেন। তিষ্যরক্ষিতা চপল-চরিত্রা ও ব্যাপিকা প্রকৃতির ছিলেন। নিজের যৌবন ও রূপের গর্ব্বে তিনি যেমন দাম্ভিকা ছিলেন, তেমনি ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণা। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধদেবের সাধনসাক্ষী বোধিদ্রুমকে যত্ন ও ভক্তির সহিত পরিচর্য্যা ও পূজা করিতেন; ইহাতে তিষ্যরক্ষিতা নিজের অধিকার ক্ষুণ্ন মনে করিয়া ঈর্ষান্বিতা হইয়া ওঠেন—সম্রাট অশোকের সমস্ত হৃদয়ের তিনিই সর্ব্বেশ্বরী সম্রাজ্ঞী হইয়া থাকিবেন, সেখানে আর কিছুর স্থান তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। এই ঈর্ষার তাড়নায় তিষ্যরক্ষিতা সপত্নী তুল্য বোধিদ্রুমকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

এই চিত্রে রাজভূষণে সজ্জিত বোধিদ্রুমের সৌভাগ্যে হিংসাক্রুর রানী

তিষ্যরক্ষিতা বোধিদ্রুমকে যেন ক্রোধাগ্নিতে ভস্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রানী তিষ্যরক্ষিতার মুখশ্রীতে যৌবনের সৌন্দর্য্য ও মনের দৃঢ়তা ও ক্রুর হিংসা আশ্চর্য্য দক্ষতায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

সম্রাট পঞ্চমজর্জ ও মহারানী মেরী মহোদয়া যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এই সুন্দর ছবিখানি বঙ্গের চিত্রশিল্পের নমুনা স্বরূপ মহারানীকে উপহার দেওয়া হয় ও তিনি উহা গ্রহণ করেন। এ ছবির মূল চিত্র মহারানীর সম্পত্তি।"

'বন্দিনী সীতা' ছবিটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ডঃ কুমারস্বামী সেটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান। ছবিখানি বাংলা ১৩১৪ সনের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। সুতরাং ইং ১৯০৮ সালের গোড়াতে ওটি অবশ্যই অঙ্কিত হয়েছিল। 'প্রবাসী'তে মুদ্রণের সময়ই তা ডঃ কুমারস্বামীর সংগ্রহভুক্ত হয়। 'প্রবাসী'র চিত্রপরিচিতিটি এইরূপ—

"লঙ্কায় বন্দিনী সীতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল তৈলচিত্র হইতে গৃহীত। চিত্রাধিকারী আনন্দ কুমারস্বামীর অনুমত্যানুসারে।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লঙ্কায় অবরুদ্ধ সীতাদেবীর বিরহশীর্ণা মূর্ত্তির একটি অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা নানাবর্ণে সুরঞ্জিত। আমরা একবর্ণে ইহার একটি সামান্য প্রতিলিপি দিলাম।"

খোলা চুল, বিষণ্নমূর্ত্তি সীতা জানালার গরাদ ধরে বসে আছেন। তাঁর চোখেমুখে বিষাদ-বেদনার ছাপ। বেশভূষা অতি সাধারণ। জানালার বাইরে অনতিদূরে সমুদ্রের আভাস। নীলাম্বুতরঙ্গের দূরাভাস শিল্পী খুব সূক্ষ্ম মোলায়েম রীতিতে করেছেন রূপায়ণ। সমগ্র পট বিষাদমগ্ন। এই চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ নারীমূর্ত্তি রূপায়ণে ও মুখাবয়ব গঠনে নতুন আদল এনে দিয়েছেন। এর আগে রচিত নারীমূর্ত্তির মুখের গড়ন আকার ছিল ভিন্ন ধরনের।

ছবিটির মূল কল্পনা ও রূপ-রচনা সম্বন্ধে একটি প্রাঞ্জল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩১৬ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে। লিখেছিলেন রাঁচির তারাপ্রসন্ন ঘোষ। আলোচনাটিতে ছবিখানির মর্ম্মকথা ব্যাখ্যাত হয়েছে অতি চমৎকার ভাবে—

"প্রতিভাশালী চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইয়া সীতার অন্তরের চিত্র—যাহা চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টির অতীত—ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে যাহা দেখিলেন ও বুঝিলেন তাহাই তাঁহার 'বন্দিনী সীতা'র চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

চিত্রকর সীতার অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পতিপ্রাণা আদর্শ রমণীর

হৃদয় আজ পতিবিরহে নিতান্তই খিন্ন ও মলিন। তাঁহার মানসমুকুর আজ মসীলিপ্ত। নন্দনকানন তুল্য অশোকবনের চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ঐ যে নধর অশোকতরুবীথি, তাহা যেন জমাট বাঁধিয়া পাষাণ কারার প্রাচীর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ যে নয়ন তৃপ্তিকর সুকোমল প্রস্ফুটিত অশোক পুষ্পগুচ্ছ, তাহা যেন পাষাণ কারার ঘনীভূত অন্ধকার পুঞ্জ। ঐ যে পুষ্পগন্ধ-বাহী পবনের স্পর্শসুখ তাহাও যেন মুকুরে পাষাণ-প্রাচীরের কঠোর স্পর্শের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেছে। অশোকতরুতলে উপবিষ্ট সীতার এই আসল অন্তরের চিত্র, এই প্রাণের চিত্র। চিত্রকর তাই অশোকবনের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া সীতাকে পাষাণ কারার মধ্যে বন্দিনী বেশে অাঁকিয়াছেন।

আবার এই পাষাণ কারার মধ্যেও চিত্রকর বাতায়ন পথে আলোকের আভাস আনিয়া আপনার প্রতিভার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সে আলোক, সেই সুখস্মৃতি. সীতার মানস রচিত করাগারের একমাত্র বাতায়ন রামচন্দ্রের চিন্তাপথে সীমাহীন সমুদ্রের পরপার হইতে শত উর্ম্মি উল্লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। পতিপ্রাণা বিরহিনীর পতিসুখস্মৃতি ভিন্ন অধিক সুখ আর কি আছে! সে সকল দুঃখ ভুলাইয়া দেয়! তাই যেন কারাগারে পুঞ্জীভূত অন্ধকার বাতায়ন পথাগত আলোকের নিকট পরাস্ত হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই যেন বাতায়নের আলোক সীতার বিষণ্ণ মুখে পড়িয়া তাহা স্বর্গীয় প্রতিমার ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে।"

ছবিখানি তখন কলারসিক মহলে একটা আলোড়ন সঞ্চার করেছিল। অনেকেই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। ইহার স্বনামধন্য সংগ্রাহক ১৯১০ সালে তাঁর এলাহাবাদের বক্তৃতায় বন্দিনী সীতা সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"Sita in captivity was one of the latest and strongest and most original. It was the most Indian and was entirely idealised."

'বন্দিনী সীতা'র রূপায়ণ যে ১৯০৮ সালের প্রথমভাগ মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগিনী নিবেদিতা ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে 'মডার্ণ রিভিউ'-তে এর একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা লিখেছিলেন। তার কিছু অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল—

"The outstanding impression made by this picture is one of extraordinary mental intensity. The face is

not perhaps chosen from amongst the most beautiful Indian types. The brow retreats, and the neck is thick,—features not usually characteristic of a Hindu Woman. On the other hand, Mr. Tagore is strongly to be congratulated on the strength of his portrayal. It cannot be said too often that Sita, as depicted in the Ramayana, is first a great woman, and only afterwards a great wife. In this picture, with its noble proportions and splendid vigour, we see that Sita who could laugh at hardships, and burn with her disdain at Ravana himself, we catch a glimpse even of the woman of the last great scene of wounded withdrwal before the popular insult."

বন্দিনী সীতার পরে ক্রমান্বয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট চিত্র অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন, তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'রাধার চিত্রদর্শন' নামক রচনাটির। লর্ড কারমাইকেল ছবিটি ক্রয় করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাহাজ ডুবিতে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছবিখানিও বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ওটি ১৯১৪ সালের পূর্ব্বেই অঙ্কিত হয়েছিল। ছবিটির প্রধান গুণ concentration—অর্থাৎ অতিনিবিষ্টতা। বিশাখা শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি-চিত্র ধরে দেখাচ্ছেন। দু'জনার চোখে মুখেই বিষাদের ছাপ ও নিবিড়ভাব। তা সত্বেও বিষয়টির মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবের গভীরতা আছে, তা যেন ছবিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়নি। মূর্ত্তি দুটির মধ্যে আবেগের প্রাবল্য দেখা যায় না। রূপরচনা, তার সমাবেশ সংস্থান ও আঙ্গিক প্রকরণে যে কৌশল ও পরিণতির ছাপ পড়েছে, সে তুলনায় ভাবাবেগ পরিস্ফুট হয়নি। ছবিটির মূল কল্পনা সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের এই কবিতাটি অবলম্বনে হয়েছিল—

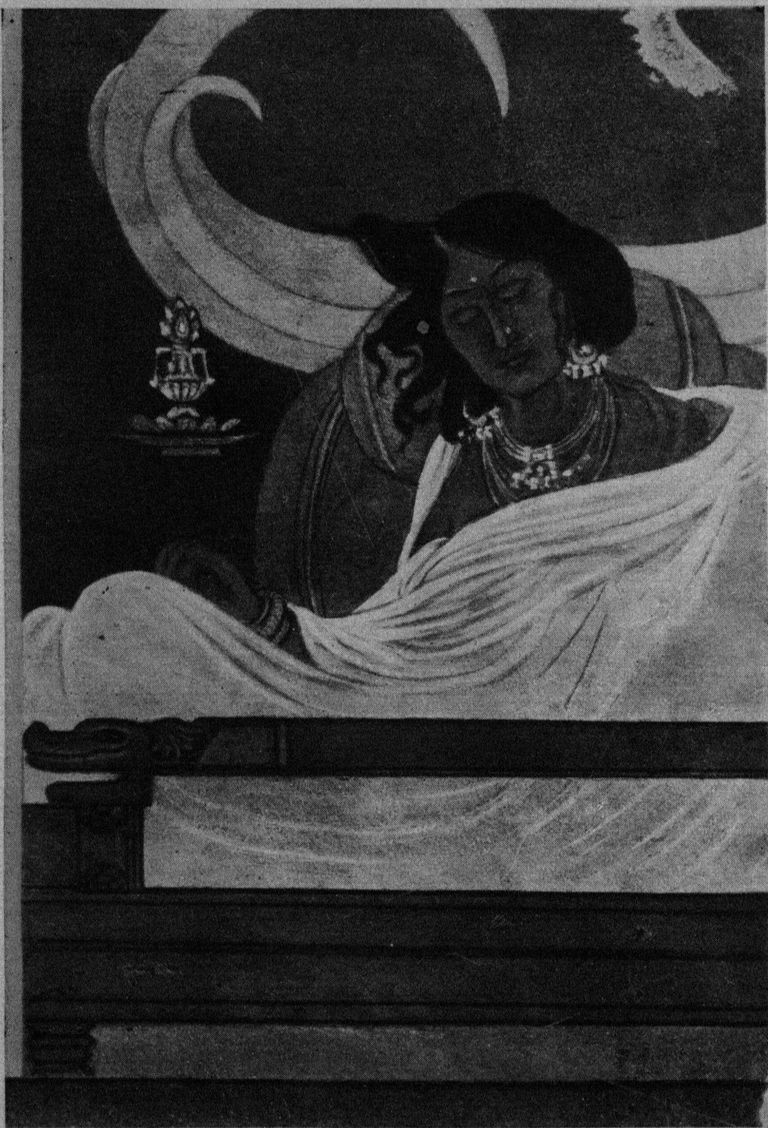
"আমি সে অবলা অখল হৃদয়া
ভালমন্দ নাহি জানি
বসিয়া বিরলে লেখা চিত্রপটে, বিশাখা দেখাল আনি।"

'ভারতী' (চৈত্র, ১৩১৯) পত্রিকাতে চিত্রখানির পরিচয় প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, "যে দেখেছি যমুনার তটে, সেই দেখি এই চিত্রপটে।" সেখানে



রাধার চিত্রদর্শন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কাশীর রাণী : ষড়দন্ত জাতক

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আরও মন্তব্য হয়েছিল, "শ্যামসুন্দরের চিত্র দেখিয়া শ্রীমতীর মুগ্ধ অভিনিবেশ বড়ই সুন্দর।" (চৈত্র, ১৩১৯)।

শ্রীমতী ও বিশাখার চেহারা ও বেশবাস উত্তর ভারতীয়। সম্ভবতঃ আঞ্চলিক পরিবেশ আনয়নের জন্যই এই প্রথা অবলম্বিত হয়েছিল।

চিত্রটি রচনার কালে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায়। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর উৎসাহী মেম্বার মিঃ নর্মান ব্লাণ্ট ছিলেন বিচক্ষণ সমঝদার। তিনি বিশেষ সূক্ষ্মভাবে ও স্পষ্টভাষায় অবনীন্দ্রনাথের ছবির দোষগুণ পর্য্যালোচনা করতেন। অনেক সময় নির্দেশ উপদেশও দিতেন। তাঁর ভারত-কলা প্রীতি ও অনাবিল বন্ধুত্বের প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্লেষণ ও নির্দেশনাদি খোলামনে গ্রহণ করতেন। ছবিতে ফিনিশিং টাচ্ দেবার আগে তিনি অনেক সময় ব্লাণ্ট সাহেবের মতামতের জন্য অপেক্ষাও করতেন শোনা যায়। অবনীন্দ্রনাথ 'রাধার চিত্র দর্শন' ছবিটি শেষ করে ব্লাণ্ট সাহেবকে দেখালেন। ছবিখানি দেখেই সাহেব বলে উঠলেন, শুধু বলা নয়, তাকে আক্রমণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বললেন—

"Perhaps the Artist will explain why he has drawn the thigh of the Lady Radhika in the shape of an ugly bolster. ?"[১]

অবনীন্দ্রনাথ সাহেবের মন্তব্য শুনে রাধার ডান হাঁটুর গড়ন নাকি সংশোধন করেছিলেন। মূল ছবিটি আজ আর নেই। প্রতিলিপিতে রাধার ডান হাঁটু এখনও কিন্তু বেশ দীর্ঘাকার। ছবির মধ্য অংশে দৃষ্টি পড়লে তা চোখ এড়ায় না।

সমসাময়িক আর একখানি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্র 'পুষ্পরাধা', অর্থাৎ রাধার কুসুম-প্রতিমা। ছবিটি বাংলা ১৩১৯ সনের চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়। তৎসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত টীকা-ব্যাখ্যাটির মধ্যে উহার বিষয়বস্তুর মূল রহস্য ও শৈল্পিক গুণাগুণ সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন—

"আমাদের বঙ্গ সাহিত্যের শাশ্বত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও শাশ্বত নারী রাধার প্রণয়লীলা লইয়া কত কাব্য, কত মূর্ত্তি, কত চিত্র যুগে যুগে রচিত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রখানি ভাব-মাধুর্য্যে ও কল্পনার ব্যঞ্জনায় অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধার বিরহে কাতর হইয়া পুষ্প দিয়া

১. ভারতের শিল্প ও আমার কথা : ও. সি. গাঙ্গুলী। পৃঃ ১০২

একটি রাধা মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন এবং তন্ময় হইয়া প্রাণবিহ্বল নেত্রে তাহাই দেখিতেছেন।"

'প্রবাসী'তে মুদ্রিত চিত্র প্রতিলিপি ও তৎসহ টীকা ব্যাখ্যা দেখে 'সাহিত্য' সম্পাদক আর স্থির থাকতে পারেন নি। 'সাহিত্য'র পরবর্ত্তী সংখ্যাতেই (বৈশাখ, ১৩২০) তিনি পুষ্পরাধাকে সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত করেন—

"পুষ্পরাধা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। প্রবাসীতে কেবল কালীর স্তূপ দেখিতেছি। ঘোর অন্ধকারে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যে আভাস দেখিতেছি, তাহা পুরুষোত্তমের ভূত হইতে পারে, পুরুষোত্তম নহে।"

'ভারতী' পত্রিকায়ও কিন্তু ছবিটি সম্বন্ধে সপ্রশংস চমৎকার একটি বর্ণনা-ব্যাখ্যান মুদ্রিত হয়েছিল (চৈত্র, ১৩১৯)। তা ছিল প্রাচ্য শিল্পসভার (I. S. O. A.) ষষ্ঠ বার্ষিকী প্রদর্শনীর রিভিউ'র একটি অংশ। সেটি হোল—

"শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের ছবি (পুষ্পরাধা); প্রথম প্রেমের অস্ফুট শ্যামচ্ছায়ার প্রকাশ, যাহা চাই, যাহাকে চাই, তখনও সবই অনির্দ্দিষ্ট; কল্পনার ছায়াপথে পথহারা; হৃদয়নেত্রে তখনও তাহা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই; পুষ্পধনুর তূণীরে লুক্কায়িত বাসন্তী সৌন্দর্য্য বিলীন। তাই ফুল দিয়াই তাহার আকার গড়িতে চাই, তেমনি বর্ণসুষমা মনে জাগিয়া ওঠে। সেই সুকুমার গন্ধ কত আশার আবেগে হৃদয়কে ব্যাকুল করিতে থাকে। সে ভাষাহীন বিহ্বলতা বিশ্বসৌন্দর্য্যে ভালবাসার ধনকে খুঁজিয়া মরে, গড়িয়া তুলিতে পারে না।"

রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চ্চার ধারায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও এই বিষয়টি তাঁর শিল্পী-জীবনকে প্রায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর দেশজ রীতির সাধনা শুরু হয়েছিল কৃষ্ণলীলার রূপচিত্র রচনা করে। আবার জীবনের শেষ সন্ধ্যালগ্নেও তিনি কৃষ্ণকথার চাক্ষুষ ও অভিনব সব চিত্র কল্পনা করেই শিল্প-সাধনাকে শেষ পরিণতির মুখে নিয়ে যান। জীবনের মধ্য পর্য্যায়ে তিনি যে রাধাকৃষ্ণের নানা রূপ কল্পনা করেন, তার মধ্যে যেমন ভাব ও রসের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তেমনি দেখা যায় আঙ্গিক-রীতির উচ্চমান ও সুগভীর আবেগ-অনুভূতির প্রবাহ। এই সিরিজের কয়েকখানি চিত্র আলোচিত হয়েছে। বাকী কয়েকটিও অতীব উচ্চ পর্য্যায়ের সৃষ্টি। তন্মধ্যে 'দাসখৎ' একটি।

'দাসখৎ' রচনার সময়কাল সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। তবে এটি ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর

প্রদর্শনীতে এই ছবিটি স্থান পেয়েছিল। ছিম্‌ছাম পরিচ্ছন্ন পটখানি, বিষয়-বাহুল্য নেই। রেলিংঘেরা বারান্দার মত একটি স্থান। সরু একটি থাম দেখা যায় পাশে। খোলা জায়গায় একটি লতানো গাছ। এই পরিবেশে শ্যামসুন্দর বাঁ-হাত দিয়ে রাধাকে বেষ্টন করে রয়েছেন, আর শ্রীমতী তাঁকে দেখাচ্ছেন 'দাসখৎ'।

রাধার মুখে-চোখে কপট অভিমান ভঙ্গী। কৃষ্ণের জামাজোড়া পাগড়ী সব বেশ ভারী ও জমজমাট। পাগড়ীতে শিখীপুচ্ছ ও মুক্তা। ওয়াশ পদ্ধতির চূড়ান্ত প্রয়োগ ও সোনার জলের ছোপে ছবিটির মনোহারিত্ব ও ভাবসুষমা অতি চমৎকার প্রস্ফুট হয়েছে। রঙের মোহিনী মায়া আছে, গভীরতা আছে, কিন্তু আলোছায়ার দৌরাত্ম্য নেই। সূক্ষ্ম তুলির রেখা আছে নানা ওজনের, কিন্তু কোমল মাধুর্য্যের শেষ নেই। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকটাক্ষ। তার মধ্যে আছে বিস্ময়, কৌতূহল ও বিহ্বলতা। সব মিলে চিত্রখানি হয়েছে অপূর্ব্ব একটি রসসৃষ্টি। এখানে শিল্পীর সংবেদনী মনোভাব ও স্বভাবসুলভ রহস্যমধুর প্রকৃতির প্রতিফলন হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। সকলের উপরে বড় গুণ হোল intense feeling-এর প্রকাশ; আর ঘরোয়া ভাবটি। ছবিটি আকারে ছোট, কিন্তু শিল্পগুণে বিরাট।

ছবিটি ১৯২০ সালে সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল 'Krishna signing the Bond of Love' নামে। বাংলা নাম—'আমি কিন বিকাইনু'। ক্যাটালগে 'Not for Sale' লিখিত ছিল। কিন্তু জনৈক বিদেশী দর্শক ছবিটি ক্রয়ের ইচ্ছে জ্ঞাপন করেন সোসাইটির তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও. সি. গাঙ্গুলীর কাছে। তিনি শিল্পীকে সেকথা জানাতে তিনি মৃদু হেসে রসিকতা করে বলেছিলেন—

"না, ও ছবি বেচবো না। যাকে আমি দাসখৎ দিয়েছি, তার কাছেই ওটি থাকবে।"[১]

এই পর্য্যায়ের আর একটি অনবদ্য চিত্র 'যমুনাতীরে রাধা'। যমুনায় জল আনতে গিয়ে শ্যামসুন্দরের কথা মনে পড়লো শ্রীমতীর। কাঁখের কলসী মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে চললো। তিনি চমকে উঠলেন। এই মুহূর্ত্তটি বিধৃত হয়েছে চিত্রপটে। বিষয়বিন্যাসে কোনও বাহুল্য নেই। কিন্তু বর্ণসুষমায়, দেহভঙ্গীতে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে চিত্রটি অসাধারণ ও অতুলনীয়। বর্ণিকাভঙ্গ অত্যুজ্জ্বল নয়, রেখাও খুব সুদৃঢ় নয়। কিন্তু অদ্ভুত

১. ও. সি. গাঙ্গুলীর মুখে শোনা।

ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে মূর্ত্তির দেহরূপে ও বস্ত্রবিন্যাসে। জলে ধুয়ে ধুয়ে রঙ-এর গভীরতা এনেছেন চমৎকার। রাধার পায়ের কাছে জমিতে দুটি তৃণগুচ্ছ জলের কলসীর সঙ্গে চিত্রপটে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করেছে।

ছবিটির কল্পনা-মূলে মনে হয় চণ্ডীদাসের সুবিদিত সেই পদটির প্রভাব রয়েছে।

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

শ্যাম নাম মনে পড়াতে ও বাঁশী শুনে ব্যাকুল হওয়ার সার্থক চিত্র বটে। আর অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যেও এটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

'ভারতী' পত্রিকায় এর প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় বাংলা ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ মাসে। নাম দেয়া হয়েছিল 'সচকিতা'। ছবিটি যতই নিখুঁত ও সুন্দর হোক না কেন, 'সাহিত্য' পত্রিকায় নীরব থাকার কথা ছিল না। সুতরাং সমাজপতি মহাশয়ের কলম উদ্যত হতে বিলম্ব হয়নি। তবে কৌতুহলের বিষয় এই যে, ছবিখানির একটি ক্ষুদ্র অংশে তিনি কিছু মৌলিকত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাছাড়া সমালোচনাটি অত্যন্ত উপভোগ্যও বটে।

"প্রথমেই শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সচকিতা'। দেখিলেই সচকিত হইতে হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা কলসী পড়িয়া আছে—আর 'সচকিতা' বোধহয় চেলাঞ্চলে যবনিকা রচনা করিয়াছেন, বা করিতেছেন! এই 'বসন-যবনিকা বিথার' সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না।"

১৯১৫-১৬ সাল মধ্যে অঙ্কিত বিশিষ্ট চিত্র মধ্যে একটি হোল 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু'। একটি তরুণী পদ্ম হাতে নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন। ছবিখানির ভাবমাধুর্য্যের গোড়ার কথা নিহিত আছে বর্ণিকাভঙ্গ মধ্যে। অদ্ভুতভাবে হলদে, লাল, বাদামী ও সবুজাভায় রচিত এ-ছবি অতি অভিনব কলাসম্পদ। নারীদেহের রঙ, শাড়ী, মাথার চুল—এই তিনের মধ্যে কোন বর্ণ-বৈপরীত্য নেই। আছে কাছাকাছি ভাবের সুরছন্দ ও রঙের একতান। এই ছবির তরুণীদেহের গাত্রবর্ণ যমুনাদেবীর প্রতিকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অবনীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই নারী রূপরচনায় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ও আদর্শকে অনুসরণ করেন নি। তাঁর অনেক ছবিতেই রমণী-রূপ কালো রঙ্-এর মাধ্যমেই

পরিস্ফুট হয়েছে। কালো মেয়ের রূপবৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁর এই বিশেষ ঝোঁক কতকগুলি চিত্রেই চমৎকার ভাবে পরিদৃশ্যমান।

ছবিখানির প্রতিলিপি 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল বাংলা ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয় চিত্র-ব্যাখ্যান।

"গত বৈশাখ মাসের মুখপাত 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু' নামক ছবির দ্যোতিত বিষয়ের ভাব এই যে পদ্মপত্রে জল যেমন ক্ষণস্থায়ী, মানুষের দুঃখও তেমনি ক্ষণস্থায়ী; পদ্মপত্রে জল যেমন লাগে না, দুঃখও তেমনি মানুষের অন্তরকে কলুষিত করতে পারে না। এই ছবিখানি একটি সুন্দর গীতি-কবিতার ন্যায় কোমল সূক্ষ্মভাবে অনুপ্রাণিত।"

এই ভাবটিই আবার ভিন্ন ভাষায় লিখিত হয়েছিল 'মডার্ণ রিভিউ'তে (এপ্রিল, ১৯১৫)।

"Tear-drops on the Lotus-leaf"

"In the poetry of Sanskrit and Sanskritic languages drops of water on the Lotus-leaf symbolize instability. Mr. Abanindranath Tagore's picture of Tear-drops on the Lotus-leaf may be taken to be artist's rendering of the idea that, like joy, sorrow too is not permanent."

ছবিটি 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল আরও আগে (আষাঢ়, ১৩১৯)। সেখানে নামটি ছিল বেশ কাব্যময়—'নলিনী দলগত'।

একই সময়ে অঙ্কিত এবং একই ধারায় বর্ণ-বৈভব এনেছিলেন তিনি আর একখানি ছবিতে। বিষয়বস্তু বলতে তেমন অর্থপূর্ণ কিছু নেই সেখানে। কি আছে তা'হলে? আছে অদ্ভুত বর্ণ-বাহার ও আলোর খেলার চমৎকারিত্ব। ছবিটির নাম—'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' (গীতালি)। কালো-ঘেষা ঘোর তামাটে রঙ্-এর একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে নবোদিত সূর্য্যের অরুণ আভার মধ্যে নিজের হাতটি দিয়েছে বাড়িয়ে। হাতখানি অরুণ-কিরণ-স্নাত। তার অলঙ্কারের সোনা আরও সোনালী হয়েছে; মুখে চোখে দীপ্ত আভার স্পর্শ লেগেছে। জামা-কাপড়, দেহরূপ সমস্ত উত্তর ভারতীয় এবং অবনিন্দ্রীক বিশিষ্টতায় মণ্ডিত। লক্ষণীয় ও উপভোগ্য হচ্ছে আলোর ঝলক ও ওয়াশ পদ্ধতির মাধ্যমে পরতে পরতে রঙ্-এর গহনতা সঞ্চার।

অবনীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নারী রূপকল্পনার এও একটি বিশিষ্টতা। তিষ্যরক্ষিতা ও বন্দিনী সীতা থেকে শুরু করে রাধার চিত্র দর্শন, ষড়দন্ত জাতকের রানী, পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু, ভোরের আলোতে রমণীমূর্ত্তি—সকলেই বিষাদের ছায়াঘেরা মহলের অধিবাসিনী। অবশ্য বিষয়বস্তু বা আখ্যানের মূল সুর ও রসভাবের প্রকৃত প্রতিফলনের জন্যও তা হয়েছে।

একটি করুণ শোকাবহ স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে তাঁর তুলিকার আর একখানি ছবি। কৃষ্ণলীলা ব্যতীত দেবদেবীর ছবি অবনীন্দ্রনাথ কিছু স্বল্পসংখ্যকই এঁকেছিলেন। নিজেও সেকথা বলেছেন—

"আমার আবার দেবতার ছবি ভালো আসে না, যা কৃষ্ণ চরিত্র করেছিলুম তাও ভিতর থেকে ওটা কি রকম খেলে গিয়েছিল বলে। নয়তো আমার ভালো দেবদেবীর ছবি নেই।"

আলোচ্য ছবিটি সার্থক হয়েছিল, কি হয়নি তা বড় কথা নয়। এটি তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনার সমকক্ষও নয়। তা'হলেও এর মূলে যে হৃদয়াকুতি, যে শোকানুভূতির স্পর্শ রয়েছে তার মধ্যে মানুষ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর পিতৃহৃদয়ের চমৎকার একটি স্বতন্ত্র রূপ পারস্ফুট হয়েছে।

সম্ভবতঃ ১৯১০ সালের ঘটনা। তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা উমা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র শিশু বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্যার গভীর শোকের ছায়া গিয়ে পড়লো স্নেহশীল শিল্পী পিতার অন্তর্লোকে। শোকার্ত্তা পুত্রীকে সান্ত্বনাদানের অপূর্ব্ব মায়াজাল রচনা করলেন তিনি তাঁর সর্ব্বক্ষণের সাধনার ধন রঙ্, তুলি দিয়ে। কন্যাকে তিনি উপলব্ধি করাতে চাইলেন যে, তাঁর পুত্র মায়ের কোল ছেড়ে গেলেও চিরায়ত হয়ে স্থান পেয়েছে সে বিশ্ববিধাতার চরণতলে। তাই তিনি একটি পটে রূপ দিলেন দ্বিভুজ একটি দেবমূর্ত্তির। দেবতার চরণপ্রান্তে আঁকলেন একটি শিশুর মূর্ত্তি। শিশুটি বসে আছে আপন মনে। দেবতার হাত দুটি অভয় ও বরদ মুদ্রা ভঙ্গীর। বেদীতলে পূজার সরঞ্জাম। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে দীপশিখার আলো।

অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি নিয়ে মেয়ের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার ছেলে দেবতার আশীর্ব্বাদ পেয়েছে।"

পুত্রহারা জননীর সকল বেদনার ধারাকে শিল্পী মুছে দিলেন তাঁর মোহন তুলির টানে টানে। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রপটে কত রঙ্-রেখার ইন্দ্রজাল রচনা করেছেন, কত মোহিনী-মায়ার খেলা খেলেছেন, জীবনভর! কিন্তু এই

একটি বিশেষ দিককে করেছে প্রতিফলিত। চিত্র এখানে চিৎশক্তিকে জাগ্রত করার ভূমিকা নিয়েছিল। কন্যার শোকে শোকার্ত্ত হয়ে তিনি তাঁর তুলির মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন জগৎ-সংসারের অনিবার্য্য গতি-প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপ। দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ আঘাতে আহত মানুষের মন এই চিত্র দেখে ও ঘটনাটি শুনে প্রকৃত শান্তির পথ খুঁজে পাবে নিশ্চয়ই।

১৯১৫ সাল থেকে ১৯২০-২২ সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ যেমন করেছেন নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তেমনি করেছেন বিচিত্র বিষয় সমূহের রূপায়ণ ও ভিন্নমুখী রসধারার সৃষ্টি। এই সময়টিকে তাঁর শিল্পায়ণের শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব বলা চলে। অনেক Symbolical বা প্রতীকধর্মী চিত্র এঁকেছিলেন তিনি এই সময়ে। যেমন ষড়দন্ত জাতকের রাণী, তুলসীর জন্ম, সমুদ্রকন্যা, শেষ বোঝা (উটের মৃত্যু), Dream of Freedom, Stagnation and flow, Old Toys, Soul of Stone প্রভৃতি। এই চিত্রের প্রতিটিই গভীর গূঢ় অর্থদ্যোতক। টেক্‌নিক বা করণ-কৌশলের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ভাব ও বৈচিত্র্য।

বিভিন্ন গ্রন্থের অলঙ্করণ স্বরূপ তিনি যত বর্ণাঢ্য চিত্র রচনা করেন, তার অধিকাংশেরই সৃষ্টিকাল ১৯১০ থেকে ১৯২০ সাল। ওমর খৈয়ামের চিত্র অবশ্য এর আগেই এঁকেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যে দু-তিন বছর সময় সীমার মধ্যে তিনি গীতাঞ্জলি, চন্দ্রকলা, Fruit Gathering, Charm of Kashmir, Fairy Tales, Myths of the Hindus and Buddhists গ্রন্থের জন্য প্রচুর চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিটি চিত্রের ভাব-ভাবনা, আঙ্গিক রীতি সব স্বতন্ত্র।[১]

১৯১৫-১৬ সালে তিনি এঁকেছিলেন এক সিরিজ পশু-প্রাণীর ছবি। এই ছবিগুলি ১৯১৬ সালে সোসাইটির প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল।[২]

রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'র অভিনয় দৃশ্যের নানারূপ চিত্রও তিনি এই সময়ে রচনা করেন। এই ছবিগুলি পূর্ণরূপের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বা চরিত্র নয়। আবার পুরোপুরি বিমূর্ত্তও বলা যায় না। এদের এক কথায় বলা যায়, মনোচ্ছায়াবাদী (Impressionistic)। তবে আধুনিক পাশ্চাত্যরীতির Impressionism-এর অনুকরণমূলক মনে করলে ভুল হবে। এ হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিরুচি ও ভাব-ভাবনা সঞ্জাত রূপাবলী। তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথের

১. বিশদ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নাটকে অভিনয় করতেন। অভিনয়কলায়ও তাঁর প্রতিভার দ্যুতি বিকীর্ণ হয়েছিল।[১] এই সিরিজের (ফাল্গুনী) চিত্রে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভঙ্গীর আলেখ্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একটা আবছা ভাবের মূর্ত্তিচিত্র, ওয়াশের দ্বারা রঙ্-এর ঘনত্ব ও কুহেলিকা সৃষ্টি হয়েছে অতি অভিনব রূপে। সাদা রঙ্-এর প্রয়োগাধিক্য এই চিত্রে অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। অন্ধবাউল নামক রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য এর বিশিষ্ট নিদর্শন। এই জাতীয় সাদার ব্যবহারে অতি আকর্ষণীয় আরও ছবি হোল—Old Toys, Kathak, Mother and Child, White Peacock ইত্যাদি। অন্যান্য ছবির তুলনায় এখানে ওয়াশের প্রভাব ভিন্নরূপ। ধুয়ে ধুয়ে পরতে পরতে বর্ণ সমাবেশ হলেও শ্বেতবর্ণের প্রভাবে ও আধিক্যে কিছু অস্বচ্ছতা ও ঘনত্বের সঞ্চার হয়েছে। কালো রঙ্-এর ব্যবহারও তিনি অনেক চিত্রে অনুরূপ পদ্ধতিতে করেছেন। যেমন, রাঁচীর দৃশ্যে ধানের আঁটি মাথায় মেয়ে, গীতাঞ্জলির শরৎ প্রভাতে বালকের মূর্ত্তি ও মাটির মেয়ে নামক ছবি।

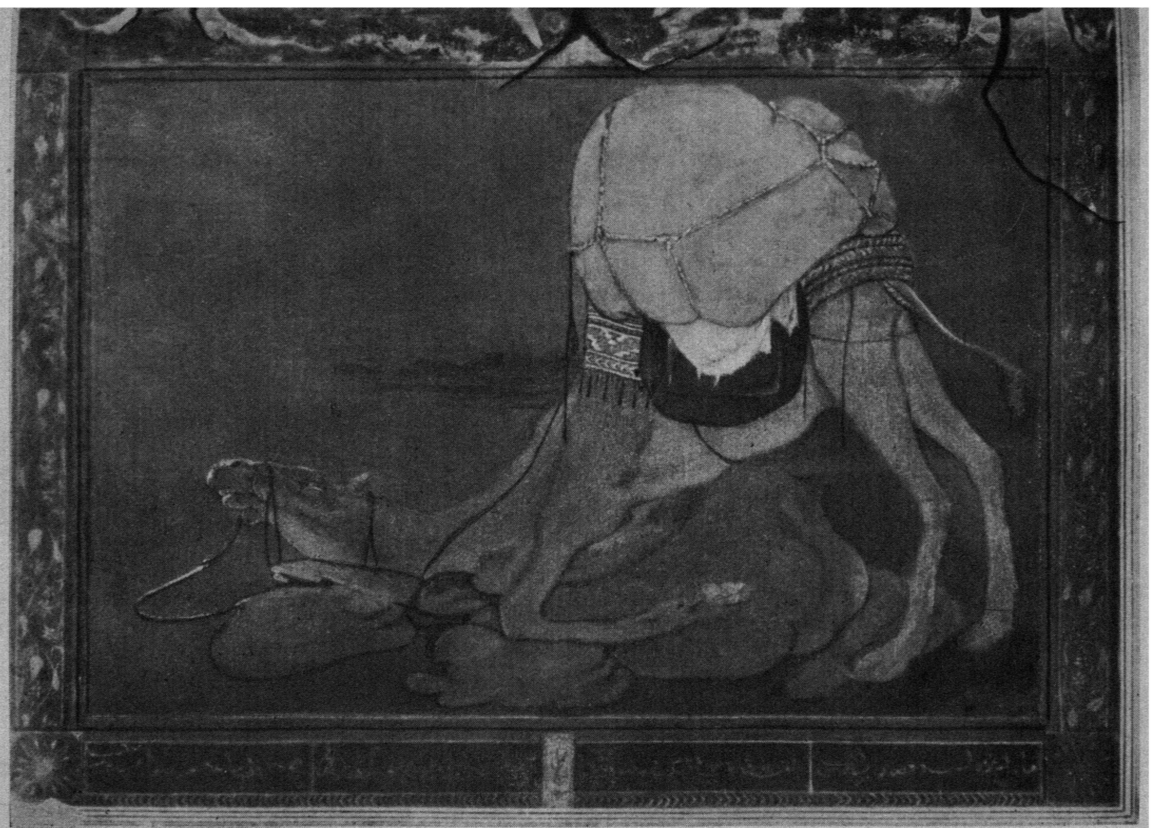
Impression বা পূর্ব্বে দেখা ধারণাকে রূপায়িত করে কিছু সংখ্যক জলরঙ-এর প্রাকৃতিক দৃশ্যও তিনি এই সময়ে এঁকেছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি ছবিতে বিলিতী জল রঙ্-এর টেক্‌নিকের কিছু লক্ষণ দেখা যায়। পুরীর দৃশ্যাবলী ব্যতীত তিনি এই পর্য্যায়ে আরও অনেক নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কন করেন। তার মধ্যে দার্জিলিং, কার্শিয়াং, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানের দৃশ্যপট উল্লেখনীয়।[২]

অবনীন্দ্রতুলিকার কয়েকটি গূঢ়ার্থক প্রতীকধর্ম্মী চিত্রের মর্ম্মকথা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। ষড়দন্ত জাতকের ছবিখানির বিষয় যেমন করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী, চিত্রায়ণও তেমনি সঠিক ভাবানুসারী। কাশীর রানী ছয়টি দাঁতের হস্তীরূপী বোধিসত্ত্বকে নিধন করিয়ে দাঁত ক'টি অর্জ্জনের অভিলাষ করেন। কিন্তু পরে দাঁত ক'টি লাভ করে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত ও শোকার্ত্ত হন। তারই রূপচিত্র এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সমগ্র ঘটনাকে প্রতীক-মাধ্যমে এক অদ্ভুত উপায়ে তিনি উপস্থিত করেন চিত্রপটে। ঈর্ষাপরায়ণা ও কুটিলমতির চেহারা কালো রঙ-এর আবেশে অঙ্কন করে, সেই মূল মনোভাবটি অতি সুন্দর ও সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি। রানীর পেছনে মাথার দিকে বিরাট হাতীর দাঁত এঁকে দিয়ে তিনি ইঙ্গিতে ও প্রতীক-মাধ্যমে

---

১. বিশদ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. এই গ্রন্থের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।



"শেষ বোঝা"
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



"আঁখি পাখী ধায়"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘটনাটির তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। অতবড় হাতীর দাঁত ওখানে যে শোভা পাচ্ছে তা রানীর প্রতিহিংসাপরায়ণতারই ফলশ্রুতি। এইখানেই চিত্র-কল্পনার সার্থকতা নিহিত। অনুজ্জ্বল, ম্লান প্রকৃতির কয়েকটি মাত্র রঙ্ প্রয়োগ করে রানীর বেদনা-মথিত ও অনুতপ্ত রূপ ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন চমৎকার ভাবে। ছবিটি ১৯১২ সাল মধ্যে অঙ্কিত। কারণ ১৯১৩ সালে ভগিনী নিবেদিতা ও কুমারস্বামী রচিত হিন্দুবৌদ্ধ কাহিনীর গ্রন্থে এটি সংযোজিত হয়েছিল।

১৯১৩ সালে অঙ্কিত আর একটি শ্রেষ্ঠ প্রতীক-ধর্ম্মী ছবি 'শেষবোঝা'। এখানি 'End of the Journey' নামে তখন অধিক পরিচিত হয়েছিল। বিষয়টি অতি সাধারণ। কিন্তু তার চিত্রকল্পনার মূলে যে চিন্তা ও ভাবনা, রূপায়ণে যে কৌশল ও প্রতীকতা তা তুলনাহীন।

একটি প্রবীণ উট বোঝা বইতে বইতে চলৎশক্তি হারিয়ে দিনান্তের অস্তরাগ রেখাতলে পা ভেঙ্গে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল উপলস্তূপের উপরে। তার পেছনের পা-দুটি তখনও প্রায় সোজাভাবে ভার বহন করার চেষ্টায় রত। মুখে, চোখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বাভাস। উটের জীবনসূর্য্য দিনমণির অস্তাচলে গমনের সঙ্গী হতে চলেছে। চারদিকে আকাশে বাতাসে সেই অস্তগামী রাগরেখা ছড়িয়ে পড়েছে অপূর্ব্ব এক ছটা নিয়ে। চিত্রপটেও স্তিমিত লাল রঙ্-এর আবেশে দিবাবসানের ইঙ্গিত। রঙ্-এর মহিমায় মৃত্যুপথযাত্রী উটের চিত্র হয়েছে মহনীয় এবং শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সামান্যকে অসামান্য করা যে উত্তম শিল্প-লক্ষণার একটি বিশিষ্টতা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে চূড়ান্তভাবে। উটের মুখে চোখে যে বেদনার্ত্ত করুণ ভাবটি প্রকট হয়েছে তা উচ্চতর প্রাণীর ভাবাবেগ প্রকাশকেও হার মানিয়েছে।

একটি উটের শেষ বোঝা নামানোর চিত্র মাধ্যমে শিল্পী মানবজীবনেরও একটি শেষ কথা, শেষ আকুতি ও বেদনাকে মূর্ত্ত করেছেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের জীবনেও এই রকমে আসে একটি দিন, যেদিন সে জীবনের সমস্ত শোক-দুঃখ, নিরাশা-ব্যর্থতার বোঝা বহন করে করে আর চলতে পারে না। তখন সে শেষ আশ্রয় খোঁজে পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে। দেহকে এলিয়ে দেয় কালের কোলে। কিন্তু বেদনার ছাপটি থেকে যায় তার মুখে-চোখে।

শিল্পীর রচনাভঙ্গী আলোচনা করলে এই চিত্রটিকে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে ভাবে ও ভাষায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের একটি বলা যায়। ছবিটির

বিষয়বস্তু সাধারণ হলেও স্থূলের সীমানার উর্দ্ধে সূক্ষ্মতার ঐশ্বর্য্যময় রসনিবিড়তায় অভিষিক্ত। অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্য সুষমায় মণ্ডিত। উপকরণ বাহুল্য নেই, কিন্তু অপার্থিব ভাব-প্রবাহে সমুজ্জ্বল। সন্ধ্যার রক্তরাগের প্রেক্ষাপটে উটের মৃত্যু অবনীন্দ্রনাথের জীবনবোধের এক অত্যুজ্জ্বল নমুনা। জীবন-মৃত্যুর বিপরীত লীলাখেলার এ যেন বাস্তব রূপ। শিল্পীর মানসরসের ভিয়ানে জীবনমৃত্যুর রসসারের ঘনীভূত রূপ। এই চিত্র কেবল অনুভূতিসর্ব্বস্ব নয়, এ-এক সত্যাশ্রয়ী অধ্যাত্ম সংবেদনের প্রতিরূপ।

ছবিখানি 'প্রবাসী'তে বেরোয় বাংলা ১৩২০ সনের ফাল্গুন মাসে। 'প্রবাসী' সম্পাদকের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ ছবিটির মূল মর্ম ব্যাখ্যা করে একটি পরিচিতি লিখেছিলেন উক্ত সংখ্যাতেই—

"চলিয়াছি, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমার বোঝা বহিয়া তোমার দিকে; আসিতেছ, কত জন্ম কত মৃত্যুর উপর দিয়া বোঝা নামাইতে আমার দিকে।

চলিতে চলিতে খসিতেছে জীবনের পর জীবন বন্ধ; জানু নত হইতেছে তোমার আসার পথে বার বার; আকাশ তোমার নেশায় রাঙ্গিয়া উঠিতেছে দিনের পর দিন; দুই আঁখি তোমার আসার পথে চাহিয়া ঝুরিতেছে কত না বিরহে যুগ যুগান্তে।"

স্বরচিত ছবি সম্বন্ধে শিল্পীর শিল্প-ব্যাখ্যান যেমন গভীর ভাবদ্যোতক ও কৌতূহলকর, তেমনি কলা-সমালোচনার ক্ষেত্রেও ইহা একটি নতুনতর অবদান। তাঁর লিখিত টীকা-ব্যাখ্যা চিত্রখানির রূপ-রহস্য বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

ছবিখানি প্রথম সাধারণের সম্মুখে হাজির করা হয় ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে, সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে। ফরাসী দেশীয়া শিল্পী ও সমালোচক আঁদ্রে কার্পেলে ছবিটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"The Last Journey of A. N. Tagore has the touching and profound symbolism which has so much of grandeur."

১৯১৪ সালে প্যারিসের আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীতে ওটি স্থান পেয়েছিল শিল্পীর অন্যান্য ছবির সঙ্গে। সেখানেও ছবিখানি সমঝদারগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অতঃপর ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে সোসাইটির তৎকালীন সেক্রেটারীকে কলকাতায় 'তার' করে ছবিটির দাম কত জানতে চেয়েছিলেন। তদুত্তরে সোসাইটির সম্পাদক মহাশয়

জানালেন, দাম পনের হাজার টাকা। সেই উচ্চমূল্যের হাঁক শুনে তাঁরা আর খবরাখবর করেন নি। ছবিটি স্বদেশে ফিরে এসেছিল।[১]

লণ্ডনের 'The Connoisseur' নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকাটিতে (Oct. 1919) এই ছবিটি সম্বন্ধে অতি সুন্দর মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল—

"A fine colourist and draughtsman he shows a wide variety in his themes and their treatmant···. This is specially the case in the End of the Journey, representing a tired camel stooping down to be relieved of its load which expressed in sumptuous and finely harmonised colour, is realised with a truth of animal physiognomy and a pathetic sentiment that recalls the work of Landseer."

'লীলাকমল' ছবিখানিতেও একটি গভীর জীবনবোধ ও গূঢ় অর্থ নিহিত আছে। মানুষ তাঁর ধ্যানের ধনকে, প্রাণপ্রিয় দেবতাকে নিজের হৃৎপদ্মাসনে অধিষ্ঠিত করেই পূজা করতে চান। ভক্তের হৃদিশতদল ভগবানের শ্রেষ্ঠ আসন। এই ভাবটি অবলম্বনেই চিত্রখানি কল্পিত। একটি সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদলের উপরে বালকৃষ্ণের আনন্দঘন মূর্ত্তি। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ছবিটি স্থান পেয়েছিল 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' নামে। নামটি দিয়েছিলেন ডঃ আনন্দকুমার স্বামী। শেষ পর্য্যন্ত তিনিই ছবিটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

বাংলা ১৩১৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ছবিটি 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল সুচারু প্রতিলিপি মাধ্যমে। আর পৌষ সংখ্যায় বেরিয়েছিল চমৎকার একটি বর্ণনা। উক্ত বর্ণনার মধ্যে চিত্রের বিষয়বস্তু ও শিল্পোৎকর্ষ—দুইয়েরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—

"লীলাকমল—শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আমাদের দেশের ভগবানের চিহ্নস্বরূপ, কেহ বা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে পূজা করেন, কেহ বা গীতার কৃষ্ণকে স্বীকার করেন, মোটের উপর একেশ্বরবাদীও গীতার কৃষ্ণকে ভগবানের নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আমাদের দেশের মন্দিরে মন্দিরে, গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্নরূপে বিরাজিত। তাহাকে বেষ্টন করিয়া মা যশোদার স্নেহ, গোপালের সখ্য ; রাধার প্রেম ; ধ্রুব, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও অক্রূরের ভক্তি ; অর্জ্জুনের নির্ভরতা অহঃরহ আমাদের মনের মধ্যে জাগরূক

১. ভারতের শিল্প ও আমার কথা : ও. সি. গাঙ্গুলী। পৃঃ ২৮০

হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিবিশেষ নহে, এ কৃষ্ণ পুরাণ মহাভারতের নয়—এ কৃষ্ণ শাশ্বত, আমাদের নয়নানন্দ, হৃদয়েশ্বর, এক অদ্বিতীয় ভগবান। তাই বুঝিয়াই শিল্পী শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি কাহারো মতানুসরণ করেন নাই। ভক্তের অমল ধবল পবিত্র হৃদয় শতদলের উপর ভাববিহ্বল আনন্দদুলালকে চিত্রিত করিয়াছেন। হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে পাতা আছে, পদ্মপত্রের যত শিরা উপশিরা সেও ভক্তেরই শিরা ধমণী—ভক্তের হৃদয় রক্তের মধ্যে আনন্দতরঙ্গ, ভাবস্পন্দন, বিচিত্র অনুভূতি বিবিধ বর্ণে, অপূর্ব্ব রেখায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণের সুন্দর শিশুমূর্ত্তি দর্শকের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করিয়া দেয়, তাঁহার মুখে-চোখে তন্ময়তা, অঙ্গে উচ্ছলতা, হস্তে ধৃত মিষ্টান্ন উপভোগের আনন্দ ও চির পূর্ণতার সূচনা করিতেছে। এই চিত্রখানি ভাবে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, অঙ্কন পারিপাট্যে প্রসিদ্ধ শিল্পীর তুলিকার উপযুক্তই হইয়াছে।”

‘ভারতী’তে মুদ্রিত চিত্র-বর্ণনার প্রত্যুত্তরে ‘সাহিত্যে’ (পৌষ, ১৩২৬) যা প্রকাশিত হয়েছিল তাকে আর চিত্র-সমালোচনা বলা যায় না। তা নিছক কটুভাষণ।

“সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ‘লীলাকমল’ নামক একখানি চিত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সংখ্যায় চিত্রকুটের ব্যাখ্যা নাই। মল্লিনাথ মহাশয়রা কি শ্রান্ত হইয়াছেন? সে যাহাই হউক, ‘লীলাকমল’ নাম দেখিয়াই অনুমান করিতে হইতেছে, চিত্রে অঙ্কিত নীল খোকার আধারটি কমল, অন্ততঃ কোনও পুষ্পবিশেষ। ভারতীয় চিত্রকলার মূল সূত্রই বোধকরি এই যে এমন বস্তু আঁকিবে বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনও সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে।

একটি বিরাট ফুলের কিঞ্জলকের উপর নীল খোকা নাচিতেছে। এই খোকাই বোধকরি ‘ধিনিকৃষ্ণ’। কিন্তু হায়, তিনি তো নাই। সে অভাব মল্লিনাথদিগকেই পূর্ণ করিতে হইবে। ইহাও যদি চিত্র হয়, তাহা হইলে কালীঘাটের প্রত্যেক পটুয়া রাফেল তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব। লীলাকমলের সার্থকতা কি, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লীলা কাহাকে বলে তাহা না জানিয়াই অশেষ-সেমুষী সম্রাট অবনীন্দ্রনাথ এই পটখানির নামকরণ করিয়া থাকিবেন। কুমারে পড়িয়াছি—‘লীলাকমল পত্রানি গণয়ামাস পার্ব্বতী’। সেকি এই লীলাকমল? পার্ব্বতী যখন লীলাকমলের পত্রগুলি গণিতেছিলেন, ভাগ্যে তখন অবনীন্দ্রনাথের খোকা

তাঁহার অঙ্গুলী চম্পক কামড়াইয়া ধরে নাই। দুর্ভাগ্য এই যে এই লীলাকমলের আদর্শেই বাঙ্গলার ভাবী চিত্রকরগণ অনুপ্রাণিত হইতেছেন। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায়, অবনীন্দ্রনাথের লীলাকমল সৌন্দর্য্যে, কল্পনায় বা রমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আশাকরি ভবিষ্যতে স্বদেশী দেশলাই-এর বাক্সের উপর এই অদ্ভুত, মৌলিক ও উদ্ভট পটগুলি চরম চরিতার্থতা লাভ করিবে।"

এই রকম একখানি ছবির কথা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণাতে উল্লেখ করেছেন। বহু আলোচিত, প্রশংসাধন্য ও আবার নিন্দিত এই লীলাকমল চিত্র ও অবনীন্দ্রনাথ বর্ণিত চিত্র এক ও অভিন্ন কিনা তা তাঁর বর্ণনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আলোচ্য চিত্রখানি ১৯১৮ সালে সোসাইটিতে প্রদর্শিত হয়। তবে কখন অঙ্কিত তা বোঝা যায় না। অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণায় যে ছবিটির কথা বলেছেন সেটি সম্ভবতঃ ১৯১০-১১ সালে এঁকেছিলেন।

গগনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালবিয়োগের পর ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি নামে জনৈক কথক নিযুক্ত হয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ভাগবত কথা শোনার জন্য। মাসের পর মাস সেই কথকতা চলেছিল। তারপরে আবার নতুন ব্যবস্থা হোল কীর্ত্তনগানের আসর বসবে। শিবু কীর্ত্তনিয়া বহাল হলেন, আর কথক ঠাকুরের ছুটি হয়ে গেল। গগনেন্দ্রনাথের তুলিকায় শিবু কীর্ত্তনিয়ার চেহারা অক্ষয় হয়ে আছে। কথক ঠাকুর প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমার কাছ থেকে একটি ছবি তিনি (কথক) চেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরই বর্ণনামত এঁকেছি পদ্মফুলের উপরে দাঁড়িয়ে বালক কৃষ্ণ। তিনি বলেছিলেন পূজো করবেন। তাঁর সঙ্গে সেই ছবি কাশীতে গেল। তারপর তিনি মারা যাবার পরে সে ছবি হাত ফিরতে ফিরতে কোথায় গেল জানিনে। সেদিন দেখি কোন্ এক কাগজে তা ছাপিয়েছে।"

'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রণের তারিখ (বাং ১৩১৬, অগ্রহায়ণ) দেখে মনে হয় অবনীন্দ্রনাথ বর্ণিত ছবিটিই ওখানে প্রকাশিত হয়েছিল। আর কয়েক বছর পরে হয়ত সেটিই আবার সোসাইটিতে প্রদর্শিত হয় ডঃ কুমারস্বামী প্রদত্ত নামে অর্থাৎ 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'।

'The Dream of Freedom'-এর বিষয়বস্তু অতি সাধারণ ও সামান্য। কিন্তু টেক্‌নিক ও বর্ণ-সমাবেশের কৌশলে তা একটি অদ্ভুত রসরচনায়

পরিণত হয়েছে। আর বিষয়বস্তুর মূল ভাবটি রূপায়িত হয়েছে বিশেষ এক অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে। একটি হরিণ গবাক্ষপথে বা ছোট একটি দরজা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। তার মনে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন তার অদ্ভুত রূপায়ণ হয়েছে এখানে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রাণী-জগতের একটি সাধারণ লক্ষণ ও মনোবৈশিষ্ট্য। মনে হয় শিল্পী সেই বিশ্বজনীন ভাবটিকে হরিণের লম্ফমান চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মনের গভীর অনুভাব এখানে একটি সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও ওয়াশ পদ্ধতির চূড়ান্ত পরিণতির ফলে তা অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতিতে হয়েছে পরিণত। এমন একটা লালরঙ-এর আমেজ দিয়েছেন তিনি চিত্রপটে যে আর কিছুর দিকে মন যায় না। পটের লালিমাই মনোহরণ করে নেয়।

'Stagnation and Flow' ছবিটিও সম্ভবতঃ প্রতীকধর্ম্মী। সেখানে রূপবদ্ধ হয়েছে দুটি নরনারীর মূর্ত্তি। সামনে তরুণী, পশ্চাতে বৃদ্ধ। জলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে দু'জনে চলেছেন। ছবিটির গোড়ার কথা ও চিন্তা বোধ হয় এই যে, বৃদ্ধের জীবনগতি স্তব্ধ, তা Stagnate হয়েছে; আর তরুণীর জীবন প্রাণময়, গতিময়, তিনি ছন্দোশীলা। জলোচ্ছ্বাস হয়ত বিশ্বজীবন প্রবাহের উদ্দাম গতিরই প্রতিরূপ।

'Soul of Stone'-এ নাতিউচ্চ একটি পাহাড়ের গায়ে একটি গাছ। গাছটি সম্ভবতঃ পাহাড়ের দেহে প্রাণস্পন্দনের ইঙ্গিতসূচক। তার মধ্য দিয়েই সমগ্র জগতের নাড়ীর স্পন্দন যেন অনুভূত হয়। পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষরূপ এঁকে শিল্পী স্থির নিশ্চল পাষাণস্তূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিল্পোৎকর্ষে এটিও প্রথমশ্রেণীর।

আর একখানি প্রতীকধর্ম্মী ছবি 'সমুদ্রকন্যা'। এর দ্বিতীয় নাম 'পানকৌড়ি'। ১৯১৩ সালের মধ্যে অঙ্কিত। কারণ সে বছরের নভেম্বর মাসে সোসাইটির প্রদর্শনীতে ওটি স্থান পেয়েছিল। অতঃপর ১৯১৪ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও অন্যান্য ছবির সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছিল। ছবিটি রঙ-এ, রস-এ, ভাব-এ ও কল্পনায় অতি চমৎকার ও অভিনব। রূপ রচনা ও বর্ণালি নয়ন বিমোহন। সমুদ্র-দুহিতা জেগে উঠেছেন নীলাম্বুর অম্বুরাশি ভেদ করে। সুবিশাল শঙ্খ থেকে তাঁর উৎপত্তি ও উদ্গম। দুটি হাতেই শঙ্খ। রত্নালঙ্কারে তিনি বিভূষিতা। বিরাট পদ্মচক্র তাঁর শিরোবেষ্টন করে আছে। সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হোল তরুণী দেহের বর্ণবাহার।

তাঁর মাথা থেকে কনুই পর্য্যন্ত ঘন সবুজ বা শ্যাওলা রঙ-এর। হাত দুটি ও উদরাংশ শ্বেতশুভ্র। এর কারণ বোধহয় এই যে, যে অংশ শঙ্খের অভ্যন্তরে আবদ্ধ ছিল, তা সাদা। আর উত্তমাঙ্গ শঙ্খের বাইরে থাকার ফলে শ্যাওলা ধরে গাঢ় সবুজ হয়ে গিয়েছে। কি চমৎকার কল্পনা ও অনুভূতি! কি অপূর্ব্ব তার ফলশ্রুতি! চিত্রপটে আর কোন অনুষঙ্গ নেই, বাহুল্য নেই। আরও চমৎকারিত্ব প্রকট হয়েছে কন্যাটির আভঙ্গ ভঙ্গিমাতে। মুখেচোখে অসামান্য লালিমা। শঙ্খধৃত হাত দু'খানির মুদ্রাভঙ্গী যেন কথা বলছে। এ-এক অতি প্রাকৃত ও অলৌকিক রসরূপের কল্পনা। এর জুড়ি নেই, বিগত কালের কোনও রূপস্মৃতির প্রভাব নেই এর গড়নে, গঠনে ও বিষয় নির্ব্বাচনে।

'Old Toys' ছবিটি অবশ্য ১৯২০ সালের পরে অঙ্কিত। তাহলেও উপর্য্যুক্ত চিত্রগুচ্ছে স্থান পাওয়ার যোগ্য। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯২২ সাল, ছবিটিকে এক কথায় বলা যায় Masterpiece। অবনীন্দ্রনাথ একটি অদ্ভুত উপায়ে মানবজীবনের একটি সুনিশ্চিত ও অবধারিত সত্যকে ধরে দিয়েছেন রঙ্-রেখার মায়াজালে। জীবন-সায়াহ্ন সমাগত, বৃদ্ধা মহিলাটি সামনে ডালা ও কুলাতে রকমারী খেলনা সাজিয়ে বসে আছেন বেদনার্ত হৃদয়ে। তার মুখে-চোখে অসীম ব্যথা-বেদনার ছাপ। আসনভঙ্গীতে বার্দ্ধক্যের অক্ষমতা ও জড়ত্বের প্রকাশ স্বাভাবিক। এ বেদনা-ব্যথা কেন? তার দুটি কারণ হতে পারে। তবে শিল্পীর মনকে কোনটি অধিক প্রভাবিত করেছিল তা জানা সকল সম্ভাবনার বাইরে।

প্রথমতঃ নিজের পেছনে ফেলে আসা সুদূর অতীতের দিনগুলি ও বাল্যের আনন্দলহরীর স্মৃতিও মনে নাড়া দিয়ে তাঁকে বেদনাহত করে তুলতে পারে। না হয় তো নাতি-নাতনী পরিবৃত হয়ে একদিন তিনি দিন কাটিয়েছেন, এখন তারা বড় হয়ে দূরে গিয়েছে চলে। তাঁর গৃহ-পরিবেশে শিশুর খেলা, কাকলি-কোলাহল আর নেই। কাজেই তার এই দুঃখ, এই ব্যথা। বৃদ্ধা সেই পুরোনো খেলনা নিয়ে বসে অতীতের স্মৃতি মন্থন করে চলেছেন। মহান্ শিল্পীর হৃদয়াকুতির সঙ্গে তাঁর মোহিনী তুলিকার অনুপম বর্ণালি মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই অপূর্ব্ব জীবনচিত্র। এ-শুধু জীবনচিত্র নয়, এ হোল অনিবার্য এক জীবন-লীলা সম্বন্ধে সুগভীর অনুভূতি ও চেতনার করুণ মধুর রূপালেখ্য।

এই জাতীয় ছবি, মানুষের প্রতিকৃতি ও আশেপাশের নানা ঘটনাবীলর

রূপচিত্র মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার একটি বিশেষ দিক স্পষ্টরূপে হয়েছে প্রতিভাত। এই পর্য্যায়ের চিত্রগুলি পর্য্যালোচনা করলে একটি বিষয় সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি একালের অনেক শিল্পীর মত বিচ্ছিন্নতাবোধে ব্যথিত হতেন না। জীবন ও সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে, অথবা জীবনে জীবন যোগ করতে না পেরে, তিনি নিজেকে কখনও একাকী বা নিঃসঙ্গ মনে করেন নি। শিল্পী-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি যেমন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে চিত্রাঙ্কন করেছেন, তেমনি প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের রসধারা আকণ্ঠ পান করে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন অজস্র চিত্রপটে। আরও এঁকেছেন আত্মীয়-বন্ধু ও চেনা মহলের কত শত প্রতিমূর্ত্তি, মানব-জীবনের নানা রূপচ্ছবি। তার মধ্যে পাওয়া যায় দৈনন্দিন-জীবনের কত ঘটনা, কত সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ রূপাবলী।

প্রতিদিনের চেনা-জানা বিষয় অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্রাবলী মধ্যে জলেধোয়া রীতির অদ্ভুত প্রভাবযুক্ত দুটি ছবি হোল কথক ঠাকুরের মূর্ত্তিচিত্র এবং মা ও ছেলের ছবি। এই সকল ছবিতে রূপরচনা অপেক্ষা তিনি অধিকতর মনোনিবেশ করেছিলেন বর্ণের মায়াজাল রচনার দিকে। বস্তুতঃই রঙের গভীরতা ও দুর্জ্ঞেয়তাই এই সকল ছবিকে শিল্পোৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে তুলে দিয়েছে। তাছাড়া 'Type' সৃষ্টির নৈপুণ্যও দেখা যায় অত্যধিক পরিমাণে।

এই অধ্যায়ে অঙ্কিত তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবি হোল পত্রলিখন, দময়ন্তী, বিশ্রাম, তুলসীর জন্ম, যমুনার ঘাটে রাধা প্রভৃতি। দময়ন্তী রঙীন প্রতিলিপিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩১৭)। পত্র-লিখন ছবিটিও উক্ত পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়েছিল মাঘ সংখ্যাতে। দময়ন্তী চিত্র সম্বন্ধে একটি পরিচিতিমূলক বর্ণনাও ছিল সেখানে। যথা—

"হংস দময়ন্তীকে নলের সংবাদ জানাইয়া দময়ন্তীর সন্দেশ বহন করিয়া নলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। এবং দময়ন্তীর অন্তরে আনন্দরসের সঞ্চার হওয়াতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। পুলক-গদগদ দময়ন্তী উড্ডীয়মান হংসকে নিরীক্ষণ করিতেছেন—ইহাই চিত্রের বর্ণিত বিষয়। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনা।"

কলসীসহ যমুনার ঘাটে রাধার দেহরূপ দীর্ঘায়ত। সর্ব্বাঙ্গ শাড়ীতে আবৃত। ভারী ভারী গহনা। মুখেচোখে বেদনার ছাপ। প্রেক্ষাপটে সুবিস্তীর্ণ নদী। ১৯১৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'তে এর রঙীন প্রতিলিপি

মুদ্রিত হয়েছিল এই নামে—'নাহি উঠল তীরে সো ধনি রাই।' পূর্ব্বে আলোচিত সচকিতা রাধার চিত্র এই ছবিটির তুলনায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

'তুলসীর জন্ম'-চিত্রে দেখা যায় সমুদ্রবক্ষে পূর্ণাবয়বা মুদিতনেত্রা তরুণী মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। দেহাবরণের অঞ্চল কিনারা সমুদ্রবারি স্পর্শ করে চলেছে। মূর্ত্তিটি অতীব রমণীয়।

১৯১০-২০ সাল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়। এই সময়ের মধ্যেই আবার তাঁর জীবনে এসেছিল দারুণ এক পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তন তাঁর ব্যক্তি-জীবন, শিল্পী-জীবন এবং বাংলার আধুনিক চারুকলার সামগ্রিক জীবনধারাকেই করেছিল আন্দোলিত ও পরিবর্ত্তিত। অবনীন্দ্রনাথের জীবন ও মনকে তা সাময়িকভাবে বিচলিত করলেও, ভারতের আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে তার ফলশ্রুতি বিশেষ অবাঞ্ছিত হয়নি। দশ বছর সরকারী চাকুরীর নিগড়ে আবদ্ধ থেকে তিনি হঠাৎ একদিন তার দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করে বেরিয়ে গেলেন অবাধ মুক্ত স্বাধীন জীবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। সরকারী কলা শিক্ষালয়ের ছাত্র, ক্লাস রুম, অঙ্গন-আবাস ও চিত্রালয়ের মোহপাশ বিমুক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন তাঁর পিতৃপুরুষের গৃহাবাসের 'বিচিত্রা ভবনে'। বিচিত্রা ভবনে চিত্রকলা ও অন্যান্য চারুশিল্প বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য অনেকের শুভ চেষ্টাতে। সেখানে চিত্রচর্চ্চা হোত, কাব্য কবিতা রচনা ও পাঠ হোত, আরও হোত নাটকের অভিনয়।

তিনি আর্ট স্কুল ছাড়লেন কেন? কারণটি খুব গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু শিল্পীর খেয়ালী ও সংবেদনশীল মন কোনও কঠিন নিয়ম বা অতিরিক্ত চাপিয়ে দেয়া কোনও বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তিনি এক কথায়, বিনা দ্বিধায় পদত্যাগ করলেন। ঘটনাটি ১৯১৫ সালের। অবনীন্দ্রনাথ যখন ১৯০৫ সালে ভাইস প্রিন্সিপাল পদে আসীন হন, তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন মিঃ ই.বি. হ্যাভেল। অবনীন্দ্রনাথই আর্ট স্কুলে প্রথম ভারতীয় ভাইস প্রিন্সিপাল। মিঃ হ্যাভেল ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে অসুস্থ হয়ে স্বদেশে চলে যান দীর্ঘ দিন ছুটি নিয়ে। তখন প্রিন্সিপালের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের উপরে।

অতঃপর হ্যাভেল সাহেবের ছুটির অবসান মুখে ১৯০৮ সালের গোড়াতে বিলেতের চিকিৎসকবৃন্দ অভিমত দিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে গিয়ে কার্য্যভার গ্রহণে সক্ষম নন। এই সংবাদ কলকাতায় পৌঁছালে আর্ট স্কুলের পরিচালক সমিতি অবনীন্দ্রনাথকে অস্থায়ী পদে রেখে নতুন অধ্যক্ষ আনয়নের প্রস্তাব

গ্রহণ করলেন। অবনীন্দ্রনাথ দু'বছর সুযোগ্যভাবে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব বহন করেও স্থায়ীভাবে সে পদে বহাল হবার সুযোগ পেলেন না।

হ্যাভেল সাহেব ভারতে আর কর্ম্মভার নিয়ে এলেন না বটে, কিন্তু স্বদেশে থেকেও তিনি ভারতের শিল্প-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন গভীরভাবে। তাঁর লেখনী চলেছিল অবাধ গতিতে। তিনি সেই সময় ভারতের চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আর অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় শিষ্যদের কলাকৃতি আলোচনা দ্বারা তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করে লণ্ডনের 'স্টুডিয়ো' পত্রিকা এবং আরও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি ভারতীয় চারুকলার দার্শনিক তত্ব ও উচ্চ ভাবাদর্শ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছেন তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে। আর সে কাজ তিনি করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। তিনি পরলোকগমন করেন ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ এ-দেশে পৌঁছোলে এখানকার অনেক শিল্পপ্রেমী ও তাঁর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নানা পত্র-পত্রিকায়।

অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে 'গুরু' বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সেই 'বিদেশী গুরু' লোকান্তরিত হয়েছেন জেনে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকাতে (মাঘ, ১৩৪১)। নিম্নলিখিত এই উক্তিটি তারই একটি অংশ বিশেষ—

"প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রের মাঝারী ধরনের ছবি এনে এদেশের ছাত্রদের oil, water colour-এ শিক্ষিত করে নকল র‍্যাফেল, টিশিয়ান তৈরী করা চলছে। সেটা যেন আর্টিস্ট হবার অভিনয়। আবার আর্টের সত্যিকার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করারও সঠিক পন্থা তখন হয়নি। প্রত্নতাত্বিকদের ব্যাখ্যানে কোন সুফল হয়নি। হ্যাভেল একাধারে প্রত্নতত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ব ও ভারতীয় শিল্পের গূঢ়তত্ব ও রস প্রথমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিল্পশিক্ষার পদ্ধতিতে ও দেশী প্রথার প্রবর্ত্তন করলেন।...

যে চোখে হ্যাভেল সাহেব আমাদের দেশের শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প ইতিহাস প্রভৃতি দেখে গেছেন তা একজন ঋষির পক্ষেই সম্ভব, সেই কারণেই আমরা না বুঝলেও তিনি জগতে শ্রদ্ধার পাত্র এবং এদেশের শিল্পশিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠাতা বলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে হবে আমাদের।"

ইতিমধ্যে আর্ট স্কুলে নতুন প্রিন্সিপাল হয়ে এলেন মিঃ পার্সী ব্রাউন। তিনি এখানে কর্ম্মভার গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৯ সালের ১২ই জানুয়ারী।

তৎপূর্ব্বে তিনি কার্য্যরত ছিলেন লাহোরে। তথাকার মেয়ো স্কুল অব্ ইনডাস্ট্রিয়াল আর্টের অধ্যক্ষ ও সেণ্ট্রাল মিউজিয়মের কিউরেটরের পদে ছিলেন তিনি প্রায় দশ বছর।

অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী করে হ্যাভেল পরিকল্পনা করেছিলেন যে, আর্ট স্কুলের শিক্ষানীতি ও আবহমণ্ডলকে ভারতীয় ভাবাপন্ন করে তুলবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আরব্ধ কর্মধারার গতিকে অব্যাহত রেখেছিলেন। আর্ট স্কুলের ১৯০৭-৮ থেকে ১৯১১-১২ সালের রিপোর্টে দেখা যায়—

"The process of denationalisation has been arrested. The policy of installing Indian Art in the place of supremacy which it ought to occupy in an Indian Art School, and of inspiring the minds of the students with a desire to follow Indian ideals, has been continued during the Quinquennium under review."

মিঃ পার্সী ব্রাউন প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হয়েও মিঃ হ্যাভেলের আরব্ধ কাজের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে তিনি পাঠক্রমে কিছু পরিবর্ত্তন করেছিলেন। সমগ্র পাঠ্যসূচীকে তিনি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন। যেমন, Elementary, Industrial, Drafting, Teaching and Fine Arts. প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রথমে Elementary বিভাগে দু'বছর শিক্ষালাভ করতে হবে। তারপর বাকি চারটি বিভাগের যে কোন একটিতে যোগ দিয়ে তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারবেন। অন্যান্য বিভাগের শিক্ষাকাল তিন বছর ধার্য্য হয়েছিল।

ফাইনআর্ট বিভাগের কাজ বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ ও পরিচালনায় ছাত্রগণ ভারতীয় বিভাগে দেশজ ভাবধারায় হলেন অনুপ্রাণিত। ভারতের পৌরাণিক আখ্যান, রামায়ণ-মহাভারত ও প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-কাহিনী থেকে বিষয় সংগ্রহ করে তাঁদের চিত্রাঙ্কন চললো অবিরাম গতিতে। ভারতীয় বিভাগের ছাত্রদের শিল্পকৃতি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করবার ব্যবস্থা হয়েছিল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর প্রদর্শনী মাধ্যমে। আর্ট স্কুলের ১৯০৯-১০ সালের রিপোর্টে তার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল এইভাবে, "A very impressive collection of paintings in Indian style, contri-

buted mainly by the students of the department was displayed."

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বিভাগে দেশীয় প্রথায় রঙ্-তুলি তৈরী করারও চেষ্টা করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টায় যে তিনি সফল হয়েছিলেন তাও জানা যায় উক্ত রিপোর্টে।

"In connection with Fine Art Department a special feature has also been made of the preparation of the indegenous pigments. The results of this action are being watched with some interest, as the old Indian colours are remarkable for their brilliancy and permanence."

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্ররীতির সাধনা ও শিক্ষাদানের কাজ এগিয়ে চলেছিল বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে। খুব সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম ছাত্রগোষ্ঠী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে যথার্থ শিল্পী হয়ে বেরোলেন ১৯১০ কি ১১ সালে।

কিন্তু দু'চার বছরের মধ্যেই আর্ট স্কুলের ভারতীয় বিভাগে একটা পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া গেল। ১৯১২ সালের জুন মাসে অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউন দেড় বছরের ছুটি নিয়ে স্বদেশে চলে যান। তৎপূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথও ছুটি নিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। তিনি ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে ফিরে এলেন কর্ম্মকেন্দ্রে। আবার তাঁকে অস্থায়ীভাবে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করতে হোল প্রায় দশ-এগার মাস। ব্রাউন সাহেব ফিরে এলে তবে তিনি সেই দায়িত্ব মুক্ত হন।

ইতিপূর্ব্বে ব্রাউন সাহেব ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে সহযোগিতা ও সহমর্ম্মিতার ভাব ছিল, তা যেন ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে লাগলো। একটু একটু করে উভয়ের মধ্যে কিছুটা মতভেদ, খানিকটা আদর্শ-বিরোধিতা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। সেই বিরোধ ও মতান্তরের একটি স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শে আস্থাবান। ছাত্রদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের মত সুমধুর ও অবাধ সম্পর্ক। তিনি নিজেও ক্লাস রুমের অতশত বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন মেনে চলতে পারতেন না, ছাত্রদেরও সেভাবে চালাবার চেষ্টা করেন নি কখনও। তাঁর ছাত্ররা ইচ্ছে মত ক্লাসের বাইরে বসেও কাজ

করতেন। এমন কি সময় সময় তাঁরা বিদ্যালয় ছেড়ে এদিকে-ওদিকে চলে যেতেন স্কেচ ও ছবি করার জন্য। পরন্তু বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে পার্সী ব্রাউনের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব তিনি মাঝে মাঝে অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে আপত্তি তুলতেন। ক্রমান্বয়ে সেই মতবিরোধ এমন আকার ধারণ করেছিল যে অবনীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যহীনতার কারণ দেখিয়ে ছুটি নিতে বাধ্য হন। শেষ পর্য্যন্ত সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পূর্ণ অবকাশ নিলেন ১৯১৫ সালে।

এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেও অনেক কথা বলেছেন 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে। সেখানে দেখা যায় যে, তিনি পারিবারিক কারণে মুসৌরী পাহাড়ে যাবেন স্থির করে ছুটি চেয়েছিলেন। ওদিকে আবার প্রিন্সিপালের বিলেত যাবার প্রয়োজন হোল। সুতরাং তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছুটি মঞ্জুর করতে নারাজ হলেন। কারণ প্রিন্সিপালের অনুপস্থিতিতে অবনীন্দ্রনাথকেই স্কুলের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথও যাবেনই, তাঁকে না গেলে নয়— এমন ভাব। আর প্রিন্সিপাল বললেন, "ছুটি দেব না, তোমাকেই চার্জ নিতে হবে স্কুলের।"

তদুত্তরে তিনি বললেন, "আমাকে পাহাড়ে যেতেই হবে। আগে থেকেই সে ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমি এখন চার্জ নিতে পারবো না।"

অধ্যক্ষ সাহেব মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি গবর্নমেণ্টের অর্ডারের বিরুদ্ধে যেতে চাও? ইউ আর বুলিয়িং।"

সেকথা শুনে শিল্পাচার্য্যের মাথা গরম হয়ে গেলে। তিনি রাগের জ্বালায় হাতের লাঠিটা মেজের উপর খুব জোরে ঠুকে গাড়ী করে বাড়ী চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—

"সাহেব, রইল তোমার চাকুরী, আজ থেকে কাজে ইস্তফা দিলুম।" এইভাবে সরকারী কাজের পালা সাঙ্গ করে অবনীন্দ্রনাথ চলে গেলেন মুসৌরী।

সেই ঘটনার কিছুকাল পরে লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর কিছু কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হয়েছিল। তিনি তখন বলেছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন তা ঠিকই হয়েছিল। তদুত্তরে শিল্পাচার্য্য তাঁকে বলেছিলেন—

"সাহেব, দুই সূর্য্য এক আকাশে থাকতে পারে না। তোমরা যাকে বেছে এনেছ, সেই থাক, আমার দ্বারা এ-চাকুরী চলবে না। তোমরা যদি

আমাকে কিছু দিতে চাও তবে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটিতে দিও, সেইখানেই আমার সত্যিকারের কর্ম্মক্ষেত্র হবে।"

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। তার কর্ম্মধারা এতদিন কয়েকটি বিশেষ কাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। যেমন, চিত্র প্রদর্শনী, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা-বক্তৃতা এবং পুস্তিকা ও চিত্র প্রতিলিপির মাধ্যমে নব্যরীতির চিত্রকলার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের প্রচার ও প্রসার। ১৯১৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন সোসাইটির কাজে। তখন থেকেই সোসাইটিতে নিয়মিত ক্লাস করে চিত্রাঙ্কন শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হয়েছিল। অতএব, অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ত্যাগ করলেও শিক্ষকতার জীবন ত্যাগ করেন নি। বরঞ্চ তাঁর নিজের মতে ও পথে, আনন্দে ও ছন্দে তিনি নিজস্ব কলা পরিমণ্ডল রচনা করে ছাত্রশিষ্য পরিবৃত হয়ে কাজ করে চললেন অবিরাম গতিতে।

তাঁর সেই নব-বিদ্যালয়ে কোনও দৃঢ় আইন-কানুন ছিল না, ছিল না কোনও ধরা-বাঁধা পাঠ্যতালিকা ও পরীক্ষার বহর।[১]

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ত্যাগ করার পরে আর্ট স্কুলে ক্রমশঃ অবস্থান্তর ঘটেছিল। হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় দেশজ চিত্র রীতির প্রবর্ত্তন করে ফাইন আর্টস বিভাগকে ক্রমশঃ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের আদর্শে পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি স্থায়ীভাবে স্বদেশে চলে যাবার পরেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কর্ম্মনীতি অক্ষুণ্ণ রাখতেই যত্নবান ছিলেন। পার্সী ব্রাউনের সঙ্গে তিনি কাজ করেন ছয় বছরেরও অধিককাল। ব্রাউন সাহেবও প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাজ ও আদর্শে কখনও বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তিনি আর্ট স্কুল ত্যাগ করার পরে ১৯১৬ সালের মধ্যভাগে ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে আসেন যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী। ইনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও এককালে সতীর্থ। পামার সাহেবের কাছে উভয়ে একসঙ্গে শিক্ষালাভ করেন। যামিনীপ্রকাশ ছিলেন পুরাদস্তর পাশ্চাত্যপন্থী শিল্পী।

তিনি আর্ট স্কুলে কর্ম্মভার নিয়ে এসে পুনরায় ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিলেন। এই বিষয়ে ব্রাউন সাহেবের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অবিলম্বে 'ফাইন আর্টস্' বিভাগ দ্বিধাবিভক্ত হোল। একটির নাম 'ফাইন আর্টস বিভাগ' অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য প্রথায় শিক্ষাদানের বিভাগ; আর দ্বিতীয়টি 'ভারতীয় বিভাগ'—

---

১. বিশদ আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ভারতকলার চর্চ্চা অনুশীলনের ক্লাস। আজও আর্ট কলেজে সেই দুটি ভিন্ন বিভাগ সেদিনের পুরোনো স্মৃতি বহন করে চলেছে।

দুটি স্বতন্ত্র বিভাগের পরিচালকও হলেন দু'জন। যামিনীপ্রকাশ গ্রহণ করলেন ফাইন আর্টস বিভাগের দায়িত্ব, আর ভারতীয় রীতির ক্লাসটির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের উপরে। কিন্তু বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের এই বিভাগটি সম্বন্ধে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর তেমন ছিল না। এই বিভাগে শিক্ষালাভে ইচ্ছুক অনেক ছাত্র-শিক্ষার্থী তখন সোসাইটিতে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিখবার জন্য গিয়ে সমবেত হলেন। আর সেখানে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্রশৈলীর চর্চ্চা ও অনুশীলন এবং সেই শিক্ষায়তনের কাজ নিয়মিত-ভাবে চলতে লাগলো অবাধ ছন্দে। ক্রমে তা বাংলা তথা সমগ্র ভারতে একটি নবচিত্র আন্দোলনের পরিমণ্ডল রচনা করেছিল।[১]

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ত্যাগ করার পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে যে সকল শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা করেন তার কয়েকখানি ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। আর্ট স্কুল ছেড়ে যেসব চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা যেমন সংখ্যায়, তেমনি বিষয়বৈচিত্র্যে ও শিল্পগুণে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করেছে। ১৯১৬ সালে সোসাইটির প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি স্থান পেয়েছিল প্রায় পঞ্চাশখানি। তন্মধ্যে নিসর্গ দৃশ্য ও পশুপাখীর রূপাঙ্কনই ছিল বেশী সংখ্যক। পুরী থেকে কোণারকের দৃশ্যপট ছিল বারোখানি। আরও ছিল সূর্য্য, চন্দ্র ও জল নামে এক সিরিজ জল রঙ্-এর ছবি। সংখ্যায় তা চব্বিশ। এই চিত্রগুচ্ছ একটি স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে স্থান লাভের যোগ্য। কারণ, এর মধ্যে একটা মনোচ্ছায়াবাদী (Impressionism) রীতির প্রতিফলন হয়েছিল। বাকী আরও কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্যের চিত্রে পাশ্চাত্যপন্থী জল রঙ্-এর রীতির আভাস পরিস্ফুট। ১৯১৬ সালের প্রদর্শনীর চিত্রতালিকায় তাঁর আরও যে সকল চিত্রের উল্লেখ রয়েছে তা হোল—

The Parody of Ideals, Dawn, The Light in the Shadow, The Call of the Rain, The Bride, The Free, The Desolate, The Song of the Evening, Night, The Queen, The Dreamer, Towards the Light, The Outcast, Riding before the Storm, In the Temple. ঐ বছরে তিনি আরও এঁকেছিলেন নদীয়ায় শ্রীচৈতন্য

১. এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এবং শিবপার্ব্বতীর ছবি। চৈতন্তের চিত্রে শিল্পীর নাম স্বাক্ষরের সঙ্গে সীলমোহরাঙ্কিত ছিল।

The Parody of Ideals চিত্রগুচ্ছ সম্বন্ধে ডঃ জেমস্ কাজিনস্-এর সমালোচনাতে উহার বিষয় ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি মাদ্রাজের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় 'The Bengal Painters' শিরোনামাতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন ১৯১৮ সালে। তাতে তিনি লিখেছেন—

"The satirical element which was noticable in the exhibition that travelled to Madras two years ago, particularly in certain sketches by A. N. Tagore under the general title of 'Parody of Ideals' has developed withrapidity and effectiveness through his brother G. N. Tagore."

রূপকধর্ম্মী হাস্যরসাত্মক আরও কিছু ছবি তিনি এঁকেছিলেন কালো কালির রেখাঙ্কনে। বিষয়, রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনী (Parrot's Training)। নিছক রেখার সাহায্যে তিনি এই চিত্রগুচ্ছে চমৎকার ভৌল সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্ণ চিত্রকল্প প্রভাব এনেছেন।

নানা বর্ণের সমাবেশে এবং জলে ধোয়া পদ্ধতির চূড়ান্ত প্রয়োগে আর এক সিরিজ চিত্ররূপ হয়েছিল মোহমুদ্গরের শ্লোকরাজি অবলম্বনে। এই চিত্রের সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। তা'হলেও এর বর্ণ-বিশিষ্টতা ও শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখে মনে হয় যে শিল্পীর প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে ভাস্বর—এ রচনা তখনকার। রঙের গভীরতা ও রেখার কারুতা দ্বারা তিনি বিষয়বস্তুর অর্থ তাৎপর্য্যকে আরও গভীরতর ভাবে প্রত্যক্ষীভূত করিয়েছেন।

রূপকধর্ম্মী চিত্র ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথ কিছু প্রত্যক্ষ রূপের হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক চিত্রও এঁকেছিলেন। বিষয়, কলকাতার রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন চরিত্র। এই ছবিগুলি সম্ভবতঃ ১৯১১-১২ সালে রচনা করেন। কারণ বাংলা ১৩১৯ সনে ভারতী পত্রিকাতে প্রাচ্য শিল্পসভার ষষ্ঠ বার্ষিক প্রদর্শনীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আলোচ্য চিত্রাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল। চিত্রার্পিত বিষয় মধ্যে দেখা যায় রাজা, কামদেব, রতি, মহাদেব, নারদ, প্রেমিক, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি। ছবিগুলির মধ্যে দু'একটি 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। তার সঙ্গে Caption হিসেবে কিছু হাস্যরসাত্মক উদ্ধৃতি ছিল। যেমন: "কাগজ শৃঙ্খলে বন্দী বীরেন্দ্রকেশরী সরোষ গর্জ্জনে রঙ্গস্থল প্রকম্পিত করিতেছেন।" (কার্ত্তিক, ১৩১৯)।

রঙ্গালয়ে মহাদেব ছবিটির পরিচিতি—"হস্তে ত্রিশূল, ভালে পঞ্চবর্ত্তিকা শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রিক বল্‌ব্ সহযোগে মদনভস্ম করিলেন।" (বৈশাখ, ১৩১৯)।

এই সিরিজের ছবিতেও অবনীন্দ্রনাথের বর্ণবিন্যাস চাতুর্য্য লক্ষণীয়। কার্টুন জাতীয় চিত্র রচনাতেও তিনি কি পরিমাণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় এই চিত্রগুচ্ছ দেখলে। এ বিষয়ে 'ভারতী' পত্রিকায় যে মন্তব্য হয়েছিল তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা লিখেছিলেন—

"শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলীর প্রশংসা করা বাহুল্য। তাঁহার অঙ্কিত রঙ্গালয় নায়ক নায়িকার বিদ্রূপ চিত্রগুলি বিরূপতাকেও যেন সুন্দর করিয়াছে, তাঁহার বিদ্রূপ রূঢ় নয়, রহস্যমধুর। হাসি পায়, রাগ ধরে না।"

১৯১৯—২০ সালের রচনারাজির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের দার্জিলিং ভ্রমণের ফলশ্রুতি আছে বিবিধ ও বিচিত্র রূপের। অবশ্য তার আগেও তিনি পার্ব্বত্য দৃশ্যের চিত্র কিছু এঁকেছিলেন। সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতেও তা স্থান পেয়েছিল। ১৯২০ সালের প্রদর্শনীতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে তিনি 'ছোট-নাগপুরের ইম্‌প্রেশন' নাম দিয়ে এগারখানি ছবি উপস্থিত করেছিলেন। সুতরাং মনে হয়, তার কিছু আগেই তিনি বোধ হয় ছোটনাগপুর অঞ্চল ভ্রমণ করে এসেছিলেন। উক্ত প্রদর্শনীতে স্থানপ্রাপ্ত অন্যান্য চিত্র—

Ruined Temple, King Soloman and the Cup of Immortality, The writing of Meghduta, Krishna signing the Bond of Love, Chinese Princess, The Mughal Princess, The Waves, The Passing of the Lunatic, The Gardener, Toys, Worshipper, The Beauty Spot.

শেষোক্ত ছবিটির সঙ্গে বিষয়বস্তুর পরিচিতি স্বরূপ হাফিজের একটি কবিতার ইংরেজী রূপান্তর করেছিলেন উদ্ধৃত। কবিতাটি হচ্ছে—

"An if you Turk of Shiraz land this heart
would take to hold in fee
Bokhara town and Samarkand to that black
mole my dower should be."

১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে অবনীন্দ্র-চিত্রের যে পর্ব্বটি আরম্ভ হয়েছিল, তার মধ্যে আরও কিছু নতুনতর ভাব-ভাবনা ও প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়। চিত্রার্পিত বিষয়ের মূল কাঠামো (structure) ও প্রতিটি অঙ্গ-অবয়বের দিকে বেশী

লক্ষ্য অনুভূত হয়। ইতিপূর্ব্বে ছবির মধ্যে একটা ওজনের ছাপ এবং ডৌল বা গড়নের দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এই সময় মূল কাঠামোর বিস্তারে তা কিছু পরিমাণে হ্রাস পেতে থাকে। এই পর্ব্বের ছবি অধিকাংশই একটু ফ্ল্যাট ধরনের ও চ্যাপ্টা গড়নের। বর্ণের প্রখরতা অধিক। পরতে পরতে, জাল বুনে বুনে যে বর্ণ প্রয়োগের ধারা এতদিন চলেছিল, তা যেন এই সময়ে খানিকটা পরিবর্ত্তনের মুখে এগিয়ে যায়। গাঢ় রঙ্-এর দিকে ঝোঁক দেখা যায়। ১৯২০-২৫ সাল মধ্যে তিনি অনেক বিখ্যাত চিত্রের রূপদান করেন। তন্মধ্যে মুঘল বিষয়ক চিত্রেরও একটি মুখ্য স্থান রয়েছে।[১]

এতদ্ব্যতীত আরও শ্রেষ্ঠ চিত্র হোল—গিরিজা, বসন্তসেনা, যাভার নর্ত্তকী, ভাঙ্গাবাঁশী, ত্রয়ী, কারাগারে গান্ধীজী, মাটির মেয়ে, শিকারী, হুয়েন সঙ্, মালিনী, উমা প্রভৃতি।

উক্ত চিত্রাবলীর প্রতিটি নিদর্শনই রূপাঙ্কন, চরিত্র-চিত্রণ, ভাবাভিব্যক্তি ও কারুকৌশলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। প্রতিটি চিত্রের টেক্‌নিক ও আবহমণ্ডল সম্পূর্ণ ভিন্ন আমেজের। এইখানেই অবনীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্টতা প্রতিভাত। বসন্তসেনা ও যাভার নর্ত্তকী দু-এরই নৃত্য-ভঙ্গিমা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এতটুকু সাদৃশ্য বা স্বারূপ্যের ইঙ্গিত নেই। একটি প্রাচীন ভারতীয়, দ্বিতীয়টি যবদ্বীপের। যাভার নর্ত্তকী গতিচঞ্চলা, বসন্তসেনা স্থির শান্ত ভাবের। প্রথমটির রূপ-ছন্দ লীলায়িত, সচকিত ও আত্মসচেতনতা মণ্ডিত। আর বসন্তসেনা আত্মস্থ। তার মধ্যে লাস্যভাব নেই। বর্ণ-বিন্যাসও পুরো ভিন্ন প্রকৃতির। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার International Studio, May 1924 সংখ্যায় ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয় একটি প্রবন্ধে (Modern Indian Painting) যাভার নর্ত্তকী সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"In the Javanese Dancer we have a somewhat different presentation. The thick deep shadows of the background throw the figure into bold relief, almost in the manner of European painting. Yet on the whole treatment is flat and frankly decorative and the attitudinised gesture catches the very flavonr of the east. The artist has never been in Java, nor seen a Javanese dancer. His picture is a wholly imaginary conception."

১. এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আলোচিত ছবি দুটির পাশে 'মাটির মেয়ে' (Daughter of the soil) চিত্রখানি সম্পূর্ণ ভিন্ন রস ও পৃথক স্বাদের। একটি সাঁওতাল মেয়ের রূপচিত্র। কর্ম্মক্লান্তিতে উপলস্তূপে পা-ছড়িয়ে, দুটি হাতে দেহভার ন্যস্ত করে বসে আছে ধরিত্রী দুহিতা। লাল পাড়ের সাদা শাড়ী পরনে, বিরলভূষণ, গায়ের রঙ ঘন কালো। কিন্তু তার রূপ-মাধুর্য্য অবর্ণনীয়। নারীর দেহ-রূপ রচনার এটি সার্থক নিদর্শন। বাস্তব দেহাকৃতির সঙ্গে শিল্পীর বর্ণলেপ পদ্ধতি ও নারীদেহের সুষমা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অনবদ্য কৌশল মিলিত হয়ে এটি উচ্চাঙ্গের একটি কবিত্বময় কলা-কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

শিকারী ছবিটি (১৯২২) আবার নতুন চিন্তাধারা ও মন-মেজাজের সৃষ্টি। এটি বস্তুতঃই একটি বলিষ্ঠ চিত্ররূপ। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি সাধারণ অভিযোগ আছে যে, তিনি ও তাঁর অনুগামীরা মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পৌরাণিক ও রোমান্টিক বিষয় নিয়েই চিত্রাঙ্কন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ সমসাময়িক জীবনের প্রতি কোনও আকর্ষণ তাঁরা প্রকাশ করেন নি। শিকারীর চিত্র ও অনুরূপ আরও অন্যান্য চিত্র পর্য্যালোচনা করলে একথা অনস্বীকার্য্য যে, তিনি বর্ত্তমানের চলমান জীবন ও সমাজ থেকে বিছিন্ন ছিলেন না। শিকারীর বলিষ্ঠ দেহের গড়ন ও চলার ভঙ্গী শিল্পীর বাস্তব জীবন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানবদেহ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতার ইঙ্গিতবহ।

বাস্তবানুগ শিকারীর এবং আরও নানা রসের নানা রূপের চিত্রের পাশে তিনি অভূতপূর্ব্ব ও অনবদ্য এক গভীর কল্পনার প্রকাশ করেছিলেন তাঁর উমা (শিব সীমন্তিনী) চিত্রে।

উমা এঁকেছিলেন তিনি দু'খানি। প্রথম যেখানি রচনা করেন সেটি অতি ক্ষুদ্রাকার। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ। নাম দিয়েছিলেন— 'Daughter of the Himalayas'. সবুজ ও বাদামী রঙ্-এর মিশ্রণে রচিত এলায়িতকেশা উমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

ঐ বছরেই দ্বিতীয় উমার রূপদান করলেন আর একটু বড় আকারে। এই দুই উমা সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, তিনি এই দু'খানি ছবি উপহার দিয়েছিলেন দুই শিষ্য ও প্রশিষ্যকে। প্রথমটি দিলেন, শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মাকে। আর দ্বিতীয়খানি দিলেন, প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসুকে।

অবনীন্দ্র-তুলিকায় সৃষ্ট ভাবমহিমান্বিত চিত্রমণ্ডলে শেষোক্ত শিব সীমন্তিনী

উমার চিত্রখানি শীর্ষস্থানীয়। এর জুড়ি নেই। তুলনা নেই এর কল্পনা বৈভবের। পৌরাণিক শৈবধর্ম্ম এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শৈব ভাস্কর্য্যের সমস্ত রস নির্য্যাসের ঘনীভূত এবং একালের উপযোগী একটি নতুন অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অনবদ্য রূপ।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন নতুন সৃষ্টিশক্তিতে যে কত শক্তিমান ছিলেন তার জীবন্ত নিদর্শন এই চিত্রখানি। কোনও পূর্ব্বসূরীর প্রভাব নেই; কোনও প্রাচীন কল্পনা-ভাবনার স্পর্শ নেই এর মধ্যে। এই উমার রূপকল্পনার মূলে তাঁর কি চিন্তা ও আদর্শ ছিল তা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে ছবিখানিতে যে রূপ ও ভাবটি বাস্তবায়িত হয়েছে, তাতে মনে হয় যে, উমা শিবের জন্য তপস্যা করে করে নিজেই শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। এই চিত্রখানি শিব ও পার্ব্বতীর সম্মিলিত একটি অভিনব রূপ। শিব ও রুদ্র, শান্ত ও ভয়ঙ্করের হয়েছে সুখ-সম্মেলন। শিবের যা কিছু দেহ-বৈশিষ্ট্য ও ভাব প্রতীক তা এখানে পার্ব্বতীর দেহলগ্ন। যেমন, শিরোপরি চন্দ্রকলা এনে দিয়েছে অনন্ত যৌবন প্রবাহ। মাথার জটাজাল ও হাতে রুদ্রাক্ষমালা ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রকাশক। তিনি দেবাদিদেবের শ্রেষ্ঠ ভূষণ ও অসীম শক্তিদ্যোতক সাপটিকে কণ্ঠলগ্ন করে, তাকে আদরে-সোহাগে অভিষিক্ত করে চলেছেন। পার্ব্বতী এখানে তপোক্লিষ্টা। তিনি গৈরিক বসন পরিহিতা। চোখে-মুখে ধ্যানমগ্নতা ও কৃচ্ছ্রতা-ক্লিষ্টতার ছাপ। মুখমণ্ডলে যে গভীর ভাবটি পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তা শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের চূড়ান্ত রূপাভিব্যক্তি। রাষ্ট্রকূট যুগের পরে আর কোন শৈবমূর্ত্তিতে এ জাতীয় রূপ ও ভাব ব্যক্ত হয়নি। পাহাড়ী-শৈলীর চিত্রেও অসংখ্য শৈবমূর্ত্তি ও শিব-পার্ব্বতীর আখ্যান-কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। আর তাও অতীব চিত্তহারী রূপের। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের এ কল্পনা ও কলাকৌশল পূর্ব্বগামীদের সমুদয় চিন্তা-চেষ্টাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে নতুনতর এক রূপলোকের দিকে। এই শিল্পভাবনা, এই নন্দনানুভূতি, এই পৌরাণিক প্রকৃতির আধুনিক ব্যাখ্যান কেবলমাত্র বিরলবস্তু নয়, তা অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয় এবং সার্ব্বিকরূপে একটি নতুন সৃষ্টি। ইহা পার্ব্বতীর অক্ষয় আলেখ্য।

চিত্রখানি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখনীয় বিষয় ইহার স্নিগ্ধ কোমল বর্ণিকাভঙ্গ। হলদে ও বাদামী রঙ্-এর প্রাধান্য; ফাঁকে ফাঁকে নীলাভাস। তদুপরি ললাটের শ্বেতশুভ্র চন্দ্রকলা মূর্ত্তির দেহরূপ ও মানস প্রক্রিয়াতে যেন একটি যাদুস্পর্শ এনে দিয়েছে। চিত্রপটে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে

শতগুণে। শিল্পাচার্য্য চিত্রখানি রচনার কিছু পূর্ব্ব থেকেই নীলমোহরের ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন বিভিন্ন চিত্রপটে। এখানে দিয়েছেন গণেশের নীল। তার ফলে চিত্রপটে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে নিশ্চিতরূপে।

ছবিখানি বিদেশেও প্রদর্শিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের ওয়েম্বলীতে ভারত-কলার প্রদর্শনীতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে এটিও গিয়েছিল এবং সমালোচকদের দৃষ্টিপথে পড়ারও সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রদর্শনীর একটি সমালোচনা লিখেছিলেন স্বয়ং ই. বি. হ্যাভেল। সেটি কলকাতার 'রূপম্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের জানুয়ারী সংখ্যাতে। তাতে এই ছবিটি সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য ছিল—

"Dr. Abanindra Nath Tagore fully sustains his reputation both as an artist and a teacher of rare genius. His 'Parvati, the Bride of Shiva' is a perfectly delightful conception of divinity as personified in the beautiful Himalayan myth. It is thoroughly adequate in its sensitive technique; the mystery and poetry of the subject are admirably realised in the evasive beauty, aloofness and dignity of the artist's ideal."

উক্ত প্রদর্শনীতে ছবিখানি দেখে আর একজন সমালোচক যে মন্তব্য করেছিলেন, তাও শিল্পীর ভাবনা-কল্পনা ও উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করেছে স্পষ্টভাবে। সমালোচক বাসুদেব বি. মেটা 'রূপম্' পত্রিকাতেই (জানু: ১৯২৫) লিখেছিলেন—

"A. N. Tagore's The Bride of Shiva has two aspects—gentle and terrible. But here the gentle aspect, almond shaped eyes and spirituality of expression on her face may be reminicent—but not the copy of Ajanta. Like her spouse Parvati has crescent moon, the symbol of eternal youth on her hair, and the snake the symbol of eternity near the neck".

'হিউয়েন সঙ্' ছবিটিতে চৈনিক পরিব্রাজক মুখ্য বিষয় হলেও, প্রাকৃতিক দৃশ্যপটও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হিউয়েন সঙ্ চলেছেন যাত্রাপথে। পাহাড়ের উপর একটি গাছের একাংশ নিম্নমুখী,

অপরাংশ মাথা তুলে দাঁড়ান আকাশ-মুখে। এর ফলে পটেতে ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে অদ্ভুত ভাবে। নতুবা গুরুভার পর্ব্বতের পাদদেশে ক্ষীণদেহ মুণ্ডিত মস্তক পরিব্রাজককে আরও নিঃসঙ্গ মনে হোত। ছবিটি শ্রেষ্ঠ গুণান্বিত হয়েছে দৃশ্যপটের গাম্ভীর্য্যময় আবহমণ্ডলের জন্য।

অবনীন্দ্র-তুলিকায় প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এই প্রকার আরও কিছু চিত্র অত্যন্ত সার্থক ও সুন্দর হয়েছিল। সেই সকল চিত্রে যে মানুষের সমাবেশ হয়েছে তারা যেন প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই এক-একটি বিশেষ ও মুখ্য অংশ। অথচ মানুষই গোড়াতে ছিল চিত্রের মূল বিষয়। অবশেষে মোহিনী প্রকৃতি রানীর রূপবৈচিত্র্য এমন জোরালো, জীবন্ত ও অনন্তবৈভব মণ্ডিত হয়ে উঠেছে যে চিত্রের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড সমভাবে তো বটেই, কোন কোনও সময় তা অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে। কখনও মনে হয় চির নিদ্রাবৃত বনভূমি যেন মানুষের স্পর্শ পেয়ে তার দুরধিগম্যতা মুক্ত হয়েছে। এই পর্য্যায়ের চিত্রকল্পনার পর্য্যায়ভুক্ত হোল—হীরামন তোতা, জনৈক তিব্বতী তীর্থযাত্রী, বনভূমিতে ভুটিয়া মেয়ে প্রভৃতি।

প্রথমোক্ত ছবিটিতে সবুজ গহন বনে ও মাঝারি বৃক্ষান্তরালে অশ্বপৃষ্ঠে রাজকুমার। পাশে গাছের ডালে পাখী। সমগ্র পটে সবুজের খেলা ও মেলা।

ভুটিয়া মেয়েটি অনুচ্চ একটি শৈল-দেহে ভর করে সামনের গাছটি ধরে দাঁড়ান। কালো লম্বা হাতের জামা, মাথায় তার লাল উড়নি। তার উপরে ফিতের সঙ্গে বাঁধা ঝুড়ি আছে পিঠের উপর। বাদামী কাপড়, গায়ের উড়নি সাদা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সবুজাভ পত্রালি। বর্ণিকাভঙ্গ যেমন জোরালো, তেমনি বিপরীতধর্মী নানা বর্ণের মধ্যে অপূর্ব্ব সুরের একতান। বিষয়টি অতি সাধারণ। কিন্তু অনবদ্য বর্ণসুষমায় ও তার গভীরত্বে এটি উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতিতে পরিণত হয়েছে।

আলোচিত চিত্রসমূহ রচনার কিছুকাল পরে (১৯২৬-২৭) তিনি এক সিরিজ প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করেন। তার অধিকাংশই বাংলাদেশের দৃশ্য। তখন আরও এঁকেছিলেন বিচিত্র সব পশুপাখীর ছবি। 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যের দৃশ্যগুলি মনে ধরিয়ে নিয়ে পরে তা প্যাস্টেলে রূপায়ণও তখনকার রচনা। প্যাস্টেল মাধ্যমটিকে তিনি কবে কোন তরুণ বয়সে ধরেছিলেন, কিন্তু তাকে তিনি ত্যাগ করেন নি কখনও। মানুষের মূর্ত্তি ও আলেখ্য ব্যতীত মাঝে মাঝে অন্যান্য বিষয় অঙ্কনেও তার ব্যবহার হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। ১৯২৭-৩০ সাল পর্য্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন মানুষের

প্রতিকৃতি রচনাতে। অতএব তখন প্যাস্টেলের ব্যবহার যেন আরও নবতর ভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্মে আধিপত্য লাভ করেছিল। তপতী নাটকের মুখোশগুলিও সেই সময়কার রচনা।[১]

চিত্রাঙ্কন করে শিল্পী স্বনাম পটের গায়ে মুদ্রিত করবেন এই প্রথা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল না। মধ্যযুগে মুঘল চিত্রকলায় এর কিছু প্রচলন হয়েছিল। রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রেও খুব সামান্য সংখ্যক চিত্রে শিল্পীর আত্মপরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথও গোড়ার দিকে অধিকাংশ চিত্রেই নামাঙ্কিত করেন নি। মাঝে মাঝে দু'একখানি ছবিতে নাম সহি করেছিলেন মনে হয়। তিনি সম্ভবতঃ ১৯০৫-৬ সালের পরবর্ত্তী রচনাতে নামাঙ্কনের কথা চিন্তা করেন। সেই নাম চিহ্নিত করার পদ্ধতিও কোন নির্দ্দিষ্ট পথে চলেনি অনেক দিন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন A. N. Tagore; আর বাংলা ও হিন্দী হরফে শ্রীঅবনীন্দ্র। তারপর শ্রীহীন অবনীন্দ্র লিখেছেন অবিরত। আর তা পারসীক ও দেবনাগরী অক্ষরের ধাঁচে। ১৯১৩ সাল থেকে জাপানের কলাবেত্তা মনীষী ওকাকুরা প্রদত্ত একটি চৈনিক সীলমোহরের ছাপ ও নাম সহি এক সঙ্গে চলতো। ১৯১৬ থেকে অঙ্কিত ছবিতে সীল ও নাম সহি সমান গুরুত্ব লাভ করেছিল। আর তা ছবির বিশেষ একটি অঙ্গ হিসেবেই পরিণত হয়েছিল। অনেক চিত্রে দেখা যায় শূন্য অংশে সীলমোহরটি পড়াতে চিত্রপটে চমৎকার ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। অবশেষে এল গণপতির মূর্ত্তিযুক্ত তাঁর একান্ত নিজস্ব সীল। ১৯১৮-১৯ সালের পরবর্ত্তী চিত্রসমূহে এই সীলমোহরটি একটা নতুন আমেজ এনে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে শিল্পাচার্য্যের জীবনে আর একটি যুগান্তরের পদধ্বনি শোনা গেল। সময় মত সে ধ্বনি তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। জীবনে যে বৃহত্তর পালা পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছিল, তাকে তিনি এক কথায় বিনা দ্বিধায় সাদরে গ্রহণ করতে পারেন নি। ঘটনাটি ১৯২১ সালের। খয়রা রাজ পরিবারের কুমার গুরু-প্রসাদ সিংহের প্রদত্ত অর্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে সৃষ্টি হোল 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে যথার্থ মণিরত্ন খুঁজে বের করার চোখ ছিল তাঁর

১. এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত একজন শ্রেষ্ঠ জহুরীর মত। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা সম্পর্কিত বিশেষ অধ্যাপক পদে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে এনে অধিষ্ঠিত করবেন—এই ইচ্ছা ও চেষ্টা হয়েছিল তাঁর সর্ব্বাগ্রে।

সেদিনের প্রখ্যাত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিদ দীনেশচন্দ্র সেনের মাধ্যমে তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে সেই প্রস্তাব পেশ করেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে বহির্জগত থেকে একটু দূরে রাখতেই চেষ্টা করতেন সর্ব্বদা। প্রথমে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে প্রস্তাবটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্যার আশুতোষ ছিলেন তাঁর সৎসঙ্কল্পে অটল। অতঃপর তিনি নিজেই চলে গেলেন শিল্পাচার্য্যের সন্নিধানে। তখন আর অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই সাদর ও সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। স্থির হোল বছরে কয়েকটি মাত্র বক্তৃতা দেবেন তিনি চারুকলার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। বক্তৃতা দিয়েছিলেন সর্ব্বসাকুল্যে উনত্রিশটি। ১৯২১ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান করে সম্মানিত করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ডি-লিট ডিগ্রী লাভ করে তাঁর সহজাত পরিহাস মধুরতায় সিক্ত করে ঐ সম্মানকে আরও আনন্দের উৎস করে তুলেছিলেন। কিন্তু সেই পরিহাসপ্রসূত কথার মধ্যে কোথায় যেন আবার একটু হতাশা ও বেদনার স্পর্শ অনুভূত হয়। ডিগ্রী লাভের পরে তাঁর শিষ্য প্রবোধেন্দু ঠাকুর একদিন গিয়েছিলেন গুরু দর্শনে। শিল্পাচার্য্য তখন তাজ-বিবির চিত্রায়ণে রত। শিষ্য প্রণাম করতেই গুরু সহাস্যে বলে উঠলেন—

"সাজাহান-এর ছবি এঁকে তিন-তিনটে মেডেল পেয়েছিলুম রে। এবার ছবি না এঁকেই, হয়ে গেলুম ডাক্তার। ওষুধ-বিষুধের ডাক্তার নয়, জলের ডাক্তার, রং-এর ডাক্তার। লেকচার না মারলে বুঝেছিস্—আজকাল ছবির আর্টিস্ট হয় না। ছবির আমার ওরা বুঝলই না কিছু, কর্ত্তব্যটাই বুঝল না। পিদ্দিমের এক ফুঁয়ে হয়ে উঠেছি এক নীলমাধব—কেরাবাত ডাক্তার।..... তখন ছবি এঁকে মেডেল পেয়েছিলুম। এবার কথা বেচে পদক পেলুম। মনে হয়, কোথায় যেন ছবিতে আমার গলদ হয়েছে।"[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ পুস্তকে গ্রথিত হয়ে 'বাগেশ্বরী

১. অবনীন্দ্র চরিতম্ঃ প্রবোধেন্দু ঠাকুর।

শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে অপূর্ব্ব এক সাহিত্যকৃতিতে হয়েছে পরিণত। এই বক্তৃতাদানের বহু পূর্ব্ব থেকেই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকলা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছিলেন নানা পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী শৈল্পিক সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছিল। বাংলা ভাষায় তো ইতিপূর্ব্বে এ জাতীয় শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যানের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না ঠিকই, পরন্তু সমগ্রভাবে দেশী ও বিদেশী কোনও কলা-সাহিত্যেই এর তুলনা বিরল। এ-এক অনবদ্য সৃষ্টি! ইহা হোল অতুলনীয় প্রতিভাবান যুগন্ধর শিল্পীর গভীর জীবনানুভূতিজাত রসের ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ আনন্দামৃতের পরিবেশন। চারুকলার অতি নিগূঢ় তত্ত্বের এই চমকপ্রদ সমাধান ও ব্যাখ্যান কেবলমাত্র জ্ঞানগর্ভ বস্তুনির্ভর বিশ্লেষণ মাত্র নয়। এর মধ্যে পাওয়া যায় সত্যশুদ্ধ এক শিল্পী-মনের স্নিগ্ধ মধুর মহান্ আদর্শের ছবি, মানবীয় রাগ-অনুরাগের অভিব্যক্তি, ব্যথা-করুণ অনুভূতির পাশে নন্দনোল্লাসের প্রস্রবণ, হৃদয়সংবেদ্য সম্পদের সঙ্গে বৈদগ্ধ্য-বৈভবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এ হোল নীরব তুলিকায় মুখর শিল্পীর বাক্‌পটুত্বের অক্ষয় আলেখ্য।

বাগেশ্বরী বক্তৃতা দানের সঙ্গে সঙ্গে, কথার কাব্য রচনার তালে তালে চিত্রপটে ছন্দলীলান্বিত রূপরাজ্য সৃষ্টির কাজও চলতো পুরো দমে। ১৯২৯ সালে বক্তৃতার পালায় ছেদ পড়লো। এল ১৯৩০ সাল। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টির ইতিহাসে এই বছরটি নবতর একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সময়টিকে তাঁর শিল্পী-জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি, এমন কি শেষ পর্ব্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। শিল্পী-জীবনের প্রারম্ভে যে আলঙ্কারিক প্রথার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, যাদ্বারা তিনি কিছু পরিমাণে তখন প্রভাবিত হয়েছিলেন (অবশ্য পরে আর তার কোন চিহ্ন তাঁর রচনার মধ্যে দেখা যায়নি), ১৯৩০ সালে তার যেন আবার একটুখানি আভাস ইঙ্গিত অনুভূত হোল তাঁর নতুন পর্য্যায়ের চিত্রগুলির মধ্যে।

এই সময় তিনি একটি বিষয় অবলম্বন করেই বহু সংখ্যক ছবি করেছিলেন। বিষয়টি ছিল আরব্য উপন্যাসের কাহিনীসমূহ। একটির পর একটি ছবি আঁকলেন আরব্য রজনীর গল্প নিয়ে। তাতে বিরাম, বিশ্রাম ছিল না। এই গল্পগুলির দিকে ছিল তাঁর সহজাত গভীর আকর্ষণ।

এই ধরনের গল্প-কাহিনীর দিকে ঝোঁক বশতঃ তিনি পুরোনো বই কেনায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন। নিজে বই-এর দোকানে গিয়ে বই খুঁজে বেড়াতেন।

একবার গিয়েছেন মেছুয়াবাজারে ইসলামী পুঁথির দোকানে পুরোনো বই সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ছিলেন কবি জসীমউদ্দীন। পুঁথিওয়ালা তো অবনীন্দ্রনাথকে দেখে অবাক! অবাক হওয়া স্বাভাবিক। যেমন ছিল তাঁর চেহারা ও আকৃতি, তেমনি তাঁর ভাবভঙ্গী ও চলন-বলন। দীর্ঘ দেহ, সুবিস্তীর্ণ ললাট, মাথার সামনের দিকে স্বল্প কেশ। দু'পাশে ও পেছনের কেশদাম সামান্য ঢেউ খেলানো। হাবভাব ও চোখের দৃষ্টি সবই ছিল স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ধরনের—কৌতুক রসে ভরপুর। অভিব্যক্তি অভিনব। আত্মভোলা ভাবে পরিপূর্ণ। সকলের থেকে যেন দূরের মানুষ, আলাদা কোনও এক জগতের বাসিন্দা।

তাই দোকানী জসীমউদ্দীনের কানেঁ কানে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ছদ্মবেশী বাদশাজাদা?"

তিনি যথার্থ উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, "বাদশাজাদা নন। ইনি রঙের রেখায় আর কথার আতসবাজ, পাশ্চাত্ত্য ও দেশীয় চিত্রকলার শাহানশাহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[১]

আরব্য রজনীর সব গল্পের ছবি করবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। বলতেন, "সমস্ত আরব্য রজনীর গল্প ছবিতে ছবিতে ভেরে দেব।"[২]

কিন্তু বার্দ্ধক্য এসে গেল। সমুদয় গল্পের ছবি আঁকতে চান শুনে জসীমউদ্দীন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "দাদামশাই, এক একটা ছবি আঁকতে এতদিন সময় নিচ্ছেন, এত বড় বিরাট আরব্য রজনীর বই-এর ছবিগুলি কি আপনি শেষ করে যেতে পারবেন?"[৩]

শিল্পাচার্য্য সহাস্যে উত্তর দিলেন, "শিল্পীর কাছে শিল্প সীমাবদ্ধ, কিন্তু শিল্পীর জীবন eternal, অনন্ত। এর কোন শেষ নেই, কতদিন বেঁচে থাকবো সে প্রশ্ন আমার নয়, আমায় কাজ করে যেতে হবে।"[৪]

এক একটি ছবি এঁকে তুলতে তাঁর সময় লাগতো পাঁচ ছয় দিন। আর উজিরকন্যা শাহাজাদী বাদশাকে গল্প বলছেন যে ছবিটিতে, সেটি শেষ করতে সময় লেগেছিল কুড়ি দিনেরও বেশী। আরব্য রজনীর ছবি করেছিলেন তিনি পঁয়তাল্লিশখানি। তবে কলা-নৈপুণ্যে ও স্বকীয়তায় তা এক হাজারেরই তুল্য হয়েছিল বলা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের আরব্য রজনীর চিত্রাঙ্কন কর্ম্মের শুভারম্ভের সঙ্গে

১. ২.৩. ৪. ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়: জসীমউদ্দীন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্মরণীয় ঘটনা জড়িত হয়ে আছে। মহাত্মা গান্ধী যেদিন ডাণ্ডী যাত্রা করেন লবণ আইন অমান্য করার জন্য, সেই দিনই তিনি এই সিরিজের ছবি আঁকা আরম্ভ করেছিলেন।

একটির পর একটি গল্পের ছবি আঁকতেন, আর সকলকে ডেকে ডেকে দেখাতেন কোথায় দোষ হয়েছে তা জানার জন্য। এই ব্যাপারে অনেক মজাদার ঘটনাও হোত। একদিন তিনি আঁকছিলেন কাসেমের খণ্ডিত মৃতদেহ আলিবাবা বোগদাদে নিয়ে দর্জিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নিচ্ছেন—এই ঘটনাটি। দু'দিন ধরে ছবিতে রঙ্-এর পর রঙ্ চাপালেন। ছবি প্রায় শেষ হতে চলেছে। সকলকে দেখিয়ে জানতে চাইলেন, কেমন হয়েছে। সকলেই বললেন, ভাল হয়েছে। এমন সময় তাঁর খাস চাকর রাধু (রাধাকান্ত বিশ্বাস) এসে হাজির। হাতে তার শরবতের গ্লাস। অবনীন্দ্রনাথ তখুনি তাকে প্রশ্ন করলেন, "দেখ্‌তো, ছবিটার কোথায় দোষ হয়েছে। ক'দিন ধরে আঁকছি, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না ঠিক।"

ভৃত্য দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিল যে, নীচের দিকে লোক তিনটি যেন কেমন লাগছে। শিল্পগুরু উল্লসিত হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছিস।" পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বললেন—

"দেখলে রাধুর চোখ আছে। ঐ তিনটে লাইনই গোল বাঁধিয়েছে।" অর্থাৎ বৃদ্ধ দরজী মৃতদেহ সেলাই করছে; নীচে তিনটি দস্যু। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল যে কে চুরি করলে মৃতদেহ। তাকে খুন করতে হবে। এদিকে ছবি তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে। সেই মূর্ত্তিগুলি ঘসেমেজে অদৃশ্য করে দিলেন। আর নিজের মনকে ভরে তুললেন খুশীতে। মুখে বললেন, "ছবির দোষ ক্ষয় করে দিলুম।"

একদিন একখানি ছবি সম্বন্ধেই যে তিনি ভৃত্য রাধুর মত ও মন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা নয়। অনেক সময়ই তিনি ছবি এঁকে রাধুকে কাছে পেলে তার মতামত শুনতেন। রাধুও একদিন তাঁর চিত্রপটে (প্রতিকৃতি) স্থান পেয়েছিল নানা ভাবে ও রূপে।[১]

আরও একটি ঘটনার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভৃত্য রাধুকে কত স্নেহ করতেন, তিনি কত দরদী মানুষ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাধু তাঁর কাজকর্ম করছে, এদিক-ওদিক চলছে ফিরছে। একদিন

১. এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহধর্ম্মিণী বসে আছেন। রাধু তখন তার মনিবের জন্য জল আর পান নিয়ে এল। শিল্পাচার্য্যের মনে হোল রাধুর মুখটা যেন সেদিন শুকনো, আর সে খুব চিন্তিত। তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে, মুখ শুকনো কেন? রাধু উত্তর দেবার আগেই শিল্পীর সহধর্ম্মিণী বলে উঠলেন, জানো না বুঝি, ওর যে বিয়ে ঠিক হয়েছে। মাস-খানেকের মধ্যেই বিয়ে। কিন্তু ওর ভাবনা, বিয়ের খরচপত্র কি করে যোগাড় হবে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "কিছু ভাবনা নেই। বিয়ের ব্যবস্থা করতে লিখে দে। ঠিক সময় টাকা পেয়ে যাবি।"

টাকা দেবেন বললেন বটে, কিন্তু তখন তো আর সেদিন নেই। আগে এই সব ব্যাপারে কত লোককে হাজার টাকাও দিয়েছেন তিনি। তা'হলেও দিতে তো হবে কিছু। তিনি কাউকে কিছু না বলে রাধুর একখানি ছবি আঁকতে বসে গেলেন। ছবিটিতে দেখা গেল বর্ষাকালের এক দুপুরে পুকুর ধারে গাছতলায় বসে রাধু ছিপ হাতে মাছ ধরছে। মাথায় তার লাল গামছা বাঁধা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। চমৎকার দৃশ্য! ছবি আঁকা হয়ে যেতে তিনি বললেন, "দেখা যাক্ রাধুর কপালের জোর কত!"

সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনী শুরু হোল। তিনি ছবিটির গায়ে পাঁচশ' টাকা দামের টিকিট বসিয়ে ওটিকে প্রদর্শনীতে টাঙিয়ে দিলেন। একদিন জনৈক বিদেশী ভদ্রলোক এলেন এক্জিবিশনে ছবি দেখতে। ঘুরে ঘুরে ছবি সব দেখে তিনি রাধুর ছবিটিকেই পছন্দ করলেন। পাঁচশ' টাকা দাম দিয়েই তিনি ছবিটি কিনে নিলেন। সাহেব এসেছিলেন বেলজিয়ম থেকে। তিনি একজন খ্যাতনামা সুরকার। ছবিটি তিনি কিনেছিলেন স্বদেশের আর্ট গ্যালারীতে উপহার দেবার জন্য। অবনীন্দ্রনাথ টাকাটা এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন—রাধুর বরাতের জোরেই ছবি বিক্রী হয়েছে। টাকাটা ওকে দাও। তাড়াতাড়ি দেশে গিয়ে বিয়ে করে আসুক। এমনি ছিল তাঁর স্নেহপরায়ণ দরদী মন ও দরাজ হৃদয়।

ছবিটি এঁকে বলেছিলেন, রাধুর সিটিং দিতে খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাঁর আঁকতে তেমন কষ্ট হয়নি। ছবিটি কিন্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন পুকুর ছিল না, রাধুও সিটিং দেয়নি। জীবন থেকে স্টাডি করে প্রথম জীবনে কিছু এঁকেছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এ জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ স্টাডি করে কখনও আঁকেন নি।

আরব্য রজনীর চিত্রের মুখ্য বিশিষ্টতা এর বর্ণকাভঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য বর্ণ-মিশ্রণ পদ্ধতি এখানে চূড়ান্তরূপে অভিনব এক রঙ-রূপের রাজ্য গড়ে তুলেছে। জলে ধুয়ে ধুয়ে এতদিন যে ছবিতে গহন গভীর ভাব, স্বপ্নালু মোহময় আবেশ পরিবেশ এনেছিলেন, তা এই চিত্রগুচ্ছে আবার নতুনতর ভাবে হয়েছিল প্রতিভাত। এখানেও জলে ধোয়া পদ্ধতিতে কাজ করেছেন, কিন্তু বর্ণাভা স্বপ্নালু বা কুহেলিকাচ্ছন্ন নয়। এখানে রঙ্ ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়েছে এবং সুস্পষ্ট রূপে দীপ্যমান। ফ্ল্যাট ধরনের চিত্র, রঙ্-রেখা দুই-ই সমুজ্জ্বল রূপের। আভিজাত্যময় পরিবেশ। তবে তা শিল্পীর অভিজ্ঞতাজাত। আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত বাগদাদ সংস্কৃতির সঙ্গে যেন শিল্পীর আশেপাশে দেখা অর্থাৎ কলকাতা শহরের জীবনকে তিনি মিলিয়ে-মিশিয়ে চিত্রে স্থান দিতে প্রয়াস করেছেন। বাস্তব ও কল্পনা দুই-এর মিশ্রণে অঙ্কিত চিত্র।

আরব্য রজনীর চিত্রে স্থাপত্যাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়। বিভিন্ন চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্থাপত্যরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। স্থাপত্যাংশে ও সাধারণভাবে আলোকপাতের নৈপুণ্যও উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। সমগ্র পটেই স্ট্রাক্চারের দিকে লক্ষ্য বেশী অনুভূত হয়। অধিকাংশ চিত্রেই উজ্জ্বল ঘন রঙ্-এর প্রয়োগ, কিন্তু রঙ্-এর অন্তর্বর্ত্তী সুরেলা ভাবটি প্রস্ফুট হয়েছে সর্ব্বত্র। কম্পোজিশন বা বস্তু সমাবেশ উচ্চাঙ্গের। মানুষ, পশুপ্রাণী ও বিশ্বপ্রকৃতি এক সঙ্গে, সমতালে ও ছন্দে হয়েছে গ্রথিত। তারা যেন অভিন্ন। কোন একটিকে বাদ দিলে আর একটি যেন নিরর্থক। মূর্ত্তি কল্পনায় শিল্পীর চারপাশের দেখাশোনা ও চেনা জানা মানুষের চেহারার আদল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এমন কি তাঁর আত্মমূর্ত্তিও যে স্থান পায়নি তা জোর করে বলা যায় না। মুসলমান সমাজের 'টাইপ' সৃষ্টির অতি চমৎকার কৌশল পরিদৃশ্যমান। এই চিত্রগুচ্ছ অবনীন্দ্র-প্রতিভার প্রদীপ্ত কিরণজালের শেষ রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত 'এক বিশেষ অবদান।

আরব্য রজনীর চিত্র সিরিজ অঙ্কন শেষ হলে, বেশ কিছুকাল অর্থাৎ প্রায় সাত আট বছর তাঁর তুলিকার গতি খুব শ্লথ হয়েছিল। স্তব্ধ হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছবির কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন লেখার কাজে মন দিয়েছিলেন। বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ছবি তিনি সেই সময় রচনা করেন নি। যাত্রার পালা লিখতেই তাঁর সৃজনী শক্তি

তখন নিয়োজিত হয়েছিল পুরোপুরি। গান লিখে, গান গেয়ে, গান করিয়ে তিনি আনন্দে বিভোর! যাত্রার পালার বিষয়বস্তুর মূল উৎস ছিল রামায়ণ ও পৌরাণিক কাহিনী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"থেমেই তো গিয়েছিল সব। দশ-এগারো বছর ছবি আঁকিনি আরব্য উপন্যাসের ছবির সেট আঁকা হলে ছেলেদের বললুম, 'এই ধরে দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সবকিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।' ব্যস্, তারপর থেকেই ছবি আঁকা বন্ধ। কি জানি, কেন মন বসত না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম; ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম, তাদের সাজাতুম, নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম, বেশ দিন যায়।"

কিন্তু সে-ভাবে বেশ দিন যেতে দিলেন না সেই চিরকালের উৎসাহ প্রেরণাদানকারী 'রবি-কা'। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সেকাল, একাল, তরুণ বয়স ও বার্দ্ধক্য দিনের, সর্ব্বদার উৎসাহদাতা ও কর্ম্ম-প্রেরণার উৎস। তিনি বললেন, "অবন, তোমার হল কি? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন?"

শিল্পী বললেন, "কি জানো রবি-কা, এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি। সেজন্যই চিত্রকর্ম্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্য মন ব্যস্ত।"

তিনি সেই নতুন খেলা কিন্তু ছবির পটেতেই খেলতে আরম্ভ করলেন। ১৯৩৮ সালে এসেছিল সেই নতুন খেলার দিনটি। তিনি বসলেন তুলি ও রঙ্ নিয়ে। তিনি যদিও বলেছেন—

"এবার আবার এতকাল বাদে ছবি আঁকতে বসলুম। এ যেন নতুন সঙ্গী জুটিয়ে আর একবার পিছিয়ে গিয়ে পুরোনো রাস্তা মাড়ানোর মজা পাওয়া।" কিন্তু সেই সময় তিনি যে ধরনের ছবি এঁকেছেন তাকে 'পুরোনো রাস্তা মাড়ানো' বলা যায় না।

এই নতুন ও শেষ পর্ব্বে তিনি পট ধরনের এক সিরিজ ছবি এঁকেছিলেন। বিষয় কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলের নানা আখ্যান ও কৃষ্ণমঙ্গল নামে আর এক সেট ছবি। শেষোক্ত ছবিগুলিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাসমূহ বর্ণনা করেছেন অতি অদ্ভুত ও অভিনব এক আঙ্গিক রীতিতে।

পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে যে, তিনি কৃষ্ণকাহিনীর ছবি করেছিলেন তিন পর্যায়ে। তিনটি ভিন্ন আঙ্গিক, ভিন্ন চিত্র-ভাবনা, নতুনতর পরীক্ষা-

সাধনার ও প্রকাশ ভাঙ্গিমার প্রতিফলন হয়েছে কৃষ্ণলীলা বর্ণনার ত্রিধারা স্রোতে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের প্রাতঃসন্ধ্যার অরুণাভায় যে তুলিকা ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হয়ে মধ্যাহ্ন লগ্নে মুঘলাই 'একবাল কলমে' সুপরিণতি লাভ করেছিল, 'বিজাদী' পন্থায় যা চরম সার্থক হয়ে উঠেছিল, যাকে এক কথায় বলা যায় অতীব সূক্ষ্ম সুকোমল 'সিয়াকলম', আর রঙ্ সে সময় শত ধৌত হয়ে পরতে পরতে পটের গায়ে আবিষ্ট ও আবদ্ধ হয়ে যে স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করেছিল—তা বার্দ্ধক্যের সীমানা-মুখে এগিয়ে গিয়ে মোটা তুলির টানে, ঘন রঙ্-এর পোছে আর এক নতুন, অদ্ভুত ও অভিনব রূপচ্ছটায় হয়েছিল উদ্দীপ্ত।

সূক্ষ্ম তুলি টেনে-টেনে, পটকে নিরন্তর ধুয়ে-ধুয়ে সুদীর্ঘকাল পথ চলার পরে আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর চিত্রায়ণকালে মনে হয় তিনি ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন। ফ্ল্যাট ধরনের ছবি এঁকে-এঁকে একটা একঘেয়েমির ছোঁয়া লেগেছিল তাঁর মনে। হয়ত আরও নবতর কোন আঙ্গিক-প্রকরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের তাগিদ এসেছিল তাঁর মধ্যে।

তাই তিনি বিগত দিনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলমবাজী ও রহস্যঘন রূপসৃষ্টির পথ ত্যাগ করে—স্পষ্টতা, বলিষ্ঠতা ও সহজবোধ্যতার পথে করলেন পদক্ষেপ। চণ্ডীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের ছবিতে পাওয়া যায় তাঁর সেই নতুন চিত্র-চিন্তার বিচিত্র বিকাশ। এই ছবিগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে লোকশিল্পের আমেজও অনুভূত হয়। খানিকটা শিশুসুলভও বলা চলে। তিনি এতকালের সাধনায় তুলি চালনা, বর্ণ-বিন্যাস প্রভৃতিতে যে চরম উন্নতি ও সুপরিণতির প্রতিফলন করেছিলেন, তাঁর চিত্র মধ্যে যে অতি মার্জিত ভাব ও পরিশীলিত রুচিবোধ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, তিনি যেন তার মধ্যে একটা বিজ্ঞানসম্মত সাংস্কৃতিক বন্ধন অনুভব করে, তা থেকে মুক্তি লাভের পথানুসন্ধানে হয়েছিলেন ব্যাপৃত। তাঁর জীবন-সায়াহ্নের অস্তরাগে রঞ্জিত এই চিত্রগুচ্ছ দেখে মনে হয় তিনি আর একবার শৈশব-কল্পনার বাঁধন-ছেঁড়া, রীতিনীতির জোয়ালহীন, স্বচ্ছন্দচারী এক শিল্পচেতনায় হয়েছিলেন উদ্বুদ্ধ। এ যেন লাগামহীন কল্পনার তুরঙ্গমে চেপে যদৃচ্ছা দৌড়ে চলা। বিধি-নিষেধের কোন বালাই নেই। রঙ্-রেখাকে অবাধে মুক্তিসায়রে অবগাহন করানোই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। বৃদ্ধ চক্ষু ও প্রবীণ মনের দরজা খুলে অতি পরিপক্ক তুলিকে তিনি আবার কৈশোর কল্পনায় জীবন্ত করে, বলিষ্ঠ করে তুলতে

প্রয়াসী হন। তারপর এই শেষ পর্য্যায়ের ছবিতে চললো তাঁর ভাবকল্পনায় ও রঙ্-তুলিতে শিশুবৃদ্ধের মিতালি ও কোলাকুলির পালা।

বয়সের ভারে তাঁর দেহমন যখন অবসন্ন, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ, নানা ঘাত-সংঘাতে প্রাণরস ক্ষীণ ধারায় নিঃশেষের পথে চলেছে এগিয়ে, তখনও কলালক্ষ্মী তাঁকে অবচ্যুত করেন নি, শিল্পী তখনও প্রতিনিয়ত তাঁর আহ্বানধ্বনি শুনেছেন, তাঁর সাদর প্রেরণাকে অনুভব করেছেন মুহুর্মুহুঃ। জলরঙ্ ও তুলিকাই তখন তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল না। প্যাস্টেল, চীনেকালি, কাঠকয়লা, অঙ্গার সকলেরই ছিল সমান স্থান, সমান কদর। রঙ্-এর মধ্যে কালো, নীল ও হলদে রঙ্-এর প্রাধান্য হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি ওয়াশের কাজে কালো রঙ্-এর ব্যবহার স্বল্পই করতেন।

চণ্ডীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গলের রূপচিত্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় আশী। কয়েক মাস মাত্র সময় মধ্যে তিনি এই বৃহৎ চিত্র ভাণ্ডারকে গড়ে তোলেন। কৃষ্ণমঙ্গল চিত্রের মুখ্য বিশিষ্টতা হোল, ফর্মের সারল্য, মানুষ, পশুপাখী সব কিছুর রূপাকৃতিতে একটা অভিনবত্ব প্রকট হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন কল্পনা। কোনও পূর্ব্বসূরীকে অনুসরণ করেন নি। গতিময়তা (dynamism) ও ছন্দশীলতা এ চিত্রের প্রাণ। অনেক পটে হাস্যকৌতুকের ছাপ আছে, কোথাও আছে ছেলেমো ভাব। মনে হয় যেন শিশুর চিত্রাঙ্কনে ফিরে যাওয়া। কিন্তু নিরীক্ষণ করে দেখলে অঙ্গ-বিন্যাসে যথেষ্ট শিক্ষিত্ব-পটুত্বের প্রকাশ হয়েছে। দেহরূপ গঠনে ভোল সৃষ্টিতে অনেক সময় দুটি ভিন্ন রঙ্-এ দুটি রেখা টেনে দিয়েছেন।

চণ্ডীমঙ্গল-এর চিত্রগুণ অনেকাংশে কৃষ্ণমঙ্গল-এর ধারায় হলেও, দুই সিরিজের মধ্যে আঙ্গিক-প্রকরণ ও চিন্তা-ভাবনায় অনেকক্ষেত্রে পার্থক্যও পরিদৃশ্যমান। দু'চারটি চিত্রে তিনি দেবী চণ্ডী ও অন্যান্য বিষয়ের রূপদানে পরিপাটিত্ব ও কোমলভাবের আমেজ এনে দিয়েছেন। তদ্ব্যতীত পশুপ্রাণীর রূপাঙ্কন প্রায় একই ধারায় চলেছিল দুই ভিন্ন আখ্যান চিত্রে। চণ্ডীমঙ্গলের চিত্রে সিংহরূপ কোনও পটে আলঙ্কারিক পদ্ধতির। দুই চিত্র সিরিজেই পশু-পাখী অদ্ভুত জীবন্ত রূপের ও শক্তিশালী। দ্রুতগামী কুকুর, শৃগাল প্রভৃতির রূপ, রেখার টানে পাহাড়ের কল্পনা, বলিষ্ঠ হাতী, আবার ছোট ইঁদুরটি সবই আকর্ষণীয় ভঙ্গীর ও অতি মাত্রায় জীবন্ত রূপের। চণ্ডীমঙ্গল চিত্র সিরিজের একটি চমৎকার অংশ জুড়ে আছে নানা ভিন্ন আকারের গণেশ মূর্ত্তি। এমন লাল রঙ্-এর ব্যবহার আধুনিক কালের চিত্রজগতে বিরল বস্তু।



শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কেশীদমন

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



হাঁটার প্রতিযোগিতায় মানুষ : কুটুম-কাটাম
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



এ. আর. পি. অফিসার : কুটুম-কাটাম
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চরিত্র চিত্রণেও এই চিত্রগুচ্ছ পিছিয়ে পড়েনি। রাজবেশে কালকেতুর ভাবাভিব্যক্তি ও চরিত্রানুগ রূপসৃষ্টি অতীব আকর্ষণীয়। মোটা তুলির টানে এই প্রকার রূপ অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব্ব। দেবী অভয়াকে পাওয়া যায় কত ভিন্ন রূপে ও ভাবে। ধর্ম্মকেতুর কুটীর দ্বারে দেবী অভয়াকে দেখা যায় বৃদ্ধার বেশে। সাধারণ বাঙ্গালী মহিলার রূপ ও বেশবাস। ভাবের প্রকাশ হাস্যরসাত্মক। মোটা তুলির টানে ও নানা রঙ্-এর পোছে অঙ্কিত। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও জীবন্ত রূপের চিত্র।

গোধিকা কাঁধে কালকেতু ব্যাধের চিত্ররূপ ভারতীয় শিল্পে নতুন অবদান। শিকারীর বেশে কালকেতুর চিত্রে সন্ধানী দৃষ্টি, গতিময়তা ও ব্যাধের রূপাঙ্কনে চরমোৎকর্ষের প্রমাণ রেখেছেন। চণ্ডীমঙ্গল চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ perspective-এর যে প্রতিফলন করেছেন তাও অতি উচ্চ পর্য্যায়ের। অনেক ক্ষেত্রে দু-চারটি তুলির টানে তা এমন সফল ও সুন্দর হয়েছে যা দীর্ঘদিনের সাধনারই ফলশ্রুতি।

এই দুটি বিষয়ের চিত্রায়ণে অবনীন্দ্রনাথ জলরঙ্ ও প্যাস্টেল—দুই মাধ্যমকেই যদৃচ্ছা ব্যবহার করেছেন। এই চিত্রাবলীর আরও বৈশিষ্ট্য হোল—প্রায় প্রতিটি চিত্রে রচনার কাল, সন, তারিখ উল্লিখিত আছে, আর আছে বিষয়বস্তু ও কাব্যকথার উদ্ধৃতি। এই দুটি কারণে ছবিগুলি আরও আকর্ষণীয় বস্তু হয়েছে।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, এই সিরিজ-চিত্র রচনা অন্তে অবনীন্দ্রনাথের কলা-শৈলীর ধারা-প্রবাহ ক্ষীণতোয়া হয়ে শেষ মোহনার দিকে এগিয়ে যায়। আর তখন থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও আসতে থাকে নানা দুঃখ দুর্দ্দৈবের পালা। ১৯৪০ সালে দেখা গেল তিনি ছেনি-বাটালির কারিগর। আগে থেকেই কাঠকুটো ও পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ দিয়ে নানারকম ছোটখাট জিনিস তৈরী করার অভ্যাস ছিল তাঁর। এবারে এল তাতে পূর্ণ আত্মনিয়োগের কাল। তিনি হলেন তখন 'কুটুম-কাটামে'র অভিনব রূপকার।[১]

১৯৪১ সালে প্রিয় রবি-কা'র মৃত্যুশোকে মুহ্যমান শিল্পী তাঁর শেষ যাত্রার চিত্ররূপ দান করে দক্ষিণের বারান্দার রঙ্-রেখার খেলাঘরকেও যেন ভেঙ্গে দিলেন। কেন না, ১৯৪১ সালেই অবনীন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষের আবাস, তাঁর জন্মস্থান, তাঁর শৈশব-কৈশোরের খেলাঘর, তাঁর রূপ-রচনার কল্পলোক ৫নং

১. এই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দীর্ঘ রোগভোগের পরে স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন (১৮ই ফেব্রুঃ, ১৯৩৮)। তাঁর মৃত্যুতে কেবল দক্ষিণের বারান্দার একটি শিল্প-সিংহাসন শূন্য হয়নি, কনিষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়-নন্দনবনের সমস্ত রসধারার স্রোত যেন তিনি শুদ্ধ করে দিয়ে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ তখন বালকের মত কেঁদে বলেছিলেন, "ওরে আজ ত্রিধারার একটা ধারা শুকিয়ে গেল।" তিনি তখন কেবল দাদাকে হারান নি—তাঁর সমস্ত চিত্র-চিন্তা ও আত্মিক শক্তির উৎসটি যেন শুকিয়ে গেল। তাঁদের বৈষয়িক অবস্থাও তখন ক্রমশঃ অবনতির দিকে। পাঁচ পুরুষের ঐতিহ্যমণ্ডিত একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গনের দিকে চললো এগিয়ে। ভ্রাতৃপ্রেমের বিরল স্মৃতিপূতঃ দক্ষিণের বারান্দা হৃত-গৌরবের প্রতীক মাত্রে পর্য্যবসিত হোল।

গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার দ্বিতীয় অংশ যে সংগ্রহালয় যা 'টেগোর কালেক্‌শন' নামে জগৎজোড়া খ্যাতির যোগ্যতা অর্জন করেছিল, যা দেখে দেশী-বিদেশী সকল কলারসিকগণ মুগ্ধ হয়েছেন, অর্থাভাবে তা বিক্রী হয়ে চলে গেল সুদূর আমেদাবাদ শহরে। সেই অমূল্য কলা-সম্পদ সম্ভার হারিয়ে ৫নং বাড়ীই কেবল শ্রীহীনা হয়নি, গোটা বাংলা শিল্প-বৈভবহীনা হয়ে গেল। কত অর্থ, কত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ, দেশপ্রেম, কত নিরলস চেষ্টা চিন্তা ছিল সেই সংগ্রহকর্ম্মের মূলে, তা আজ গল্প-কাহিনী মাত্র। সে গল্পকথাও আজ যেন অজানার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে চলেছে। আবদুল খালেকের প্রতিকৃতি চিত্রটির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের পুরাবস্তু সংগ্রহের স্মৃতিকণামাত্র বিধৃত হয়ে আছে অক্ষয় রূপে। আবদুল খালেক ছিলেন জনৈক পুরাবস্তু বিক্রেতা। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ খদ্দের।

এই সকল ঘটনার মুখেই রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "অবন, তুমি এবারে শান্তিনিকেতনে চল। সেখানে বেশ আরামে থাকবে।"

কিন্তু তখন শিল্পীর সহধর্ম্মিণীর শরীর অত্যন্ত খারাপ ছিল। অতএব তিনি কবির অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, "এই বন্ধন যতদিন থাকবে, কোথাও নড়বার উপায় নেই আমার।"

জানা যায় যে, অসুস্থ হয়ে কবি বলেছিলেন যে তাঁর পরে অবনীন্দ্রনাথকে যেন বিশ্বভারতীর আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কার্য্যতঃ তা হয়েও ছিল, কিন্তু রুগ্না স্ত্রীকে রেখে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসবাস করেন নি। কলকাতায় থেকেই কাজকর্ম্ম চালাতেন। তবে খুব বেশীদিন আর সে-ভাবে

চালাতে হয়নি। ১৯৪১ সালে বসতবাড়ী হস্তান্তর হবার তিন মাস পরে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল অন্যস্থানে, একটি ভাড়া বাড়ীতে। চলে গেলেন তিনি বি. টি. রোডে 'গুপ্তনিবাস' নামে একটি বাগানবাড়ীতে। পেছনে পড়ে রইল তাঁর পাঁচ পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত, নানা ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই গৃহাবাস, সেই শিল্পতীর্থ ও ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র দক্ষিণের বারান্দা। কিছুদিন সেটি নিঝুম, নীরব, ঘুমন্তপুরীর মত পড়ে রইল অসংখ্য স্মৃতিভার বুকে নিয়ে। তবে সে অবস্থাও বেশীদিন চলেনি। বাড়ীটির দায়িত্বভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কিছুকাল মধ্যেই তাকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। তার ফলে একটি বাড়ীই কেবল ভূলুণ্ঠিত হয়নি, একটি জীবন্ত ইতিহাস সমাধি লাভ করলো ভগ্নস্তূপের অন্তরালে।

অবনীন্দ্রনাথ স্বগৃহচ্যুত হয়ে 'গুপ্তনিবাসে' কাটিয়ে গেছেন পুরো দশটি বছর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর গৃহদেবতা ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দনও একশ' সাতাম বছর পরে গিয়ে ভিন্ন স্থানে হলেন অধিষ্ঠিত। এই গৃহদেবতার সেবা-পূজার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সত্তর বছর বয়সে গৃহদেবতাকে বুকে নিয়ে তিনি নতুন আশ্রয়ে চলে গেলেন। সে বাড়ীতেও ছিল একটি টানা বারান্দা। অবনীন্দ্রনাথ সেখানে আবার নতুন করে শিল্প-সাধনার আসন-পীঠ স্থাপনা করলেন। কুটুম-কাটাম গড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিছু চিত্রাঙ্কনের কাজও চলতো তখন। প্রাকৃতিক দৃশ্যও কিছু এঁকেছিলেন সেই সময়।

স্বগৃহচ্যুত অশান্ত জীবনে শান্তি আনয়নের চেষ্টায় সফল হতে না হতে আবার তাঁর জীবনে এল নিদারুণ এক আঘাত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হারালেন বাংলা ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯৪২)। প্রচণ্ড আঘাতে তিনি বন্ধনমুক্ত হলেন। কবির শেষ অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করে আচার্য্যের পদে বৃত ছিলেন।

তিনি সেখানে কেবলমাত্র আচার্য্যের কর্ত্তব্য করেই দিন কাটান নি। তাঁর শিল্পীসত্তা তখনও প্রাণবন্ত। অনেক ছবি এঁকেছেন, কত কুটুম-কাটামের রূপ দিয়েছেন তিনি শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত পরিমণ্ডলে বসে। তখন তিনি যে সকল চিত্র রচনা করেছেন, তা পুরোপুরি আর এক নতুন ভঙ্গীর সৃষ্টি। শিল্পী-জীবনের শেষ সন্ধ্যালগ্নে যা এঁকেছিলেন, তার সঙ্গে পূর্ব্বদিনের কোন পর্য্যায়ের কোন ছবির এতটুকু মিল নেই। শেষের দিনের ভাব-ভাবনা,

আঙ্গিক-প্রকরণ সমস্তই ভিন্নমুখী, ভিন্ন রূপের ও আলাদা স্বাদের। তখনকার অধিকাংশ ছবি খণ্ড খণ্ড রঙ্-এর পোছে অঙ্কিত। রেখাঙ্কন পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এতদিনের সূক্ষ্ম তুলির ছন্দায়িত অথচ সুদৃঢ় টান-টোন্ এবারে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা খণ্ড স্ট্রোকে হোল পরিণত। মোটা তুলির বলিষ্ঠ চালনার গতি চলেছিল তখন অবাধ ছন্দে।

এ যুগের অতি আধুনিক চিত্ররীতির অনেক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত আভাস অবনীন্দ্রনাথের শেষ পর্য্যায়ের চিত্র মধ্যে সম্পূর্ণ নিরুদ্দিষ্ট ও অকল্পনীয় নয়। চিত্র-কল্পনায় তিনি শেষ বারের মত নতুন আর একটি দিগ্‌দর্শন করালেন শান্তিনিকেতনে অঙ্কিত চিত্রগুচ্ছের মধ্যে। তাঁর সমুদয় চিত্রকর্ম্মের ধারাকে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন পর্য্যায়ে তিনি সর্ব্বদাই নতুনতর কিছু করার প্রয়াস করেছেন। কখনও পিছু ফিরে তাকান নি। দৃষ্টি সর্ব্বদাই ছিল সম্মুখে ও নতুনত্বের দিকে প্রসারিত।

সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে মোটা তুলির টানে যদৃচ্ছ রঙ্-এর পোছ দিয়ে আঁকা ছবির মূলে তাঁর বার্দ্ধক্যের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। তখন আর সেই বিগত দিনের আমিরী মেজাজ, সৌন্দর্য্য খোঁজার দিব্যদৃষ্টি, সূক্ষ্ম তুলিকে অবাধ ছন্দে চালনার এবং পটকে বার বার ধুয়ে ধুয়ে গহন গভীর রসাবেশ সৃষ্টির শক্তি তাঁর ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকার মনটি তখনও ছিল। তাই মনে হয় চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি ও দুর্ব্বল হাতে অনায়াসে ও স্বল্প সময়ে যা সম্ভব হয়েছে তাই ধরে দিয়েছেন এই চিত্র সমূহে।

শান্তিনিকেতনে অঙ্কিত অধিকাংশ ছবি তিনি দিয়েছিলেন ভাগ্নী প্রতিমা ঠাকুরকে। তা এখন সম্ভবতঃ দিল্লী ন্যাশনাল গ্যালারীর সম্পদ। বাকি চিত্রসমূহের কয়েকটি উপহার ও পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন নাতবৌ পূর্ণিমা গাঙ্গুলীকে (শোভনলাল গাঙ্গুলীর পত্নী)। আর কিছু সংখ্যক এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে।

পূর্ণিমা দেবীকে প্রদত্ত ছবিগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যেও কৌতুহলোদ্দীপক এবং বেশীরভাগই তারিখ যুক্ত। তাছাড়া আরও আছে শিল্পীর সহজাত রসিক মন ও কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয়। নাতবৌকেও ছবি আঁকতে এবং পুতুল বানাতে বলতেন। অতঃপর তাঁকে একটি দৃশ্যপট ও পাহাড়ী মেয়ের ছবি এঁকে দিয়ে তাতে লিখেছিলেন—পূর্ণিমাকে পুত্তলিকাপুরের দোরের এই ছাড়পত্র প্রদত্ত হোল। দোলপূর্ণিমা, নামসহি, শান্তিনিকেতন, ভুলে যাওয়া সন তারিখ।

আর একটি ছবিতে দেখা যায় জনৈক গায়িকা ও শ্রোতা। ছবির পেছনে লিখেছেন—এই কাগজ ভাল নয়, ছবি ভালো হোত, ভাল দেশী কাগজ হলে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই চিত্র-সংগ্রহে আরও আছে অরূপরতনের অভিনয়ে শোভনলাল গাঙ্গুলীর চেহারা, জলরঙ্-এ উত্তরায়ণের দৃশ্য, সবুজ ও কালোতে রচিত দৃশ্যপট, মোটা তুলিতে আঁকা বালিকা, ঝুড়ি মাথায় হিন্দুস্থানী মেয়ের অসম্পূর্ণ রূপ, থামওয়ালা একটি বাড়ী ইত্যাদি। আরও আছে টুপি মাথায় বৃদ্ধের চেহারা, তার কালো জামাজোড়া ও অদ্ভুত অভিব্যক্তি। আর একটি গভীরতর ভাব-প্রস্ফুট চিত্র 'সকালের আভাস'। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হোল ঝড়ের মুখে টোকা মাথায় দিয়ে নীচু হয়ে ভারী বোঝাসহ চলেছে একটি লোক। তার শরীরের আর কোন অংশ দেখা যায় না। কিন্তু তার পদক্ষেপ ও চলনভঙ্গীতে সমগ্র দেহরূপ যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচেকার দৃশ্য এটি। 'গন্ধমাদনে হনূমান' এই সময়কার চিত্রলক্ষণাবলীযুক্ত নিদর্শন।

অবনীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে সাঁওতাল মেয়ে, বিশেষতঃ রাঁচির, এঁকেছেন কয়েকটিই। তার মধ্যে দু'তিনটি শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত। শেষ বয়সের ক্ষীণপ্রভ চোখের আলোয় আবার নতুন করে আঁকলেন সাঁওতাল মেয়ে। তখন আর কোনও রেখার কারুত্ব ও বর্ণের মনোহারিত্ব রইল না। যেমন-তেমন করে চালিত স্থূল রেখার টানে কল্পিত রূপ।

ময়ূর পাখীর ক্ষেত্রেও হয়েছিল একই অবস্থা। মেঘদূতের চিত্র-সিরিজে সেই কবে কোন তরুণ বয়সে এঁকেছিলেন বনভূমিতে ময়ূর। তাঁর সূক্ষ্ম আঙ্গিক কৌশলের সেটি চূড়ান্ত নিদর্শন। অতঃপর মধ্যবয়সে অঙ্কিত শ্বেতময়ূর পুঙ্খানুপুঙ্খতার পথে না গিয়ে জলেধোয়া রীতির আর এক ভিন্ন রসাশ্রিত নতুন ভাবনার প্রতিফলন করেছে। মোলায়েম ভাবের অপূর্ব্ব নিদর্শন। কিন্তু শেষ জীবনের ম্লান গোধূলি আলোয় আবার যে ময়ূরের রূপ দিলেন, তাতে না আছে রঙ্-এর মোহিনী মায়া, না দেখা যায় রেখার সৌকুমার্য্য ও সুষমা। তাহলেও এখানে কিছু ভিন্নতর রসের স্বাদ পাওয়া যায়। কালো ও প্রগাঢ় নীলের সমন্বয়ে রচিত। পেখম ছড়ানোর বাহার নেই। এ যেন কোনও দুর্ব্বল চেষ্টা-চিন্তার ফলশ্রুতি। কিন্তু মনকে নাড়া দেয়। ময়ূরের দুই পাশে আলপনা ধরনের নক্সা। সারা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে লাইন টেনে টেনে crack-এর মত নক্সা করেছেন। এ যেন ছবির ছেলেমো।

এই সকল চিত্রের উপাদানও সামান্য। কাগজেই সব এঁকেছেন। কিন্তু

তার ভালমন্দের বিচার আর করেন নি। মনে হোত কাগজ ভাল হলে ছবি ভাল হয়। তা সত্ত্বেও মনে হয় হাতের কাছে যখন যা পেতেন, খণ্ড টুকরা কাগজ বা ছেঁড়া কাগজ, তাতেই অবাধে তুলি চালাতেন। অন্তরের প্রেরণায় করে যেতেন। আত্মপ্রকাশের তাগিদ তখনও চলছিল। তাই হাতের তুলি ও রঙ্-এর পাত্রকে তখনও ছাড়তে পারেন নি। অতএব, সৃষ্টি প্রেরণায় ও আনন্দে মগ্ন হয়ে রূপ, অরূপ, কি বিরূপ যাই রচনা করুন না কেন, তা শিল্পসৌকর্য্যে উচ্চস্থান লাভের যোগ্য বিবেচিত না হলেও, ইতিহাস রচনার এবং তাঁর চিত্র-রীতির বিবর্ত্তন-কাহিনীর মুখ্য উপাদান নিশ্চয়ই। সুপ্রবীণ যুগন্ধর শিল্পীসত্তার আর একটি স্ফূর্ত্তির তা প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এর মধ্যে আছে তাঁর শিশুমন, বৃদ্ধ চক্ষু, শিথিল হস্ত, খেলার ছলে তুলিকে রঙ্-এ ডোবানো, আর কাগজে বোলানোর রহস্য-কথা। কি হোল, আর হোল না, সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ও খেয়াল ছিল না।

শান্তিনিকেতনে যাবার মুখে 'গুপ্তনিবাসে' তিনি আর একটি নতুন উদ্যোগের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন দেয়ালে ছবি এঁকে। তার মধ্যে তাঁর মনন-ক্রিয়ার আর একটি বিশিষ্টতা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। প্রাচীর-পটকে ছবির যোগ্য করে তৈরী করেন নি সেখানে। প্রকৃতির প্রভাবে যেখানে যা স্বাভাবিক অবস্থা ছিল, অর্থাৎ পুরানো দেয়ালের ফাটা-ফুটা, স্বল্প মেরামতের ছাপ, বৃষ্টির জলের ছোপ, ড্যাম্পের দাগ—তাকে সঠিকভাবে রেখে, ওদেরই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড করে তিনি ছবি করলেন মনের আনন্দে। আসল কথা তিনি সেই পুরানো মলিন দেয়ালের অঙ্গে অঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক উদ্ভট ও অভিনব সব রূপের সন্ধান পেতেন। আর রঙ্-রেখার সাহায্যে তাদের নানা নতুন রূপে পরিস্ফুট করে তুলতেন। দেয়ালে যা এঁকেছিলেন তার মধ্যে মহাদেব, পাতিহাঁস ও গরুর ছবি উল্লেখনীয়।

ছবিগুলির পরিলেখ (outline) করেছেন সরু লম্বা কাঠের খণ্ড পুড়িয়ে তা দিয়ে। অন্যান্য রঙ্-এর পোচ দেবার জন্য তুলির ব্যবহার হলেও, তাকে বাঁশের চটা দিয়ে মেজে-ঘষে নিতেন। কাঠকয়লা, নীল ও বাদামী রঙ্ দিয়ে ছবির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে দেয়ালের স্বাভাবিক ছাত্‌লা ও ড্যাম্পের দাগ ও মেরামতী চিহ্ন রেখেই সব এঁকেছেন। সে জায়গায় তুলির টাচ্ আদৌ দেন নি। আলোচ্য তিনটি কাজই ভাব প্রকাশে, রেখার বলিষ্ঠতায় উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতি। অল্প চেষ্টা ও স্বল্প বর্ণনা দ্বারা চমৎকার ভাবাভিব্যক্তি হয়েছে।

এই প্রকার স্বল্প আয়োজনেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পকর্ম করেছেন চিরকাল। এই কাজের জন্য বিশেষ কোনও আড়ম্বর আয়োজন ছিল না কোনদিনই। তাঁর সর্ব্বদা লক্ষ্য ছিল কম রঙ্ খরচ করে কিভাবে বেশী ছবি করা যায়। ছবির পর ছবি হোত, কিন্তু সে তুলনায় রঙ্-এর বাক্স খালি হোত না। তিনি নিজের রঙ্-এর পেটিকাকে বলতেন, 'অক্ষয় তূণ'। স্বদেশীয়ানার প্রভাবে অন্যান্য বিদেশী জিনিসের সঙ্গে বিলিতী রঙ্-ও বর্জন করেছিলেন। বাজারে যত রকম গুড়া রঙ্ পাওয়া যেত—অর্থাৎ এলামাটি, গেরিমাটি, খয়ের ইত্যাদি কিনে এনে তার সঙ্গে ভূষা কালি মিশিয়ে সব রঙ্ তৈরী করে নিতেন। তাছাড়া বাজার থেকে আরও আনিয়ে নিতেন কমলা, লাল, নীল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি সব রঙ্। তা বিলিতী মোড়কে থাকলেও আপত্তি ছিল না। আর সেই সব রঙ্-এর সঙ্গে গঁদ ও গ্লিসারিন মিশিয়ে নতুন রঙ্ বানিয়ে নিতেন। গঙ্গামাটি দিয়েও একটি রঙ্ তৈরী করেছিলেন। তার সঙ্গে অন্য রঙ্-এর টাচ্ দিয়ে জমি ও মাটির রূপ রচনা সহজ হয়েছিল।

ছবি আঁকতে তুলি হচ্ছে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ও যন্ত্র। কিন্তু তিনি তা মনে করতেন না। তিনি বলতেন—

"তুলি না থাকলে কলম দিয়ে আঁকতুম, পেন্সিল দিয়ে লিখতুম। কলম পেন্সিল না থাকলে খড়িমাটি, তাও যদি না থাকে গাছের ডাল, পাখীর পালক সবই যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে হাতের আঙুল। ছবি আঁকা বন্ধ হোত না।…হাত যখন সৃষ্টি হয়েছে, ছবিও হোত। আগে যন্ত্র তারপর কারিগর, এ নয়। আগে হাত, পরে হাতিয়ার।"[১]

পোড়া কাঠের কয়লা দিয়ে ছবি করবার সময় নতুন পদ্ধতিতে তাকে স্থায়ী করে তুলতেন। কাঠ কয়লার রঙ্ মুছে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত মিডিয়ামে ছবি এঁকে পটখানিকে জলে ডুবিয়ে দিতেন। অর্দ্ধেক আন্দাজ রঙ্ তাতে ধুয়ে-মুছে যেত। তারপর ওটিকে শুকিয়ে নিয়ে কয়লার রেখার উপর আঙুল চালাতেন। খানিকক্ষণ ঘষাঘষি চলতো। নতুন রেখাঙ্কন করেও তার উপর আঙুল চালাতেন। অতঃপর আবার চলতো জলের ছোপ। অনেক সময় ধরে এইভাবে ঘষা-মাজা ও জলে ধোয়ার পরে সাদা-কালোর রেশে চমৎকার ছবি ফুটে উঠতো। সব কাজের শেষে আবার ছবিকে রোদে শুকিয়ে নিতেন। রঙ্ তখন একেবারে পাকাপোক্ত ও স্থায়ী হয়ে যেত। আর কখনও তা উঠে যাবার আশঙ্কা থাকতো না।

১. দক্ষিণের বারান্দা : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বাজারের 'চারকোল' তিনি পছন্দ করতেন না। কাঠ কয়লার ছবিকে আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে এমন মজবুত ও মনোরম করে তুলতেন যে তা সকলের কাছেই আকর্ষণের জিনিস হোত। তাঁর পশুপাখীর চিত্রাবলীর মধ্যে কোন কোনও পাখীর চিত্র মনে হয় এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত।

তিনি টুথব্রাশ দিয়েও দু'-একখানি ছবি করেছিলেন এবং তাও অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল। আসল তুলির কাজের মতই মনে হোত। তিনি বলতেন, "আর্টিস্টের হাতে পড়লে সব ব্রাশ সমান।"

১৯৪৫ সালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন বরানগরে। বয়স তখন তাঁর পঁচাত্তর বছর। সেই রোগাক্রমণের পরে তিনি আর পূর্ব্বের মত সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারেন নি। ক্রমে ক্রমে তিনি এগিয়ে চললেন জীবন-পথের শেষ সীমানার দিকে। সমস্ত সৃজনকর্ম্মের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। এল রঙ্-তুলি, ছেনি-বাটালির 'শেষবোঝা' নামাবার দিন। শিল্প-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে চরম সমুন্নতির দিনে, একদিন পথশ্রান্ত ও বোঝা বহনে অক্ষম উটের 'শেষ বোঝা' নামানোর চিত্র এঁকেছিলেন দিনমণির অস্তরাগ রেখায় রঞ্জিত করে। দেশ-বিদেশের কলারসিকরা সেই চিত্র-কল্পনা দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি আরও যে সহস্র চিত্রপটে কতশত রঙ্-এর খেলা খেলেছিলেন জীবনভর, তার মধ্যেকার গোধূলি আলোকের করুণ, ম্লান ও ধূসর আলোকচ্ছটার দিকে মুখ করেই জীবনের শেষ পাঁচটি বছর তিনি কাটিয়েছেন।

তারপরে এল সেই শেষের দিনের আহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁর রূপ-রেখার খেলাঘর ছেড়ে তিনি যাত্রা করলেন অনন্ত অসীমের পথে। ১৯৫১ সালের ৫ই ডিসেম্বর তিনি মরজগতের শিল্পগুরুর আসন ত্যাগ করে চিরন্তন রূপের একটি আসন অধিকার করলেন তাঁর তুলি কল্পনার অজস্র চিত্রপটের মধ্যে। আর রেখে গেলেন তাঁর স্নেহধন্য তিনটি পুত্র, দুটি কন্যা, কত নাতি-নাতনী, ছাত্র, শিষ্য ও দেশী-বিদেশী কত গুণমুগ্ধ তাঁর চিত্রানুরাগী আত্মীয় বন্ধুজনদের।[১]

১৯৫১ সালের ৫ই ডিসেম্বরের পরে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ আর নেই; নেই তাঁর বাল্যস্মৃতি ও কর্ম্মকৃতি-বিজড়িত ৫নং বাড়ী। দক্ষিণের বারান্দা কালের গর্ভে নিলীন। সব আজ ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসও কথা কয়। মৌন হয়েও সে মুখর। সে বলবে—

১. বংশলতা দ্রষ্টব্য।

যাঁর তুলির টানে-টানে, রঙ-এর হিল্লোলে, ভাবের আবেশে ভারত-কলার ক্ষীণ প্রাণে নতুন স্পন্দন জেগেছিল, যিনি রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন কাব্য-কাহিনীকে নবভাবে চাক্ষুষরূপে সঞ্জীবিত করেছিলেন, মুঘল ইতিহাসের জাঁকজমক, বেদনা-ব্যথা ও হতাশার করুণ-কাহিনীকে স্বকীয়তা-মণ্ডিত করে এ-যুগের আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন, প্রাচীন ভারতের শিল্পকীর্ত্তির ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য লহরীর শিলীভূত রসধারাকে মন্থন করে আধুনিক চিত্রকলার অমৃত প্রবাহে দেশবাসীর রূপ-তৃষ্ণা মিটিয়ে দিলেন, যিনি রঙ-রেখার প্রাণছন্দে আজও জীবন্ত, যাঁর স্নেহ-মমতা ও হাস্যমুখর আলাপচারিতার মাধুরী আজও কলার কাকলীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, যাঁর নান্দনিক অনুভূতি ও রসোল্লাসের ভাব প্রকৃতি চিত্রকল্প ভাষার নৈবেদ্যে বাঙময়ীরূপে দীপ্যমান—তিনি এখন এই মরজগতের ওপারে অমরাবতীর নন্দনরাজ্যের অধিবাসী। সেই রূপসাধক এই জগত পারাবারের তীরে পাথর, নুড়ি কুড়ানো ও রূপের সাগরে অবগাহন শেষ করে অনন্ত রূপাবলী ও অক্ষয় নুড়ি-পাথরের সন্ধানে নিমগ্ন। তাঁর চিত্রপট ও কুটুম-কাটাম আজ শিল্পরাজ্যের শোভা ও জগতবাসীর আনন্দের উৎস।

॥ ৫ ॥

'গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক'—এই উক্তিটি অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষক-জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ, তিনি যেমন ছিলেন সুযোগ্য গুরু, তেমনি ছিল তাঁর শিষ্য-ভাগ্য। তাঁর জীবনে দেখা গিয়েছে যে গুরু একজন, কিন্তু যোগ্য শিষ্য অনেক। গুরুর আসনে বসবেন, গুরুগিরি করবেন—এই কল্পনা, এই ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না। চিত্র রচনায় চলছিল তখন নতুন নতুন চেষ্টা। নতুনতর কল্পনা-চিন্তাকে পটের বুকে ফুটিয়ে বিচিত্র রূপসম্ভার সৃষ্টির আনন্দে তিনি সে সময় বিভোর। অনেক রঙ-রূপের অভিনব রাজ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তখন। মন তাঁর ভাব-কল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে চলেছিল দিক হতে দিগন্তরে, রঙ-রেখার আকাশে-বাতাসে। তাঁর নবাবিষ্কৃত চিত্রকল্পনার ভাব-ভাষায় আত্মপ্রকাশের গতি তখন অবাধ, মুক্ত। সেই ভাব, সেই ভাষা তাঁর একান্ত ভাবে নিজের। রূপসাধনা চলেছিল নিভৃতে, নিরালায়। সেখানে তিনি ছিলেন একা। প্রচারবিমুখতা ছিল তাঁর সহজাত স্বভাব। অতএব চিত্রাঙ্কনের নতুন পালা অবারিত ছন্দে চললেও বাইরে তার বড় একটা প্রকাশ ও প্রচার ছিল না।

এমনি একটি সময়ে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়ে যায় মিঃ ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে। তার ফলে অবনীন্দ্রনাথ এলেন আর্ট স্কুলে। নিয়মমাফিক কর্মজীবন শুরু হোল তাঁর। আর্ট স্কুলের তিনতলার দক্ষিণ দিকে একটি ঘরে তাঁর ভারতীয় চিত্রকলার ক্লাস হোল স্থাপিত। কিন্তু ছাত্র কোথায়? ভারতীয় রীতিতে চিত্রাঙ্কন শিখবে কে? সুতরাং শূন্য কক্ষেই অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন একলা বসে চিত্রাঙ্কন করে চললেন। আর বিদ্যালয় সংলগ্ন আর্ট গ্যালারীতে যেসকল প্রাচীন ভারতীয় ছবি ও মূর্ত্তি ছিল, তা হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতেন। তাছাড়া হ্যাভেলের কাছে আর্ট সম্বন্ধে কিছু নতুন আদর্শ শিক্ষার অবকাশও তখন তিনি পেয়েছিলেন। ফলে, তাঁর শিল্পের ত্রি-নেত্র যায় খুলে। এই কারণেই তিনি হ্যাভেলকে 'গুরু' বলতেও কুণ্ঠিত হননি।

ভারতকলার রস আস্বাদনের তখন আর একটি অপূর্ব সুযোগ এসে গিয়েছিল তাঁর সামনে। সেই সময় নানা দেশ থেকে শিল্পসম্পদ বিক্রেতারা রকমারি সব জিনিসপত্র, ছবি, মূর্ত্তি নিয়ে আর্ট স্কুলে যাতায়াত করতেন নিয়মিত। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সে এক পরম সুযোগ! ভারতবর্ষের

আঞ্চলিক শিল্প সামগ্রীর রূপ দর্শন ও মর্ম উপলব্ধির জন্য তাঁকে হ্যাভেল সাহেব প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর তিনি নিজেই সেই নতুন আমদানী ছবি মূর্ত্তি প্রভৃতির রস-রহস্য তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন। নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, সেই দু'ঘণ্টা সময় অফিসের কোন কাজ হবে না, কোন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও চলবে না।

এইভাবে চললো কিছুকাল হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের গুরু-শিষ্যের পালা। অতঃপর এক শুভদিনে আর্ট স্কুলের সেই শূন্য কক্ষে (ভারতীয় ক্লাসে) এলেন অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র সুরেন গাঙ্গুলী।[১] মিঃ হ্যাভেল তাঁকে তাঁতের কাজ শেখার জন্য প্রথমে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনে অবনীন্দ্রনাথকে বললেন, "তুমি তোমার ক্লাস শুরু কর।" এই ঘটনার কয়েক দিন পরে সত্যেন বটব্যাল নামে এন্‌গ্রেভিং ক্লাসের জনৈক ছাত্র একটি ছেলেকে নিয়ে এসে ভাইস প্রিন্সিপালকে বললেন, "একে আপনার ক্লাসে নিতে হবে।" অবনীন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে মুখ তুলে দেখলেন, 'কালোপানা ছোট একটি ছেলে।' ছেলেটি আর কেউ নন, তিনি নন্দলাল বসু। গুরুর দ্বিতীয় ছাত্র—ভাবীকালের যুগন্ধর ও ধুরন্ধর শিল্পী।

গুরু জানতে চাইলেন, নবাগত ছাত্র লেখাপড়া কতদূর শিখেছেন। ছাত্র জবাব দিলেন. ম্যাট্রিক পাশ ক'রে, এফ্. এ. পর্য্যন্ত পড়েছেন। আবার প্রশ্ন, তোমার হাতের কাজ? ছেলেটি একখানি ছবি দেখালেন—শকুন্তলার ছবি। একটি মেয়ে, পাশে হরিণ ও গাছপালা। গুরুর মতে ওটিতে একটু জ্যাঠামির ছাপ ছিল। তাই তিনি হুকুম দিলেন, সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি করে আনতে হবে। শকুন্তলায় হবে না।

পরদিন নন্দলাল নিয়ে এলেন একটি কাঠিতে ন্যাকড়া জড়ানো, তার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। সুন্দর ছবিখানি, প্রভাত-ভানুর বর্ণনা দিয়ে অঙ্কিত। গুরুর খুব পছন্দ হয়ে গেল ছবিটি। সঙ্গে এসেছিলেন নন্দলালের শ্বশুর মহাশয়। তিনি অবনীন্দ্রনাথকে বললেন. "ছেলেটিকে আপনার হাতে দিলুম।" তিনি উত্তর দিলেন, "লেখাপড়া শেখালে বেশি রোজগার করতে পারবে।" সে-কথার জবাব দিলেন নন্দলাল নিজেই— "লেখাপড়া শিখলে তো ত্রিশ টাকার বেশী রোজগার হবে না। এতে আমি তার বেশী রোজগার করতে পারব।"

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১২৯

তখন আর আপত্তি হোল না। নন্দলাল থেকে গেলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তখন ছাত্র হোল দুটি। একদিকে সুরেন গাঙ্গুলী, আর একদিকে নন্দলাল বসু, মাঝখানে গুরু অবনীন্দ্রনাথ। ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষাদান-পর্ব্বের সুপ্রভাত হোল ১৯০৫ সালেরই একটি সুন্দর শুভদিনে।

ক্রমান্বয়ে আরও তিনটি ছাত্র এলেন আর্ট স্কুলের ভারতীয় বিভাগে। সুতরাং সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ। নবাগত তিনজন হলেন—অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্পর্কে বলতেন, এরা আমার 'পঞ্চপাণ্ডব'। তারপরে দিনে দিনে ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। লক্ষ্ণৌর দু'জন মুসলমান ছাত্রও এসে যোগ দিলেন ভারতীয় বিভাগে। নাম তাঁদের হাকিম খান ও শমী উজ্জমান। মহীশূর থেকে এলেন ভেঙ্কটাপ্পা। আর পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন রূপকৃষ্ণ।

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা হোল অনুভূত। ঈশ্বরীপ্রসাদ ও বাহাদুর লাল নামে দু'জন শিল্পী এসে শিক্ষকের আসনে বসলেন। তাঁদের কাজ হোল পুরোনো মুঘল ও পাহাড়ী চিত্রের রীতি-পদ্ধতি ছাত্রদের শেখাবেন। এছাড়া দেশী রঙ-তুলি প্রভৃতি তৈরী করা ও ছবিতে সোনা লাগানোর পদ্ধতি শেখাবার ভারও পড়েছিল তাঁদের উপরে।

ক্রমশঃ আরও অনেক ছাত্র এসে সমবেত হলেন অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে। পরবর্ত্তীকালে তাঁরা সকলেই হয়েছিলেন কৃতি ও কুশলী শিল্পী এবং সুযোগ্য শিক্ষকও বটে। তাঁদের দ্বারাই অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতির প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে। এঁদের অনেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে শিক্ষাগুরুর পদে ব্রতী হয়ে ও কলাবিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, সেই নবজাত কলারীতিকে দেশবাসীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন।

আধুনিক ভারতের নব্য-কলারীতির জনক অবনীন্দ্রনাথ। গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি আর একটি বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও একটি নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে হয়েছিলেন অতি মাত্রায় সফল ও সুসিদ্ধ। ছাত্র-শিষ্যকে আপন ক'রে মনের মত ক'রে তৈরী করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাঁর কাছে ছাত্র ও পুত্র ছিল অভিন্ন। এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের একটি নবরূপ হয়েছিল প্রতিভাত। ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষার দায়িত্ব নিতে গিয়ে তিনি অনেক সময় যেন তাঁদের জীবনের সমগ্র ভার গ্রহণ

করে ফেলতেন। ঘণ্টা, মিনিটের ও ক্লাসরুমের বিধি-নিয়মে আবদ্ধ ছিল না তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি। খোলা মন, উদার হৃদয় ও সহজ ভাব নিয়ে তিনি ব্যবহার করতেন ছাত্রদের সঙ্গে। স্কুল-শিক্ষকের মত নিয়ম, নির্দেশের কোন বালাই ছিল না সেখানে। তাঁর শিক্ষাদান রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং তাও তাঁর একান্ত নিজস্ব।

এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার ক্লাসে ছিল একটু বিশেষত্ব। আমি কখনো ছাত্রদের নিয়ে স্কুল মাস্টারী করিনি। আমিও আঁকতুম, তারাও আঁকত আমার সঙ্গে বসে।...আমার বসে বসে ক্লাস করা পোষাত না। ওরা রীতিমত স্টাডি করতো।..কি যে আনন্দে ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করে যেতুম, সেরকম মজার দিন আমার জীবনে আর আসেনি। আমি আর নন্দলালরা মিলে ছবির পর ছবি এঁকে গেছি। রোজ নতুন নতুন ছবি বের হয়েছে, তার আর বিরাম ছিল না। ছাত্র আর গুরুতে মিলে সৃষ্টি করা—এই রকমই ছিল আমার ক্লাস। সে যে কি স্ফূর্তি তা বোঝাতে পারবো না।"[১]

অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে নানা ধাতের, নানা ধরনের ছাত্রের আগমন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ছাত্রদের নিয়ে স্বভাবসুলভ রহস্যবোধের পরিচয়ও দিয়েছেন তিনি বারে বারে। আবার তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার-নির্দেশনার মধ্যেও কতবার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দরদী মন, সেই অদ্ভুত শিল্পমানস ও রসের অফুরন্ত ধারা-প্রবাহ।

একবার সেকালের ভারত-বিখ্যাত বিপ্লবী বারীন ঘোষ এসে হাজির। অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রবিদ্যা শিখবেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। শিল্পগুরু জানতে চাইলেন, ছবি আঁকাব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা কতটুকু। বারীন্দ্রনাথ স্বহস্ত অঙ্কিত একটি দুর্গার ছবি দেখালেন তাঁকে। সাধারণতঃ দুর্গার মূর্ত্তি যেমনটি হয় তেমনি করেই আঁকা হয়েছিল ছবিটি। অবনীন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করলেন, কেমন করে আঁকা হয়েছে পটটি। উত্তর দিলেন ছাত্র, ধ্যান করে রূপটি ঠিক করে নিয়ে এঁকেছেন। গুরু বললেন, "তা হবে না বারীন। ধ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখ, তবেই ছবি আঁকতে পারবে। যোগীর ধ্যান ও শিল্পীর ধ্যানে এইখানেই তফাত।"[২]

শিল্পীর ধ্যান অবনীন্দ্রনাথের মতে চোখবুজে ধ্যান নয়। চোখ দুটি খুলে বিশ্বের বিচিত্র রূপরাজিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখা। সেই রূপবৈচিত্র্যকে

১. স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা ঠাকুর। পৃঃ ৯০
২. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১০১

চোখে দেখে মনের ল্যাবরেটারীতে নিয়ে রূপান্তরিত, ভাবান্তরিত করে নিজেরটি করে নিতে পারলেই শিল্পীর ধ্যান হয় সার্থক। আকাশে, মাটিতে, জলে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, মানুষের সমাজে, পশুপাখীর মহলে যা কিছু আছে তাকে চোখে দেখে, মন দিয়ে ঢেলে সাজিয়ে নতুন করে দিতে হবে চিত্রপটে।

তিনি ছাত্রদের সর্ব্বদা বলতেন বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে, সেখানে কত ডিজাইন, নক্সা রয়েছে ছড়ানো। তাছাড়া কাগজটির দিকে তাকিয়ে নিজের মনোরাজ্য মন্থন করলেও কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।

শিক্ষাদানের রীতিই ছিল তাঁর স্বতন্ত্র ও অভিনব। তিনি যত বড় শিল্পী ছিলেন, আবার ততখানি শ্রেষ্ঠ ছিলেন শিক্ষক। ছাত্রদের শেখাবার সময় খুব ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেন। সে-কাজ করতেন অত্যন্ত স্নেহ-মমতা দিয়ে। বিশেষ প্রতিভা নেই এমন সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যেও তিনি অনেক গুণ দেখতে পেতেন এবং তা টেনে বের করতেন।

তাঁর নিজের শিল্পরীতিকে কথনও ছাত্রদের অনুকরণ করতে বলতেন না। কোন শিক্ষার্থীর রচনার ভুলত্রুটী সংশোধনকালেও তিনি নিজের পন্থা-পদ্ধতিতে তা না করে, সেই শিল্পীর আদর্শ ও মনোভাব বুঝে নিয়ে সেইভাবে তাকে এগিয়ে দিতেন। কোনও ছাত্র হয়ত কিছুতেই একটি রচনাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে পাচ্ছে না, তা দেখে তিনি ছবিটির উপরে একবার চোখ বুলিয়ে, এখানে-ওখানে দুটো একটা সোজা লাইন বা বাঁকা রেখা জুড়ে দিয়ে, তুলির টানে ও রঙের একটি পোঁছ দিয়ে সেটিকে দিতেন পূর্ণ একটি রসসৃষ্টির নিদর্শন করে।

শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁর আদর্শের কথা জানা যায় একখানি চিঠিতে। তিনি একবার ছাত্র অসিত হালদারকে লিখেছিলেন—

"বোলপুরে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরু মশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না। মনে রেখো যে পাখী পড়াতে হলে পাখীর সঙ্গে নিজেকেও পাখী হতে হয়।"

সেই সময় অসিত হালদার বিশ্বভারতীর কলাভবনে অধ্যক্ষ পদে ব্রতী ছিলেন।

তুলি-কলমের রহস্য শেখানো ব্যতীত তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারেও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শুধু তুলি-কলমের

বাহাদুরীতে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি না পেলে এবং কল্পনায় বিকাশ না হলে আসল শিল্পী তৈরী হয় না। তিনি ছাত্রদের রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাব্য-কাহিনী পাঠ করে করে মাথা বোঝাই করতে বলতেন। এইজন্য তিনি আর্ট স্কুলেও নানা প্রকার আয়োজন ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজেও যেমন ছেলেদের কাছে অনবরত প্রাচীন কাহিনী ও পৌরাণিক আখ্যান সব বলতেন, তেমনি আর্ট স্কুলে একজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছিলেন ছাত্রদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও কালিদাসের কাব্য পড়ে পড়ে ব্যাখ্যা করার জন্য। তা শুনে শুনে গুরু ও তাঁর শিষ্যরা এঁকে চলতেন নানা ছবি। মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিয়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখারও ব্যবস্থা ছিল।

এত সব ব্যবস্থা করে এবং পৌরাণিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেও অবনীন্দ্রনাথ কোনও রক্ষণশীলতার বা প্রাচীনকে আঁকড়ে থাকার শিক্ষা কখনও দেননি। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ও নির্দেশ ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর রস ও রূপবৈচিত্র্য আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে তা থেকে মধু সঞ্চয় করতে হবে। আর সেই সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের কোন্‌টি এ যুগে গ্রহণীয়, কোনটি বর্জনীয় তা বিচার করে চলতে হবে। কিন্তু পুরাতনের হুবহু অনুকরণ বা জাবর কাটা চলবে না। এখনকার পরিবেশের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করে আজকের ও ভাবীকালের যোগ্য রস রূপ রচনা করতে হবে। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্র-লক্ষণে ও আদর্শে এবং আঙ্গিকের মধ্যে আমাদের ভাবীকালের উপযোগী অনেক মূল্যবান তত্ত্ব ও উপাদান নিহিত আছে। তাকে গ্রহণ করে নিজেদের প্রয়োজনানুরূপ অংশ বিশেষকে কাজে লাগালে তাতে আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ হতে পারবে। এই গ্রহণ-বর্জনের নীতিতে তাঁর কাছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেদাভেদ ছিল না। তিনি ছাত্রদের পশ্চিম দেশের শিল্পরীতি থেকেও নানা উপাদান সংগ্রহ করতে উৎসাহ দিতেন। তবে পাশ্চাত্য রীতি দ্বারা কেউ প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন না হন সেদিকে তাঁর বিশেষ সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর শিল্পী-জীবনের আদর্শই ছিল মূলটি যেন ভারতের মাটিতে আবদ্ধ থাকে, শিল্পী যেন মনে-প্রাণে ভারতীয় হয়ে ওঠেন। মিলন-মিশ্রণে বাধা ছিল না, কিন্তু প্রভাবিত ও পরাভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কি করে ছাত্রদের উন্নতি হবে, নাম হবে, এই ছিল তাঁর সর্ব্বদার চেষ্টা। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে নিজের ছবি বেশী দিতে

চাইতেন না। ছাত্রদের ছবি যাতে বেশী স্থান পায় তার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করতেন। তিনি বলতেন, তাঁর ছবি বেশী থাকলে ছাত্রদের ছবি বিক্রী হবে না। এই স্নেহ-মমতার তুলনা নেই। এ পুত্রস্নেহ ব্যতীত আর কি! নিজে অসুস্থ হলে বাইরের কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হতেন। কিন্তু কোন ছাত্র এসেছে শুনলে ভারী খুশী হতেন। কলকাতার মধ্যে কোন ছাত্র অসুস্থ হলে নিজে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতেন। বাইরে হলে চিঠি লিখে, এমনকি 'তার' করে খবর নিতেন। কারোর অর্থাভাব হলে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন।[১]

এই প্রসঙ্গে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মুকুল দে-র একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য।

"Of warm and affectionate disposition, Abanindranath has always looked after the welfare of his pupils, and besides ungrudgingly giving his help and encouragement in their work he was always ready to help them out of their difficulties with financial aid. Indeed his timely and secret financial assistance has enabled many of his students, whose careers would otherwise have come to an end, to attain success for themselves. It is a rare fortune to be one of his pupils"[২]

মুকুল দে আর এক জায়গায় বলেছেন, "কাহারও বাড়ীঘর জায়গা জমি করিয়া দিয়া, কাহাকেও বা কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়া এই শিল্পীশ্রেষ্ঠ মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৯১৭ সালে আমার পিতার মৃত্যুকালে ও কয়েক বছর পূর্ব্বে আমার মারাত্মক পীড়ার সময়ে তিনিই আমাকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ উপকার আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।"[৩]

ভেঙ্কটাপ্পা ও রূপকৃষ্ণ বাংলা দেশের বাইরে থেকে এসেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ সেইজন্য সর্ব্বদা সস্নেহ দৃষ্টি রাখতেন যাতে তাঁদের কোন অসুবিধা না হয়। ভেঙ্কটাপ্পাকে তিনি আদর করে ডাকতেন 'আপ্পা'।

তাঁর প্রথম ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী তরুণ। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। তাঁর প্রতি অবনীন্দ্রনাথের

১. বাবার কথা: উমা দেবী।

২. Visva-Bharati Quarterly : May-Oct, 1942

৩. অবনীন্দ্রনাথ: মনোজিৎ বসু।

স্নেহমমতার অন্ত ছিল না। আর্ট স্কুল থেকে তাঁকে বৃত্তি মঞ্জুর করে, প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি টাঙিয়ে বিক্রী করে, নানাভাবে তিনি তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁর অকাল বিয়োগে তিনি মর্ম্মাহত হয়েছিলেন অত্যধিক মাত্রায়।

সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তিনি 'প্রবাসী'-তে একটি চিঠি পাঠিয়ে লিখেছিলেন—

"সুরেনের একান্ত দীন ও দরিদ্র অবস্থা হইলেও সে পয়সা উপায়ের জন্য অন্য পন্থা ছাড়িয়া এই কাজে যোগ দিয়াছিল। তাহার এমন দুরবস্থা যে আমি কম্বল কিনিয়া দিলে তবে সে শীত কাটাইয়াছে। নচেৎ শীতের দিনে সে একখানি চাদর মাত্র গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত। এত দরিদ্র, তাহার পক্ষে ছবি আঁকা (তাও আবার দেশী ছবি) লইয়া পড়িয়া থাকা কতটা মনের তেজ আবশ্যক…।"

তাঁর এই প্রথম ছাত্রটি তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে অনেকগুলি ছবির মধ্যেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তার মধ্যে 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নামক একটি চিত্রাঙ্কন করে তিনি ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত মহলে তুমুল এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ বিষয়টির সত্যতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক চালিছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। শিল্পী 'সাহিত্য' পত্রিকায় তিরস্কৃত হলেন কঠোর ভাষায়। স্নেহশীল গুরু আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রিয় শিষ্যের সম্মান রক্ষা করতে তিনি এগিয়ে এলেন তাঁর সুরসাল লেখনী হাতে নিয়ে। পর পর 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রবাসী' দুটি পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে তিনি ছাত্রের চিত্রায়ণ ও তার নামকরণকে সমর্থন জানালেন নানা সরস যুক্তির মাধ্যমে।

ছাত্রদের ছবি ভাল না হলে সংশোধন করতেন তিনি রঙ-তুলি দ্বারা। সেবারে চিত্রের বিষয়বস্তুর সমস্যা সমাধান করলেন লেখনীর সাহায্যে।

কিন্তু তার জন্য সর্ব্বদা এবং সব ব্যাপারেই তিনি ছাত্রদের পূর্ণ সমর্থন বা সহযোগিতা করেন নি। যেখানে যেটুকু সাহায্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন, তা তিনি দিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। অনেক সময় আবার মজা করে, রহস্যচ্ছলেও শিক্ষা দিতেন। আর তাঁকে যেন কেউ নকল না করেন সে দিকেও লক্ষ্য রাখতেন।

একবার প্রশ্ন হোল, ছবি আঁকা শিখতে কত সময় লাগে? তিনি বললেন, বেশী দিন নয়, ছয় মাস; তার মধ্যেই তিনি শিখিয়ে দিতে পারেন। যাদের

হবার এর মধ্যেই হয়। যাদের হবে না, তাদের বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত।
একবার বললেন—

"ছবি আঁকবে তুমি নিজে, মাস্টার মশায় তার ভুল ঠিক করে দেবেন কি? তুমি যে রকম গাছের ডাল দেখেছ তাই এঁকেছ। মাস্টার মশায়ের মতন ডাল আঁকতে যাবে কেন? তরকারীতে নুন বেশী হয়, ফেলে দিয়ে আবার রান্না কর; পায়েসে মিষ্টি কম হয়, মিষ্টি আরো দাও। ছবিতেও ভুল হয়, ফেলে দিয়ে আবার নতুন ছবি আঁক। বারে বারে একই বিষয় নিয়ে আঁক। আমি হলে তো তাই করতুম। ছবিতে আবার ভুল শুধরে দিয়ে জোড়াতাড়া দেওয়া, কি রকম শেখানো? দরকার হয়, আর একটু নুন দিতে পার। কিন্তু গাছের ডালটা এমনি হবে, পা-টা এমনি করে আঁকতে হবে, এরকম শেখাবার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। আমি নন্দলালদের অমনি করেই শিখিয়েছি। তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, এঁকে যাও, কিছু এদিক-ওদিক হয় তো আমি আছি।"[১]

তিনি যে সর্ব্বদাই ছাত্রদের পেছনে থাকতেন ও সাহস দিতেন তার অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

একবার শিষ্য নন্দলাল গুরুর কাছে কি বিষয় নিয়ে ছবি আঁকবেন তার নির্দেশ চাইলেন। তিনি তাঁকে 'কর্ণের সূর্য্যস্তব' আঁকতে বললেন। আরও বললেন যে, ঐ বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজেও একবার একটি ছবি করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। নন্দলাল বিষয়টি এঁকে নিয়ে এলেন। আচার্য্য তার উপরে দু-তিনটি 'ওয়াশ' দিয়ে দিলেন মাত্র। এটা কর, ওটা কর, এইভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতেন না। হাতে ধরেও কাউকে কিছু শেখাতেন না।

নন্দলাল বসুকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "হাতে ধরে দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাই নি। ছবি করে নিয়ে আসত, আমি শুধু কয়েকটি ওয়াশ্‌ দিয়ে মোলায়েম করে দিতুম, যেমন ফুলের উপর সূর্য্যের আলো বুলিয়ে দেয়া—সূর্য্য নয় ঠিক, আমি তো রবি নই, নানা রঙের মাটিরই প্রলেপ দিতাম।"

ছাত্রকে চিত্র-রচনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দেশ দানের ব্যাপারে শিক্ষকের দায়িত্বও অনেক। সময় সময় তা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণও হয়।

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১১৮

অবনীন্দ্রনাথের জীবনেও এই ব্যাপারে কয়েকবার অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসু একবার বেশ বড় একখানি ছবি করলেন। বিষয়: উমার তপস্যা। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে উমা তপস্যারতা। মাথার উপরে সরু চাঁদের রেখা। ছবিতে রঙ বিশেষ পড়েনি। সারা পটে গৈরিক রঙের আবছা আবেশ। অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি দেখে বললেন—

"নন্দলাল ছবিতে একটু রঙ দিলে না? প্রাণটা যেন চড়বড় করে ছবিখানির দিকে তাকালে। আর কিছু না দাও অন্ততঃ উমাকে একটু সাজিয়ে দাও। কপালে একটু চন্দন-টন্দন পরাও, অন্ততঃ একটি জবা ফুল।"

স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করে এলেন সেদিন অবনীন্দ্রনাথ! নন্দলালকে নির্দেশ দিয়ে ফেললেন। বাড়ী ফিরে রাতে চোখে ঘুম নেই। মাথায় কেবল একটি কথা ঘুরছিল। কেন তিনি উমাকে সাজাতে বললেন। নন্দলাল তো তাঁর (গুরুর) মত করে উমাকে দেখেন নি। তিনি হয়ত দেখেছেন শৈলসুতা উমা পাথরের মতই কঠিন, তপস্যা ক'রে ক'রে তাঁর দেহের রঙ-রস সব চলে গিয়েছে। কাজেই সে উমার রূপ দেখে মন বেদনার্ত্ত হয়, বুক ফেটে যায়। সে উমার আবার সাজগোজ, চন্দন-তিলক কি! সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কখন ভোরের আলো ফুটবে এই চিন্তা। ভোর হতেই ছুটে গেলেন শিষ্যের আলয়ে। মনে ভয়, নন্দলাল যদি রাত্রিতেই ছবিতে রঙ্ চড়িয়ে থাকে। গিয়ে দেখেন শিল্পী ছবিটির সামনে বসে ভাবছেন, রঙ লাগাবার আগে শেষ ভাবনা।

আচার্য্য ছুটে গিয়ে বললেন—

"কর কি নন্দলাল, থামো থামো, কি ভুলই আমি করতে যাচ্ছিলুম, তোমার উমা ঠিকই আছে। আর হাত লাগিয়ো না।"

এই ঘটনার পরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি যেন একটা সর্ব্বনাশ করতে গিয়েছিলেন। ভালো ছবিটি প্রায় নষ্ট হতে চলেছিল। সেই থেকে তিনি ও বিষয়ে আরও সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আরও ধারণা হয়েছিল যে, ছবি শিল্পীর নিজের সৃষ্টি, অন্য কারোর তাতে উপদেশ দানের কিছু নেই।

কিন্তু শিল্পাচার্য্যের সামান্য একটু উপদেশে ও যাদুস্পর্শে এক একটি রচনা যে অসাধারণত্ব লাভ করতো এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

ছাত্রাবস্থায় একবার নন্দলাল বসু একটি মেয়ের ছবি করে গুরুকে দেখাতে নিয়ে এলেন। মেয়েটির গড়ন, চেহারা বেশ ভাল, চোখ, ভ্রূ টানাটানা। আর

কিছু নেই পটে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, ওটি কৈকেয়ীর ছবি হয়েছে। এখন পিছনে মন্থরার চেহারা এঁকে দেয়া হোক্।' তাই হোল, দাঁড়িয়ে গেল কৈকেয়ী-মন্থরার চিত্র। গুরুর অমূল্য নির্দেশটি না পেলে ছবিটি অনামা ও কাহিনী-কাব্যহীন একটি স্টাডি হয়েই থাকতো।

'Indian Society of Oriental Art'-এর প্রদর্শনী থেকে তিনি ও তদীয় অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ছাত্রদের উৎকৃষ্ট সব ছবি কিনে রাখতেন। নন্দলালের বিখ্যাত ছবি 'সতী'-র প্রতি আচার্য্যের বিশেষ আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি সেটি কিনবার সুযোগ পাননি। সেটি কিনলেন, সোসাইটির উৎসাহী সভ্য থর্নটন সাহেব। তারপরে স্থির হোল অন্যান্য ছবির সঙ্গে ওটিকেও জাপানে পাঠানো হবে উত্তম প্রতিলিপি তৈরীর জন্য। কিছুকাল পরে ছবিটি জাপান ঘুরে-ফিরে এল বটে, কিন্তু ছবিটিকে আর চেনা যায়নি। একেবারে বদলে গিয়েছিল, রঙ সব পুড়ে যেন ছাই হয়ে গিয়েছিল। সাহেবের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ছবিটি নিয়ে তিনি কি করবেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইলেন রঙ ফেরানো সম্ভব কিনা। উত্তর পেলেন, সম্ভব নয়। তারপরে অবনীন্দ্রনাথ সাহেবের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, ছবিটি যদি তিনি না রাখেন তাহলে তিনি ওটি নিয়ে তৎপরিবর্ত্তে অন্য ছবি দিতে পারেন। সাহেবের প্রস্তাব—আচার্য্যের নিজের হাতের ছবি দিতে হবে। তিনি রাজী হলেন। সাহেব নিলেন অবনীন্দ্রনাথের দু'খানি ছবি। তন্মধ্যে একটি ছিল ঔরঙ্গজেব ও দারার মুণ্ড।

অবনীন্দ্রনাথ 'সতী'কে বাড়ীতে এনে খোলা হাওয়াতে জানালার পাশে টাঙিয়ে রাখলেন। কিছু দিন পরে দেখা গেল আলো হাওয়াতে 'সতীর' রঙ ফিরে এসেছে, পোড়া রঙ ধুয়ে-মুছে গেছে, আসল রঙ ফুটে বেরিয়েছে। কিন্তু সে ছবি আর থর্নটনের কাছে ফিরে যায়নি। তিনিও চাননি।

শিষ্যের শ্রেষ্ঠ রচনাটির আকর্ষণে ও তার মূল রূপ ফিরিয়ে আনার আগ্রহে অবনীন্দ্রনাথ নিজের একখানি শ্রেষ্ঠ রচনাকে করলেন হাতছাড়া। মুঘল বিষয়ক ছবির মধ্যে তাঁর 'দারার মুণ্ড' একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কিন্তু প্রিয় শিষ্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি ব্যর্থ হতে চলেছিল। তাকে রক্ষা করার জন্য তখন তাঁর মন এত ব্যাকুল হয়েছিল যে, নিজের কি গেল আর এল, সেদিকে তাঁর কোন খেয়াল ছিল না। এই জাতীয় দরদ, এই মেজাজ ও ঔদার্য্য দেনা-পাওনার জগতে বিরল দৃষ্টান্ত ও অমূল্য সম্পদ।

জাপান থেকে এখানে সর্ব্বাগ্রে যে দুটি তরুণ চিত্রশিল্পী এসেছিলেন

অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রাঙ্কন ও চিত্রভাবনা বিনিময়ের জন্য, তাঁরা হলেন হিশিদা ও টাইকান। তাঁরা এদেশের শিল্পীদের দেখাতেন জাপানী টেক্‌নিকের কায়দা কানুন, আর অবনীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের ভারতীয় চিত্ররীতির মর্ম্মকথা। হিন্দু দেবদেবীর লক্ষণাবলীর বর্ণনা শুনে শুনে তাঁরা মূর্ত্তি রচনাও করতেন।

একবার অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্টুডিয়োর দেয়াল জোড়া মাপের একখানি ছবি আঁকতে বললেন টাইকানকে। বিষয়: রাসলীলা। জাপানী শিল্পীকে অবনীন্দ্রনাথ ভাল করে রাসের বর্ণনা দিলেন, মর্ম্ম-রহস্যও বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে এনে শাড়ী পরার ধরণ-ধারণ, আঁচল ঘোরানো সব প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলেন। পুরোনো মূর্ত্তির ছবি দেখিয়ে গয়নাগাটি কেমন হবে তাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। মস্ত বড় একটি রেশমী পটে ছবির কাজ শুরু হোল। ছবির কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেলেও টাইকান ছবিটিকে শেষ করে তুলছেন না। ছাত্রবৎসল আচার্য্য অনুভব করলেন কোথায় যেন একটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সরাসরি তিনি জানতে চাইলেন ব্যাপার কি? টাইকান বললেন, যে তিনিও ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না; তবে কিসের যেন একটা অভাব বোধ কচ্ছেন। সুরসিক স্নেহশীল গুরু বুঝে নিলেন সমস্যার নিগূঢ় মূলটি কোথায়। তারপরে তিনি কি যেন মন্ত্র দিলেন বিদেশী ছাত্রের কানে কানে। তাঁর মনের ভার নেমে গেল, মুখের কালিমা গেল কেটে।

পরদিন টাইকান বালিগঞ্জ থেকে সবে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর স্টুডিয়োতে এসেছেন। তার কিছু আগে বাড়ীর মেয়েরা শিউলি ফুল তুলে রেখে গেছেন সেই ঘরে। হাওয়ায় কিছু ফুল মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। টাইকান তা দেখে হাতে কিছু ফুল নিয়ে ছবিটির গায়ে দিলেন ছড়িয়ে। তার effect দেখে মুখে আর হাসি ধরেনি তাঁর। অবনীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন মজাটা। ফুল ছড়ানো ছবিটিকে ভাল করে দেখে টাইকান ফুলগুলিকে তুলে নিয়ে বসলেন ছবির সামনে। আর ক্রমে ক্রমে হাতের ফুল তুলির ডগায় উঠে রঙে-রেখায় ছড়িয়ে পড়লো ছবির পটে। সাদা ও কমলা রঙ-এ মিলে পটের বুকে পুষ্প বৃষ্টি হোল শিল্পীর তুলিকাতে। রাসলীলার নৃত্যে ফুলের ছড়াছড়ি, রাধার হাতে কদম ফুল, গলায় শিউলির মালা, কৃষ্ণের বাঁশীতেও মালা জড়ানো। নৃত্যের তালে ছন্দে মেঝেতেও ফুল ছড়িয়ে পড়লো। ছবি হেসে উঠলো। রাসলীলা এবারে পূর্ণ হোল গুরুদত্ত মন্ত্র-সাধনায়। নিজের

হাতে বালুচরী শাড়ীর আঁচল বসিয়ে ছবিটিকে বাঁধালেন টাইকান। আর গুরুকে বললেন, এ ছবি আপনার, আপনি এর শেষ মন্ত্রদাতা। বিদায়ের লগ্নে টাইকান সেটি তাঁর ভারতীয় গুরুকে উপহার দিয়ে গেলেন অন্তরের শ্রদ্ধা জড়িত করে।

তারপরে কয়েক বছর কেটে গেল। ১৯১৮ সালে জাপানের জনৈক শিল্পপতি মিঃ সেণ্ডা কলকাতায় এলেন। স্বদেশের শিল্পীর সেই ঘর জোড়া ও আলো করা ছবি দেখে তিনি পাগল আর কি! বহু চেষ্টা যত্ন ও নানা অনুরোধ করে অবনীন্দ্রনাথকে রাজী করলেন সেই মন-মাতানো ছবিখানির মায়া ত্যাগ করতে। বিনিময়ে এল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার একখানি চেক্। শিল্প-প্রিয় দেশ জাপান। স্বদেশের শিল্পকৃতিকে সম্মান দিলেন তাঁরা এই ভাবে। দেশের সম্পদ নিয়ে গেলেন তাঁরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে। ছবিটি এদেশে আর রইল না। তার অপরূপ রূপ-স্মৃতি মাত্র মুদ্রিত হয়ে রইল 'রূপম্' পত্রিকার রঙীন প্রতিলিপিতে। গুরু-শিষ্য মিলনের অভূতপূর্ব্ব ভাবমূর্ত্তি, অপূর্ব্ব স্মৃতি-চিত্র সেটি।

জাপান থেকে আগত সেই ছাত্র-শিল্পীদের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ ভালবাসার ধারা শুকিয়ে যায়নি কোনদিন। হিশিদা দেশে ফিরে গিয়ে আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। টাইকান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাচ্ছেন, সঙ্গে নন্দলাল বসুও যাবেন। তা শুনে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের হাতে দিলেন টাইকানকে দেবার জন্য নক্সাযুক্ত একটি ব্রোঞ্জ, আর তাঁর স্ত্রীর জন্য দিয়েছিলেন এ দেশের শাড়ী ও জামার কাপড়। ভারতীয় গুরুর স্নেহসিক্ত উপহার পেয়ে তিনি যে অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কোন দিন বিদেশ ভ্রমণ না ক'রেও অবনীন্দ্রনাথ এই ভাবে দেশ-বিদেশকে স্নেহ সূত্রে ও মিলনের রাখিবন্ধনে বেঁধেছিলেন তাঁর উদার মহৎ ও দরদী মনের নিবিড় স্পর্শে।

আঙ্গিক-রীতির ব্যাপার নিয়েও তিনি ছাত্রদের সঙ্গে অনেক সময় খুব মজা করতেন। তিনি তো দেশ-বিদেশের কত শত চিত্র-রীতি অনুশীলন ক'রে, তাদের রস-রহস্য উদ্ধার করে, তাকে নিজের রসের ভিয়ানে চাপিয়ে নতুন নতুন রস-রূপ করেছেন সৃষ্টি। তার ফলে তাঁর চিত্রপটে দেখা যায় কত অনন্ত রকমের টেকনিক্। হাজার পটে হাজার ভঙ্গী, সহস্র রকম তুলি কলমবাজী। রঙ-রেখার প্রবাহ যেন শতমুখে অনন্ত-পথে হয়েছিল ধাবিত। এক এক পর্য্যায়ের ছবিতে এক এক প্রকার আঙ্গিকের প্রকাশ। সবই

ভিন্ন ও নতুনতর। অন্য কোন দেশ, কোনও যুগের কারোর সঙ্গে তার হুবহু মিল নেই। কিন্তু সব ছবিতেই মূল সুর অভিন্ন।

তাঁর ছাত্র-শিষ্যরাও অনেক সময় সেই অভিনব ও নবতর রীতি-পদ্ধতির রহস্য কোথায় তা ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না। মোটামুটি সকলেই জানতেন, আচার্য্য wash technique-এর স্রষ্টা এবং তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনা এই পদ্ধতির। কিন্তু আসলে তাঁর 'ওয়াশ' পদ্ধতিও একটি বাঁধা-ধরা নিয়মে কখনও চলেনি। প্রয়োজনমত তিনি তার মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন এনেছেন। অনেক নতুন চিন্তা-চেষ্টার ছাপ দেখা যায় নানা চিত্র মধ্যে।

একবার সোসাইটির প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর এক সেট্ পাখীর চিত্র হাজির করেছিলেন। চিত্রগুলির কল্পনাবৈভব ও তুলিবাজী দেখে তো সকলে অবাক! তখন তাঁর জনৈক নামজাদা ছাত্র বললেন, "এ কায়দাটা তো শেখান নি আমাদের।" তিনি তখন বেশ মজা করে জবাব দিয়েছিলেন, "সবই শিখিয়ে দেব নাকি? অনেক প্যাঁচ এখনও শিখি, রেখে দিই, তোমরা লড়তে এলে তখন শেখাব।"

'অনেক প্যাঁচ এখনও শিখি'—কথাটা অতীব সত্য। শিল্পী-জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি শিখেই গেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল সারা জীবন ধরে। নতুনের সাধনার শেষ ছিল না। জীবনের শেষ সন্ধ্যা-লগ্নের ছবিতেও দিয়ে গেছেন কত নতুন নতুন ভাব ও ভাষা।

ছাত্রদের ধরে ধরে তিনি শেখাতেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁদের ভুল ত্রুটী সংশোধন করে উপদেশ-নির্দেশ দিতেন যেমন দরদী মন নিয়ে, তেমনি আবার আনন্দ-কৌতুকসহকারে। ছাত্রদের ছবি নিন্দিত হবে, তাঁদের সুখ্যাতি সুনাম হবে না, তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। পুলিনবিহারী দত্ত ছাত্রাবস্থায় একবার 'শিশু-ক্রোড়ে জননী' নামে একটি ছবি দিয়েছিলেন সোসাইটির প্রদর্শনীতে। ছবিখানিতে মাতৃমূর্ত্তির পায়ের সংস্থান ও অঙ্কন ভাল উতরোয় নি দেখা গেল। দর্শকরা তা নিয়ে নানা বিরূপ মন্তব্যাদি করেন। আচার্য্য তা শুনে মনে ব্যথা অনুভব করলেন। কিন্তু কাউকে কিছু বলেন নি। রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় সকলের অজানতে তিনি ছবিটি দেয়াল থেকে খুলে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে সেটিকে ঘষে-মেজে দোষ মুক্ত করে আবার এনে যথাস্থানে টাঙিয়ে দিলেন। সকলে দেখে তো অবাক! মাতৃমূর্ত্তির সেই দোষ-ত্রুটী কোথায় গেল? আচার্য্য উচ্চ-হাসি হেসে বললেন, আরে ওর পায়ে যে আজ সকালে অ্যাম্পুটেশন

হয়ে গেছে। ছবিখানি তখন এমন সুন্দর ও মনোরম হয়েছিল যে তৎকালীন লাটসাহেব লর্ড রোনাল্ডসে সেটি কিনে নিয়েছিলেন খুব আগ্রহসহকারে। গভর্ণর আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ করে করমর্দনও করেছিলেন। তা দেখেও সুরসিক গুরু শিষ্যের সঙ্গে নানাভাবে কৌতুক করে সকলকে আনন্দ দিয়েছিলেন।[১]

তাঁর 'পঞ্চপাণ্ডব' শিষ্যের মধ্যে শৈলেন দে সেদিনও আচার্য্যের কাছে শিক্ষালাভের সুমধুর দিনগুলির স্মৃতি বহন করে চলেছিলেন। সেই কৌতূহলকর অভিনব শিক্ষাদান-রীতির বর্ণনায় তিনি ছিলেন মুখর।

তখন ছাত্রসংখ্যা সীমিত; মাত্র পাঁচটি। পরিবেশ ছিল অত্যন্ত ঘরোয়া। ছাত্ররা সকলে মিলে মিশে কাজ করতেন। সিনিয়র ছাত্র নন্দলালের উপর ভার দিতেন জুনিয়রদের সাহায্য করার। তিনি সমগ্র ক্লাসটিকে পরিচালনা করবেন এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন স্বয়ং আচার্য্য। ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ-দরদ ছিল পুত্রবৎ। মনে হোত, ওদের সব দায়িত্ব যেন তাঁরই।

সেইজন্যই তিনি নিবেদিতার অনুরোধে নন্দলাল, অসিত হালদার প্রমুখকে অজন্তায় পাঠিয়ে নিদ্রাবিহীন রজনী যাপন করেছিলেন তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে ক'রে।

ছাত্রদের অনেক সময় তিনি ডেকে পাশে বসাতেন। বলতেন, চোখ বন্ধ কর। তারপরে তাঁদের গায়ে কখনও তুলির ডগা, কখনও পেন্সিল বা নিজের আঙুল বুলিয়ে প্রশ্ন করতেন, বল তো কি? এর মানে ছাত্রদের sensitiveness পরখ করা। যিনি সঠিক উত্তর দিতেন, তাঁকে বলতেন, তোমার হবে।

ছাত্রদের একটানা বেশী কাজ করতে বারণ করতেন। যতটুকু পর্যন্ত মনে হবে ঠিক হয়েছে, করে আনন্দ পাওয়া যাচ্ছে, ততটুকুই করবে। তারপরে থেমে যাবে। ছাত্রদের নিয়ে বসে কথকের মত গল্প-কাহিনী বলতেন। আর্ট স্কুলে তো এজন্য সুব্যবস্থা ছিলই।

অন্যের ছবি কপি করা নিষেধ ছিল। Nature study বেশী করাতেন না। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মূর্ত্তি প্রতিমা দেখে ড্রইং স্কেচ বেশী করার নির্দেশ দিতেন। বর্ণ-প্রয়োগের ব্যাপারে বলতেন, রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রের বর্ণ-বিন্যাস খুব স্টাডি ক'রে ক'রে মনে ধরে রাখবে। তারপরে প্রয়োজন মত নিজের মত করে ইচ্ছানুযায়ী তা কাজে লাগাবে।

১. ভারতের শিল্প ও আমার কথা: ও. সি. গাঙ্গুলী। পৃঃ ২২৬

ছবি আঁকার আগে ধ্যান করে নেবে। অর্থাৎ যা আঁকবে সেই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করবে। সাদা কাগজটি সামনে রেখে বসে বসে চিন্তা করবে। যেই ছবিটি মনে ভেসে উঠবে অমনি কাগজে হাত লাগাবে। ছাত্রদের ড্রইং হয়ে গেলে অনেক সময় তিনি নিজের হাতে তা সংশোধন করে দিতেন। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে, ছবি finished হলে, burnt sienna দিয়ে outline টেনে দেবার নির্দেশ দিতেন।

ড্রইংটি হয়ে গেলেই ছবির বিভিন্ন অংশ, অঙ্গ-অবয়ব এবং বেশভূষার—কোথায় কি রঙ দেয়া হবে, তা একবারে ঠিক করে নেয়া চাই। একটি কাজ করে, আর একটির কথা ভাববো, এমনটি হবে না। যে রঙে কাপড় জামা বা দেহ রচনা হবে, সেই রঙেতেই হবে outline; রঙ সর্ব্বদা হালকা ধরনের হবে। Burnt Sienna-ও হবে হালকা। কালো রঙ খুব কম ব্যবহার করতে বলতেন। সবশেষে চুলে, চোখে ও ভ্রূ-তে কালো রঙের টান পড়বে।

ছবির মূল ভাবটি ড্রইং-এর সময়ই আসা চাই। শেষ পর্য্যন্ত সেই গোড়ার ভাবটিকেই বজায় রাখতে হবে। রঙ চাপিয়েও সেই ভাব ঠিক রাখতে হবে।

Wash Technique তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। অন্য দেশীয় রীতিকে হুবহু নকল করেন নি। তাঁর wash, তাঁরই। গোটা পটে নির্দ্দিষ্ট রঙ চাপিয়ে জলপূর্ণ পাত্রে সেটিকে পুরো ডুবিয়ে রাখতেন দু'তিন মিনিট। তারপরে তুলে তাকে বোর্ডে রেখে শুকোতেন। প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারে রঙ fix করার জন্য যতবার খুশী ততবার পটকে জলে ডোবাতেন। তার ফলে ছবিতে depth আসতো।

শিল্পী-জীবনের প্রায় গোড়া থেকেই তিনি ছবিতে সোনা লাগাতে আরম্ভ করেন। গয়নাগাটি, কাপড়-জামা সব কিছুতেই তিনি সোনার ছোপ দিতেন। ছবির কাজ সব শেষ হয়ে গেলে সোনার ছোপ বা লাইন দিতেন। কোথাও রঙ বেশী পড়লে বা রঙ তুলবার প্রয়োজন হলে, তা সোনা দিয়ে ঢেকে দিতেন। ছাত্রদেরও সেই কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

ছাত্রদের মোটামুটি চার-পাঁচ বছর কাছে রেখে শেখাতেন। তারপরে ছেড়ে দিতেন। আর্ট স্কুলের কথা আলাদা। সোসাইটিতে কোনও ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট দানের ব্যবস্থা ছিল না। গোড়ার দিকে রঙ, তুলি, দুই-ই বিদেশী ব্যবহার করতেন। রেশমী কাপড়েও ছবি করেছিলেন, তবে খুব কম। Technique-এর ব্যাপারে খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। মাঝে মাঝে

ছবির পটে মিহি মাটির হালকা পোঁছ লাগিয়ে দিতেন। নাটকের ছবি আঁকার সময় কিছু মাটির ব্যবহার করেছিলেন।[১]

ছাত্ররা তাঁর কাছে চিরকালই ছাত্র। নির্দ্দেশ-উপদেশ চাইলে তা পাওয়া যেত সর্ব্বদা। ১৯১৬ সাল। অবনীন্দ্র-শিষ্য শৈলেন দে তখন বারাণসীতে রয়েছেন। আর অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় অগ্রজগণ গিয়েছেন মুসৌরীতে। বারাণসীর প্রখ্যাত কলাবিদ ও শিল্প-সংগ্রাহক রায় কৃষ্ণদাসজীর সঙ্গে শৈলেনবাবুও গিয়েছিলেন মুসৌরী পাহাড়ে। সেখানে অনেক দিন পরে আবার গুরু-শিষ্য মিলন-পর্ব্বে স্থির হয় যে, শৈলেনবাবু বারাণসীতে ফিরে গিয়ে এক সেট্ মেঘদূতের ছবি করবেন। প্রস্তাবক রায় কৃষ্ণদাসজী। আরও স্থির হোল যে, ছবিগুলির ড্রইং-স্কেচ করে মুসৌরীতে পাঠানো হবে শিল্পাচার্য্যের কাছে। তিনি তা অনুমোদন করলে তবে শিল্পী রঙ চাপাবেন। তার আগে নয়।

অবনীন্দ্রনাথ সেই স্কেচগুলির পেছনে পেন্সিল দিয়ে comment লিখে পাঠাতেন। তা যেমন শিক্ষাপ্রদ ও শিল্পীর এগিয়ে চলার পথে সহায়ক হয়েছিল, তেমনি মজাদার ও কৌতুককর। সেই লেখাগুলি অদ্যাপি ছবির পশ্চাতে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এবং অবনীন্দ্রনাথের রহস্যমধুর মানস-চিত্র ও ছাত্রকে নির্দেশ দানের নিখুঁত রূপটি বহন করে চলেছে।

নির্ব্বাসিত যক্ষের ছবির পিছনে লিখে দিয়েছিলেন—যক্ষের চেহারাটা বদলে দাও। পাহাড়ের প্রাচীরে আলোটা জেঁকে পড়েছে। যক্ষ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। যক্ষের চেহারাটা হয়েছে অতি দুর্ব্বল ; পূর্ব্ববঙ্গের ম্যালেরিয়া রোগীর মত। বদলে দাও। কি রকমে বদলাবে—অশ্বত্থ গাছের পাতা ঝ'রে গেলে যেমন হয়, তেমনি। অর্থাৎ উপরে একটা শূন্যতা, ভেতরে কিন্তু শক্তিও জোর থাকবে।

দ্বিতীয় ছবিতে লিখে পাঠালেন—এখানে যক্ষিণীর চেহারাটা দর্শকের imagination-এর উপরে রেখ।

শিল্পী তারপরে যক্ষকে দিয়ে যক্ষিণীর চিত্র শিলাফলকে অঙ্কনের দৃশ্য আর প্রত্যক্ষ রচনা করেন নি। যক্ষের হাতে তুলি দিলেন, পাশে রাখলেন রঙের পাত্র। এই হোল যক্ষিণী figure-এর symbol।

তৃতীয় চিত্রের বিষয় হোল—পাহাড়ের মাঝে হ্রদে পদ্মফুলের সমারোহ,

১. Technique, ছাত্রদের শিক্ষাদান ও তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে এই তথ্যগুলি শৈলেন দে'র কাছ থেকে আহরিত।

তিনটি হাঁস, পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ব্যাঙের ছাতা (সাদা), গাছপালা, ঝোপঝাড়, আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘমালা, দুটি উড়ন্ত হাঁস, মুখে তাদের মৃণাল।

ছবি finish করার আগে অবনীন্দ্রনাথ sketch দেখে লিখে পাঠালেন—

এটা বেশ হয়েছে। খালি একদল হাঁস মৃণাল মুখে নিয়ে মেঘের সঙ্গে উড়ে চলেছে, তা করলেও মন্দ হোত না। বেঙের ছাতা না দেখে এই শ্লোকটার মধ্যে যেটা বড় জিনিস ও আসল জিনিস হাঁসেদের সেই হিমালয়ের মানস সরোবরে উড়ে গিয়ে পড়বার (ঘরে ফেরবার) ব্যাকুলতা এটা দেখানো চাই, সবাই চলেছে ফিরে কেবল ছত্রকের মত ঐ যক্ষ মাটি ছাড়তে পারছে না। সে আটকা পড়েছে, মন তার উড়ছে।[১]

১. ছবিগুলির পিছনে অবনীন্দ্রনাথের লেখার হুবহু রূপ। প্রথম ছবিটি সম্বন্ধে সবখানি এখন লিখিত নেই। শেষাংশ শৈলেন দে মহাশয়ের মুখে শোনা।

॥ ৬ ॥

সাধারণ একটা ধারণা আছে যে, ভারতীয় চিত্র-পদ্ধতিতে আলোছায়া-পাতের প্রথা নেই, বাস্তবিকতার প্রয়োগ নেই, প্রকৃতিকে অপরিবর্ত্তিত রূপে চিত্রে স্থান দেবার বিধি নেই, সুতরাং তদ্দ্বারা মানুষের সার্থক প্রতিমূর্ত্তি রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের চিত্রকলার ইতিহাস-ঐতিহ্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বাস্তবানুগ মুঘল আলেখ্য ব্যতীত রাজস্থানী ও পাহাড়ী শৈলীতেও প্রচুর সফল ও সুন্দর প্রতিকৃতি চিত্র রচিত হয়েছে।

কালক্রমে এদেশে পাশ্চাত্য প্রথায় কলা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হতে ভারতীয় শিল্পীরা স্বভাববাদী প্রতিকৃতি রচনায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করে নতুন শিক্ষাকে সার্থক করে তুলেছিলেন। তেলরঙ-এ মূর্ত্তি-চিত্রায়ণের বিলিতী রীতি দেশীয় জলরঙ-এর রেখা-প্রধান প্রতিকৃতি অঙ্কনের ধারাকে আচ্ছন্ন ও অপ্রচলিত করে দিয়েছিল অচিরে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ লগ্নে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই বিষয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টির শুভসূচনা করেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষার মূল ভিত্তি তৈরী হয়েছিল পাশ্চাত্য প্রথায় বাস্তববাদী রীতিতে। সুতরাং anatomy, perspective, chiaroscuro, composition, light and shadow ইত্যাদির মূল তত্ত্ব তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বিশেষ সুষ্ঠুভাবে। তার ফলে তিনি যখন স্বদেশের চিত্রকলার রহস্য উদ্ধারে ব্রতী হলেন, তখন তাঁর তুলিকায় মানুষের প্রতিকৃতি রচনার ধারাও একটা নবতর খাতে প্রবাহিত হতে থাকে।

শিল্পরীতির ব্যাপারে তিনি কখনই রক্ষণশীলতার পরিচয় দেননি। তিনি দেশী-বিদেশী সমুদয় চিত্রপদ্ধতি থেকেই রস ও উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তবে তাকে আত্মসাৎ করে, সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ও রূপে এবং নিজের করে প্রকাশ করেছেন।

প্রতিকৃতি অঙ্কনেও সেই একই কথা, একই ভাব-বুদ্ধির প্রেরণা। পাশ্চাত্য প্রথায় মানুষের মূর্ত্তি রচনার মৌল আদর্শের ভিত্তিতে তিনি স্বকীয় ভাবধারায় চিত্রায়িত মানুষটিকে কিন্তু স্বতন্ত্র ভাব ও সৌন্দর্য্যেমণ্ডিত করে তুলেছেন। প্রথম পর্য্যায়ে তিনি তেলরঙ-এ অনেক মূর্ত্তিচিত্র অঙ্কন করেন। পরে ধরলেন প্যাস্টেল ও জলরঙ। শেষ পর্য্যন্ত এই দুটির মাধ্যমেই তিনি মানুষের চেহারা-চরিত্র ফুটিয়ে তুলতেন পটের বুকে। প্যাস্টেলে মূর্ত্তিচিত্র

রচনায় তিনি শুরু থেকেই অতি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন যখন, তখনও সেই প্রতিভা-দ্যুতি ছিল অম্লান।

শিল্পী-জীবনে পালা পরিবর্ত্তনের পরে, যখন 'দেশী মতে' চিত্র-সাধনায় তিনি মগ্ন, তখন যেসকল প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান হোল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্যাস্টেল) ও রবীন্দ্রনাথের (প্যাস্টেল) মূর্ত্তিচিত্র। মহর্ষির মূর্ত্তিচিত্র করেছিলেন তিনি দু'খানি। শান্তিনিকেতনস্থ বিচিত্রা-ভবনের সংগ্রহে একটি আছে, সেটি পেস্টবোর্ডে প্যাস্টেলে অঙ্কিত। Highlight-এর প্রয়োগে রচিত। প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ। মূর্ত্তিখানি বাস্তবানুগ। তবে শিল্পী বর্ণ-প্রয়োগে ও আলোছায়াপাতে কিছু নিজস্বতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাহলেও, তিনি তখনও, পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষালাভের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দু'খানির মধ্যে, এইটিই সম্ভবতঃ প্রথম সৃষ্টি। বিচিত্রা-ভবনের রেকর্ড থেকে এই কথাই জানা যায়। তারিখ চিহ্নিত আছে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ (ইং 11th. May, 1897)। কিন্তু ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ইংরেজী ১১ই মে হওয়া স্বাভাবিক নয়।

সেই সময় এবং পরবর্ত্তী আরও কিছুকাল অবনীন্দ্রনাথ প্রতিকৃতি রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই highlight-এর প্রয়োগ করতেন। তা অনেকাংশে realism-এর ভিত্তিতেই অঙ্কিত।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মূর্ত্তিখানি প্রথমোক্তটির ন্যায় পুরো পার্শ্ব-দৃষ্টিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়টি থ্রি-কোয়ার্টার রূপের। দাড়ি কিছু বেশী লম্বা। এখানিও প্যাস্টেলের। তবে অতি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন। ধ্যানগম্ভীর ভাবময় মূর্ত্তি। দু'খানি ছবিতে মহর্ষির চেহারা কিছু ভিন্নতর হলেও, কাছাকাছি বয়সের আলেখ্য বলেই মনে হয়।

স্কেচ ড্রইং-এর মাধ্যমেও দেবেন্দ্রনাথের রূপাভাস পাওয়া যায় শিল্পীর প্রথম পর্য্যায়ের সৃষ্টির মধ্যে। শামিয়ানার নীচে একটি সভাতে দেবেন্দ্রনাথ ভাষণ দান করছেন। সম্ভবতঃ প্রার্থনা সভা। রচনাকাল সুনির্দ্দিষ্ট না হলেও, সম্ভবতঃ ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে অঙ্কিত। সূক্ষ্ম কলমের ছোট স্কেচ, অনেক মানুষের সমাবেশ। তবে মূল বক্তার চেহারা সুস্পষ্ট। আদল, আকৃতি মোটামুটি স্বাভাবিক। রেখাচিত্র, কিন্তু জমজমাট। প্রতিটি মানুষের চেহারা স্বতন্ত্রভাবে লক্ষণীয়। আবার সকলে মিলে যে একটি বিশেষ

চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন, তাও হয়েছে পরিস্ফুট। স্কেচটির মধ্যে একাত্মতার একটি ঘন রূপ চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

এই ধরনের স্কেচ ড্রইং-এর মাধ্যমে তিনি আরও অনেকের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তখন এমন হয়েছিল যে, যাঁকে কাছে পেতেন তাঁরই স্কেচ পোর্ট্রেট এঁকে তুলতেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় হোল ঈশ্বর মুখার্জ্জীর প্রতিকৃতি (১৮৮৭), নাটোরের মহারাজার অল্প বয়সের একটি পাখোয়াজ বাজানোর ছবি (স্কেচ), আরও কিছুকাল পরে অঙ্কিত (১৮৯৫) তাঁর আর একটি বেশী বয়সের চিত্র। এই স্কেচধর্ম্মী ছবিগুলি পাশ্চাত্য রীতিতে অঙ্কিত। কয়েকটি রচনা অতি সূক্ষ্ম ও সুপরিণত।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চ্চার প্রথম পর্য্যায়ে অঙ্কন ও গান-বাজনা একসঙ্গেই চলতো। গান-বাজনা উপলক্ষ্য করেই নাটোরের মহারাজার সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই সূত্রেই অবনীন্দ্রনাথের কলমে মহারাজার নানা প্রকার মূর্ত্তিচিত্র প্রস্ফুট হয়েছিল। তখনকার কথার বর্ণনা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"নাটোরের মহারাজার সঙ্গে এই সময় আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে নাচ-গানের আসরে আমাদের নিমন্ত্রণ হ'ত। এসব আসরে রবিকাকাও কথনো কথনো নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। তখন সঙ্গীতের পিপাসা মনে এত জেগেছিল যে, ভাল গান শুনবার জন্য মন সর্ব্বদাই উৎসুক থাকতো। আর হাতে চলতো ছবির স্কেচ, স্কেচের পর স্কেচ করে গেছি।"[১]

সেই সময়েই (১৮৯১-৯৪) অঙ্কিত শাহীবাগে (আমেদাবাদ) রবীন্দ্রনাথ চিত্রখানি আর একটি নতুন ভাব ও মূর্ত্তি চিত্রায়ণের নবীন বার্ত্তাবহন করে এনেছিল। লেকের ধারে গালিচার উপরে আরাম কেদারায় বসে আছেন কবি; পায়ে চটি জুতা, গায়ে চাদর জড়ানো। কবির রূপ চিন্তামগ্ন। তিনি ভাবতন্ময়। পার্শ্বদৃষ্টি রূপ, চোখ মুখ সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু আসনভঙ্গী ও সমগ্ররূপে প্রস্ফুট হয়েছে একটি চমৎকার আকর্ষণীয় ভাব।

এই জাতীয় স্কেচ-চিত্রের প্রধান লক্ষণ হোল যে সেখানে কেবল রেখার কারিগরী নয়; সাদা-কালোয় মিশে একটা রঙের আমেজ (Tonal effect) অনুভূত হয়। রেখাঙ্কনের কৌশলে বর্ণহীন ছবিতে যেন বর্ণাঢ্য চিত্রের সুর-ছন্দ লীলায়িত হয়েছে। শাহীবাগে রবীন্দ্রনাথ ছবিটিতে সূক্ষ্ম রেখার আঁচড়ে বস্তুসমূহের রূপ ও দূরাভাস (perspective) ফুটে উঠেছে চমৎকার।

১. স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা দেবী। পৃঃ ৫০

কবির সেই বয়সেরই আর একটি মূর্ত্তি-চিত্র অবনীন্দ্রনাথের হাতে আরও মনোরম, আরও সুষমামণ্ডিত হয়েছিল কলকাতার Bose Institute-এ সংরক্ষিত প্যাস্টেলের বর্ণাঢ্য পোর্ট্রেটে। ১৮৯৪ সালে অবনীন্দ্রনাথ পোর্ট্রেট অঙ্কনে সিদ্ধ-শিল্পী। এমন বর্ণবাহার; এমন স্বাভাবিক অথচ ভাবময় মূর্ত্তি প্যাস্টেলের চিত্রে অত্যন্ত বিরল। সর্ব্বোপরি হয়েছে কবিসত্তার পূর্ণ প্রকাশ। রূপবান রবীন্দ্রনাথের দেহরূপের অন্তরালে তাঁর যে আত্মার রূপটি, শিল্পী তাকে বাইরে এনে অন্তর-বাহিরকে এক করে রূপবদ্ধ করেছেন। এখানে অন্তর মিশিয়ে তিনি অন্তরের পরিচয় নিয়েছেন। এই চিত্রেও আলোকপাতে প্রখরতা আছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প। দেশী-বিদেশী কোন রীতিতে অঙ্কিত, বা কোন ধারাটি প্রবল তা আলোচনা না করেও বলা যায় যে, শিল্পী এই মূর্ত্তিখানি রচনায় অশেষ অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

লণ্ডনের 'The Connoisseur' নামক পত্রিকায় (Oct, 1919) এই আলেখ্য চিত্রটি সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়—

"A refined and characterised head of Rabindra Nath Tagore is more occidental in its treatment, though still keeping within the guiding tenets of Indian Art. This however is one of the painter's earlier examples, and his later work is generally more strictly in accord with the conventions of the Hindu-Persian School".

হিন্দু-পারসীক ধারার কথা উক্ত মন্তব্যে উল্লেখ করা হলেও অবনীন্দ্রনাথের তুলি-কল্পনায় মূর্ত্তি চিত্রণে কোন বিশেষ রীতি-পদ্ধতির নিয়মানুগ ভাব অনুসরণের কোন ছাপ নেই। তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে বিদেশী বাস্তব রীতির প্রভাব-প্রাধান্য লক্ষণীয় বটে, কিন্তু কালক্রমে তিনি পোর্ট্রেট পেন্টিং-এও এমন একটা স্বকীয়তা প্রবর্ত্তন করেছিলেন, যার মধ্যে কোন বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তির আর কোন প্রশ্ন ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের আলেখ্য রচনাতে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রান্তিহীন। এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ আগ্রহ কবির জীবনাবসান পর্য্যন্ত অটুট ছিল। নানারূপে ও ভঙ্গীতে তিনি কবিকে চিত্রপটে মূর্ত্ত করেছেন। মনে হয় তিনি যেন কবির অনুপম চেহারা ও ব্যক্তিত্ব মধ্যে শিল্পায়ণের উপযোগী মহৎ রূপের উপাদান ও আদর্শ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন বয়সে কবি কত বিচিত্র রূপে ভ্রাতুষ্পুত্রের

যাদুকরী তুলির খেলায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিলেন তার তালিকাও নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়।

শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রভবনে (বিচিত্রা) অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কবির প্রতিকৃতি আছে চারখানি।

সব ক'টি ছবি মোটামুটি বড় সাইজের। তার মধ্যে তিনখানি জলরঙ-এর। জলরঙ-এর একটি চিত্রে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানমগ্ন সমাহিত রূপ। পেস্টবোর্ডে অঙ্কিত। দ্বিতীয়টি মেসনাইট বোর্ডে। তৃতীয়খানি কাগজে। রচনাকাল ১৯৪৪-৪৫। সুতরাং শেষোক্তটি কবির তিরোভাবের পরে কল্পনায় অঙ্কিত নিশ্চয়ই।

প্যাস্টেলের মূর্ত্তিটি অতি অভিনব ও বিচিত্র। এই ছবিখানির আকর্ষণ বহুমুখী। একে তো রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। দ্বিতীয়তঃ দোল পূর্ণিমার দিনে কবির চেহারা। ফাগের রঙে রাঙানো কবি। কালো জোব্বার উপরে রঙ-এর ছড়াছড়ি। মুখমণ্ডলও আবীরমণ্ডিত। ছবির নাম, 'আমাদের পাকবে না চুল।'

কলাভবন (শান্তিনিকেতন) সংগ্রহেও আছে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি চিত্র। তার মধ্যে 'Poet in cycle of spring' নামধেয় ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। গাছপালার মধ্যে টুপি মাথায় কবি। হাল্‌কা কালো রঙ-এর প্রাধান্য।

কবির অভিনয় ভঙ্গীর অনেক রূপ অবনীন্দ্র-তুলিকায় অক্ষয় হয়ে আছে। তন্মধ্যে 'তপতী' নাটকে রাজা বিক্রম রূপে রবীন্দ্রনাথ কালো প্যাস্টেলের কয়েকটি রেখার টানে অপূর্ব্ব এক ভাবমূর্ত্তিতে হয়েছেন রূপায়িত। মনে হয় কোন সাধু সন্তের রূপচিত্র। অদ্ভুত প্রশান্তি ও ধ্যানতন্ময়তার প্রকাশ হয়েছে। অল্পকথায় ও স্বল্পরেখায় এমন চিত্র সুদুর্লভ। 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে এঁকেছেন তিনি তিনখানি চিত্রপটে। কবিশেখরের রূপসজ্জায় রবীন্দ্রনাথও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপটে স্থায়ী রূপ লাভ করে আছেন। এই সকল চরিত্র-চিত্রের অঙ্কনপদ্ধতি অতীব আকর্ষণীয়। জলে ধুয়ে ধুয়ে রঙের প্রহেলিকা সৃষ্টি করে নাটকীয় চরিত্রের আন্তর ভাবমূর্ত্তির প্রতিফলন করাই ছিল শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব, নিখুঁত রূপের বাস্তব প্রতিমূর্ত্তি এ নয়, এ হোল মনোচ্ছায়াবাদী রীতিতে নাটকের রসগুণকে অভিনয় দৃশ্যে অভিনেতার ভাবমূর্ত্তির মাধ্যমে প্রকাশ।

অন্ধ বাউলের একটি ছবি ১৩২৩ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'-তে মুদ্রিত

হয়েছিল। ছবিটির সঙ্গে যে টীকা ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছিল তার মধ্যে 'অন্ধ বাউলের' স্বরূপ হয়েছে ব্যাখ্যাত। চিত্রপটেও সেই ভাবটি হয়েছে রূপবদ্ধ।—

"অন্ধবাউল রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর একটি চরিত্র। বাউল চোখে দেখতে পায় না, সে গান গেয়ে গেয়ে বিজনের মধ্যে পথ আবিষ্কার করে। অন্ধতার অন্ধকারে সে যে পরমবন্ধুকে লাভ করেছে, তাঁরই চরণ-শব্দ সে আপনার হৃৎস্পন্দনে শুনতে পায়, সেই চরণ-শব্দ বরণ করে সে চলে। সে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে; মনের পাওয়াই এখন তার সর্ব্বস্ব। এই অন্ধ দুঃসহ দুঃখের আঘাত সহ্য করে অটল নিষ্ঠা লাভ করেছে। চিরবসন্তের বীণা তার হাতে।"

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের মধ্যে জগদানন্দ রায়ের প্রতিকৃতিও অবনীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি-চিত্রণের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। এটি অবশ্য শিল্পীরও পরিণত বয়সের রচনা। সূক্ষ্ম তুলির টানে, মোলায়েম বর্ণলেপে রচিত নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণে এটি প্রতিকৃতির ভাণ্ডারে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

প্যাস্টেলে অঙ্কিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তিখানিও (১৯০৪) অবনীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রচনার অন্তর্ভূত হওয়ার যোগ্য। চিত্রখানির বর্ণ-সুষমা ও আলোকপাত অতি মনোরম ও সুসমঞ্জস।

শিল্পাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বালক অলকেন্দ্রনাথ পিতার তুলিকায় অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করেছেন। অবনীন্দ্র-সৃষ্ট মূর্ত্তি চিত্রশালায় এটি প্রথম সারিতে স্থান-লাভের যোগ্য। প্যাস্টেলে অঙ্কিত। Background লালচে আভাযুক্ত। তার মধ্যে ফুলের মত বালমূর্ত্তি। চমৎকার নমনীয় রূপ। Realistic বটে, কিন্তু বাস্তবতার রূঢ় স্পর্শ লাগেনি কোথাও। কোমল মধুর আমেজে এক অলৌকিক ভাব-সৌন্দর্য্যের প্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দ। প্যাস্টেলের চিত্র, কিন্তু জলরঙ-এর কাজের মত কোমল ভাব। আলোকপাতের ধারা পাশ্চাত্য রীতির অনুগামী। কিন্তু সমগ্র রূপে এমন কমনীয়তা ও স্বর্গীয় সুষমা এনে দিয়েছেন যে, এটি ইতালীর রেনেঁসা চিত্রে দেবশিশু মূর্ত্তির রূপকল্পনা ও উন্নত টেক্‌নিকের সমকক্ষ তো বটেই, ভাবসম্পদে আরও বেশী কিছু দিয়েছেন বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ১৯১৪ সালে প্যারিসের প্রদর্শনীতে ছবিখানি পুরস্কৃত হয়েছিল।

অবনীন্দ্র-তুলিকায় আর একজন প্রাণময় পুরুষ বার বার রূপায়িত হয়েছেন বিভিন্ন ভাবে ও ভঙ্গীতে। তিনি হলেন দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। শান্তিনিকেতনের কলাভবন সংগ্রহেই দীনবন্ধুর একক চিত্র আছে তিনখানি। তার মধ্যে

একটির রচনাকাল ১৯২৫ সাল। এণ্ডরুজের স্বহস্তে নামাঙ্কিত। কালচে রঙের সূক্ষ্মকারুকার্য্যময় শাল গায়ে, বই নিয়ে বসে আছেন। অতি চমৎকার কলাকৃতি। মহামনীষীর স্বরূপ, স্বভাব ও চিৎসত্তার অপূর্ব্ব প্রকাশ। আর একখানি পটে এণ্ডরুজ জানালার পাশে মেঝেতে একটি আসনে উপবিষ্ট। নগ্নপদ, ধুতি চাদর পরিহিত, বাঁ হাতে বই নিয়ে উপাসনার ভঙ্গীতে তিনি বসে আছেন। একটু কম বয়সের চেহারা। এই বয়সেরই আর একটি আবক্ষ মূর্ত্তি আছে নানা রঙের আবেশে অঙ্কিত। তবে সেখানেও কালো রঙের প্রাধান্য।

আর একখানি দীর্ঘ পটে দীনবন্ধুকে দেখা যায় আর দুই মহামানবের পাশে। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ডরুজ একখানি চিত্রপটে সুমধুর বন্ধুত্বের মিলনসূত্রে গ্রথিত হয়ে আছেন অবনীন্দ্রনাথের তুলি-কলমের বন্ধনে। গান্ধীজী ও কবি মুখোমুখি বসে। গান্ধীজীর পেছনে এণ্ডরুজ। সবুজ জোব্বা পরিহিত কবিগুরু চিবুকে হাত রেখে বসেছেন। গভীর আলোচনা ও চিন্তায় মগ্ন তাঁরা। ছবিটির নাম 'ত্রয়ী'। সেদিনের ভারতের ভাগ্যাকাশের তিনটি নক্ষত্র, উজ্জ্বল ও দীপ্যমান হয়ে আছে বিরাট চিত্রফলকে।

গান্ধীজীর একক একখানি মূর্ত্তি চিত্রও এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ছবিখানি প্রত্যক্ষভাবে স্টাডি করে আঁকা। গান্ধীজী তখন প্রৌঢ়। সরল সাদাসিধে ভাব ও রূপের প্রতিকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-পথে শেষ যাত্রার চাক্ষুষ অথচ গভীর কল্পনার প্রবাহময় রূপচিত্র অবনীন্দ্র-তুলিকায় শাশ্বত হয়ে আছে কলাভবনের চিত্রশালাতে। ছবিটির নাম, 'সম্মুখে শান্তি পারাবার'। বিশ্বকবির মরদেহ যেন ভাসমান। অগণিত শোকার্ত্ত নরনারীর আবছা রূপের ভিড় এদিকে-ওদিকে। তুলির পোঁছে আঁকা। কোন সূক্ষ্ম টানের রেশ নেই। মোলায়েম রঙের আবেশে ও তুলি চালনার কৌশলে শোকমগ্নতার ভাবটি হয়েছে সুপরিস্ফুট। শায়িত কবিদেহের মাথার উপরে একটি আনত গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে। তাতে চিত্রপটে একটা ভিন্নতর অদ্ভুত ভাব এসেছে। গভীর শোকের ছায়া চিত্রের সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে। পটের নিম্নাংশে কালস্রোতের ইঙ্গিত। কবি রূপের জগত ছেড়ে অরূপের পথে পাড়ি দিচ্ছেন কালসাগর পেরিয়ে অনন্ত-অসীমের দিকে।

সুদীর্ঘকাল পরে আজও সে দৃশ্যপট দর্শকের মনে শোক ও বিষণ্ণতার সঞ্চার করে। মনে হয় এই দৃশ্য অবনীন্দ্রনাথের কল্পনায় এসে ধরা দিয়েছিল কোনও এক বিশেষ মুহূর্ত্তে। বস্তুতঃই তা হয়েছিল। কবির দেহাবসানের পরে শিল্পীর

জীবনছন্দে একটা স্তব্ধতার পালা চলেছিল কয়েক দিন। তারপরে তিনি আঁকলেন কবির শেষ যাত্রার দৃশ্য। এ সাদা চোখে দেখা দৃশ্য নয়।

এই ধরনের, তবে আকারে অনেকখানি ছোট আর একটি চিত্রেও কবির শেষ যাত্রাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে জনতার ভিড় নেই। কালস্রোতে কবির ভাসমান দেহ। নানা বর্ণের মিশ্রণে অঙ্কিত চিত্র, নাম 'The End'। এই চিত্রেও কবির রূপাকৃতি সুস্পষ্ট।

পেন্সিল স্কেচে পিয়ার্সন সাহেবও ধরা পড়েছিলেন তাঁর হাতে চমৎকার রূপে। অতি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি।

সাধারণভাবে মানুষের রূপাকৃতি রচনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত শিল্পকর্ম। মানুষটিকে না দেখে, তার চেহারা স্টাডি না করে, প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কনে স্বাভাবিকতাকে ও মানুষটির সত্যরূপকে ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। পূর্ব্বে দেখা পরিচিত ব্যক্তিকে পরে কল্পনায় ধরে নিয়ে ছবির পটে বাস্তব ক'রে তোলা ক্বচিৎ কখনও কারোর পক্ষে হয়ত সম্ভব হতে পারে। তবে তার সঙ্গে যদি আবার কোনও অলৌকিক ভাব-ভাবনাময় বিশেষ মুহূর্ত্তের মিলন ঘটে, তবে অত্যাশ্চর্য্য কিছু সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে তদনুরূপ একটি দৈবক্ষণ একদিন এসেছিল পরম ভাবসম্পদ নিয়ে।

শিল্পীর জীবনে সেই ক্ষণিকের অনুভূতি, সেই চরম মুহূর্ত্ত এসেছিল আনন্দ ও বেদনার মিশ্রিত রূপ নিয়ে। মাতৃবিয়োগের পরে তিনি দেখলেন, মার একটিও ছবি নেই। তিনি একদিন ভাবে বিভোর হয়ে চিন্তা কচ্ছিলেন যে কি করে মায়ের একটি মূর্ত্তিচিত্র করা যায়। গভীর চিন্তায় আবিষ্ট শিল্পীর চোখের সামনে পরিষ্কার মাতৃমূর্ত্তির আবির্ভাব হোল। তিনি তখুনি কাগজে পেন্সিল দিয়ে মায়ের মুখচ্ছবির ড্রইং করতে বসলেন। কপাল থেকে নাকের উপর ভ্রূ'র খাঁজটি তুলতে গেছেন, আর তখুনি সে মূর্ত্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আলোর সুইচ্ বন্ধ করে দিলে যেমন সব অন্ধকার হয়ে যায়, ঠিক সেই রকমটা হোল। শিল্পী চম্‌কে উঠে তাঁর দাদাকে ডেকে বললেন, "দাদা, একি হোল?"

দাদা সামান্য কিছু দূরে বসেছিলেন। মৃদু হেসে তিনি বললেন, "বড্ড তাড়া করতে গিয়েছিলে তুমি!"

বিষণ্ণ মনে দারুণ হতাশা নিয়ে শিল্পী চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তখন আবার মাতৃমূর্ত্তির আবির্ভাব ঘটলো। সেবারে আর তিনি তাড়াহুড়ো করেন নি। স্থির হয়ে বসে রইলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনায় বলেছিলেন—

"মেঘের ভিতর দিয়ে যেমন অস্তদিনের রং দেখা যায় তেমনি তরো মায়ের মুখখানি ফুটে উঠতে লাগলো। দেখলুম মাকে, খুব ভালো করে মন-প্রাণ ভরে মাকে দেখে নিলুম। আস্তে আস্তে ছবি মিলিয়ে গেল, কাগজে রয়ে গেল মায়ের মূর্ত্তি। এই যে মা'র ছবিখানা ওই অমনি করেই আঁকা। এতো ভালো মুখের ছবি আমি আর আঁকিনি।"[১]

ছবিখানি রচনার গোড়ার কথা কৌতূহলোদ্দীপক তো বটেই, শিল্পকৃতি হিসেবেও সেটি অতুলনীয়। মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কনে অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম তুলিকার অপূর্ব্ব টানও প্রতিটি রেখার কারুতা চরমোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। মূর্ত্তির কেশ বেশ রচনায় তাঁর তুলি চালনার সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্য মোগলাই 'একবাল' কলমকেও যেন হার মানিয়েছে। এই চিত্রের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯১২-১৩ সাল।

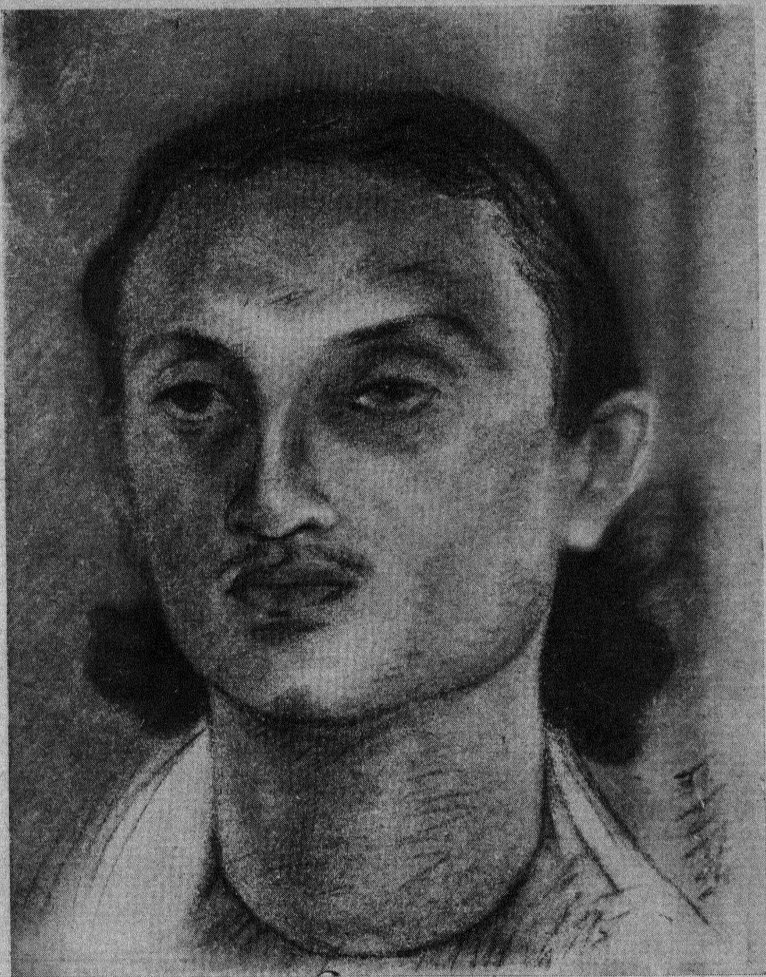
কবিগুরুর একটি মূর্ত্তি রচনার ব্যাপারেও এই জাতীয় স্মৃতিচারণার প্রভাব পড়েছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে একবার তিনি খুল্লতাত কবির মুখের একখানি ছবি এঁকেছিলেন। কবির চেহারা স্পষ্ট দেখতে না পেয়েই তিনি কাগজে অস্পষ্ট লাইন টেনে চললেন। কিন্তু শিল্পীর মানস নেত্রে আসল চেহারা ঠিক এসে গিয়েছিল। অতঃপর সেদিনের মত ছবিটি তিনি রেখে দিলেন। রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে উঠে কয়েকটি নতুন রেখার টান দিতেই ছবি পূর্ণ রূপ নিয়ে ফুটে উঠলো।

অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্যাস্টেল পোর্ট্রেটের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভের যোগ্য হোল তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুর নলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মূর্ত্তি-চিত্র। এটি রচনার তারিখ ১লা এপ্রিল, ১৯০১ সাল। ১৮৯৪ থেকে তিনি যে মানবমূর্ত্তি রূপায়ণের কাজ শুরু করেছিলেন, যা প্রারম্ভ থেকেই পরিণত রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল তাঁর বৈবাহিকের রূপ-চিত্রে। তারপরে শিল্পাচার্য্যের হাতে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও নাতনীর বালিকা বয়সের প্যাস্টেল আলেখ্যও অতি সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

সম্ভবতঃ ১৯০২-৩ সালে তিনি তাঁর ভাগ্নে কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের একটি শিশুমূর্ত্তি এঁকেছিলেন প্যাস্টেলে। চিত্রায়িত মানুষটি তখন দু'তিন বছরের শিশু। দাঁড়ান ভঙ্গীর চিত্র, তবে পূর্ণাঙ্গ নয়। এই প্রতিকৃতিখানিও অবনীন্দ্রনাথের প্যাস্টেলে রচিত উচ্চ পর্য্যায়ের মূর্ত্তিচিত্রের মধ্যে স্থান লাভের যোগ্য।

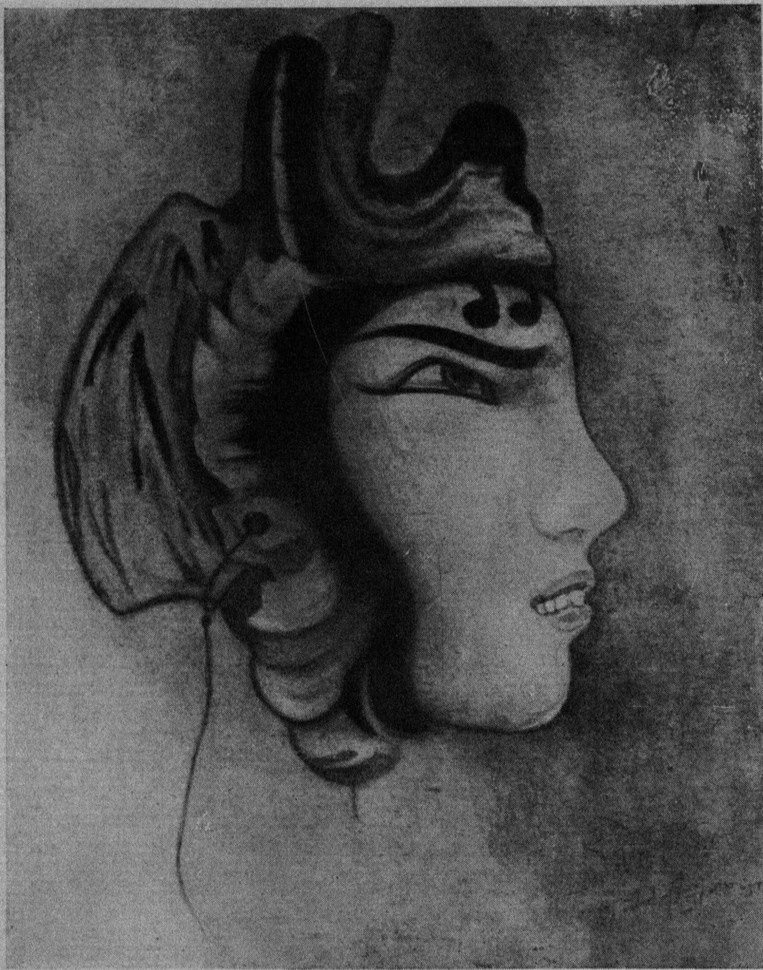
---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১৩১



ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মুখোশ
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত নানা পর্য্যায়ে অন্যান্য সাধারণ ছবির পাশে পাশে অবনীন্দ্রনাথ প্রতিকৃতি অঙ্কনের কাজও চালিয়েছিলেন সমতালে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র-শিষ্য সকলেই স্থান পেয়েছিলেন তাঁর চিত্রপটে। জলরঙ ও প্যাস্টেল—এই দুই মাধ্যমকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন সমভাবে। আলোচিত আলেখ্যরাজি ব্যতীত আরও যেসকল উল্লেখনীয় মূর্ত্তিচিত্র তিনি বিভিন্ন সময়ে করেছিলেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে—শিল্পীর সহধর্ম্মিণী, কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা দেবী, দৌহিত্র শোভনলাল, প্রিয় শিষ্য নন্দলাল, ক্ষিতিন মজুমদার, শৈলেন দে, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমল হোম, আবদুল খালেক ও ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর প্রতিকৃতি। কুমারস্বামীর মূর্ত্তিটি রেখাচিত্র। খুব সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় লাইনে অঙ্কিত। ছবিটির কাজ শেষ হলে কুমারস্বামী রহস্য করে শিল্পীকে বলেছিলেন—

"You have made me look more wicked than I am."[১]

প্রতিকৃতি রচনায় অবনীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য সম্পর্কে নানা সময় বিদেশের কলারসিকগণও সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। ফরাসী শিল্পী ও সমালোচক আঁদ্রে কার্পেলে লিখেছিলেন—

"Tagore is also a great portrait painter—a psychologist and sincere withal. The profiles of Rabindranath and Coomarswamy bear witness of them."

কুমারস্বামীর রেখাচিত্র ব্যতীত আর একটি স্কেচ আছে যা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। রচনাকাল ২১শে ডিসেম্বর, ১৯২২। পাজামা, চাপকান ও টুপি পরিহিত গোঁফওয়ালা স্থূলকায় প্রৌঢ়ব্যক্তির রূপচিত্র। হাতে তাঁর ছড়ি। চেহারাটি তৎকালীন দ্বারভাঙ্গার মহারাজার। তিনি সোসাইটির প্রদর্শনীতে এলে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অজ্ঞাতে অতি দ্রুত এই স্কেচ চিত্রটি এঁকে রেখেছিলেন।

১৯২৬ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে তিনি এত অধিক সংখ্যক পোর্ট্রেট এঁকে-ছিলেন যে, তাঁকে তখন নিছক আলেখ্য রচয়িতা বলে কেউ আখ্যাত করলেও অত্যুক্তি হোত না। তখন প্যাস্টেল মিডিয়ামই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ইতি-পূর্ব্বে উল্লিখিত অনেক প্রতিকৃতি এই সময়কার সৃষ্টি। তাছাড়া আরও যে সকল পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও উচ্চস্তরের

---

১. অবনীন্দ্র-সুহৃৎ ও সহযোগী ও. সি. গাঙ্গুলীর কাছে শোনা।

সৃষ্টি হোল নন্দলাল বসুর কনিষ্ঠা কন্যা যমুনা দেবীর আলেখ্য। রচনাকাল ১৯২৬ সালের৮ই ডিসেম্বর। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি গৌরী-দেবীরও একটি প্রতিমূর্ত্তি রচনা করেন প্যাস্টেলে। খোলা চুলের মধ্যে মুখখানি ফুলের মত কোমল মাধুর্য্যের প্রতীক হয়ে রয়েছে। যেমন জীবন্তভাব, তেমনি বাস্তবমুখী রচনায় নিদর্শন। কিন্তু অতিমাত্রায় চিত্তাকর্ষক পদ্ধতির সৃষ্টি। কনিষ্ঠা ভগিনী যমুনা দেবীর আলেখ্য রচনায় শিল্পীগুরু নতুন আদর্শ ও আঙ্গিক ভাবনায় আর এক অপূর্ব অভিনবত্ব এনে সেটিকে চিরন্তন শিল্প-সৌকর্য্যে মণ্ডিত করেছেন।

এই প্রতিকৃতিখানি কেবল নির্দ্দিষ্ট কারোর রূপচিত্র নয়। এটি শিল্পীর আলেখ্য রচনার ভাবতরঙ্গ বিবর্ত্তনের একটি বিশেষ Landmark। বিশেষ কারোর মূর্ত্তিচিত্র হিসেবে পরিচিতি না দিয়ে একে 'কালোমেয়ে' নামে অবনীন্দ্র-নাথের শ্রেষ্ঠতম রচনা সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই রকম বর্ণ-সুষমা ও ভাবের দ্যোতনা প্রতিকৃতি চিত্রে বিরল বস্তু। বালিকা বয়সের স্বভাবসুলভ ভাবের সঙ্গে এমন একটা গভীর সঙ্কল্প ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়েছে যা আবার পার্শ্ব দৃষ্টিযুক্ত মুখাবয়বের সুদৃঢ় গঠনের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপূর্ব্ব এক ভাব মাধুর্য্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত এই চিত্রের বর্ণালি, আরও অভিনব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মাধ্যমে একতান রচনা। গায়ের রঙ, মাথার চুল, হলদে শাড়ী—সব ক'টি রঙ একাত্ম হয়ে এক সুর ও ছন্দের লহরী তুলেছে চিত্রপটে। শিল্পাচার্য্যের তুলিকার যাদুস্পর্শে কালোমেয়ের রূপ আলোয় মণ্ডিত হয়েছে, সৌন্দর্য্য-সুষমার মূর্ত্ত প্রতীক হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। প্রতিকৃতিখানির শ্রেষ্ঠ গুণ হোল চিত্র-কল্পনায় শিল্পীর সংযম ও ওজন জ্ঞান।

গৌরী দেবীর প্রতিকৃতিখানির পর্য্যায়ভুক্ত আর একটি আলেখ্য-চিত্র অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন শ্রীমতী ঠাকুরের। এটির রচনাকাল ১৯২৭ সাল। পাস্টেলে রচিত প্রতিমূর্ত্তি।

রঙ-ধোওয়া (ওয়াশ) রীতিতে অবনীন্দ্রনাথ যে ক'খানি মূর্ত্তিচিত্র অঙ্কন করেছিলেন তার মধ্যে আবদুল খালেকের প্রতিকৃতি অন্যতম প্রধান নিদর্শন। আবদুল খালেক ছিলেন একজন শিল্পদ্রব্য বিক্রেতা। পার্ক স্ট্রীটে ছিল তাঁর দোকান। কলকাতা যাদুঘরের আর্ট গ্যালারী তৈরীর সময় তাঁর কাছ থেকে অনেক জিনিস সংগ্রহ করা হয়েছিল। গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের কলা-সংগ্রহ রচনায়ও আবদুল খালেকের অবদান ছিল বেশ কিছু। ঠাকুর-সংগ্রহের অনেক উৎকৃষ্ট শিল্প-নিদর্শন তাঁর দোকান থেকে সংগৃহীত। সেই সূত্রে

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।[১] ওয়াশ পদ্ধতিতে তিনি যে ক'টি মূর্ত্তিচিত্র করেছিলেন, তার মধ্যে আবদুল খালেকের চিত্র সম্ভবতঃ প্রথম পর্য্যায়ের। খালেক তাঁর দোকানে শিল্পময় পরিবেশে বসে যে ধূমপান করতেন, সেই রূপটি এই চিত্রে ধরে দিয়েছেন শিল্পী। রঙ ধুয়ে ধুয়ে গভীর ভাব সঞ্চারের ফলে পরিবেশ প্রভাবটি হয়েছে উচ্চাঙ্গের। অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্ট প্রতিকৃতি মণ্ডলে এই চিত্রখানিরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

যে কোন শিল্পী প্রসঙ্গেই আত্ম-প্রতিকৃতি রচনার কাজটি কৌতুহলোদ্দীপক। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত আত্মমূর্ত্তি তাঁর মুখে বর্ণিত জীবন-কথার মতই সুন্দর স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত। তিনি তা একেছিলেন দু'খানি। ১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে তিনি প্যাস্টেলের রেখায় এবং সামান্য বর্ণচ্ছটা ও আলোছায়া-পাত করে নিজের যে মূর্ত্তিটি রচনা করেছিলেন, সেটি নানা কারণে আকর্ষণীয়। প্রথমতঃ, পূর্ণ বার্দ্ধক্যের ভারে আনত চেহারা; দ্বিতীয়তঃ, শ্মশ্রু-গুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডল। আর তাঁর 'কুটুম-কাটাম' গড়ায় ব্যাপৃত রূপ। অজানা ভাবে দেখলে অবনীন্দ্রনাথ বলে মনে হবে না। চেহারা ও সাদৃশ্যের কথা ব্যতীত শিল্পীসুলভ নিবিষ্ট ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে অতি চমৎকার।

আত্মীয় বন্ধু সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি রচনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই প্রতিকৃতি মহলে অবশেষে স্থান পেল তাঁর খাস চাকর রাধু। গ্রাম্য বালক রাধু কলকাতা শহরে কাজে এলো, কিভাবে তাঁর জীবনে ও চেহারায় ধাপে ধাপে পরিবর্ত্তন এসেছিল তা তিনি দেখিয়েছেন চিত্রপটে। ছবি ক'টি আকারে অতি ক্ষুদ্র। এঁকেছেনও খুব সূক্ষ্মভাবে ও রঙ ধুয়ে ধুয়ে। প্রথম চিত্রে গ্রাম্য বালক রাধু সদ্য এসেছে অবনীন্দ্র-আলয়ে। কিছুদিন পরে দেখা গেল সে লেখা পড়া শেখার চেষ্টায় নিরত। শেষ চিত্রে দেখা যায় সে খদ্দর পরে গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে দেশ সেবকের রূপ নিয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তার সেই পোশাক দেখে বলতেন, "এবার রাধু দেশের কাজে নামলো।"

রাধুর জীবনধারা বিবর্ত্তনের এই রূপচিত্র মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের দুটি মনোভাব ও হৃদয়বৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমতঃ, কাজের লোকটির প্রতি স্নেহ-মমতা; দ্বিতীয়তঃ, পরিহাস-প্রিয়তা।

এইভাবে প্রতিকৃতির রূপমহলটি যখন বেশ বড় হয়ে উঠলো, নানা মানুষের ভিড়ে সেটি বেশ জমজমাট, কত রঙ, কত রেখা, কত বিচিত্র চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখা গেল সেখানে; তখন শিল্পী মুখ ফেরালেন মুখোশ রচনায়

১. ভারতের শিল্প ও আমার কথা: ও. সি. গাঙ্গুলী।

দিকে। শিল্পী-জীবনের শেষ পর্য্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ আর একবার মানুষের প্রতিকৃতি রচনার দিকে বিশেষ ভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তখন বলেছিলেন—

"মানুষের মুখ দেখে দেখে এমন হয়েছে যে আজকাল মুখোশ দেখি। আসলে সব মানুষের মুখের চামড়ার ঠিক তলায় একটা করে মুখোশ আছে—সেগুলো আমার চোখে পড়ে এখন। ঐতেই মানুষের আসল রূপ ধরা যায়।"[১]

এই অনুভূতি থেকেই এসেছিল মুখোশ রচনার প্রেরণা। প্রচুর মুখোশ এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তা সংখ্যায় প্রায় আশীটি। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকের চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন অভিনেতার মুখোশ হয়েছিল প্রায় দশ-বারোখানি। তিনি নিজের মুখকেও মুখোশে রূপান্তরিত করতে কুণ্ঠিত হননি। মুখোশ-চিত্র রচনার মূলে অঙ্কন-চাতুর্য্য ব্যতীত আরও আছে সুগভীর চিন্তাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও স্বাভাবিক রহস্যবোধ।

অবনীন্দ্রনাথের রচিত মুখোশ-চিত্র একটি স্বতন্ত্র শিল্পপর্য্যায়। মুখোশের বর্ণিকাভঙ্গ, তুলি চালনার কৌশল এবং সর্ব্বোপরি অনন্ত বিচিত্রতা সম্পন্ন ভাবভঙ্গী ও মুখের গড়ন অত্যুচ্চ শিল্পচেতনা ও করণ-কৌশলের পরিচয় বহন কচ্ছে।

মুখোশে রূপায়িত ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আছেন স্বয়ং শিল্পী, তাঁর আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র, শিষ্য এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনীত বিভিন্ন চরিত্রের মুখছবি। তাঁদের আসল রূপ মুখোশের আড়ালে আবৃত হয়ে বাইরে প্রস্ফুট হয়েছে অভিনীত চরিত্রের বিশেষ ভাবভঙ্গী ও অভিব্যক্তি।

সাধারণভাবে মুখোশ বলতে যা বোঝায় এ মুখোশ কিন্তু তা নয়। তার চেয়ে ঢের বেশী কিছু। 'তপতী' নাটকের চরিত্র রূপই তিনি অনেক এঁকেছেন। যেমন, বিক্রম রূপে রবীন্দ্রনাথ, কুমার সেন—অলোকেন্দ্রনাথ, নীরেশ—অজিনেন্দ্রনাথ, দেবদত্ত—দিনেন্দ্রনাথ, বিপাশা—সুমিত্রা দেবী, প্রতিহারী রূপে আর্য্যনায়কম্, শঙ্কর—কনকেন্দ্রনাথ, ভার্গব—কালীমোহন ঘোষ। অন্যান্য ভূমিকার মুখোশ-চিত্রে পাওয়া যায়—নিতাইবিনোদ গোস্বামী, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী ও সন্তোষ মিত্রকে।

সাধারণ মুখোশ-চিত্রে রূপবদ্ধ হয়ে আছেন মুকুল দে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী,

---

১. দক্ষিণের বারান্দা: মোহনলাল গাঙ্গুলী।

কুমুদ মজুমদার, মোহনলাল ও শোভনলাল গাঙ্গুলী, রেবা দেবী, ব্রতীন ঠাকুর, নীতিন গাঙ্গুলী, অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে।

'মোগোল' রূপে নিশিকান্ত রায় চৌধুরীর মুখোশ অতি অপূর্ব্ব। বর্ণাঢ্য চিত্র। গাল দুটি উজ্জ্বল গোলাপী রঙের। চরিত্র-চিত্রণ অনুপম। মোটা তুলির পোঁছে আঁকা। কাগজ ঘষে ঘষে রঙ দেবার ছাপও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরও কয়েকটি মুখোশ-চিত্রে এই টেক্‌নিকের লক্ষণ দেখা যায়। নিশিকান্ত বাবুকে অবনীন্দ্রনাথ আর একটি মুখোশেও রূপান্তরিত করেছেন আরও অদ্ভুতভাবে। রক্তবর্ণ কর্ণাভরণযুক্ত সেই মুখোশে উগ্রভাব প্রস্ফুট হলেও, তা দর্শককে আকৃষ্ট করে।

অধিকাংশ মুখোশই বর্ণাঢ্য ও বহুবর্ণা। কিছু সংখ্যক আছে সাদায়-কালোয় রচিত। মুখ্যতঃ জল রঙ-এর সৃষ্টি। মুখোশের মুখে একটা ঢালাও রঙ দিয়ে তদুপরি চুল ও চোখ মুখের রূপ স্পষ্ট করে তুলতেন। চিত্র-ক্ষেত্র বা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে ঘন গাঢ় রঙের প্রলেপ দিয়ে, তার উপরে রঙের contrast বা বৈপরীত্যে তৈরী হয়েছে মুখমণ্ডল। কয়েকখানি আছে যা প্রধানতঃ হাল্‌কা রঙের। রঙ ধুয়ে ধুয়েও তিনি অনেক মুখোশ-পট এঁকেছিলেন। তা'হলেও ফিনিশ করার সময় মুখমণ্ডলের নানা অংশে মোটা তুলির উজ্জ্বল গাঢ় টান দিয়ে তাকে জোরালো করে তুলতেন। মাঝে মাঝে মৃদু আলো ছায়াপাত করে সুমধুর দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য মাধ্যমে তাকে আরও রমণীয় করে তুলেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের মুখোশ-চিত্রের সংখ্যাও যেমন বৃহৎ তেমনি রচনা সৌকর্য্যে এবং ভাবৈশ্বর্য্যেও তা অনন্য ও অসাধারণ। তাঁর কল্পনার সহস্রমুখী ধারা ও তুলি চালনার অনন্ত স্রোত মুখোশ-চিত্রের ক্ষেত্রকেও করেছিল উর্ব্বরা ও নানা রসে, নানা ছন্দের জোয়ারে প্লাবিত।

সেই রঙ, রস ও ছন্দের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে মুখভঙ্গী ও ভাবনা-চিন্তার অসীম বৈচিত্র্য। প্রতিটি চিত্রে ভিন্ন ভাব। আর তা চরিত্রানুযায়ী নিখুঁত। বহু সংখ্যক মুখোশে প্রকাশ পেয়েছে চিন্তামগ্নতা ও বেদনা, বিষণ্ণতা। কতকগুলি ছবিতে যেন pathos-ই মুখ্য হয়ে উঠেছে। যে ছবি দেখে দর্শকের মনে হাসির উদ্রেক হয়, তার মধ্যেও যেন একটা pathos আছে নিহিত। হাস্যরসাত্মক ছবি, কিন্তু ঠিক ব্যঙ্গচিত্র বা cartoon-এর পর্য্যায়ে পড়ে না। কোন কোনও মূর্ত্তি রূপায়ণের মূলে ব্যঙ্গ-কৌতুক ও পরিহাসের প্রভাব থাকলেও, তা করুণভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লঘু চপলতা বা বিদ্রূপের কশাঘাত চিহ্ন নেই কোথাও। গভীর জীবনানুভূতিজাত মনোজ্জ্বল রচনা।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মোটাসোটা স্থূলকায় মানুষ ছিলেন, তা তাঁর মুখোশেও হয়েছে প্রতিফলিত। মুখের গড়নেও যেমন, তেমনি বর্ণরঞ্জনের কৌশলেও সে ভাবটি হয়েছে সুসিদ্ধ। শিল্পীর পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথের মুখোশটি সাদা-কালোয় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। শিশির ভাদুড়ীর মুখখানি সরস কল্পনার ও পরিপাটি গড়নের। লাল পাগড়ী পরিহিত অবনীন্দ্র-তনয় অলকেন্দ্রনাথ মুখোশেও অতি সুন্দর। ব্রতীন্দ্রনাথ জীবন্তভাবে সমুজ্জ্বল। নীতিন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর মুখোশে বিরক্তির ছাপ।

দুর্ম্মুখের মুখোশে রূপকল্পনা ও ভাবের প্রকাশ—দু-দিকেই উৎকর্ষের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হয়েছে। এই মূর্ত্তিটি বিরক্তি, বীভৎসতা ও কুটিল ভাবনার মূর্ত্ত প্রতীক। কালো, বাদামী ও সামান্য লাল রঙের টাচে অঙ্কিত। 'কিরাতি' মুখোশটি বর্ণাঢ্য। রূপসৃষ্টি ও ভাব-ভাবনার অভিব্যক্তি অতি চমৎকার। এটি অনেকাংশে যাত্রার মুখোশের ভাবলক্ষণা-মণ্ডিত। বিসর্জ্জনের রঘুপতির মুখোশে দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাবটি প্রকট হয়েছে অতি নিখুঁত ভাবে।

দু'একটি নারী চরিত্রের মুখোশে যন্ত্রণাদিগ্ধতা ও গভীর বিরক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু রেবা দেবী শান্ত, স্নিগ্ধ রূপের। সুমিত্রার বেশে অমিতা ঠাকুরের মুখোশ-রূপ বস্তুতঃই রমণীয়।

রবীন্দ্রনাথ মুখোশের আড়ালে বাঁধা পড়েছেন অনেকবার। রাজা বিক্রমের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-রূপ মুখোশে পাওয়া যায় দু'তিনটি। প্রতিটি নিদর্শন ভিন্ন রূপের এবং বর্ণবিন্যাস ও আকার-প্রকারও স্বতন্ত্র। কবির একটি বর্ণোজ্জ্বল মুখোশ অপূর্ব্ব। কয়েকটি মাত্র সোজা ও বাঁকা রেখার সমন্বয়ে কল্পিত মুখমণ্ডলে শ্বেত শুভ্র কেশগুচ্ছ ও শ্মশ্রুর বহর। তদুপরি অস্পষ্ট নয়ন। ফলে মুখোশটি অপূর্ব্ব ভাবমূর্ত্তিতে হয়েছে পরিণত।

অবনীন্দ্রনাথ-কল্পিত মুখোশ সাধারণ হাটুরে মুখোশের মত কয়েকটি জোরালো রঙ, মোটা মোটা টান-পোঁছ দিয়ে অঙ্কিত নয়। এগুলি পুরাদস্তুর সাধনালব্ধ, গভীর চিন্তাপ্রসূত, অথচ আয়াসহীন অভিনব এক আঙ্গিক কৌশলের সৃষ্টি। চরিত্র-চিত্রণের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সাবলীল গতিতে তুলি চালনা ও রসসঞ্চারী বর্ণবাহারে রঞ্জিত নতুনতর এক মননদীপ্ত চিত্রসম্ভার। এ-সৃষ্টি তুলনাহীন। এর জুড়ি নেই। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রশ্ন নেহাৎই অবান্তর। অবনীন্দ্র-প্রতিভার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল চিত্রকলার ভিন্নতর ও নবতর উন্মেষ, অগ্রগতি ও সুপরিণতির প্রতিফলন হয়েছে এই মুখোশের মুখে।

॥ ৭ ॥

ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রকলার প্রধান একটি শাখা পুঁথি-চিত্র। সে যুগের তালপাতার পুঁথি, হাতে লেখা তুলট কাগজের পাণ্ডুলিপি-পুঁথি, সবই নানা সুন্দর বর্ণাঢ্য চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হোত। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ধর্মীয় গ্রন্থ এবং কাব্য-কবিতার সচিত্র পুঁথি-পুস্তক ভারতীয় চিত্রকলার এক একটি অপূর্ব্ব ভাণ্ডার। বাংলা দেশের পাল যুগীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের চিত্রান্বিত পুঁথির খ্যাতি জগৎ জোড়া। মুঘল যুগে বিভিন্ন সম্রাটের উৎসাহ প্রেরণায় দরবারী চিত্রীদের তুলিকায় তৈরী হয়েছিল পারসীক কাব্য-কাহিনী ও ভারতীয় গ্রন্থাদির সচিত্র সংস্করণ। আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী জাতীয় ইতিহাসগ্রন্থ, জীবন-বৃত্তান্ত ও আত্মজীবনী সমূহের মূল সংস্করণগুলি তৎকালীন কলাকারদের সুনিপুণ তুলিকায় মণ্ডিত। হস্তাক্ষর-নিপুণ ব্যক্তি ও প্রতিভাবান শিল্পীর মিলিত প্রচেষ্টায় তখন তৈরী হোত এক একটি পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ।

কালক্রমে এদেশেও ছাপাখানার আমদানী হোল। ইংরেজী বই-এর আদর্শে ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ-প্রকাশনা রীতিতেও পরিবর্ত্তন সাধিত হতে বিলম্ব হয়নি। তার ফলে হাতে লিখে পুস্তক তৈরী ও তাতে চিত্র যোজনার প্রয়োজনও হ্রাস পেতে থাকে। ছাপানো বই-এর সঙ্গে চিত্র মুদ্রণের রীতিও প্রবর্ত্তিত হোল অনতিবিলম্বে। সরকারী প্রচেষ্টায় কলা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হতে গ্রন্থাদি অলঙ্করণের প্রথা-পদ্ধতিতেও এসেছিল পরিবর্ত্তনের পালা।

ক্রমে দিন এগিয়ে চললো। এল বিগত শতাব্দীর শেষ লগ্ন। আবির্ভূত হলেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর তুলি-কল্পনায় ভর করে আধুনিক চিত্রকলা নব-যাত্রা পথে করলো পদক্ষেপ। শিল্পী-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আখ্যান-কাহিনীর রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি দুটি ভিন্ন পন্থায় আখ্যানমূলক চিত্রের ভাণ্ডারকে করেছেন ফলবন্ত। এক হোল স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে নানা কাব্য-কাহিনীর বিষয় নিয়ে চিত্রাঙ্কন। আর দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এসেছিল এ যুগের বিশেষ কয়েকখানি গ্রন্থ-পুস্তককে সুচিত্রিত ও অলঙ্কৃত করার সাদর ও সশ্রদ্ধ অনুরোধ ও আহ্বান। সেই আবেদন ও

আমন্ত্রণ এসেছিল যশস্বী গ্রন্থকার ও প্রকাশক মহল থেকে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাঁর সৃষ্টিসম্ভার যেমন সংখ্যায় সুপ্রতুল তেমনি তা শিল্পবৈভবে, রসাবেশে ও হৃদয়সংবেদ্যে সুসমৃদ্ধ। তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্ব্ব ও মধ্যাহ্ন লগ্নের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা বিভিন্ন গ্রন্থের পাতায় মুদ্রিত হয়ে মনোরম প্রতিলিপিতে ভাস্বর ও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও প্রকাশক মণ্ডলীর আহ্বান পৌঁছোবার বহুদিন পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ নিজের খেয়াল-খুশীতেই Book Illustration-এর কাজে হাত দিয়েছিলেন। ব্যাপারটি লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে অনেক কাল। আজও প্রায় অজ্ঞাত। তাঁর হাতের প্রথম পুঁথি-চিত্র স্বরচিত একখানি ক্ষুদ্র অনুবাদ কাব্যেরই চিত্রায়ণ। সেই সময় তিনি পুরোপুরি বিদেশী রীতির শিল্পী। তখনও বিদেশী গুরুর কাছে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হয়নি। এমন সময়ে ১৮৮৮ সালে তিনি ছয়খানি ছবি এঁকে একটি পাণ্ডুলিপিকে অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ছবিগুলি মুখ্যতঃ দৃশ্যপট। প্যাস্টেলে অঙ্কিত। একটু-আধটু তুলির টাচ্ও মাঝে মাঝে পড়েছিল মনে হয়।

তিনি খ্যাতনামা ইংরেজ কবি টমাস মুরের প্রখ্যাত গ্রন্থ Lalla Rookh-এর Fire-wood Worshipper অধ্যায়টি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তরুণ বয়সে। বাংলায় নাম দিয়েছিলেন তিনি 'অগ্নি উপাসক'। অনূদিত অধ্যায়ে স্বহস্তে চিত্রাঙ্কন করে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তা যুক্ত করে যেদিন কাজ শেষ করেছেন, তার তারিখ ৩রা জুলাই, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ। প্রতিটি চিত্রের নীচে তার বিষয়-বস্তুর বর্ণনামূলক কাব্যাংশ হয়েছে উদ্ধৃত। চিত্র-কল্পনা, আঙ্গিক-পদ্ধতি কিছুই উচ্চাঙ্গের নয়। তরুণ শিল্পীর শিক্ষানবিসি দিনের চেষ্টা-ভাবনার ফলশ্রুতি মাত্র। ইহা তাঁর শিল্পী-জীবনের গোড়ার কথার প্রত্যক্ষ দলিল স্বরূপ। সুতরাং এর ঐতিহাসিক মূল্যই বড় কথা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

টমাস মুরের কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজী সাহিত্যপ্রেমী মহলে সুবিদিত ও সুপঠিত। এখানে চিত্র-পরিচিতি প্রসঙ্গে কাব্যাংশের অনুবাদ-উদ্ধৃতি নিচয়ে তরুণ শিল্পীর কাব্য রচনায় শক্তি-প্রচেষ্টারও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় অতি সুস্পষ্টরূপে।

ছবিগুলির আকার, আয়তন পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পরিমাপের ও চৌকো ধরনের। নীল, সবুজ ও বাদামী রঙের প্রাধান্য। আর মাঝে মাঝে কালো রঙ ও সামান্য লাল-হলদের আভা।

অবনীন্দ্রনাথ-কৃত 'অগ্নি উপাসক' পাণ্ডুলিপির ছয়খানি চিত্রের বর্ণনা ক্রমান্বয়ে এইরূপ—

প্রথম চিত্র :

পর্ব্বত শীর্ষে তোরণ ও চূড়াসমন্বিত মন্দির। নীচে লেক্ বা জলস্রোত। আকাশে মেঘ ও রক্তিমাভা ছড়ানো।

"সুউচ্চ একটি পর্ব্বত শিখর
আকাশ ছাড়ায়ে উঠিয়া গেছে।
তাহার উপরে ভাঙ্গাচোরা এক
অগ্নির মন্দির দাঁড়ায়ে আছে।"

দ্বিতীয় :

লেকের জলের ধারে ঝোপ-ঝাড়। তারই উপরে একটি দুর্গের আভাস। ঝোপের কাছে একটি ছোট নৌকা। আরোহী চারজন।

"হিন্দার মন্দির তলে অতি ধীরে
লাগিল এসে তরী একখানি।"

তৃতীয় :

বড় ছিপ ধরনের একখানি তরণী জলে ভাসমান। তদুপরি সাদা একটি ছাউনি। চারজন মাঝিমাল্লা নৌকা চালাতে ব্যস্ত। কালো জল তরঙ্গান্বিত। আকাশের গায়ে লাল রশ্মি বিকীর্ণ।

"এইরূপে ধীরে হিন্দার তরীটি
সাঁতার দিল চলিল ভেসে।"

চতুর্থ :

এই ছবিটি সাদায় কালোয় অঙ্কিত। জলে ছোট নৌকা। অনেক লোকজন। পাশে পর্ব্বতোপরি জমিতে থাম ও খিলানের মত স্থাপত্যাংশ।

"আঁধার যেন সে শকরের মত,
যেথা দিয়ে যায় মৃত জীবেরা
মশাল আলোক আলোকে না কিছু
শুধু দু'একটি তরঙ্গ ছাড়া।"

পঞ্চম :

চিত্রপটের দু'পাশে কালো পাহাড়, মাঝে জলপথ নদীর আকার ধারণ করেছে। পাহাড়ের উপর গাছপালা ও ঝোপ ঝাড়। আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

"সন্ধ্যায় বৃষ্টির জলেতে পথটি
কোমর অবধি ভরিয়া গেছে
দুপাশেতে এর অতি ভয়ানক
পাহাড়ের শ্রেণী দাঁড়ায়ে আছে।"

ষষ্ঠ :

আকাশে চাঁদ। নীচে পাহাড। তার কোল ঘেঁযে জলস্রোত। কিনারায় গাছপালা। জলে নৌকা। পাহাডের উপর চিতাব আগুন জ্বলছে।

"জলিয়া উঠিল চিতার আগুন
ইরান ও তার আশা ফুরাইল।"[১]

ছবি ক'খানি সমগ্র ভাবে আলোচনা করলে প্রথমেই লক্ষ্য হয় যে, তরুণ অবনীন্দ্রনাথ তখনও নিয়মানুগ পদ্ধতিতে চিত্র-রচনায় অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাননি। এই ছবিগুলি নিছক অলঙ্করণ হিসেবে অনুবাদ কর্মটিকে সজ্জিত করার জন্য কৈশোর-কল্পনার রূপচিত্র। তবে কাছের ও দূরের জিনিসের স্থাপনা, আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্য-দ্বন্দ্ব এবং বস্তু-বিন্যাসেব একটা স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চতর শিল্প-ভাবনা ও প্রারম্ভিক পর্য্যায়ের আভাস ইঙ্গিত এর মধ্যে অবশ্যই প্রতিভাত।

স্বকীয় বঙ্গানুবাদ-পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ণের পরে ছয়টি বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ গিলার্ডি সাহেবের কাছে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করেছেন। আর এদিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য রচনাও শেষ হয়েছে। কবির ইচ্ছা ও প্রস্তাবে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা কাব্যের রেখাচিত্র অঙ্কনের ভার নিলেন অতি আগ্রহ সহকারে। সচিত্র চিত্রাঙ্গদাকে কাব্যকার খুল্লতাত উৎসর্গ করেছিলেন চিত্রকার ভ্রাতুষ্পুত্রকে।

---

১. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ।

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমকল্যাণীয়েষু

বৎস,

তুমি আমাকে তোমার যত্ন রচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ আশীর্ব্বাদ উপহার দিলাম।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রাঙ্গদার প্রথম সচিত্র সংস্করণে রেখাচিত্র মুদ্রিত হয়েছিল বত্রিশটি। এগুলি সাধারণ ভাবে বই-এর পাতাকে অলঙ্কৃত করার জন্যই অঙ্কিত। তবে কাব্য-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা রচিত। বিষয় হোল—

যবের শীষ, তুলি-কলম, গাছের গায়ে সাপ জড়ানো, দ্রুতগামী হরিণ, অরণ্যে শিবালয়, ভগ্ন ধনুঃশর, জলের মধ্যে ঘাট-সোপান, পাশে গাছপালা, ঝোপঝাড়, জলে পদ্ম ও পত্র, আকাশে পাখীর মেলা, জলে হাঁস, আকাশে চাঁদ, গাছের ডালপালা, জলাশয় ও তদুপরি গাছ, উপরে চাঁদ, নীচে ঝোপ-ঝাড়, ডালে ফুল, ফল ও পাতা, শঙ্খ, ছড়ানো তীর-ধনুক, খরস্রোতা নদী, হাতে হাত বাঁধা, ফুলগাছ ও প্রজাপতি, লতায় জড়ানো বর্শা, পার্ব্বত্য গুহা, গাছের ডালেও উড়ন্ত পায়রা, দুর্গ-প্রান্তে ছুটন্ত ঘোড়া, পিলসুজে দীপ, গাছের ডালে ফুলের মধ্যে পায়রা যুগল, দোয়াত-কলম-বই।

কাব্যের মূল আখ্যান অবলম্বনে পূর্ণাঙ্গ রেখাচিত্র এঁকেছিলেন শিল্পী আটখানি।

প্রথম চিত্রে চিত্রাঙ্গদা লজ্জানতা নারী। তিনি বলছেন—

“অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসঙ্কোচে।”

দ্বিতীয়টিতে গাছের নীচে জলের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা। অর্জ্জুন দূরে থেকে তাঁকে দেখে বলছেন—

"সেথা তরু অন্তরালে
অপরাহ্ণ বেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা,...
নামি ধীরে সরোবর তীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া,
উঠিল চমকি।...
সরোবরে, পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন,
চরণের আভা।"

পরবর্ত্তী রেখাঙ্কনে চিত্রাঙ্গদা এলায়িত কেশে শায়িতা। তিনি বলে চলেছেন—

"যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল।"

এরপরে চিত্রপটে দেখা যায় নিদ্রিত অর্জ্জুন, পাশে অর্দ্ধশায়িতা চিত্রাঙ্গদা। তিনি বললেন—

"প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সঙ্গীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।"

এখন চিত্রাঙ্গদাকে শিল্পী আলেখ্যায়িত করেছেন মালা রচনায় ব্যাপৃতা। তিনি সেই সময় অর্জ্জুনকে প্রশ্ন করেছিলেন—"কী দেখিছ বীর?"

তদুত্তরে অর্জ্জুন বলেছেন—

"দেখিতেছি পুষ্প বৃন্ত
ধরি, কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে মালা।"

তার পরেই দেখা যাবে মৃগয়ার বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পনা। বনপথে চকিত মৃগের রেখারূপ। মৃগয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন অর্জ্জুন। এই বর্ণনা চিত্রাঙ্গদা কাব্যের প্রাণ। কাব্যরসিকের প্রাণে তা উল্লাস সঞ্চার করে। অতি সামান্য সঙ্কেতে

শিল্পী সেই পরিবেশটি রচনায় চেষ্টা করেছেন। তিনি একটি চকিত মৃগ এঁকে কবির বর্ণনাকে চাক্ষুষ রূপ দিয়েছেন এখানে।

> "মুখর নির্ঝর কলোল্লাসে
> সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
> মৃগ ; চিত্র ব্যাঘ্র পদনখ চিহ্ন রেখা
> রেখে যেত পথ পঙ্ক পরে, দিয়ে যেত
> আপনার গৃহের সন্ধান।"

চিত্রাঙ্গদাকে এখন দেখা যাবে অশ্বারূঢ়া। তিনি দ্রুতগামিনী। এই রেখাচিত্রটি রচিত হয়েছে অর্জ্জুনের উক্তি অবলম্বনে। তিনি বলছেন—

> "দেখিতে পেতেছি তারে
> বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে,
> দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
> বিজয়লক্ষ্মীর মতো, আর্ত্ত প্রজাগণে
> করিছেন বরাভয় দান।"

শেষ চিত্র 'অবগুণ্ঠন খুলিয়া'। সম্মুখে সূর্য্যোদয়। চিত্রাঙ্গদা অবগুণ্ঠন খুলে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান। আত্মপরিচয় দানের পালা হোল শুরু।

ছবিগুলি স্কেচ ধরনের রেখাঙ্কন। ইহা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনের প্রারম্ভিক রচনা। তিনি ভারতীয় রীতিতে সিদ্ধিলাভের পরে রঙে-রেখায় এই বিষয়টির চিত্রাঙ্কন করলে কবির কাব্যের প্রকৃত রসভাব ও সৌন্দর্য্য হয়ত অধিকতর প্রতিফলিত হোত। কাব্যের আবহমণ্ডলে, সংলাপে যে ভাবোচ্ছ্বাস, যে নাটকীয়তা, যে হৃদয়সঙ্ঘাত আছে, তা রেখাচিত্র, মাধ্যমে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হতে পারে না। তবে সাধারণ ভাবে পুস্তকের পাতা অলঙ্কৃত করার কাজ সুসিদ্ধ হয়েছে বলা যায়।

এই রেখাচিত্রগুলি রচনা করে শিল্পী নিজেও বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন নি। তিনি এই বিষয়ে বলেছেন, "চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবি-কা বললেন, ছবি দিতে হবে। আমার তখন একটু সাহসও হয়েছে, বললুম, রাজি আছি। সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস্ করেছি। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হল। এখন অবশ্য সে সব ছবি দেখলে আমার হাসি পায়।"

শিল্পী এই রেখাচিত্ররাজি এঁকেছেন বাংলা ২৮শে ভাদ্র, ১২৯৮ সাল, কটক। রবীন্দ্রনাথও কাব্যটি রচনা করেছেন কটকে অবস্থান কালে। সম্ভবতঃ খুল্লতাত কবি ও ভ্রাতুষ্পুত্র শিল্পী একই সময়ে উড়িষ্যায় প্রবাস-জীবন কাটিয়েছিলেন। সেকথা রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ-সূচনায়ও লিখেছেন—

"অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।"

চিত্রাঙ্গদা চিত্রায়ণের তিন বছর পরে শিল্পী কবিগুরুর আর একটি বই-এর পাতা অলঙ্কৃত করার ভার গ্রহণ করেন। বইটি 'নদী'। বাংলা ১৩০২ সালের ২রা মাঘ নদী পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার অল্প কিছুদিন পরেই বইখানির মুদ্রিত পৃষ্ঠার উপরেই অবনীন্দ্রনাথ একুশখানি স্কেচ ধরনের রেখাচিত্র অঙ্কন করেন। তখনও তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্ব্বই চলছিল।

কবিতার পঙ্‌ক্তিসমূহ জুড়েই আঁকা হয়েছিল ছবি। সুতরাং ছবি ও কাব্য-কথা সেখানে একাত্ম, একপ্রাণ। কি আছে সে ছবিতে? আছে পাহাড়, বরফের স্তূপ, আকাশের কোলে মেঘের বুকে ঘুমন্ত নদী, নদীর জন্ম, খরস্রোতা নদী, গাছপালা, শৈলশিখরে আলোর রেখা, নীচে বুনো ছাগল, কাঠের বোঝা পিঠে পাহাড়ী মানুষ, শিকারী, শিলাস্তূপ মথিত করে কলস্বনা নদীস্রোত, সমতলে ঘোলা জলের আবর্ত্ত, জলের ধারে ঝোপের মধ্যে বকপাখী, নদী তীরে জঙ্গলে বুনো শেয়াল, নদীর ধারে গমের ক্ষেত, ছোটগ্রাম, নবাবের সৌধ-আভাস, ঘাটের সোপানশ্রেণী, সেতু-পুল, জেলে ডিঙ্গি, শিবালয়, কোথাও আবার ঝোপ-ঝাড়ে নানা রকম পাখী এবং আরও কত গ্রামের ছবি।

স্কেচগুলি সব কলমে আঁকা। তার ফলে বেশ একটা তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা আছে। সূক্ষ্ম কলমের রেখা। কিন্তু জোরালো ভাবের কিছু অভাব নেই।

এই ধরনের স্কেচ চিত্র দ্বারা বই-এর পাতা অলঙ্কৃত করার শেষ পর্য্যায়ে তিনি এঁকেছিলেন স্বরচিত ক্ষীরের পুতুল ও শকুন্তলা বই-দুটির চিত্রমালা (ইং ১৮৯২-৯৪ সাল)।

বাংলা ১৩০২ সনে অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পরিকল্পনারত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। এই মূর্ত্তি-চিত্রখানিও বইটির কলেবরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে যথেষ্ট পরিমাণে। বলিষ্ঠ তুলিকার টানে যৌবনোত্তর রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকার চিত্তহারী রূপে হয়েছেন চিত্রার্পিত।

এই ধরনের রেখাঙ্কনমূলক প্রারম্ভিক পুঁথি চিত্রায়ণের পরে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে নানা পালা-পর্য্যায় চলেছিল প্রায় দশ বছর। স্বকীয় সাধনায়

পথেও অগ্রসর হন তিনি ঐ সময়ের মধ্যেই। হ্যাভেলের সংস্পর্শে ও তাঁর উৎসাহ-প্রেরণায় চিত্র রচনা করে চললেন তিনি অবাধ গতিতে। প্রতিটি চিত্রপটে স্বতন্ত্র ভাব-লহরীর ললিত প্রবাহ ছড়িয়ে পড়লো নানা বিচিত্র ভঙ্গী ও ভাষায়।

তখন এদেশের মাটিতে বিদেশী শিল্প-প্রবাহ দুর্দম গতিতে প্রবহমান। জনসমাজের চোখ ও মন পাশ্চাত্য কলার আপাতঃ-রমণীয়তার মোহে আচ্ছন্ন। পুঁথি-পুস্তকের পাতায়ও মুদ্রিত হয়ে চলেছিল বিলিতী রীতির অতি নিম্ন পর্য্যায়ের সব ছবি ও নক্সা। ভগিনী নিবেদিতা তা দেখে খুব মর্ম্মপীড়া অনুভব করতেন। তিনি এই ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়ে অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি শিল্পগুরু ও তাঁর শিষ্যদের উৎসাহ-প্রেরণা দিয়ে স্বরচিত গ্রন্থাদির বিষয়বস্তুর চিত্ররূপ-দানের কাজে উদ্বুদ্ধ ও ব্যাপৃত করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অবনীন্দ্র-তুলিকার চিত্র-সম্বলিত তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ তাঁর (নিবেদিতা) জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। মাত্র একখানি চিত্র ও একটি নক্সার মুদ্রিত রূপ দেখে যাবার অবকাশ তিনি পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ছাত্রদের তুলিকায় শোভিত গ্রন্থ-পুস্তকের প্রকাশকগণ সকলেই বিদেশী অর্থাৎ ইংলণ্ড দেশীয়।

ভগিনী নিবেদিতার মহৎ প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ যে নবতর শিল্প-ভাবনার বীজটি বপন করলেন যে ভারতের প্রাচীন আখ্যান-কাহিনীর রূপচিত্র আধুনিক কালের উপযোগী করে, এ যুগের পুঁথি-পুস্তকে স্থান দিতে হবে, তা অনতিবিলম্বে ফুলে ফলে ও রসভারে হোল প্রাণবন্ত ও পরিব্যাপ্ত। সেই শুভ চেষ্টার প্রথম ফলশ্রুতি অবনীন্দ্র-তুলিকায় ওমর খৈয়ামের অনবদ্য চিত্ররূপ। ওমর খৈয়ামের বিশ্ববন্দিত রুবাইয়াৎ-এর চিত্রাঙ্কন করেছিলেন তিনি বারোখানি।

Fitzerald কৃত একটি বিশেষ সংস্করণে সেই বারোখানি চিত্র হয়েছে সংযোজিত। এই বিশেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল বিলাতের স্টুডিয়ো প্রকাশনের উদ্যোগে, ১৯১০ সালে। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথ এই চিত্রগুলি ১৯০৮-৯ সালের মধ্যে অঙ্কন করেন সুনিশ্চিত ভাবে। ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছ পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করা যায় যে, শিল্পী ১৯১০ সালের মধ্যেই স্বকীয় পথ ও পন্থা নির্ণয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছ হোল অবনীন্দ্র-রীতির রাজ্যে একটি Landmark। ভারতীয় ও একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শুরু করে তিনি

এতদিন যে অনিশ্চয়তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কঠিন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তা এই পর্য্যায়ে এসে যথার্থ স্বকীয়তার দৃঢ় ভিত্তি রচনায় হোল সফল ও সার্থক। প্রারম্ভ থেকে নানা ভিন্ন ভাব-প্রবাহের স্তর অতিক্রম ক'রে ক'রে তাঁর কল্পনা ও আবেগ এখানে স্নিগ্ধ ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে ঐতিহাসিক ও প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর চিত্রে যে আবেগ-স্পৃষ্টতার অভাব ঘটেছিল—এখানে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য তৎপূর্ব্বেও বর্ণ-প্রবাহ অকৃত্রিম ও অঢেল রূপে ছড়িয়ে পড়েছিল পটের বুকে। কিন্তু তার মধ্যে আরও অধিক কিছু প্রকাশের আকুলিবিকুলি উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। হৃদয়-নন্দনবনে তখনও পথ খোঁজার পালাই চলছিল। ক্রমে ক্রমে এল মানস-জাগৃতির মাহেন্দ্রক্ষণ। ওমর খৈয়ামের মধ্যে শুরু হোল সেই অপ্রাপ্ত সুর ও বর্ণ-যোজনায় নৈপুণ্যময় খেলার পালা। ওমর খৈয়ামের প্রেমানুভূতির উপলব্ধি, শিল্পীর আলো-আঁধারি রূপচ্ছায়া রচনার শক্তি ও সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ হয়েছে এখানে। ভাবের আলোড়নে আন্দোলিত মন এতদিনে ভাব সংহতির পথ খুঁজে পেয়েছে। ছন্দোময় তুলিকা অবলম্বন করে শিল্পীর কল্পনার বিস্তার যেন নির্দিষ্ট রূপের সীমানা ছাড়িয়ে, এগিয়ে চলেছে রহস্যময় গহন এক অসীম রসবেদনের পথে।

এই চিত্রসমূহ একাধারে বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগ-অনুভূতিময়। কবিতা-নিচয়ের গূঢ় ভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে চিত্ররূপ। সামগ্রিকভাবে এই চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে গভীর চিন্তা ও বিষণ্ণতার ভাব। করুণ সুরের মূর্চ্ছনাই যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আবেগ অপরিমেয়, কিন্তু উচ্ছ্বলতা নেই। বর্ণরঞ্জনে তিনি যাদুকরের ভূমিকা নিয়েছেন। তবে তা বাইরের চটকমাত্র নয়। সাদা চোখের খোরাকও নয়। শিল্পের তৃতীয় নেত্রের প্রখর দৃষ্টিপ্রসূত রচনা। রঙ, রেখা, দুই-ই চূড়ান্ত নিপুণতা ও অপূর্ব্ব কৌশলে হয়েছে নিষ্পন্ন। বর্ণ-বিন্যাস শত ধৌত হয়ে 'ওয়াশ'-এর চূড়ান্ত পরিণতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে। সবুজ রঙের প্রয়োগ অতি অপূর্ব্ব। তারপরে বাদামী, তাও হাল্‌কা ও গাঢ় দুই রকমেই হয়েছে প্রযুক্ত। তদুপরি সোনালী জলের আখর ও হলদে রঙের ছোপ মিলে প্রভাব হয়েছে ভারী চমৎকার।

Composition বা বস্তু সমাবেশ নিখুঁত ও অতীব আকর্ষণীয়। চিত্রপটে Balance, Harmony এবং ভারতীয় প্রথায় Perspective অর্থাৎ দূরাভাস অতি মনোরম। রাত্রির অন্ধকার, নিঃশব্দ নিস্তব্ধতা ও দিনের আলোর বিভিন্ন পর্য্যায় সৃষ্টি হয়েছে অতীব চিত্তহারীরূপে। মূর্ত্তি রচনায় এক একটি 'টাইপ'

দেখা যায় নিখুঁত রূপের সার্থক সৃষ্টি মহিমায় মণ্ডিত। শিল্পীর স্বকীয় পদ্ধতিতে আলো-ছায়ার খেলাও অভূতপূর্ব্ব জিনিস। কোন কোনও চিত্রে আলো-ছায়ার সুমধুর দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্যে অদ্ভুত রসধারা হয়েছে উদ্বেলিত। চিত্র নিচয়ে বেদনা, বিষণ্ণতা, গভীর চিন্তামগ্নতা মুখ্য হলেও, শিল্পীর সৃজন চাতুর্য্যে, বর্ণের মায়াজালে, কুহেলিকাময় স্বপ্নালু ভাবাভিব্যক্তিতে অভিসিঞ্চিত হয়ে প্রতিভাত হয়েছে রহস্যঘন এক রমণীয় রূপের রাজ্য। তদুপরি ফাঁকে ফাঁকে সোনার জলের রেখা ছবিগুলির গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে বিজুলির চকিত চমক।

আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয় এই যে, প্রাক্-অবনীন্দ্র ও অবনীন্দ্রোত্তর অনেক দেশী ও বিদেশী শিল্পী ওমর খৈয়ামের চিত্ররূপ দিয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টিসংখ্যাও সুপ্রচুর। বিদেশের কোন কোনও শিল্পী ওমর খৈয়াম গ্রন্থ চিত্রায়িত করে যশস্বীও হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু রুবাইয়াৎ-এর চিত্ররূপ দানে কোন পূর্ব্বসূরীকে আদৌ অনুসরণ ও অনুকরণ করেন নি। আবার দেশের উত্তরসাধকরাও তাঁকে হুবহু অনুকরণ করতে সমর্থ হননি। তিনি যে ওমর খৈয়ামের চিত্ররূপ দিলেন, তা সম্পূর্ণ মৌল ও তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই স্বকীয়তা সম্বন্ধে অবনীন্দ্র-চিত্র বিশেষজ্ঞ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি অতি চমৎকার ভাবে প্রযোজ্য—

"In the illustrations of Omar Khayyam we see for the first time Abanindranath's work showing a difinite individual style. This series is a landmark in Abanindranath's style. For the first time we see texture, atmosphere, deep interest in portraiture and dramatic expression."[১]

ইরান দেশের দার্শনিক কবির চিন্তা-ভাবনা ও জীবনদর্শনের চরম অভিব্যক্তি হয়েছে যে কবিতায়, তার প্রত্যক্ষ রূপদানে ভারতের শিল্পী নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলারই চেষ্টা করেছেন। মানুষের চেহারা চরিত্র রূপায়ণে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সর্ব্বত্র ইরাণী আদর্শ অনুসরণ করেন নি। স্থাপত্য বিন্যাসও করেছেন নিজের খেয়াল-খুশী মত। কবি ও কবিতার উৎসক্ষেত্র যাই হোক না কেন, শিল্পী তার চিত্রায়ণে অবাধ স্বাধীনতার অনন্ত অবকাশ সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তবে কোন কোনও চিত্রপটে যে ইরাণী আমেজ একেবারেই পাওয়া যায় না, তা নয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ স্টেলা ক্রামরীশের মন্তব্য যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত।

১. Visva Bharati Quarterly (May, 1942) P. 125

"'L' art nouveau' yields to the rhymes of Omar Khayyam, played in an Indian mode. Curves are brittle, lines are traced by a brush of nerves; where horizontals predominate they bend under the weight of invisible load."[১]

এই চিত্রগুচ্ছ সম্বন্ধে একটি মূখ্য কথা হোল এই যে, অবনীন্দ্রনাথ অনেকখানি বাহুল্যবর্জিত পন্থায় করেছেন এই চিত্র-রচনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কবিতার মূল ভাব ও সুর প্রকাশ। আর তাঁর তুলির কারুতা, রঙের চারুতা ও জলে ধোয়া রীতির সার্থক প্রকাশ ক'রে ওমর কবির কবিসত্তার সফল রূপায়ণ।

এক একটি ক'রে চিত্রপটের মূল বিষয় ও রূপকল্পনাকে বিশ্লেষণ করলে শিল্পীর ভাবনা, কল্পনা ও এই সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর যে নান্দনিক অনুভূতি রয়েছে তার কিছু পরিমাণে অন্ততঃ সন্ধান পাওয়া যাবে। চিত্রে বর্ণিত কাব্যাংশ ও তার চাক্ষুষ রূপের অন্তরালে নিহিত রসধারা নিষ্কাশন ও উপভোগ করতে সহায়ক হবে।

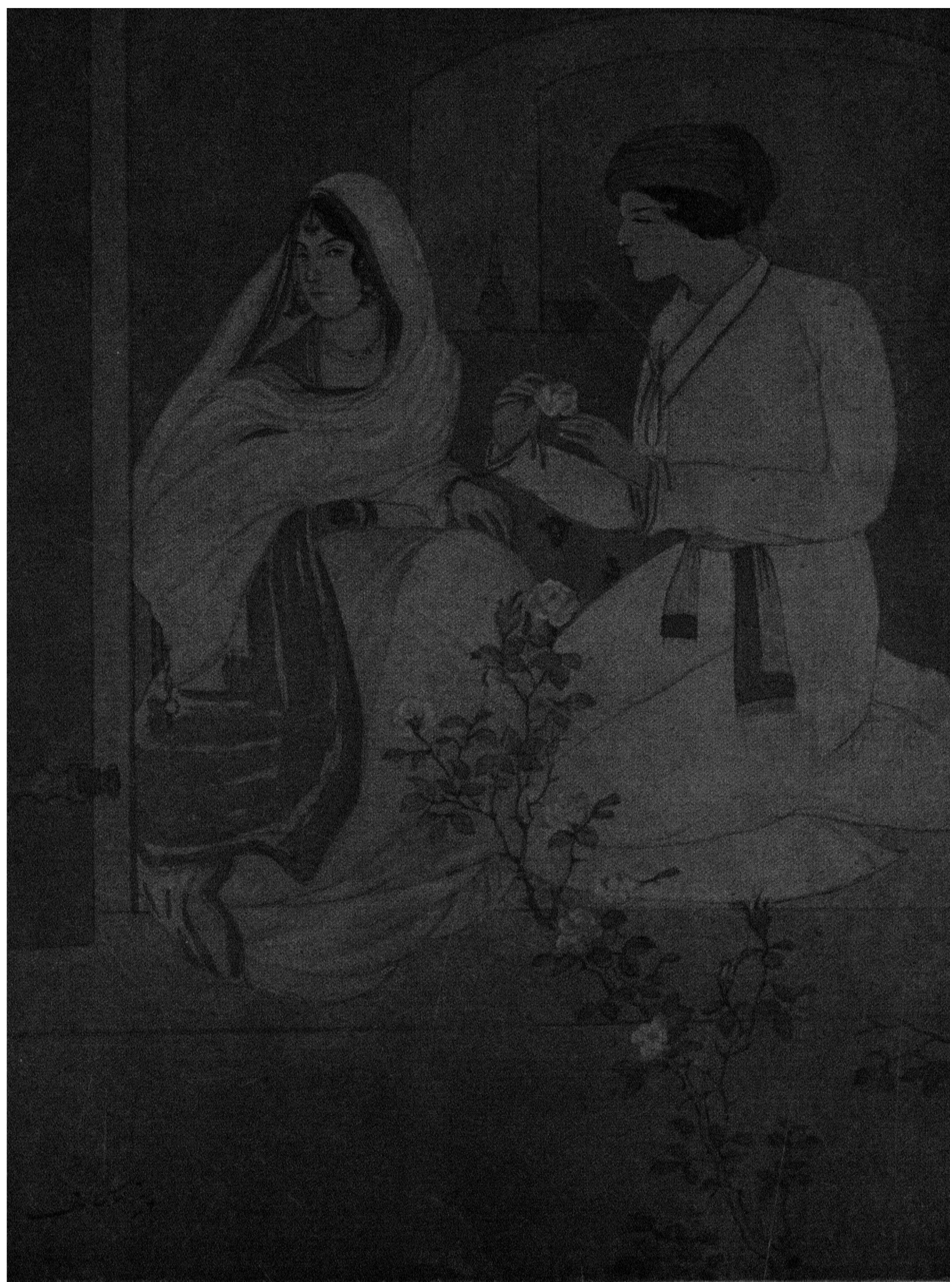
আলোচ্য বারোখানি চিত্রের প্রথমটি ওমর কবির দ্বিতীয় রুবাইয়াৎ-এর চিত্ররূপ—

"স্বপ্নে যেন কণ্ঠ শুনি—রাত্রি জানি শেষ প্রহর—
পানশালে মোর দৈববাণী, কর্ণেতে কার বাজল্ স্বর!
বলছে হেঁকে, ওঠরে বাছা, ভরিয়ে নে তোর পেয়ালাটুক্,
জীবন-সুরা শুকিয়ে না যায়, আপশোষে ফের ফাটবে বুক।"

ছবিটি এঁকেছেন শিল্পী অতি সাধারণ ভাবে। জোব্বা পরিহিত প্রৌঢ় পুরুষ বসে আছেন। তার পেছনে সবুজ শাড়ী পরিহিতা এক নারী কাঁধে হাত দিয়ে বসে রয়েছেন। অতি বিষণ্ণতার রূপ। শিল্পী তাকে শাড়ী পরিয়েছেন সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরোয়া ধরনে। প্রৌঢ় ব্যক্তির চেহারা চরিত্রে 'জীবন-সুরা শুকিয়ে' যাবার আশঙ্কা ও চিন্তার ছাপ। তিনি জীবন উপভোগের জন্ম ব্যাকুল। রঙ, রেখা অতি উন্নত ও অপূর্ব্ব।

সাত সংখ্যক কবিতার রূপচিত্রে বিষণ্ণমনা এক তরুণী হাঁটুতে দুই হাত রেখে পা-ছড়িয়ে বসে আছেন একটি বারান্দায়। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্না। সামনে রেলিঙ-এ একটি পাখী।

১. Abanindra Nath Tagore, His Early Work.



ওমর খৈয়াম ঃ কবিতা–১৩ ব্লক ঃ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আজ ফাগুনের আগুন-জ্বালে হুতাশ-বোনা শীতের বাস
পুড়িয়ে সেসব ছাই ক'রে দাও, দাও আহুতি দুখের শ্বাস।
আয়ু-বিহগ্-খোঁজ রাখো কি মেলিয়ে ডানা উড়ল হায়,
পেয়ালাটুকু শেষ ক'রে নাও এক চুমুকে ফাগুন বায়॥"

পরবর্ত্তী তের নম্বর কবিতার চিত্রে বারান্দায় তরুণ-তরুণী। সামনে সপুষ্প গোলাপ গাছ। তরুণ হাতে একটি ফুল নিয়ে জীবনের অসারত' ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত। কিন্তু তরুণী অন্যমনা। মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। এই চেহারা দুটি পুরোপুরি ভারতীয় রূপ ও পরিচ্ছদ মণ্ডিত! দেয়ালে কুলুঙ্গিতে পানপাত্র। হলদে ও বাদামী রঙের চটকের মধ্যে ঘন কালচে সবুজ ও সোনার জল অদ্ভুত রসসঞ্চার করেছে।

কবিতার মর্ম্ম তরুণী-হৃদয়কে স্পর্শ করেনি কি? শিল্পী তার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে সম্ভবতঃ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। রসসৃষ্টি তাতে বিঘ্নিত হয়নি।

"সদ্য-ফোটা এই যে গোলাপ, গন্ধ প্রীতি উজ্জ্বল মুখ,
বলছে নাকি—মিথ্যা এসব, এই ক্ষণিকের দুঃখ সুখ!
পৃথ্বী-বুকে উঠ্ছি ফুটে গর্ব্বে পরি' রঙীন সাজ—
পাপ্ড়ি টুটে ছড়িয়ে মোদের জীবন-রেণু পথের মাঝ॥"

আঠার সংখ্যক পদ্যের চিত্রে দেখা যায়, একটি সমাধিক্ষেত্রের পাশে উঁচু জমিতে উপলস্তূপের উপরে চিন্তামগ্ন বিষণ্ণ চেহারার জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি সমাসীন। হাতে তার একখানি গ্রন্থ। সমাধিস্তম্ভের পাশে সপুষ্প ছোট ছোট গাছপালা। জমি সবুজ। সুবিস্তীর্ণ আকাশ নীল। প্রবীণ ব্যক্তির গায়ে বাদামী জোব্বা ও মাথায় পাগড়ী।

তিনি ভাবছেন ও বলছেন—

"দীর্ণ-হিয়া কোন সে রাজার রক্তে নাওয়া এই গোলাপ—
কার দেওয়া সে লালচে আভা, হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত ছাপ!
ফুল-বাগিচায় ওই যে ফোটে রঙের বাহার আশমানির—
কোন রূপসী সীমন্তিনীর আঁখির দিঠি করুণ, স্থির॥"

কবিতা চব্বিশ। চিত্রপটে দেখা যায় পাহাড় সদৃশ কিছুর কোল ঘেঁষে তীব্র আলোকশিখার মধ্যে নতজানু এক পুরুষ মূর্ত্তি প্রার্থনারত। তার দুটি হাত দুই কানের পাশে ন্যস্ত। সাধারণ মুসলমানের চেহারা। গায়ে গাঢ় বাদামী

আলথাল্লা, মাথায় সাদা টুপি ও চাদর। প্রেক্ষাপট নীল। সামগ্রিক ভাবে হলদে রঙের প্রভাব বেশী।

কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল জীবনের অসারতার বাণী। জগতবাসীকে সতর্ক করার, জাগ্রত করার, আহ্বান-ধ্বনি।

"সত্য ফলের আশায় মোরা ম'রছি খেটে রাত্রি দিন,
মরণপারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন;
মৃত্যু আঁধার মিনার হ'তে মুয়োজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই॥"

উনত্রিশ সংখ্যক পদ্যের রূপায়ণে উপস্থাপিত হয়েছে জলের ধারে উপল-স্তূপে একটি বিষণ্ণ ও চিন্তামগ্ন প্রৌঢ় মূর্ত্তি। পাশে তার সুরাধার। সমগ্র পটব্যাপী সবুজ, লালচে, ও বাদামী রঙের খেলা ও মেলা। Wash রীতির চূড়ান্ত পরিণতি ও সূক্ষ্মরেখার অপূর্ব্ব সমাবেশ। কাব্যের সঙ্গে চিত্র-ভাবনা ও রূপকল্পনা একাত্ম হয়ে গিয়েছে। গভীর অনুভূতিময় চিত্র। কবির জীবন-জিজ্ঞাসার সার্থক প্রতিচ্ছবি।

"কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্ব মাঝ,
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
কোথায় পুনঃ, কেই বা জানে, ফিরতে হবে একটি দিন—
উধাও সে কোন মরুর 'পরে হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন॥"

আটত্রিশ নম্বর কবিতার চিত্র। সেখানে রূপবদ্ধ হয়েছে একটি তাঁবুর মধ্যে কার্পেটের উপরে দুটি তরুণ-তরুণী। তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ। সামনে পানপাত্র। গভীর অনুভূতিময় চিত্র। অতি সূক্ষ্ম রেখা ও মোলায়েম বর্ণের মিলনে নিগূঢ় মরমী ভাব হয়েছে পরিস্ফুট। কবিতাটির মূল মর্ম্মানুগ চিত্র-ভাবনা সফল ও সার্থক রূপে হয়েছে প্রকাশিত। জীবন-আয়ু নিঃশেষের পথে। মরণ-উষার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পার্থিব সুখ সম্ভোগের পালাকে দ্রুত সমাপ্তির জন্য আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। তারই বর্ণনা কাব্যে ও চিত্রে সমুপস্থিত।

"এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর—
ভোগসায়রে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশায় ভোর।
আয়ুর তারা পড়ছে খ'সে মরণ-উষার চরণ 'পর—
যাত্রা যে কাল করতে হবে, ফুরিয়ে নে সব ত্বরিৎ কর॥"

ছেচল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি যেমন জীবনের অসারতার কথা ব্যক্ত করেছেন, শিল্পীও তেমনি এমন একটি মানুষের চেহারা পটে ধরে দিয়েছেন যিনি জীবন প্রবাহে ভেসে ভেসে অবশেষে কূলে ভেড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাঁর জীবন ভোগের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এসে এখন ত্যাগের জন্য উন্মুখ। শেষ পরিণতির অনুভূতিতে দেহ মন আচ্ছন্ন। অতএব চিত্রপটে দেখা যায় পক্ককেশ এক প্রবীণ ব্যক্তি বিছানার উপরে তাকিয়ায় দেহ বিন্যস্ত করে বসে আছেন। চিবুকে হাত রেখে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। দৃশ্যটি রাতের অন্ধকারময়। নীচে কাচের ডোমযুক্ত লণ্ঠনের মধ্যে জলন্ত দীপ। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে বাদামী ও কালো রঙ ধুয়ে ধুয়ে কোমল ছায়াপাত হয়েছে। জীবনে শেষ সন্ধ্যা-সমাগমের চরম অনুভাব, আবেগের কাব্যকথাটি এই :

"ঊর্দ্ধে, অধে, ভিতর বাহির, দেখছ যা সব মিথ্যা ফাঁক,
ক্ষণিক এসব ছায়ার বাজী পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক ;
পৃথ্বীটা তো মায়ার খেয়াল সূর্য্য বাতির ফানুস-খোল্
ছায়ার পুতুল আমরা সবাই চৌদিকে তার ক'রছি গোল ॥"

পঞ্চাশৎ কবিতা কবির ঈশ্বরে সম্যক আত্ম-সমর্পণ। শিল্পী দেখিয়েছেন, জীবন-তরণীতে ভেসে ভেসে একটি মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তমুখে চলেছেন এগিয়ে। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি হাঁটু গেড়ে নমাজের ভঙ্গীতে বসে আছেন একটি ডিঙিতে। সামনে একটি ছোট বিড়াল। আকাশের রঙ কালো। কিন্তু চন্দ্রমা বিরাজিত।

এই সব চিত্রের অন্যতম মুখ্য বিশিষ্টতা হচ্ছে, মুসলমান টাইপের বিচিত্র ও বিভিন্ন ভাবের সার্থক রূপায়ণ। আর চিত্রপটে রঙ-রেখায় Texture সৃষ্টির অনবদ্য কৌশল। বস্তু সমাবেশে অদ্ভুত রকমে ওজন জ্ঞান ও ভারসাম্য রক্ষার নৈপুণ্য এবং জলে ধোয়া রীতির চরম সাফল্যসূচক পরিণতি।

আলোচ্য শিল্পরূপটির অনুপ্রেরণা যে কাব্যাংশ তা এই :

"নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন, যেই নিয়েছে খেলার ভার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেলছে তারে, যখন যেমন ইচ্ছা তার ;
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায় করেন যিনি কিস্তিমাৎ—
সবটা জানেন তিনিই শুধু—জয় পরাজয় তাঁরই হাত ॥"

তিয়াত্তর কবিতায় কবি নতুন সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর। জীবনের শেষ লগ্নে তিনি তাঁর চির-প্রিয়ার কাছে সেই প্রস্তাব রাখলেন। শিল্পী তাঁর মূর্ত রূপায়ণেও এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ও নারীকে দিলেন মুখোমুখি বসিয়ে। পানপাত্রও

আছে পাশে। চারদিকে পুষ্প-পত্রালিময় গাছপালা, ঝোপঝাড়। তার সবুজ, হলদে, বাদামী রঙের মধ্যে প্রাণের পরশ ও জীবন-প্রাচুর্য্যের স্পন্দন হয় অনুভূত। পাহাড় রয়েছে চিরায়ত শক্তি ও স্থিতির প্রতীক হয়ে। আকাশে ফালি চাঁদ আশার আলো করছে বিকিরণ। স্বপ্নময় পরিমণ্ডল। অতি মোলায়েম স্নিগ্ধ বর্ণালি। রেখাভঙ্গী সূক্ষ্ম সুকুমার। ধুয়ে ধুয়ে রঙকে আরও স্নিগ্ধতর ও মধুরতর করে তোলা হয়েছে। গাছপালা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যে রূপভেদ তার মধ্যে যেন যৌবন ও বার্দ্ধক্যের বিপরীত লীলা-প্রভাব চলছে।

কবিতাটির অক্ষর-রূপ হচ্ছে :

"নিয়ৎ-দেবীর চরকা সুতোর ধরতে পারি খেইটা আজ,
ভাগ্য সাথে ষড় ক'রে তার ঢুকতে পারি ভুয়ার মাঝ,
নিঠুর পায়ে চূর্ণ করি' বিশ্ব সৃজন কল্পনায়,
নূতন সৃষ্টি গড়'তে প্রিয়া পারব নাকি দুই জনায়।"

শেষ কবিতায় (পঁচাত্তর) কবি তাঁর শেষ নিবেদন জানিয়ে গেলেন তাঁর চিরআকাঙ্ক্ষিতা, চিরবন্দিতাকে।

"বিভোর প্রাণে আসবে যে দিন—আকুল মিলন প্রতীক্ষায়,
তৃণাসনে অতিথ্-সভা ছড়িয়ে কোথা তারার প্রায়,
উজল পায়ে আসবে যখন আমার যেথায় ছিল স্থান,
উপুড় ক'রে রেখো সেথায় আমার শূন্য পাত্রখান।"[১]

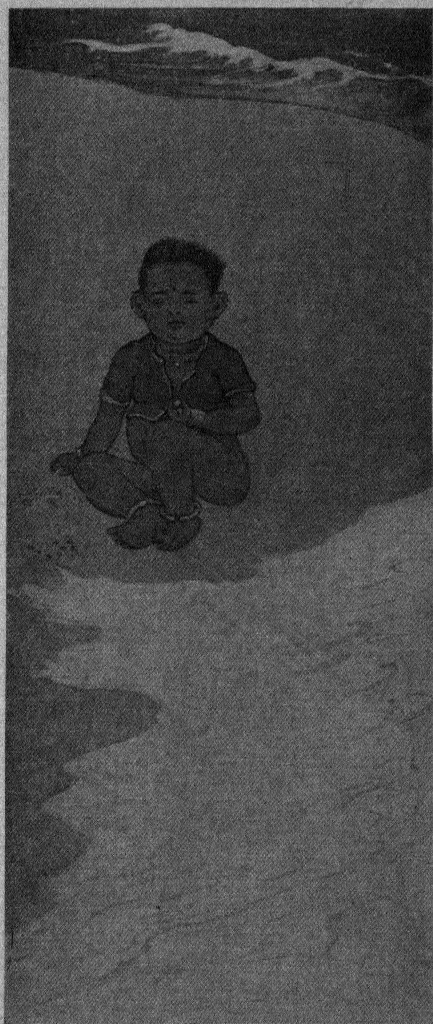
শিল্পীর তুলিকায় দেখা যায় সমাধিস্তম্ভের সামনে এক তরুণী। চোখে মুখে বেদনা বিহ্বলতার চেয়ে সচকিত ভাবটি অধিক। স্থানটি সাধারণ কবরখানা; কাশফুলের কিছু সমারোহ। আরও কত গাছপালা, তৃণ ঘাসে আচ্ছাদিত পটভূমি। আকাশে অস্তরাগ রেখা। সারা পটে সবুজের মেলা।

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ আলোচনা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ রসজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—

"এ কবিতার জন্ম হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে।" এই কথা অবনীন্দ্রনাথের চিত্র প্রসঙ্গেও প্রয়োজ্য। তিনিও কাব্যানুসারী চিত্রপটে ভাবের প্রবাহ আনয়নের চেয়ে টেক্‌নিক-আঙ্গিকের চূড়ান্ত কৌশল, রঙ-রেখার অপরিসীম মাধুর্য্য, মনোহারিত্ব, 'ওয়াশ' পদ্ধতির চর্চ্চা, চেষ্টার অশেষ সুপরিণতি সাধনের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন যেন বেশী।

---

১. কবিতানিচয় কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত বাংলা সংস্করণ থেকে গৃহীত।



সমুদ্রতীরে শিশু

ব্লক : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

উপর্যুক্ত চিত্র সম্বলিত ওমর খৈয়াম প্রকাশনার তিন বছর মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথ আবার হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতার চিত্ররূপ দানে। রবীন্দ্রকাব্যানুসারী চিত্র-প্রচেষ্টার প্রথম ফলশ্রুতি শিল্পীর বিদেশী ধারায় শিক্ষা প্রসূত ও পূর্ব্বে আলোচিত রেথাঙ্কন চিত্রাবলী। কিন্তু গ্রন্থ-চিত্রণের দ্বিতীয় পর্ব্বে তিনি স্বকীয় পন্থায় সিদ্ধ-শিল্পী। তিনি এবারে কবির কাব্যকলাকে চিত্রকলায় রূপান্তরিত করলেন নানা বর্ণে ও ছন্দে। এ চিত্র কবিতার প্রাণধর্ম্মের নিষিক্ত রূপ। আর তা যথার্থই উচ্চাঙ্গের কলাকৃতি।

বর্ণাঢ্য পুঁথি চিত্রায়ণের প্রথম পর্ব্ব রচিত হয়েছিল 'চন্দ্রকলা' (The Crescent Moon) বইটির ইংরেজী সংস্করণের চিত্র অঙ্কন করে। ১৯১৩ সালে এই বইটির সচিত্র ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ম্যাক্‌মিলন কোম্পানীর উদ্যোগে। এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সংযোজিত হয়েছিল দু'খানি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই জাতীয় চিত্ররূপ দানে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের শিষ্যরাও অংশ গ্রহণ করেন।

শিল্পাচার্য্যের প্রথম ছবিখানি 'সমুদ্রতীরে শিশু'র।

"জগৎ পারাবারের তীরে,
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারাবেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।
বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।"

ছবিটি কেমন?

গূঢ় অর্থময় বিশ্বের বিচিত্র উদ্যানে, অন্তহীন জীবন পারাবারের বেলাভূমিতে মানুষের আনাগোনা ও ক্রিয়া-চাঞ্চল্যের রূপ-প্রতীক এ চিত্র। ছোট্ট চিরন্তন শিশুটি বালুকাময় বেলাভূমিতে ঝিনুক নিয়ে ক্রীড়ারত। সম্মুখে শ্বেতশুভ্র ফেনিল তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত জলধি। দিগন্তে নীল আকাশের সাদা মেঘপুঞ্জেও তরঙ্গ-লীলা। তাও প্রায় সমুদ্রের উর্ম্মিভঙ্গের অনুরূপ। কবিতার সরল স্বচ্ছ অথচ তাৎপর্য্যময় বর্ণনা ক্ষুদ্র চিত্রপটে অদ্ভুত রূপ-মহিমায় ভাস্বর।

দ্বিতীয় চিত্রে রূপ গ্রহণ করেছে 'রাজার বাড়ী'।

"সাত মহলা কোঠায়, সেথা থাকেন সুয়োরানী,
সাত-রাজার-ধন-মাণিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে সেইখানে।"

ছবিটিতে দেখা যায় একটি বালক, তার সামনে একটি ভিতের উপরে গামলা আকারের টবে তুলসী গাছ। তার নীচে আরও ছোট গাছ। বালকটির চেহারা ও অভিব্যক্তিতে কবিতার মূল ভাবটি প্রকাশ পেতে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি।

এরপরেই আসে ইংরেজী গীতাঞ্জলি ও Fruit Gathering-এর কয়েকটি কবিতার চাক্ষুষ রূপদানের প্রসঙ্গ। এই চিত্রগুচ্ছের রচনা শুরু ও সম্পন্ন হয়েছিল ১৯১৮ সালের মধ্যে বা পূর্ব্বে কোন এক সময়ে। কারণ, আলোচ্য বইটির প্রথম চিত্রযুক্ত ইংরেজী সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯১৮ সালে। ইহারও প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানী। ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি স্থান পেয়েছিল পাঁচখানি, আর Fruit Gathering-এ সাতখানি। ছবিগুলির কিছু সংখ্যক বর্ণাঢ্য; আর বাকি কয়েকখানি সাদায়-কালোয় মুদ্রিত।

মুদ্রণরীতি যাই-ই হোক না কেন, সূক্ষ্ম মোলায়েম তুলির টানে, কল্পনার গভীরতায় ও ভাবের নিবিড়তায় কবিতার মূল সুর চিত্রপটে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সার্থকরূপে। গীতিকবিতার স্বচ্ছ সাবলীলতা চিত্রে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির স্বাক্ষর নিয়ে হয়েছে রূপায়িত। গীতিকাব্যের কল্পনার ঐশ্বর্য্য, সুরের অন্তরঙ্গতা, আবেগ অনুভূতির বহুচারিতা চিত্রপটে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলা যায় অনায়াসে। কবিতার চিত্ররূপ দানে শিল্পী কবির মানসচেতনাকে, তাঁর প্রকৃতি পূজার ভাববৈচিত্র্যকে এড়িয়ে অন্য পথে, ভিন্ন মুখে যাননি। এ যেন কবিতাগুচ্ছের স্বচ্ছ সরল চাক্ষুষ টীকা ব্যাখ্যা।

যে কবিতানিচয়ে কবির আবেগ মূর্চ্ছনা কিছু পরিমাণে শান্ত স্তিমিত, শিল্পী সেখানেও পিছিয়ে থাকেন নি। সেখানে চিত্রপটে দেখা যায় ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্ত্তে পরিণত প্রজ্ঞা দৃষ্টি, মননশীল জীবনবোধ, মানব মনের দুরূহ ভাবরাশির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সচেতনতা। ভাবসমৃদ্ধ কবিতা চিত্র-রূপে গিয়ে ব্যর্থ হয়নি। কবির কবিতায় শব্দের ঝঙ্কার, কথার কাকলি ও অর্থের আবেদন উচ্চাঙ্গের ও স্বতন্ত্র রূপের তো বটেই। কিন্তু কলার কুঞ্জন, তুলির সহজচারী সূক্ষ্মতা, বর্ণিকাভঙ্গের নিগূঢ় মায়াজাল, রূপাবলীর বিচিত্র ভাব-গরিমা কবিকৃতির সঙ্গে সমতালে চলারই প্রয়াস করেছে। সুষ্ঠু আঙ্গিক

বিন্যাসে কাব্যকলা ও রূপকলা অভিন্ন আত্মার বন্ধনে হয়েছে গ্রথিত। শিল্পীর পটে মানুষের মূর্ত্তি ও আকৃতি যেখানে আভরণহীন সেখানেও কবিতার ছন্দালঙ্কার ও ভাবালঙ্কারের সজ্জা রঙ-তুলির মোহিনী-মায়ায় অটুট ও অক্ষুণ্ণ রয়েছে যথার্থরূপে।

কবিতাবলীর বিষয় ও চিত্রপটের রূপরেখা দুই-ই সমান সুন্দর, সমান আকর্ষণীয় ও রমণীয়। এখানে কবিতাগুচ্ছের বাংলা রূপ উদ্ধৃত হোল।[১]

ইংরেজী গীতাঞ্জলির ৩১ সংখ্যক পদ্যের কথা ও চিত্ররূপ:

"বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
এত কঠিন করে'।
প্রভু আমায় বেঁধেছে যে বজ্রকঠিন ডোরে।
মনে ছিল সবার চেয়ে আমিই হব বড়ো,
রাজার কড়ি করেছিলাম নিজের ঘরে জড়ো।
... ...
জেগে দেখি বাঁধা আছি আপন ভাণ্ডারেতে।" (খেয়া)

ছবিটিতে দেখা যায় দুই হাত শিকলে বাঁধা একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। তার ভাব-ভঙ্গীতে বাঁধন ছিঁড়বার অদম্য চেষ্টা। মুখে চোখে বেদনা ও বিরক্তির প্রকাশ।

৪০ সংখ্যক কবিতা—

"দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক চক্রবাল
ভয়ঙ্কর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা—কেহ নাহি আনে
নব বারি বর্ষণের শ্যামল সংবাদ।" (নৈবেদ্য)

চিত্রপটে আবছা ধরনের একটি জলার ধারে সারস ঠোঁট উঁচু করে তৃষ্ণার বারি কামনায় রত। আর বিশেষ কোনো অনুষঙ্গ নেই। পটখানি জুড়ে একটা রহস্যঘন রূপাভাস।

৪৫ সংখ্যক পদ্যের কথা-কলি এই:

"তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি কি
তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।"

১. গীতাঞ্জলির বর্ত্তমান সংস্করণের সঙ্গে এই সচিত্র ইংরেজী সংস্করণের বিষয় বিন্যাস অভিন্ন নয়। পুরাতন চিত্রযুক্ত বইটির কিছু কবিতা পরে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে স্থানান্তরিত হয়েছে।

চিত্ররূপে ঝাঁকড়া চুলের ও চাদর গায়ে একটি লোক দরজার মুখে হাত তুলে দাঁড়ান। তার চেহারায় সচকিত ভাব। বেদনা-ব্যাকুলতার ভাবও অস্পষ্ট নয়।

সচিত্র গীতাঞ্জলির ৭৩ অঙ্কের কবিতা সুবিদিত।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মহানন্দে মুক্তিকামী পুরুষটি অবনীন্দ্র-তুলিকায় অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ। চারদিকে তার অগ্নিশিখা সম পুঞ্জ পুঞ্জ লাল ও মেটে রঙের স্তূপ।

১০১ সংখ্যক কবিতার চিত্রই অবনীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি রূপায়ণের শেষ নিদর্শন।

"গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি বাহির মনে
চির দিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে।
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই এই ভুবনে।"

ছবিতে একটি নারীমূর্ত্তি। আলুলায়িতাকেশা। বিরহবিধুরা। হাতে একটি একতারা যন্ত্র। তাই নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন। পশ্চাৎপটে মনে হয় সফেন সমুদ্র।

Fruit Gathering-এ স্থান পেয়েছিল নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা, আর তখনকার বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কবিতা। এই বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি স্থান পেয়েছিল সাতটি।

ইহার রূপালেখ্যে দেখা যায় একটি গাছের পত্রহীন মোটা ডাল ধরে একটি নারীমূর্ত্তি। মাথায় ঘোমটা। অত্যন্ত সাদাসিধে ভাব ও রূপ।

কবিতা ৩ :

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা
ফুলের মেলারে।
দেখিসনে কি শুকনো-পাতা
ঝরা ফুলের খেলারে।"

শিল্পী তাই পত্রহীন ডালে ও ঝরা ফুলে বসন্তের লীলাখেলার বিকল্প রূপ-বৈচিত্র্য প্রতিভাত করার প্রয়াসী হয়েছেন। কাব্যানুগঅঙ্কন-প্রচেষ্টার সার্থক প্রতিফলন হয়েছে বলা যায়।

কবিতা ১৭ :

গেরুয়া বসন ও উত্তরীয় পরিহিত পূজারী দেবতার মন্দির দ্বারে দাঁড়িয়ে ডান হাত বুকে চেপে, আর বাঁ-হাতটি তুলে বলছেন। কাকে বলছেন? কি বলছেন? বলছেন তিনি—

"ঘরের থেকে এনেছিলাম
প্রদীপ জ্বেলে—
ডেকেছিলাম, 'আয়রে তোরা পথের ছেলে।'
বলেছিলাম, 'সন্ধ্যা হল
তোমরা পূজার কুসুম তোলো,
আমার প্রদীপ দেবে পথে কিরণ মেলে'।"

কবিতা ২২ :

ছবিটিতে খোলা মাঠের দৃশ্য। দিগন্ত রেখার উপরে শ্বেত সবিতৃ। মাঠের মাঝে ছোট ধুতি পরিহিত ও উত্তমাঙ্গ অনাবৃত একটি গ্রাম্য বালক হাঁটু গেড়ে বসে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে অবিরাম। তার গলায় মালা, কানে কুণ্ডল ও মাথায় ঝুঁটি। চিত্রাঙ্গিকের মহিমায় ও ভাবের গভীরতায় এই পটখানি শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর পর্য্যায়ভুক্ত। অতি সূক্ষ্ম সুকোমল স্বপ্নালু ছবি। Wash পদ্ধতির চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে এই চিত্রে। মূল পটের পেছনে লেখা আছে ইংরেজী কবিতাটির একটি লাইন "The Autumn morning is tired of excess of light."

কবিতাটিও 'বাঁশী', ছবিতেও বাঁশরীর সুর লহরীর আমেজ।

"ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাওগো আমার করে।
শরৎ প্রভাত গেল বয়ে
দিন যে এল ক্লান্ত হয়ে···।"

কবিতা ২৫ :

"ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
ভোরের পাখি ডাকে।
ভোর না হতে ভোরের খবর কেমন করে রাখে।
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালী বরণ পুচ্ছ ডোরে
হাজার লক্ষ পাকে।"

শিল্পী ছবিতে দেখিয়েছেন গভীর অন্ধকারে গাছের ডালে পাখী। জলের মধ্যে আলোর রেখা সবে ফুটে উঠছে। গাছ ও পাখীর গায়ে মাঝে মাঝে high light-এর প্রয়োগ দেখা যায়। খুব গাঢ় রঙে রচিত চিত্র। দৃশ্যটি রহস্যঘন।

কবিতা ৩৫ :

ছবিটি রেখাঙ্কন। একটি লোক সজোরে দ্বার উন্মুক্ত করতে সচেষ্ট। তার অভিব্যক্তিতে বেদনা, হতাশা ও অভিমান হয়েছে প্রস্ফুট।

"তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে,
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে
এ কীরে দুর্দৈব।"

কবিতা ৪৯ :

চিত্রে দেখা যায় ঘাগরা পরিহিতা ও উড়নি আবৃতা একটি ব্যথাতুরা রমণী হাতের বীণাটি উঁচু করে ধরে আছেন। রঙ-রেখা অতি মাত্রায় সুকুমার ও মোলায়েম। কাব্য-কথার রসনিবিক্ত সার্থক রূপ।

"যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুঃখের কথা।"

এই গ্রন্থের শেষ চিত্র হোল কবিতা ৬৫ অবলম্বনে। পটের বুকে অতি মানবায় দীর্ঘায়ত দণ্ডায়মান এক পুরুষমূর্ত্তি। অনেকটা বুদ্ধদেবের অনুরূপ মূর্ত্তি। তাঁর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত। একটি পাদপাঠে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। নীচে অনেক বাড়ী-ঘরের সঙ্কেত।

মূল বাংলা পদ্য :

"এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার—
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা
সফল হল তার।"

কবিতাবলীর ভাবানুসারী এই চিত্রমালার কয়েকটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে ব্যথা, বেদনা ও মানসিক যন্ত্রণার ভাব। কিন্তু শিল্পী তাকে এমন রূপের ভাষায় বাস্তবায়িত করেছেন যা দেখে মানুষের মন ব্যথিত হয় না। কবিতাগুলিও যেমন হৃদয়কে আন্দোলিত করে, কিন্তু বেদনা-মথিত করে না, সরস কাব্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু রূঢ় বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করিয়ে ব্যথাতুর করে তোলে না। চিত্রগুচ্ছও ঠিক তদনুরূপ। এ যুগের অনেক কবিতায় ও চিত্রপটে যে যুগ-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, এখানেও সেই। ব্যথা, বেদনা, নিরাশা, ব্যর্থতা এখানে কোমল, মধুর ও রসস্নিগ্ধ। এবং তা একান্তভাবে মনে-প্রাণে অনুভব ও উপলব্ধির বিষয়। মনকে তা নিপীড়িত করে না। শুদ্ধ করে, পবিত্র করে।

রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার দ্যুতি ও অবনীন্দ্র-চিত্র-চন্দ্রিমার কিরণজালের মিলন-পর্ব্ব অন্তে শিল্পীর কাছে আবার পুঁথি চিত্রায়ণের তাগিদ এল ভগিনী নিবেদিতা রচিত গ্রন্থাবলীর জন্য। একটি বিষয় নির্দ্ধারণ করা আজ অত্যন্ত দুরূহ। বিষয়টি : এই সকল চিত্রের রচনা কাল। নিবেদিতার 'Cradle Tales of Hiuduism'-এর প্রথম সংস্করণ হয় ১৯০৭ সালের জুন মাসে। সুতরাং এই বইটির প্রথম মুদ্রণে যে ছবির প্রতিলিপি সংযোজিত হয়েছিল, তা ১৯০৭ সালের মধ্যে অবশ্যই অঙ্কিত। কিন্তু বাকি সচিত্র গ্রন্থ ক'খানি ১৯১৩ সালের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়নি। ছবিগুলি শিল্পী কবে রচনা করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। তবে ১৯১৩ সালের মধ্যে এঁকেছেন নিশ্চয়ই। অতএব পুস্তক-প্রকাশনার তারিখ অনুসারে চিত্র-পর্য্যালোচনা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই।

১৯০৭ সালে প্রথম প্রকাশিত ভগিনী নিবেদিতার 'Cradle Tales of Hinduism'-এ অবনীন্দ্রনাথের চিত্র একখানি ও মলাটের জন্য একটি বজ্রের নকশাই মাত্র স্থান পেয়েছিল। বজ্রের নকশা-কল্পনার মূলে ছিল নিবেদিতার নির্দেশ, উপদেশ ও প্রবল অনুপ্রেরণা। ছবিখানি : 'রাত্রিতে ভারতীয় গল্প-কথকের।' কথক ঠাকুর প্রদীপের আলোতে পুঁথি খুলে পুরাণের গল্প-কাহিনীর মর্ম্ম ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত।

ভগিনী নিবেদিতা বইটির ভূমিকা সমাপ্ত করেছেন এই কথা লিখে—

"The frontispiece of 'The Indian story Teller at Nightfall', and the Thunderbolt of Durga on the cover, are the works of the distinguished Indian artist, Mr. Abanindra Nath Tagore".

অবনীন্দ্রনাথের পাঁচখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রশোভিত দ্বিতীয় গ্রন্থ হোল ভগিনী নিবেদিতা ও ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর মিলিত চেষ্টায় লিখিত 'Myths of the Hindus and Buddhists'। প্রকাশনা কাল ১৯১৩ সাল। প্রকাশক George G. Harrap & Co. London। এই বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথের আরও পাঁচজন ছাত্র-শিষ্যের চিত্র সংযোজিত হয়েছিল। গ্রন্থ-ভূমিকায় ডঃ কুমারস্বামী লিখেছেন—

"The illustrations are reproduced from water colour drawings executed specially for this book by Indian artists under the supervision of Mr. Abanindranath Tagore C. I. E. Vice Principal of the Calcutta School of Art who has himself contributed some of the pictures.

The stories have thus the advantage, unique in the present series, of illustration by artists to whom they have been familiar from childhood, and who are thus well able to suggest their appropriate spiritual and material environment."

এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ যে পাঁচখানি ছবি এঁকেছেন তা সবই বুদ্ধ-জীবনী অবলম্বনে। বিষয়বস্তুর মহিমাও যেমন, রূপের মাধ্যমে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গীও তদপেক্ষা কিছু হীনপ্রভ নয়। বক্তব্যের মহিমা-গৌরবের যথার্থ অনুপূরক হয়েছে শিল্পীর কলাকৌশল। চিত্রনিচয়ে তিনি কিছু প্রতীকধর্ম্মিতারও আশ্রয় নিয়েছেন। সোজা কথায় স্পষ্ট ভাষায় সব কথা বলেন নি! বুদ্ধ-জীবনের দার্শনিক সত্যকে গভীর অনুভূতি ও রঙ-রেখার মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। বরণীয় বিষয় গৌরব, স্বদেশের ঐতিহ্য কীর্ত্তির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রেম, সংঘর্ষময় আখ্যায়িকার মূল ভাব, যুগপৎ সতেজরূপে ও স্নিগ্ধভাবে হয়েছে প্রকাশিত। নিছক ভাবোচ্ছ্বাসের রূপচিত্র নয়। এখানে প্রস্ফুট হয়েছে পরিণত বয়সের প্রজ্ঞাদৃষ্টি, মননশীল জীবন-চেতনা ও পূর্ব্বস্মৃতি মন্থনের

তাৎপর্য্যবোধ। ইতিহাস কিন্তু অবহেলিত হয়নি। চিত্রশৈলীর দুঃসাহসিক পরীক্ষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই চিত্রে একটি সার্ব্বভৌম আবেদন সত্তাশ্রয়ী সৃষ্টিরূপে হয়েছে প্রতিফলিত।

প্রথম চিত্রটি বোধিসত্ত্বের দাঁত। ছবিটি প্রতীকধর্ম্মী। পূর্ণ আখ্যানের বর্ণনারিক্ত। অনুতপ্তা ও শোকার্ত্তা বারাণসীর রানীর পৃষ্ঠপটে হাতীর বিশাল দাঁত। এই ইঙ্গিত-প্রতীকের মাধ্যমেই রানীর প্রতিহিংসার জ্বালা ও তার পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়েছেন শিল্পী।

দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধের জয় অর্থাৎ মার ধর্ষণের ঘটনা অল্পকথায় ও স্বল্প আয়োজনে সুন্দর ও চিত্রগ্রাহী।

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ চিত্রেও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার চেষ্টা নেই। রাজকুমার ও একটি মাত্র অশ্ব। মনে হয় তিনি যেন মেঘলোকের মধ্য দিয়ে চলেছেন এক অজানা জগতের অভিমুখে—সেই ধ্রুব সত্য লোকের সন্ধানে।

অতঃপর সন্ন্যাসী বুদ্ধের মূর্ত্তি স্থির, শান্ত ও সৌম্য। হাতে ভিক্ষাপাত্র। গৈরিক বসনে দেহ আবৃত। মস্তক তাঁর প্রভামণ্ডলবেষ্টিত।

এল মহাপরিনির্ব্বাণের দিন। চিতার লেলিহান শিখা। পদ্মোপরি তথাগতের চরণ-চিহ্ন। শিষ্যত্রয়ের (ভিক্ষু) শোকবিহ্বল চিত্র।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসম্বলিত নিবেদিতার তৃতীয় গ্রন্থ: 'Foot Falls of Indian History'। সচিত্র সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ সালে। এখানে তাঁর ছবি মুদ্রিত হয়েছিল মাত্র একখানি। বুদ্ধের জন্ম। এটির রূপকল্পনা, রঙ-রেখার বিন্যাস সমস্তই শিল্পীর প্রথম ভারতীয় ধরনের চিত্র-প্রচেষ্টার অনুরূপ এবং প্রারম্ভিক পর্য্যায়ের কৃষ্ণলীলা চিত্রের ন্যায় অপরিণত রূপের।

১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অবনীন্দ্র-তুলিকার আর এক সিরিজ —অপূর্ব, অভিনব এবং অতিমাত্রায় চিত্তামোদী পুঁথি-চিত্র। তা হচ্ছে, T. B. Bradley Birt কৃত 'Bengal Fairy Tales' বইটির ছ'খানি সেরা ধরনের ছবি। এরও প্রকাশক বিদেশী—John Lane, London।

ছ'টি ছবির ক্রমপর্য্যায় ও বিষয়বস্তু নিম্নোক্তরূপে আলোচনার যোগ্য:

দুর্ঘটনায় বা আচম্বিতে যার ভাগ্যোন্নতি। পটে দেখা যায় বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণ কালি-কলম-কাগজ নিয়ে দাঁড়ান। সামনে কালো গরু বা মহিষ জাতীয় একটি প্রাণী মুখ তুলে রয়েছে। অপূর্ব্ব রঙ ও আলোর খেলা।

অংশতঃ বাস্তববাদী পন্থায় অঙ্কিত। আদর্শ ও বাস্তবের ঈদৃশ সমন্বয় চিত্রখানিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

তাঁতী পদ্মলোচন হুঁকায় তামাক টানছে, আর গ্রামের জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করাচ্ছেন। চমৎকার গ্রামীণ পরিবেশ। খড়-বাঁশের বেড়া। কালো ও বাদামী রঙের প্রয়োগাধিক্য। চরিত্র-চিত্রণ অতুলনীয়। মুখভঙ্গী ও ভাবের অভিব্যক্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সার্থক ও সুন্দর।

মুদির ছোট ছেলে ক্ষুদিরাম। পা ছড়িয়ে বসে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে জিনিসপত্র ওজন করতে ব্যস্ত। এখানেও চরিত্র-চিত্রায়ণ ও পরিবেশ রচনা বিশেষ কৌতুহলকর ও আনন্দদায়ক। কালো, হলদে ও বাদামী রঙের প্রাধান্য।

কালোপরী ও নিদ্রাপরী। মেঘের অন্তরালে দুটি নারীমূর্ত্তি। আবক্ষ দৃশ্যমান। কেশে-কবরীতে নানা রত্নালঙ্কার। আকাশে বৃত্তাকার চাঁদ। এখানেও বাদামী ও কালোরঙের নিবিড় বাহার। মেঘের খেলা ও চাঁদের রূপমাধুরী ভারী উজ্জ্বল ও চমৎকার। পরীদ্বয়ের গহনাগাঁটির সোনালী ঝলক যেন বিজুলির চমক। অদ্ভুত রঙ-রসের আকর্ষণীয় চিত্র। কোন অত্যুজ্জ্বল বর্ণের সমারোহ নেই, নেই কোন জাঁকজমক ও আড়ম্বর। কিন্তু রূপমাধুর্য্যের অতলান্ত প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে পটের গায়েতে। যেন স্বপ্নরাজ্যের মোহিনীরা চলেছেন কোন এক মায়ার দেশে। বর্ণিকাভঙ্গের নিবিড়তা ও চাতুর্য্যই এই চিত্রের প্রধান সম্পদ-সুষমা।

বড় রানী ও সন্ন্যাসী (রাজকুমারী ও কলাবতী)। বড় তালপাতার নীচে সন্ন্যাসী। লাল শাড়ী ও উড়নি মণ্ডিতা বউ-রানী। বধূটির চোখ মুখ আবৃত। সন্ন্যাসীর বিরলবেশ। কৌপীন মাত্র সম্বল। চুল দাড়ি typical, পাশে চ্যাপ্টা কমণ্ডলু। Type সৃষ্টি অত্যন্ত নৈপুণ্যময় ও বাস্তবানুগ।

দেড় আঙুল আয়তনের মানুষ। উপরে বিশাল বপু একটি ব্যাঙ্ লাফিয়ে আসছে। তার নীচে ক্ষুদ্রাকার সেই মানুষটি। পরনে তার লাল কাপড়। চিত্রখানি সার্ব্বিকরূপে কৃষ্ণবর্ণের রহস্যাবরণে আবৃত। তার মধ্যে ব্যাঙের অতি-বিস্ফারিত গোলাকার অক্ষিদ্বয় জলজ্বল করছে। ক্ষুদে মানব ক'টির গায়ে জোরালো আলোর ঝলক চিত্রপটে বিস্ময়কর এক রসপ্রবাহ এনে দিয়েছে।

বাংলার রূপকথার কাহিনীর ইংরেজী সংস্করণের জন্য চিত্র রচনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনিই তো আবার কত শত রূপকথার

অপরাজেয় কথক। কত বিচিত্র বাক্‌ভঙ্গীই না প্রকাশ করেছেন তিনি তাঁর শিশু-সাহিত্যের মধ্যে। শৈশবে তিনিও শুনেছেন, 'পড়ন কথা'র মত কত শত গল্প-কাহিনী, আর তা শুনতেন দাসী, চাকর থেকে শুরু করে বড় হয়ে পেশাদার কথকের মুখেও। শৈশবে শোনা এবং তারুণ্যের রসে সিক্ত সেই গল্প-কথা পরবর্ত্তীকালে তাঁর রচিত সাহিত্যের পাতাকে করেছে আনন্দরস-নির্ঝরের উৎস। সেই কল্পনার উৎসকে তিনি আবার খুলে দিয়েছিলেন ইন্দ্রধনুতুল্য বহু বর্ণাঢ্য চিত্রশৈলীর মাধ্যমে।

পদ্ম দাসীর মুখে শোনা ছড়া কাটার সুর আবার ধ্বনিত হোল তাঁর রচিত গল্পে ও চিত্রে। কত দিন বদলের পালা এসেছিল তাঁর জীবনে। কত আসর জমে ছিল ও ভেঙ্গে ছিল তাঁর চলার পথের দু'ধারে, কিন্তু তাঁর সৌখীন মেজাজ ও মজলিশী মন বদলায় নি এতটুকু। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথ অনন্য ও অসাধারণ। শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর সহজাত রহস্যবোধ ও কল্পনা-বিলাসকে অটুট ও অপরিবর্ত্তনীয় রেখে ব্যক্ত করেছেন লেখায়-লেখায়, নানা-রচনায় ও ছবিতে-ছবিতে। প্রবীণ অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যেও বারে বারে সেই শৈশবধর্মী কল্পনার ধারা উপচে পড়েছে বিচিত্র ও সহজ কৌতুকপ্রিয়তার পথ বেয়ে। আলোচ্য রূপকথার চিত্রেও সূক্ষ্ম কৌতুকরসের সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষ-কটাক্ষের নিদর্শন আছে অনেকখানি। তবে কোন নির্ম্মমতা নেই। এই কৌতুকবোধের মধ্যে শিল্পীর সমাজ-সচেতনতার ছাপও দুর্লভ নয়।

টেক্‌নিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অবনীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষার মূল কাঠামোটিও মাঝে মাঝে অন্তর্গূঢ়ভাবে কাজ করেছে এই চিত্র চয়নিকার মধ্যে।

সেদিনের প্রখ্যাত কলা-পত্রিকা 'রূপম্'-এ এই বইখানির চিত্রমালা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২১ সালের এপ্রিল সংখ্যাতে। সেখানে সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন—

"Mr. Tagore's six accompaniments in colours furnish the necessary pictorial atmosphere of the stories—and some of them reflect the peculiar humour of the stories with remarkable delicacy and charm."

গ্রন্থ পুস্তকের পাতা অলঙ্কৃত করার উদ্দেশ্যে অঙ্কিত অবনীন্দ্রনাথের শেষ সৃষ্টি নিদর্শন পাওয়া যায় Scott O'Conar-এর 'Charm of Kashmir'

নামক গ্রন্থে (Longmans Green, 1920)। এই বইখানিতেও অবনীন্দ্রনাথের চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল ছয়খানি। যেমন :

(ক) রাজা অশোক, (খ) নিশাতবাগে জাহাঙ্গীর ও তাঁর বেগম, (গ) চশমশাহী জলের ধারে বালিকার চিত্র, (ঘ) নশিম গ্রন্থ হাতে জনৈক কবি, (ঙ) নিশাকালে শালিমারে সম্রাট শাজাহান, (চ) ভাগ্য এবং সুখের পিয়ালী।

অবনীন্দ্রনাথ কখনও কাশ্মীর ভ্রমণে যাননি। কিন্তু তাঁর কল্পনার নয়নাঞ্জনে রঞ্জিত ও তাঁর হৃদয়-মুকুরে প্রতিবিম্বিত কাশ্মীরের যে রূপ, তাকে তো সেখানকার বাস্তব দৃশ্য ও পরিবেশ আদৌ পরাভূত ও হীনপ্রভ করতে পারেনি। ওখানকার প্রাকৃতিক আবহমণ্ডল ও সৌন্দর্য্য-সুষমার বাস্তব রূপের সঙ্গে তো চিত্রীর চিত্তপটে উদ্ভূত রূপলহরী এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছে। বাস্তব ও কল্পনা মিলে এমন এক আলো-আঁধারি মায়াময় রূপের রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে ধরাতলের স্বর্গ যেন সত্যসত্যই প্রত্যক্ষের বস্তু হয়ে উঠেছে। সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম এই চিত্রের বর্ণিকাভঙ্গ। দিবারাত্রির সময়াবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর-প্রকৃতি যে কত বিচিত্র ও ভিন্নরূপে আবির্ভূতা হন, তা অবনীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে না দেখেও সত্যরূপে ও সুসিদ্ধ উপায়ে চিত্রার্পিত করেছেন। বাদশাহ শাজাহানের চেহারা ও ভাবভঙ্গী বিশুদ্ধ মুঘলাই। কিন্তু এখানে মুঘল চিত্রের বাহ্যাড়ম্বর ও কৃত্রিম জাঁকজমক বাহুল্য একেবারেই নেই। বাস্তবানুগ প্রথায় অঙ্কিত হলেও, উগ্রতা ও যথার্থ অনুকরণের কোন প্রশ্ন ছিল না। এই চিত্রের প্রধান লক্ষণীয় বিষয়, ঐশ্বর্য্য-মহিমার সুসংযত ব্যঞ্জনা। স্থাপত্য-বিন্যাস রমণীয়। প্রকৃতির রূপমাধুরী এখানে অঢেল। কিন্তু তাতে উচ্ছলতা নেই, আছে প্রশান্ত রমণীয়তা। পাহাড়-পর্ব্বতের রূপারোপে এই বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই চিত্রের মধ্যে শিল্পীর ইতিহাস-সচেতনতাও অলক্ষণীয় নয়।

এই চিত্র-কল্পনা সম্পর্কে গ্রন্থকার ও'কোনর সাহেব বিশেষভাবে প্রশংসা-মুখর। তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বাণী বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে উদ্ধৃতির যোগ্য। কারণ তার মধ্যে চিত্রের রূপরহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে অতি চমৎকারভাবে।

"রসিকের বিচারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রনিচয় অবশ্যই সম্মান ও সুখ্যাতির উচ্চ মর্য্যাদালাভ করবে। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক ও নবজাগরণের অন্যতম হোতা ও নব্যচিত্র আন্দোলনের উদ্বোধক তিনি। তাঁর এই সৃষ্টিসম্ভার কেবল ভারতে নয়, পরন্তু প্যারিস, লণ্ডন এবং নিউ ইয়র্কেও

প্রচুর আগ্রহ ও সপ্রশংস দৃষ্টি লাভ করেছে। তাঁর কোমল, কমনীয় রেখা রচনা ও মধুর মাধুরী সৃষ্টির শক্তি এই চিত্রের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয়েছে পরিস্ফুট। এই কলা-নিদর্শনসমূহে আমাদের চোখের সামনে শিল্পীর যে অলৌকিক ও কাব্যময় অন্তর্দৃষ্টি প্রতিভাত হয়েছে তা বিচার করলে ইহাকে নিছক বুক্ ইলাস্ট্রেশন্ বলা চলে না। পরন্তু ইহা উচ্চাঙ্গের মৌলিক সৃষ্টি। এই চিত্রমালায় কাশ্মীর প্রদেশের আত্মার কথা রেখা বর্ণের অক্ষরে হয়েছে লিখিত। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ইহা অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান ও নিগূঢ় অথচ প্রাঞ্জল পরিচায়িকা। এই স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত দেশে যাঁরা যাওয়া-আসা করেন, তাঁদের চোখে ইহার বাহ্য সৌন্দর্য্য সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রে কাশ্মীরের বাহ্য সৌন্দর্য্যের অতিরিক্ত অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।"

॥ ৮ ॥

অবনীন্দ্রনাথ বলতেন—

"আমি মুঘল সিদ্ধ, নন্দলাল শিব সিদ্ধ, আর ক্ষিতিন চৈতন্য সিদ্ধ।"[১]

কথাটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ও কৌতূহলজনক সন্দেহ নেই। ইহা কেবলমাত্র অর্থ গৌরবে ও স্বয়ং শিল্পাচার্য্যের উক্তি হিসেবেই তাৎপর্য্যময় নয়। কার্য্যকরীভাবে, প্রত্যক্ষরূপেও তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নানা চিত্রপটে, বহুতর রূপে ও অজস্র ভঙ্গীতে।

গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই অবনীন্দ্রনাথ মুঘল ইতিহাসে বর্ণিত সুখ-ঐশ্বর্য্যময় স্মৃতির রাজ্যে বিচরণ করেছেন বারে বারে। কৈশোরে প্রপিতামহের গ্রন্থাগারে একটি 'মুরাক্কায়' (অ্যালবামে) নিবদ্ধ যে চিত্রগুচ্ছ দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন, তাও মধ্যযুগীয় মুঘল চিত্র। মুঘল যুগের চিত্রকলা ও কারুশিল্পই ছিল তাঁর দেশজ চিত্র-ভাবনার স্রোতধারার উৎস। তিনি তা দেখলেন ও আনন্দাভিভূত হলেন তো বটেই। আর তাতে খুলে গিয়েছিল তাঁর হৃদিকন্দরে নিহিত শিল্প-ভাবনার রুদ্ধদ্বার। তিনি পাশ্চাত্য প্রথার আদর্শ ও ইজেল ক্যানভাসকে পাশে সরিয়ে, তেলরঙের মোটা তুলিকে তুলে রেখে ধরলেন সূক্ষ্ম সরু তুলিকা। তবে তেলরঙের আধারটিকে পুরোপুরি ও-পাশে সরিয়ে রাখেন নি কিছুদিন।

মুঘল বিষয়ক চিত্রের প্রথম পর্য্যায়ের দুই একখানি তিনি তেলরঙ-এর মাধ্যমেই অঙ্কন করেন।

তাঁর অঙ্কিত মুঘল ইতিহাসের প্রথম চিত্র: 'মৃত্যুশয্যায় শাজাহান'। ছবিখানি প্রথম এঁকেছিলেন তেলরঙে। পরে জলরঙে তার আর একটি সংস্করণ তৈরী করেন স্বহস্তেই। সেটি আরও উৎকৃষ্ট হয়েছিল।

মর্ম্মর প্রাসাদের যমুনামুখী উন্মুক্ত কক্ষে রোগশয্যায় শায়িত শাজাহান। চারটি সুউচ্চ স্তম্ভ ও জালি কাজ-যুক্ত রেলিঙ-বেষ্টিত প্রশস্ত কক্ষে পালঙ্কোপরি সম্রাট শায়িত। পদপ্রান্তে গালিচার উপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন শোকমগ্না জাহানারা। সম্রাটের চেহারায় বার্দ্ধক্য ও রোগক্লিষ্টতার ছাপ। দূরে যমুনার ও-পারে দেখা যাচ্ছে তাজমহলের শুভ্র-সমুজ্জ্বল রূপ। সম্রাট সেদিকে তাকিয়ে শেষলগ্ন অর্থাৎ তাজবিবির সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য

১. ও. সি. গাঙ্গুলী ও ক্ষিতিন মজুমদারের মুখে শোনা।

অপেক্ষমান। উচ্চ আকাশে চারু চন্দ্রিমা। কিন্তু তার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে মেঘের কালো ছায়া। কিরণজাল তাতে ছড়িয়ে পড়তে বাধা পাচ্ছে।

শিল্পী বোধ হয় বিষণ্ণ রুগ্ন সম্রাটের শেষ অবস্থার বিষাদময় পরিবেশকে সার্থক রূপায়ণের জন্যই চন্দ্রমাকে মেঘের অন্তরালে স্তিমিত রূপে রেখে দিলেন। সমগ্র পশ্চাৎপটটি ঘন ছায়াতে আচ্ছন্ন। স্থাপত্যাংশ মুঘল স্থাপত্যের সফল অনুকরণ। স্থাপত্য দেহের অলঙ্কার নকশা পুরো মুঘলাই। তবে মাঝে মাঝে শিল্পী তাকে সরলতর করে, পরিপাটি করে, তোলার চেষ্টা করেছেন। পরিবেশ রচনা, রূপসৃষ্টি ও বর্ণ-বিন্যাসে যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। মধ্যযুগীয় চিত্রকে সর্ব্বাংশে অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায় না।

জাহানারার চেহারা অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য Early works-এর নারীমূর্ত্তির অনুরূপ। অতি Simple ও Slender। মুঘল রাজদুহিতা। কিন্তু পোশাকে-আসাকে, ভাবভঙ্গীতে কোন আড়ম্বর নেই। সাধারণ গেরস্তসুলভ বেশভূষা। সম্রাটের কক্ষে, আশেপাশেও কোন আসবাব আড়ম্বর নেই। কন্যাসহ বন্দী-জীবন। সুতরাং সারল্য-সুষমাই যথাযোগ্য। ও-পারে তাজমহলের ক্ষুদ্রাকার শ্বেত-শুভ্র রূপ বস্তুতঃই 'কালের কপোলতলে একবিন্দু অশ্রু'-র মতই সমুজ্জ্বল।

জাহানারার চেহারা ব্যতীত আর কোনও দিকে এটিকে Early works-এর মত মনে হয় না। Composition বেশ পরিণত ও মৌলিক। প্রথম প্রচেষ্টা হলেও আসল মুঘল চিত্রের আদলও দেহভঙ্গীকে কপি করেন নি। এই চিত্রখানি বস্তুতঃই শিল্পীর প্রারম্ভিক রচনা। কারণ এর আগে মুঘল বিষয়ক তো নয়ই, ভারতীয় রীতির সাধনাই শুরু হয়েছিল তার স্বল্পকাল পূর্ব্বে।[১]

ছবিখানি সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা অতি মাত্রায় প্রশংসামুখর হয়ে 'মডার্ণ রিভিউ'-তে একটি টীকা ব্যাখ্যা লিখেছিলেন (মে, ১৯০৭)। তার কিছু অংশের অনূদিত রূপ—

"...চমৎকার রাজত্বের শেষ ভাগে এসে গেল সাত বছরের বন্দী-দশা। যার সম্মুখে বলতে গেলে সমগ্র পৃথিবী (ভারতবর্ষ) মাথা নত করতো, তিনি শেষ পর্য্যন্ত গর্ব্বিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করলেন তাঁর একটি মাত্র নিজ কন্যার অতি সুমিষ্ট গভীর শ্রদ্ধা ও সেবা লাভ করে।...

এবারে শেষ দিনটি এসে গেল!

শোনা যায় যে মৃত্যুমুখী বাদশার তীব্র আকুতি ও অনুরোধেই ঐ দিনটিতে

১. এ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

তাঁর পালঙ্কটিকে আগ্রা দুর্গের জেস্‌মিন টাওয়ারের (জুঁই-গম্বুজ) ও-ধারে নদীর উপরে ঝুল বারান্দায় এনে রাখা হয়েছিল। পিতার পদতলে জাহানারা ক্রন্দনরতা ; অন্যান্য সকলেই সেখান থেকে চলে গিয়েছেন। মহিমান্বিত বন্দীকে সাহায্য বা সেবা করার জন্য আর কেউ রইল না। গালিচার কিনারায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে সম্রাটের জুতাজোড়া ও বাদশাহী শিরস্ত্রানটি। শেষবারের মত ওদের ত্যাগ করেছেন সম্রাট। কারণ তখন তাঁর সমস্ত পার্থিব বস্তু-সামগ্রীর প্রয়োজন মিটে গিয়েছে। গভীর নিস্তব্ধতা ও রাত্রির গাম্ভীর্য্য এবং ভাসমান মেঘমালার সুস্নিগ্ধ আবরণে অর্দ্ধাবৃত শশাঙ্ক সেই শান্তিময়ী বাদশাহ নন্দিনীর আত্মাকে আচ্ছন্ন করে আছে।

কিন্তু স্বয়ং শাজাহান ? তিনি সেই মুহূর্ত্তে একটি আশার আনন্দে মগ্ন। দুর্গ প্রাকারের নীচে প্রবহমানা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি তাঁর মনকে পূর্ণ করে দিচ্ছে একটি কথায়, যে জীবন-নদীর শেষ কিনারায় তাঁর আত্মা উপনীত হয়েছে। অদূরে, নদীর বাঁকের ও-ধারে যেন শ্বেত আবরণে আবৃত অতি সূক্ষ্ম ও স্বর্গীয় কোন সত্তা তাজের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে—সেই বেগমের জন্য নির্ম্মিত তাজ, তাঁরই মুকুট যা সম্রাট তাঁরই জন্য করিয়েছিলেন তৈরী। কিন্তু সেই রাত্রিতে তা বেগমের মুকুটের চেয়েও ঢের বেশী কিছু হয়ে উঠেছিল। ঐ দিনে তিনি মূর্ত্তিমতী হয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন সেখানে।...

শাজাহানের এইভাবে মৃত্যু, এ জগত থেকে এই বিদায় দৃশ্য, বাস্তবিকই একটি মহিমময় রাজকীয় জীবনাবসান। তবে একজন নারীর হৃদয়ে তাঁর যে স্থান, তিনি সেখানে যে রাজাসনে সমাসীন তার মত সত্য আর কিছু নয়।”

অবনীন্দ্রনাথ এই ছবিখানি এঁকেছিলেন তাঁর একটি কন্যার অকাল-বিয়োগের অব্যবহিত পরে। সে কাহিনী তিনি আত্মস্মৃতি বর্ণনে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল শিল্পীর যৌবনকালে। বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েও সুদূর পেছনে ফেলে আসা সেই দুঃখের স্মৃতি-জড়িত চিত্রখানি রচনার গোড়ার কথা ভুলতে পারেন নি। শিল্পীর অন্তরের অন্তরালে সঞ্চিত সেই দুঃখ বেদনা বোধ হয় মাঝে মাঝে গভীর একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি করতো। আর তা কখনও কখনও উদ্বেলিত হয়ে নানা কথার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতো।

শেষ বয়সে সেই রকম একদিন অবসরকালে কবি জসীমউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা কালে তিনি ‘শাজাহানের মৃত্যু’ চিত্রটির প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন—

“আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। শোকে তাপে আমি জর্জরিত। হ্যাভেল সাহেব বললেন, করোনেশন উপলক্ষে দিল্লীতে একজিবিশন হচ্ছে। তুমি

একটা কিছু পাঠাও। আমি কি করি, মনও ভাল না। রঙ-তুলি নিয়ে আঁকতে আরম্ভ করলাম। আমার মেয়ের মৃত্যু-জনিত সমস্ত শোক আমার তুলিতে রঙীন হয়ে উঠলো। শাজাহানের মৃত্যুর ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। আঁকতে আঁকতে মনে হল, সম্রাটের চোখে মুখে, তাঁর পিছনের দেয়ালের গায়ে আমার সেই দুঃসহ শোক যেন আমি রঙিন তুলিতে করে ভরে দিচ্ছি। ছবির পিছনের মর্ম্মর দেয়াল আমার কাছে জীবন্ত বলে মনে হল। যেন একটা আঘাত করলেই তাদের থেকে রক্ত বের হবে। দিল্লীতে সেই ছবি পুরস্কার পেল। কিছুদিন পরে হ্যাভেল আমাকে বললেন, এই ছবিটার একটা নকল আমাকে দাও। আমি ছবিটা কপি করতে আরম্ভ করলাম। নন্দলাল আমার পেছনে বসা। ছবি আঁকতে আঁকতে আমার মনে হচ্ছে, ছবির পিছনের মর্ম্মর দেয়াল যেন যুগ যুগান্তর ধরে আমার সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে। ছবির যা কিছু সব যেন আমার কাছে জীবন্ত। এই ভেবে আমার তুলি নিয়ে সেই পিছনের প্রসারিত দেয়ালের উপর তুলির টান দিতে যাচ্ছি, অমনি নন্দলাল আমার হাত টেনে ধরেছে: করেন কি, ছবিটা ত' নষ্ট হয়ে যাবে। অমনি আমার জ্ঞান ফিরে এল।"[১]

মূল চিত্রটি অঙ্কনের তিন চার বছর পরে বোধ হয় কপিটি করেছিলেন। তা না হলে নন্দলাল বসু সেখানে থাকতে পারেন না। কারণ, তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯০৫ সালের শেষ ভাগে, কি পরে।

১৯০২-৩ সালে দিল্লীর দরবার প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল তিনখানি। উপর্যুক্ত 'শাজাহানের মৃত্যু' ব্যতীত আর দু'খানি ছবিও মুঘল বিষয়ক। একখানি 'বন্দী বাহাদুর শাহ', দ্বিতীয়টি 'তাজ নির্মাণ'।

শেষোক্ত দু'খানি ছবির বিষয়বস্তু ও রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রদর্শনীর ক্যাটালগের বর্ণনা যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রথম দু'খানি ছবি তেল-রঙের। তৃতীয়খানি জলরঙের। প্রথমখানি প্রদর্শনীতে রৌপ্যপদক লাভ করে সম্মানিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় চিত্রখানি সম্বন্ধে ক্যাটালগের বর্ণনা—

"The Capture of Bahadur Shah was hardly so good as the picture previously described. The usual conception of the scene is rather more dramatic than the one here shown which represents a very quiet scheme of colour with

---

১. ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়: জসীমউদ্দীন। পৃ: ৮০-৮১

three or four figures, the proportion of some of these being open to criticism. A noticable part of the effect however is the admirable harmony displayed in the colour of the old king's costume with the blue and gold dress of his guard."

তৃতীয় চিত্রের বিষয় হোল, সম্রাট শাজাহানের কাছে কারিগরগণ তাজমহলের মডেল তৈরী ক'রে এনে হাজির করেছেন। এই ছবিটিরও যে বর্ণনা পাওয়া যায় ক্যাটালগের পাতায়, তা হচ্ছে—

"The remaining picture is executed in 'body colour' touched with gold and silver. It depicts the 'construction of the Taj'. The quality of the drawing is somewhat mixed, in some places being decidedly wrong, but the most striking part of the effort is the exceptionally good modelling of the features, which appear to have been copied from early likenesses, they are infact early Muhammedan paintings but infused with a feeling of like that was rarely attained by those artists. The whole effect of the particular composition is most rich and decorative."

ছবিখানি 'মডার্ন রিভিউ'তে মুদ্রিত হয়েছিল ১৯০৯ সালের জুন মাসে। তৎসহ লিখিত বর্ণনায় ছবিখানির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়—

"Our frontispiece, 'Building the Taj' is a reproduction from the original water colour by Mr. Abanindra Nath Tagore. The Emperor Shah Jehan sits contemplating with concentrated attention to the still incomplete Taj Mahal in the distance. There are still the minors to add. He holds a miniature of Taj in his hand. It is well known that he took great interest in architecture and understood the art. His very looks show that he is capable of suggesting appropriate additions and improvements. Farthest from him to the right sits the chief builder, lost in thought probably as to how he could carry out his master's orders.

The maker of the plan too, is there with his plan. And there is the old Maulavi selecting texts from Quran to be inscribed on the walls to serve both as decoration and concentration. The boy standing behind the Emperor is servant."

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত পরবর্ত্তী মুঘল বিষয়ের চিত্র শাজাহানের তাজমহল কল্পনা (Shah Jehan dreaming of Taj)। ছবিখানি ১৯০৯ সালের মধ্যে অঙ্কিত হয়েছিল। কারণ ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'তে, আর বাংলা ১৩১৬ সনের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এর প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছিল। তৎসঙ্গে দুটি পত্রিকাতেই ছবিখানি সম্বন্ধে এত আলোচনা বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল, যার পরে আর কিছু বক্তব্য ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজন বা অবকাশ কিছুই থাকে না। ছবির বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, রীতির বিশিষ্টতা, ভাবব্যঞ্জনা সবই সে আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে প্রাঞ্জল রূপে।

'মডার্ণ রিভিউ'তে লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর অনবদ্য লেখনীর বর্ণনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য। সেই অংশটি হোল—

"Its beauty will appeal to all. The intense quiet of the subject demands night-treatment, and the little tomb of Taj-Bibi, focussing the light of the veiled moon upon itself, is wonderfully, eloquent of its spiritual place in the Emperor's life. The drawing is full of strength. But we do wish that we might again enjoy colour at the hands of Mr.Tagore !"

সেদিনের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী মুখেও এই ছবিখানি অতি চমৎকার ভাবে ও ভাষায় 'প্রবাসী'র পাতাতে বর্ণিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন—

"শাজাহান দীন দুনিয়ার মালিক শাহানশা, আর আর্জুমন্দ বানু তাঁহার মহিষী—উভয়ে প্রেমের রাজ্যে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী। দুইটি মানব হৃদয় প্রণয়মন্ত্রে এমন দৃঢ় দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহাদের না ছিল বিরহ, না ছিল বিচ্ছেদ ; হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়া জীবনে মরণে একাকার হইয়া গিয়াছিল।

সম্রাট শাজাহান যাইবেন যুদ্ধে। সেই সুদূর দাক্ষিণাত্যেও প্রণয়িনী তাঁহার সঙ্গের সাথী। যখন নরনারীর প্রেমের চরম সার্থকতা, সেই শুভ মুহূর্ত্তে শাজাহানের হৃদয়ে নির্ঘাত বেদনা বাজিল ; সন্তান প্রসবের পরে মহিষীর মৃত্যু

হইল। সম্মিলিত হৃদয় দ্বিধা ভাঙ্গিয়া গেল। মৃত্যু মনে করিল, হরণ করিলাম, কিন্তু প্রেমে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহাকে বিনাশ করে কার সাধ্য?

উজ্জ্বল তরঙ্গা নদীর ধারে শ্যামল সুন্দর উদ্যানের মধ্যে বাদশাহের উজ্জ্বল সুন্দর চিরনবীন প্রেমের স্মরণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। তাজ বিবির সমাধি আজ শাজাহানের পবিত্র তীর্থ; ইহা তাহার মিলন-মন্দির।

দিনান্তের রবিকর আকাশের মলিন মুখে যখন বিদায় চুম্বন আঁকিয়া দিতেছে; শিশুশশী মেঘের আড়ে লুকোচুরি খেলিতেছে, তখন শাজাহান সকল কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া একাকী তাঁহার প্রেয়সীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, ঐ দূরে জমাট বাঁধা অশ্রুবিন্দুর মত শুভ্র মর্ম্মরের সমাধি, ঐ মর্ম্মরের চারিদিকে সম্রাটের মর্ম্মবেদনা নিবিড় হইয়া আছে। কল রোদনে নদী তাঁহারই অন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে, পুঞ্জিত মেঘের মত বেদনার পশ্চাতে নিষ্ঠা ও প্রেম শান্তির রেখাপাত করিয়াছে; অন্তরের প্রদীপ আজ নিভিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু নিষ্ঠার বেদীতে প্রেমের হোমাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে; সম্রাট ধীর প্রশান্ত ভাবে প্রেয়সীর সমাধির পার্শ্বে যজ্ঞাহুতি দিতে চলিয়াছেন।

যিনি একদিন দেবীর মত এক বুক প্রেম ও সেবা, শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা, শান্তি ও সন্তোষ বহিয়া সম্রাটের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পত্নী, মাতা, সম্রাজ্ঞী আজ ইহজগতে নাই বলিয়া কি কোথাও নাই? আছেন, তিনি আছেন, সম্রাটের অন্তর আজ তাঁহার সিংহাসন, অনাবিল প্রেম আজ তাঁহার মুকুট, আজ তিনি রাজরাজেশ্বরী। আর আজ তিনি দেবী!—পরমেশ্বরের শ্রীচরণতলে বসিয়া তিনি বিরহীর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করিতেছেন।

প্রাণ যেমন দেহকে চায়, অন্তরের শ্রদ্ধা তেমনি বাহিরে বিকাশ পাইতে চাহে। শাজাহানের অন্তর আজ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া টলমল করিতেছে, ধর্ম্মের প্রশান্ততায় তাঁহার অন্তর বাহির থমথম করিতেছে, কিন্তু বাহিরেও ইহার বিকাশ চাই—এমনি শুভ্র অনাবিল বিরাট সুন্দর যা হোক একটা কিছু। ভাব আজ আকার পাইবার জন্য প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করিতেছে।

কোনো এক অজ্ঞাত সায়াহ্নের ধূসর আলোকে শাজাহানের চিত্তে তাজ-মহলের অপূর্ব্ব কল্পনা হয়ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা প্রেমকে বরিষ্ঠ সুন্দর করিয়াছে, প্রেমিককে ধন্য করিয়াছে, প্রেমিকাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

একেই বলে রাজার মত প্রেম, আর রাজার মত কল্পনা! আর সেইজন্যই ইহা কবির আদরের সামগ্রী।

অবনীন্দ্রবাবু কবি-চিত্রকর। কবি প্রকাশ করেন বাক্যে, চিত্রকর প্রকাশ করেন বর্ণে ও রেখায়। কবি-চিত্রকর রেখা ও বর্ণের সমাবেশ করিয়া তাহার মধ্যে কাব্য রস ধারা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। তাজমহল ভারতের গৌরব, অবনীন্দ্রবাবু বিবিধ চিত্রে তাহাকে কবিত্বময় করিয়া তুলিয়াছেন।"

ইতিহাসের যে অংশ অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ এই চিত্র অঙ্কন করেছেন তার মর্ম্ম এই—

"দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে যাবার সময় শাজাহান তাজবিবিকে সঙ্গে নিয়ে যান। রাস্তায় পুত্র প্রসবকালে তাঁর (তাজবিবি) মৃত্যু হয়। প্রথমে ঐ অঞ্চলেই নদীতীরস্থ একটি মনোরম উদ্যানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। নদীর এক পারে যুদ্ধক্ষেত্র, অপর পারে সম্রাজ্ঞীর সমাধি। প্রতি শুক্রবারে শাজাহান একাকী সেই সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে উপাসনা করতেন।"

সম্রাটের সেই যাবার দৃশ্য। আর যেতে যেতে আগ্রায় তাজমহল নির্মাণের কল্পনা। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার উক্তি—

"চন্দ্রগর্ভ শুভ্র মেঘের পরিপাণ্ডু আলোক সমাধির উপর পাতিত করিয়া নিপুণ শিল্পী ঐ বস্তুটিকে সম্রাটের অন্তরের অতি পবিত্রলোকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন।"

ছাবটি নিয়ে এত হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, এত মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা ব্যাখ্যান দেখে তৎকালীন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি 'প্রবাসী'তে ছবির প্রতিলিপি ও সেই সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্যাদি দেখেই তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে চালিয়ে দিলেন ছবিখানির সমস্ত গুণাগুণকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য। তিনি চিত্রার্পিত বিষয়ের মধ্যে ঘোড়াটিকে নিয়েই মাত্রাহীনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'সাহিত্য'র ১৩১৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায় তিনি লিখলেন—

"সর্ব্বপ্রথমেই (প্রবাসীতে) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত শাজাহানের 'তাজ নিমাণ স্বপ্ন', নামক একখানি চিত্রের প্রতিলিপি। অবনীন্দ্রনাথের শাজাহান ঘোড়ায় চড়িয়া তাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখিতেছেন। সামান্য মানব শয্যায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া, অন্ততঃ চেয়ারে বা দেয়ালে বা ঘানীগাছে 'ঠেস্' দিয়া স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির শাজাহান ত' তা করিতে পারেন না। তিনি তাজ নির্ম্মাণের স্বপ্ন দেখিবার জন্য উদ্ভট কল্পনা-লোকের পক্ষিরাজে আরোহণ করিয়াছেন। শাজাহানের বাহনটি চমৎকার। মুখটি চমৎকার ছুচঁলো, ঘোড়া বলিয়া চেনা যায় না।

কতকটা ইঁদুরের ও কতকটা শূকরের মুখ মিলাইয়া এই ঘোড়ার মুখ কল্পিত ও চিত্রিত হইয়াছে। কালীঘাটের কাঠের ঘোড়া ইহার আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু সে আদর্শেও স্বাভাবিকতার যে ক্ষীণ আভাস দেখা যায়, অবনীন্দ্রনাথ ততটুকু স্বাভাবিকতাও সহিতে পারেন নাই। সযত্নে তাহাকে ঘোড়ার সান্নিধ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। অশ্ববরের পুচ্ছও অত্যন্ত চমৎকার —কোনও মতে পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন। আকাশেও উদ্ভট বর্ণের বিকার। মোটের উপর এই চিত্রখানিকে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির অকালকুষ্মাণ্ড বলা যাইতে পারে। স্যার যোশুয়া রেনল্ড জীবচিত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের ঘোড়া দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনিও যদি জানোয়ার আঁকিতে আরম্ভ করেন, ভবিষ্যতে রেনল্ড হইতে পারিবেন। যদি সে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পীরের আস্তানা হইতে মাটির ঘোড়ার 'মডেল' আনিয়া আঁকিতে আরম্ভ করুন—সেই মৃৎপিণ্ডই তাঁহার যোগ্য মডেল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্য এই যে, অবনীন্দ্রবাবু অসঙ্কোচে এই ছবিখানি ছাপিবার অনুমতি দিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এই রূপচিত্রের স্তুতিগান যাঁহাদের পেশা, শ্রী-বিরাগী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম, অতএব তাঁহার স্তুতিগানে আমরা বিস্মিত হই নাই।"

সমাজপতি মহাশয় অবনীন্দ্রনাথকে কটু ভাষায় ও কদর্য্য ভঙ্গীতে আক্রমণ চালাতে গিয়ে একটি মারাত্মক ভ্রম করে বসেন। আসলে যোশুয়া রেনল্ড বিখ্যাত পশু-প্রাণী চিত্রকর নন। তিনি হলেন ল্যাণ্ডসীয়র। কিন্তু সাহিত্য পত্রিকায় তিনি রেনল্ডের নাম উল্লেখ করার পরে অবনীন্দ্র-চিত্রানুরাগী মহল থেকে ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয় সরস ব্যঙ্গ করে ভুলটি ধরিয়ে দেন। তারপরে 'সাহিত্য' সম্পাদক উক্ত বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতেই ভুল সংশোধন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন।

ছবিখানি সম্বন্ধে অনেক স্তুতি-নিন্দার পালা চলেছিল বেশ কিছুদিন। কিন্তু ওটির একটি মুখ্য বিশিষ্টতা কোথাও আলোচিত হয়নি। তা হচ্ছে, পটের উপরিভাগে ঘন মেঘ রচনার ভঙ্গী ও সেই অংশে আলো-ছায়া পাতের বৈপরীত্য রীতি। তার মধ্যে শিল্পীর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের প্রতিফলনও যেমন, তেমনি আবার আসল মুঘল চিত্রানুগ প্রথায় বাস্তবিকতাময় মেঘ ও আকাশের রূপ রচনা হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। তৎসঙ্গে শিল্পীর মৌলিক ভাব কল্পনা এবং ওয়াশ পদ্ধতি মিশ্রিত হয়ে অদ্ভুত ও অভিনব ধরনের একটি নতুন চিত্ররূপ রচিত হয়েছে।

তাজমহল কল্পনার চিত্ররূপ দানের সমকালে বা হয়ত কিছুদিন পরে তিনি প্রায় বারোখানি মুঘল প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন। ছবিগুলি স্কেচ-ধর্ম্মী এবং সাইজে একটু বড়। তারপরেই (১৯০৭-৮) তিনি এঁকেছিলেন তাঁর সেই প্রখ্যাত চিত্র 'দারার মুণ্ড'। মেঝেতে দারার ছিন্ন মস্তক। অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে ঔরঙ্গজেব তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে দেখছেন মুণ্ডটি। তাঁর চেহারায় ও ভঙ্গিমায় ক্রূরতা ও অসহিষ্ণুতার ছাপ উঠেছে ফুটে। চরম ঈর্ষা, উচ্চাভিলাস ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক এটি।

মুঘল ইতিহাসের সুবিদিত ঘটনা। ছবিটি ই. বি. হ্যাভেলের Indian Sculpture and Painting নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মিঃ হ্যাভেল লিখেছেন—

"One of Mr. Tagore's latest compositions, Aurangzeb examining the Head of Dara is reproduced in plate Lxxv and the dramatic power with which he has treated this tragic episode in Mughal history will show the versatility of his art."

ছবিটিতে বস্তু সমাবেশ ও পরিবেশ পরিমণ্ডল পুরোপুরি কল্পনা প্রসূত। মূল মুঘল চিত্রে এই বিষয়টির রূপারোপ হয়েছে বলে জানা যায় না। এই চিত্রের চেহারা আকৃতি সাধারণ মুসলমান টাইপের। তার ফলে মুঘল আমেজ পাওয়া যায়। শিল্পী শুরু থেকেই এই ধরনের টাইপ সৃষ্টিতে সিদ্ধ-হস্ত হয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র পদ্ধতির চিত্রচর্চ্চা সম্বন্ধে তাঁর শিষ্য নন্দলাল বসুর একটি মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। মন্তব্যটি হোল—

"পুরাতন-পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, নিজস্ব ধারায় আমাদের ছবি হতে লাগল। তবে আমাদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। আমি আরম্ভ করলুম, আমাদের পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য আর ইসলামী কাহিনী কেচ্ছা থেকে রাজা বাদশাদের ছবি। এসব উনি করতেন অতি অদ্ভুতভাবে। সেটা আমরা পারিনি।"[১]

এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের কৌতুক স্পৃষ্ট রহস্য মধুর একটি উক্তি উল্লেখনীয়। তিনি নন্দলাল প্রমুখ ছাত্রদের একবার বলেছিলেন—

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা : কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২ শক। পৃঃ ১৬৯

"তোমরা পারবে না এসব ছবি করতে। এই রকম মুঘলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই কায়দা। তোমরা করো স্রেফ দেশী ছবি।"[১]

১৯০৮-৯ সালের পরে ১৯২০ সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ আর কোন মুঘল প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন বলে জানা যায় না। ১৯২০-২৫ সালের মধ্যে তিনি আর এক সিরিজ মুঘল প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন যা রঙ-রেখার কৌশলে ও চেহারা চরিত্র রূপায়ণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। নিপুণ বিশ্লেষণেই যে কেবল সেই চিত্র নিচয়ের গুণবৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় তা নয়—তার মধ্যে আপাতঃ রমণীয়তাও যথেষ্ট বিদ্যমান। এক পলকে ও এক ঝলকে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অথচ মূল মুঘলাই চিত্রের মত বর্ণ-জৌলুষ, চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশগত জাঁকজমক আড়ম্বর কিছুই নেই। ইহা সম্পূর্ণ বাহুল্য বর্জিত। তথাপি তা বিশেষ ভাবেই আকর্ষণীয় ও রমণীয়। তিনি নিজেই মুঘল চিত্রকলার লক্ষণ প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন যে, "সুবিচিত্রতা মোগল শিল্পের মূলমন্ত্র।" কিন্তু তিনি মুঘল বিষয়ক চিত্র রচনায় 'সুবিচিত্রতা' সাধনের চেষ্টা করেন নি।

এই সিরিজে পাওয়া যায় বিরাটাকার পটে পূর্ণাবয়ব আলমগীর। আরও দেখা যায় নূরজাহান, তাজবিবি, জেবউন্নিসা, উদ্যান বিহারে রত জাহাঙ্গীর, উপবিষ্ট শাজাহান। এর বাইরে আরও এমন কয়েকটি চিত্র রচনা করেছিলেন যাকে মুঘল পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। যেমন, অবগুণ্ঠিতা, ঘুমন্ত রাজকুমারী, Mad Musician ও তিনচারটি বহুবর্ণা ছোট প্রতিকৃতি। তবে এই প্রতিকৃতিসমূহ ও পূর্ব্বোক্ত চিত্র কয়েকটিতে রূপবদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। আজ তা জানা না গেলেও শিল্পীর কাছে এরা সুবিদিত ছিলেন।

ইতিহাসের পাতায় সুবিদিত ব্যক্তিসত্তাকে যুগ যুগান্তর 'পরে প্রত্যক্ষ রূপায়ণ একটি দুরূহ কর্ম্মসাধনা। তার মধ্যে আবার মুঘল যুগের চেহারা-চরিত্রকে নিখুঁতভাবে এ যুগে চিত্রার্পিত করার পথে অন্তরায় অনেক। ইতিহাসে কাল্পনিকতার কোন স্থান নেই। অতএব, চিত্রকারকে যদি কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তার চাক্ষুষ রূপারোপ করতে হয় তাহলে সেখানে আসে সত্যরূপ, সত্যভাব ও সেই সুদূর অতীতকে বাস্তবায়িত করার সমস্যা। চিত্র রচনাকালে এই দায়িত্ব আরও গুরুতর দায়িত্বে হয় পরিণত। কারণ

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা : কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২ শক। পৃঃ ১৬৯

প্রত্যক্ষ রূপের প্রতিক্রিয়া-প্রভাব স্বতন্ত্র। অতীতকালের সেই হারানো বিস্মৃত রূপগুলিকে পুনঃপ্রকাশ করতে হলে ইতিহাসনিষ্ঠা ও সততার প্রয়োজন সমধিক। এই জন্য এ যুগের শিল্পীকে ইতিহাসের সেই বিশেষ যুগ কালের দীপশিখার আলোতেই সেই অতীতের মুখগুলিকে চিনে নিতে হবে। সেখানে ইতিহাস-নিষ্ঠার সঙ্গে আরও চাই বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে রূপদান। নিছক কল্পনায় নির্ভর করে এগোলে চলবে না। সেই ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের মৌল ভাবসত্তা, ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ উপলব্ধি করাই মুখ্য কাজ। তৎকালীন জনসমাজের চেহারা আকৃতি, চিন্তা-ভাবনা ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও সুপরিচয় লাভ আবশ্যক।

সুতরাং বিগতকালের বিস্মৃত সভ্যতা-সংস্কৃতিকে স্মৃতির আলোকে উদ্ভাসিত করে তাকে নতুনভাবে চিনে নিয়ে উপলব্ধি করতে যিনি পারবেন, তাঁর হাতেই ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্রণ সার্থক ও সুন্দর হওয়া সম্ভব। এই পথ কেবল ঐতিহাসিক জ্ঞানের পথ নয়। এই কাজে আরও চাই দূরদৃষ্টি ও বিশেষ এক মন-মেজাজ; অতীত যুগ ও কালের আবহাওয়া পরিমণ্ডল ও কর্ম্মকাণ্ডকে মনে-প্রাণে অনুভব করার শক্তি।

অবনীন্দ্রনাথকে এই বিষয়ে আরও কঠিন পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল। দায়িত্বও ছিল অপরিসীম। কেন না, সমসাময়িক মুঘলাই চিত্র ও আলেখ্যর ভাণ্ডার দেশে ও বিদেশে বিপুল। অবনীন্দ্রনাথ মুঘল যুগীয় যে সকল বাদশা-বেগমদের প্রতিমূর্ত্তি রচনা করেছেন, তাঁদের এক একজনার বিভিন্ন বয়স ও ভঙ্গীর সমসাময়িক আলেখ্য আছে প্রায় এক ডজন করে।

কিন্তু তিনি শিল্পী-জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমঃধারায় যে মুঘল প্রতিকৃতি রচনা করেছেন, তার মধ্যে যেমন পাওয়া যায় ইতিহাস-সচেতনতা, তেমনি তাঁর স্বকীয় চিন্তা-কল্পনার প্রভাব। এই দুই-এর মিলনে তাঁর প্রতিটি চিত্র সফল ও সুন্দর শিল্পকীর্ত্তি রূপে দীপ্যমান।

এই সূত্রে অবনীন্দ্র রীতির একনিষ্ঠ সাধক প্রখ্যাত শিল্পী বীরেশ্বর সেনের উক্তি বিশেষ উপযোগী। তিনি তাঁর গুরুর অঙ্কিত মুঘল বিষয়ক চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"He made the dry bones of history live in a way as they never had lived before. His renderings of Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb and others are truer renderings of the character of the Grand Mughals than even the magnificent

courtly portraits painted by contemporary master painters of the Imperial Household."

মুঘল বাদশাদের প্রতিকৃতি রচনাতে শ্রেষ্ঠত্বের চরম নিদর্শন রেখেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'আলমগীর' চিত্রপটে। বার্দ্ধক্যে অবনত দীর্ঘায়ত আলমগীর বাদশাহ তাঁর পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়মুষ্টিতে এক সঙ্গে তরবারি, কোরান ও জপমালা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন অদ্ভুত এক আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে। মাথায় পাগড়ী। গায়ের জোব্বা পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বমান। পায়ে নকশাযুক্ত চটি জুতা। জামা-জোড়া, পাগড়ী সব শ্বেত শুভ্র। চুল দাড়িও সাদা। অদ্ভুত ও অপরূপ মহিমা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি। শিল্পী একসঙ্গে তলোয়ার, কোরান ও মালার সমাবেশ করে বাদশার চরিত্র ও চিন্তাদর্শের মূল স্থর ধরে দিয়েছেন। আলমগীর ধর্ম্মাদর্শে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। কিন্তু তরবারির সাধনা ছিল তাঁর মুখ্য জীবন-সাধনা। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ও শিল্পনৈপুণ্যের বিষয় হোল বাদশার মুখে চোখে ও ভাব ভঙ্গীতে তাঁর আসল চরিত্র ও মানসিকতার অপূর্ব্ব প্রকাশ ও প্রতিফলন। গৃধিনীবৎ কর্ণ ও চোখের ক্রূরদৃষ্টি প্রতিহিংসা ও ব্যর্থতার দ্যোতনা করেছে অতি সফলরূপে।

এই প্রকাশ-পটুত্বে অবনীন্দ্রনাথ মুঘল চিত্রীদের পরাস্ত করেছেন প্রতি পদে। মৌলিক মুঘল চিত্রে দেখা যায় বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাদশাহী গৌরব-মহিমা, জাগতিক ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকের লীলা-লহরী। তা সার্ব্বিকভাবে বাস্তবানুগ। আর অবনীন্দ্রনাথ রচিত এই বিশাল পটে মুঘল বাদশার অন্তরাত্মা বস্তুতঃই সমুপস্থিত। কোন বাহ্য সম্পদ স্থষমার আড়ালে সেই ব্যক্তিসত্তা ও প্রাণময় পুরুষটির আসল রূপ চাপা পড়েনি। আলমগীর বাদশার জীবন-সায়াহ্নের এ-এক ব্যথা-করুণ অনুভূতিময় চিত্র। অবর্ণনীয় নৈরাশ্য, কিন্তু তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে কুটিল চিন্তারাজি। একদা যা ছিল আত্মপ্রত্যয় ও দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, আজ যেন তা বার্দ্ধক্যে ভারাক্রান্ত সম্রাটের অভিব্যক্তিতে একটা ক্রূর অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। ইতিহাসে বর্ণিত ঔরঙ্গজেব যেন বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনীতে ছবিখানি স্থান পেয়েছিল ১৯২১ সালে। 'রূপম্' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯২২) একটি রিভিউতে ছবিখানি সম্বন্ধে মন্তব্য—

"...His big picture 'Aurangzeb' certainly appropriated the largest amount of comment and attention. That the



আলমগীর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সমুদ্রকন্যা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

artist has been able to give a new presentation of the great actor in Mughal History was the generally accepted opinion. Though carrying a faint memory of the manners of the Mughal portrait painters, who have left nearly a dozen contemporary portraits of this Emperor, Dr. Tagore's treatment of the face in its realistic and extremely complicated modelling is far removed from the many surviving examples of the historical portraits."

ছবিখানির গুণাগুণ সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা হয়েছিল 'International Studio' পত্রিকায় (মে, ১৯২৪)[১]

"His 'Aurangzeb' one of his latest historical creations, notwithstanding its large size (It is one of the largest that he has ever painted) still retains all the character of a miniature painting. The details of the sword blade, the gold embroideries on the turban and on the shoes, and the general treatment of the delicate outlines follow faithfully the methods of the miniaturists. They are in the best manner of the Mughal painters of the 16th. century modernised to the taste of the Twentieth. The high quality of his performance is due to the great imaginative powers with which he conjures up a 'true' picture of the last of the great Mughals without descending to the level of a portrait in the realistic sense. This suspicious crafty monarch is symbolised in the characteristic stoop of the shoulder and in the attitude of the hands which grasp the Koran and the sword in a manner which suggests that the two were often inextricably mixed up in his sanguinary reign. The artist adds a spiritual quality lacking in the work of the court painters of the Mughals".

১. Modern Indian Paintings : O. C. Gangoly.

ছবিখানি যেমন অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-কল্পনার ক্ষেত্রে একটি landmark, তেমনি এর রচনা ও স্থায়ী রূপ লাভের সময়কার ঘটনা অতীব আকর্ষণীয় ও কৌতূহলকর। তার একটি সজীব বর্ণনা পাওয়া যায় অবনীন্দ্র-শিষ্য ও সাহিত্য-সেবী প্রবোধেন্দু ঠাকুরের লেখনীতে। তিনি এই মহান্ শিল্পকর্মটির প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁরই বর্ণনাতে জানা যায়।[১]

ছবিখানি রচনার প্রেক্ষাপট দক্ষিণের বারান্দা। সময় ১৯২২ সাল। এক সকালে শিল্পী ব্যতীত সেখানে আরও ছিলেন তাঁর দুই অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা নিজ নিজ আসনে ছিলেন সমাসীন। গগনেন্দ্রনাথও ছবি আঁকছিলেন, আর মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন পুস্তক পাঠে নিমগ্ন। এমন সময় সেখানে নিয়মমত গিয়ে হাজির হলেন তরুণ ছাত্র প্রবোধেন্দু ঠাকুর। গুরুদেব ও তদীয় অগ্রজগণকে প্রণামপর্ব্ব শেষ করতেই তিনি শুনলেন গগনেন্দ্রনাথ আমিরী কণ্ঠে বলছেন—

"অবনের কাণ্ডটা একবার দেখেছ? বারান্দায় সমুদ্দুর বইয়ে দিলে। পা ছপছপিয়ে জল ছিঁটিয়ে এবার চলতে থাকুক সবাই।"

তখন দেখা গেল, অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আসনে নেই। বারান্দার পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড এক তক্তপোশ। তার চারদিকে 'চর্কী'র মত ঘুরছেন শিল্পী। জাম-রঙের লুঙ্গি জলে ভিজে গেছে। পিরানের সাদা পুট-হাতা-আস্তিন রঙে রঙ। হাতে তাঁর ফ্ল্যাট ব্রাশ। একবার উঠছেন, বসছেন, ওয়াশ দিচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলছেন—

"ঢাল্ জল, ঢাল্ জল—ছবির ভিতরে বাদশাহী গরম রয়েছে, বাবা,—গরমটা কমে যাক্। কড়া লাইন নরম হোক। ঢাল্ জল।"

তার পরেই আবার ছাত্রকে ছবিটি ধরতে বলে মন্তব্য করলেন—

"দে, রোদে এবার। এবার শুকোও বাদশা—রাজসিঙ্গির হাতে যেমন করে শুকিয়েছিলে,—ঠিক সেই রকম।"

প্রকাণ্ড ছয় ফুট ছবি। মাউণ্টেড্ কার্টিজ পেপারে আঁকা। একবার রোদে পড়ছে, আবার একটু নরম থাকতে তুলে এনে 'বর্ণ সঙ্কমিত' করা হচ্ছে। বহুক্ষণ চললো এইভাবে। অদ্ভুত পরিশ্রম সে ছবির পেছনে। ছবিটি নিয়ে শিল্পী সেদিন ঘর্মাক্ত কলেবর হলেন।

সেই সময় শিল্পগুরু ছাত্রকে ছবিতে রঙ বসিয়ে নেবার কয়েকটি রহস্য কথা

---

১. অবনীন্দ্র চরিতম্ঃ প্রবোধেন্দু ঠাকুর। পৃঃ ২৫-২৭

শোনালেন আনন্দ-উচ্ছল-ভঙ্গীতে। তার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে জলে ধোয়া রীতির গূঢ় রহস্য।

"বুঝেছিস্—রঙগুলোকে একেবারে সেঁদিয়ে দিতে হবে কাগজের মগজে। ভাসা রঙ চলবে না-রে জল ছবিতে।

বুঝেছিস্ শিষ্য, যত ভিজোবি আর শুকোবি, তত পরমায়ু বাড়বে জলের ছবির। Secret; ভেজাও ভেজাও।

বুঝেছিস্, ছবির আবার Immortality, আবার Permanancy! ওতো জলের হাতে আর রোদের হাতে।

বাদশা এলে খুসী হতেন, কি বলিস্?"

পার্টিশানের ধারে দু'জন ভৃত্য তুলে ধরল রৌদ্রশুষ্ক তসবিরখানি। গগনেন্দ্রনাথ আসন ছেড়ে উঠে ছোট ভাইকে বললেন—

"অবন, ব্যস্ এইখানেই ইস্তফা দাও। আর কিছু করতে যেও না যেন ছবিতে। বললে তুমি শোন না। শেষ বলে একটা জিনিস আছে।"

তারপরেও প্রায় তিন ঘণ্টা পরিশ্রমের পরে ছবিটি যেন দাঁড়াল। আর শিল্পীর মুখে ফুটে উঠলো স্বস্তির হাসি। প্রথমে বাড়ীর সকলে এসে দেখলেন ছবিখানি। চারদিক প্রশংসামুখর। কেউ প্রশংসা করলেন তলোয়ারের বাঁটের কারুকার্য্যকে। কি চমৎকার কাজ! যেন Calligraphy, 'সিয়াকলম' বটে। কেউ তারিফ করলেন বাদশার মুকুটের পান্নার কল্কাটির।

ছবিখানি সম্বন্ধে প্রবোধেন্দু ঠাকুর মহাশয়ের সরস মন্তব্যও বিশেষ আকর্ষণীয়। তিনি বলেছিলেন—

"সত্যিই, তারিফ না করে পারা যায় না, সেই বিরাট ওয়াটার কালার ছবিটির। তখনকার দিনে এর আগে অত বড় জলের ছবি আঁকা হয়েছিল কিনা ভারতবর্ষে সন্দেহ। একেবারে নৌতুন। গুলে খেয়ে ফেলেছেন 'বিজাদী' কলম। প্রতি ইঞ্চি তার শাহী মুঘলী।

আর,—তার মধ্যে, আলমগীরের সেই হিংসা-প্রতিভূ চক্ষু, ধর্মভীরু শুভ্র শ্মশ্রু, সম্রাট-ঈগলের মত সেই স্বর্ণ-কপিশ লুব্ধ-মুগ্ধ গ্রীবা! তার মধ্যে, আলমগীরের সাত্ত্বিকতার মত শুভ্রবসনাবৃত নম্রত দেহ, এবং তামসিকতার মত, সেই তরক্ষু-ক্ষুধিত শিরোভাগ! তার মধ্যে—ধর্মগ্রন্থ এক পবিত্র কোরান, এবং হিংসার ইতিহাস এক কঙ্কহাস তলোয়ার। ধর্ম এবং হিংসা, এই দুয়ী,

যেন নবৈব্দ কলেবর ধারণ করে অভাবনায় চিত্র হয়ে উঠেছে বাদশার মধ্যে। বিনা প্রশ্নেই চিত্রখানি যেন জানিয়ে দেয় তার আত্মনিষ্ঠভাব। ব্যঞ্জনার নেই পদচিহ্ন। অথচ সে ছবিকে পূজা করতে ইচ্ছা করে।"

ছবিখানি সম্বন্ধে আরও একটি কৌতূহলকর ঘটনার কথা জানা যায় প্রবোধেন্দু ঠাকুরেরই জবানীতে।

'আলমগীর' ছবিটির প্রশংসায় যখন দক্ষিণের বারান্দা মুখর, তখন একদিন সেখানে এসে হাজির হলেন 'মহম্মদী' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক। দক্ষিণের বারান্দায় তাঁর কিছু যাতায়াত ছিল। তিনি ও-বাড়ীতে সুপরিচিত মানুষ। তাঁকে ছবিখানি দেখানো হোল। তিনি উচ্চ প্রশংসা করতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর মুখখানা কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। আর তিনি যা বলে উঠলেন তার মধ্যে প্রকাশ পেল 'ভীতি-ভাবনা-ক্রোধ'। কি বললেন তিনি? বললেন, "বড় গলতি হয়ে গেছে, এ তো তসবির হয়নি। এ ছবি যেন একজিবিশনে না যায়।"

সকলে তো অবাক! বিস্ময়-বিমূঢ়। 'এ-ছবিও ছবি হয়নি?' শিল্পী ছবির কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন গল্‌তি হয়েছে কোথায়। সম্পাদক মহাশয় কিন্তু যথার্থই অবনীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। ক্ষমা-প্রার্থনাদি করে তিনি অনেক কষ্টে বললেন যে, বাদশার তলোয়ার কোরান শরিফের বুকের মাঝখান দিয়ে চিরে চলে গেছে।

এই কথা শুনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন ছবির সামনে। তারপরে কনিষ্ঠকে বললেন—

"তাইতো অবন, ও···তো ঠিকই বলেছে। ইসলামকে চিরতে যাবেন কেন আলমগীর? তুমি না হয় এক কাজ কর। ওটা বদলে দাও। হাতে মালা তো আছেই। কেতাবটা মুছে দাও।"

শিল্পীর মেজদাদা সমরেন্দ্রনাথ বললেন—

"ছবিতে কোরান না থাকলে, ও ছবি আমার ছবিই হবে না আলমগীরের। ওটি যদি না থাকে, তাহলে কোনো মানেই হয় না ছবির। কোরান রাখতেই হবে, বুঝলে অবন?"

দাদারা তো বলেই খালাস। কিন্তু বদলানো কি সহজ! জল-রোদ্দুর খেয়ে খেয়ে রঙ বসে গেছে এমন, আর রঙ এত deep যে তা কি করে মোছা যায়? বেশী ঘষলে কাগজ ছিঁড়ে যাবে যে।

শিল্পীর মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেদিন, তা তাঁর মুখের ভাব

দেখে কিছু বোঝা যায়নি। বরং স্মিত গম্ভীর মুখে সম্পাদক মহাশয়কে বললেন তিনি—

"বুঝেছ এডিটর সাহেব, ছবির জানটাকে আজ তুমি বাঁচিয়েছ।"

এই বলে তিনি গিয়ে বসে পড়লেন আরাম-কেদারায়। সকলে মিলে এডিটরকে নিয়ে জমজমাটি গল্পে মশগুল হলেন। আর তাঁর ফাঁকে ফাঁকে এক একবার উঠে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কখন যে চিত্র-শুদ্ধি করে ফেলেছেন তা কারোর নজরেই পড়েনি। কেউ তা খেয়াল করেন নি। তারপরে এডিটর সাহেবকে বললেন, "অনেক বেলা হয়ে গেল। এইবার দেখত হে একবার তোমার বাদশাকে।"

তিনি উঠে গিয়ে দেখলেন। দেখেই তিনি অদ্ভুত এক মুখের ভাব নিয়ে ছুটে গিয়ে শিল্পীর হাতখানি করজোড়ে ধরে বললেন—

"ব্যস্ ঠিক হয়ে গেছে। যাদু জানে আপনার হাত।"

শিল্পাচার্য্য সহাস্যে বললেন—

"মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে, কোরান আর তলোয়ারের মধ্যে মিল করিয়ে দিয়েছি হে। বাদশার মেজাজ তো এখন খুশ?"

অবনীন্দ্রনাথ এখানে সম্পাদক মহাশয়ের প্রদর্শিত ক্রটী থেকে ছবিটিকে মুক্ত করলেন একটা সামঞ্জস্য বিধান করে। আর তা করলেন দু'একটি রেখার টানেতে। সে সামঞ্জস্য সাধন মুখ্যতঃ হয়েছিল শিল্পী, শিল্পবস্তু ও দর্শক—এই তিন-এর মধ্যে। এই প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজের একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্য্যময়—

"শিল্পীরই বল, কবিরই বল, মন লইয়াই কারবার। দর্শকের বা পাঠকের মন আর নিজের মন—দুই দিকে দুই কূল, মাঝে সংস্কার শিক্ষা প্রভৃতির খরস্রোত দুই মনকে পৃথক রাখিয়াছে; এই খরস্রোতের উপরে বর্ণের ও ভাবের সেতু বাঁধিয়া দুই মনে সংযোগ স্থাপনেই শিল্পীর ও কাব্যের সার্থকতা।"—নামকরণ রহস্য।

আলমগীর বাদশার হাতের পুঁথি, তলোয়ার নিয়ে যে ঘোরতর সমস্যা হয়েছিল সেই হাতের গঠনভঙ্গী কিন্তু অতুলনীয়। সেই অতুলনীয়ত্ব কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্য-গত নয়, প্রকাশভঙ্গিমায়ও তা অনন্য। প্রখ্যাত শিল্পী ও আচার্য্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য মুকুল দে মহাশয়ের একটি উক্তিতে সেই ভাবের বর্ণনাটি হয়েছে চমৎকার। আলমগীরের শিল্পসৌকর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"The finger of the aged monarch are like the iron claws of an eagle which catch its prey without mercy."

এই পর্য্যায়ে শিল্পীর অন্যান্য মুঘল বিষয়ক চিত্রের মধ্যে 'উদ্যানবিহারেরত জাহাঙ্গীর' ছবিটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ছবিটি কেবলমাত্র প্রতিকৃতি নয়। দৃশ্য চিত্রেরও সফল নিদর্শন। উদ্যান কল্পনা, গাছপালা ও ফুলপাতার রূপারোপ ও সমাবেশ অত্যন্ত মনোরম ও নিখুঁত। বাগানের পরিকল্পনা মুঘল আমলের উদ্যান কল্পনার অনুরূপ হলেও, শিল্পীর নিজস্বতাও কিছু লক্ষণীয়। শ্বেতমর্ম্মরে বাঁধানো চত্বরের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা ও গাছপালায় ফুলের সমারোহ। তার মধ্যে জাহাঙ্গীর বাদশা ডান হাতে ছড়ি, বাঁ-হাতে লাল গোলাপ নিয়ে ভ্রমণরত। কান ও গলায় মুক্তাবলী এবং মাথার পাগড়ী মুঘল চিত্রানুসারী। কিন্তু বাদশার জামাজোড়ার রূপায়ণে শিল্পী বহুলাংশে স্বকীয় ইচ্ছা ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন। জমকালো জরির কারুকর্ম নেই। এই চিত্র সমসাময়িক মুঘল চিত্রের অনুকৃতি মাত্র নয়। মুঘল চিত্রের গতানুগতিক ছকে বাঁধা দেহভঙ্গীও অনুসৃত হয়নি। বর্ণবিন্যাসও স্বতন্ত্র পদ্ধতির। ওয়াশ রীতিতে ধুয়ে ধুয়ে বসানো বর্ণময় চিত্র। অত্যুজ্জ্বল বর্ণের জৌলুস নেই, কিন্তু গভীরতা ও গাম্ভীর্য্য আছে। আরও আছে স্নিগ্ধ কোমল বর্ণের নয়নবিমোহন প্রীতিপ্রফুল্লভাব ও সূক্ষ্ম রেখার সুকুমার ছন্দ ব্যঞ্জনা ও বস্তু সমাবেশে ভারসাম্য রক্ষার অপূর্ব্ব কৌশল।

শাজাহানের জীবনালেখ্য নিয়েই অবনীন্দ্রনাথ প্রথম মুঘল ইতিহাসের চিত্ররূপ দান শুরু করেন। সে এক অন্য রূপ, ভিন্ন কল্পনা। অনন্তর শিল্পী-জীবনের মধ্যাহ্ন লগ্নে তিনি আবার শাজাহানের রূপাকৃতি রচনায় হাত দিয়েছিলেন, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সম্রাটের পরিণত বয়সের আর এক ভিন্ন রূপের আলেখ্য। ঐশ্বর্য্যপ্রেমী সম্রাটের এই ছবিতে কোন জাঁকজমক আড়ম্বরের উত্তাপ নেই। তবে ঐশ্বর্য্য-বিরল সেই রাজমহিমা আরও সমুন্নত। এই চিত্রকল্পনার মূলে মুঘল চিত্র পর্য্যালোচনার প্রভাব থাকলেও রূপসৃষ্টি, বেশবাস ও দেহভঙ্গীতে মামুলী প্রথাকে অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। এই চিত্র অতি সরল সুষমামণ্ডিত। ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মর্য্যাদার প্রকাশ বেশী। জলে ধোয়া রঙের ভিন্ন ভিন্ন মোলায়েম রেশ ও আবেশে চিত্রপটে ছড়িয়ে পড়েছে সুস্থির প্রশান্ত ভাব ও কোমল পেলব সৌন্দর্য্য-সুষমার নয়নাভিরাম দ্যুতিচ্ছটা।

নূরজাহান এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ দু-তিনখানি। তার মধ্যে একটি কিছু কম বয়সের, আর একখানি অধিক বয়সের। দ্বিতীয় চিত্রখানিতে নূরজাহান বয়স ও অভিজ্ঞতার ভারে গম্ভীর বিষণ্ণ রূপের। হাতে ফুলের

মালা। বারান্দায় বসে তিনি যেন বিগত'দিনের স্মৃতি বিজড়িত চিন্তাভাবনার জাল বুনে চলেছেন। পশ্চাৎপটে সপুষ্প লতার বহর। পোশাক-পরিচ্ছদ মামুলী চালের নয়। অতি সাধারণ ও নতুনতর। একমাত্র পায়ের চটিজোড়ায় কিছুটা মুঘলাই আমেজ পাওয়া যায়। চিত্রখানি যেন বেগমের শেষ বয়সের নানা ব্যর্থতা ও বেদনার ঘনীভূত রূপ। সমগ্র পটে বিষণ্ণতা ও গাম্ভীর্য্য নিষিক্ত ব্যথাকরুণ অনুভূতির প্রবাহ। তার মধ্যে বারান্দার দরজার লাল চৌকাঠটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। আসনটির কালো কিনারা ও পান্না সুরের সামঞ্জস্য এনেছে।

নূরজাহানের কিছু কম বয়সের চিত্রটিও ইতিহাসে বর্ণিত ধনমানগর্ব্বিতা প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী বাদশা-দয়িতার রূপ নয়। এখানেও রাজৈশ্বর্য্যের চমক নেই। নূরজাহানের রূপ এখানে সার্থক প্রেমাস্পদার রূপ। মাঙ্গলিক সৌন্দর্য্যের আধার। কোন উগ্রতা নেই। মোহিনী বটে, কিন্তু ললিত লাস্যময়ী নন। চিত্রখানি রচনায় শিল্পী মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন চূড়ান্ত-রূপে। মূল মুঘল চিত্রে আবদ্ধ নূরজাহানের নানা বয়সের প্রতিকৃতির সঙ্গে এর কোন দিকে এতটুকু সাদৃশ্য নেই। এখানে সুনির্ম্মল শ্বেতশুভ্র রূপ। গোলাপের সুরভিত সৌন্দর্য্যের সরল মূর্ত্তি। কোন হাহাকার দাহ ও জ্বালার অভিব্যক্তি নেই। দুর্দম ভোগ লালসার প্রকাশ দেখা যায় না। বেগমের একহাতে পানপাত্র, অন্য হাতে পদ্মফুল। সর্ব্বাঙ্গ জামা পোশাক ও উড়নিতে আবৃত। মুঘল চিত্রের রঙ-রেখা ও কল্পনা কোনও দিকে লক্ষ্য না রেখে শিল্পী নিজের খেয়াল, ভাবনা ও অনুভূতির বিলাসে রূপায়িত করেছেন নূরজাহানকে।

সম্রাট শাজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের চিত্রও অবনীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তাজবিবির এই চিত্রও অবনীন্দ্রনাথের নতুনতর ভাব-কল্পনা ও বিষয়-বিন্যাসের শুদ্ধ নিদর্শন। ওয়াশ টেক্‌নিকে এই চিত্রপটখানিতেও ধুয়ে ধুয়ে রঙের সুস্নিগ্ধ গভীরতা সঞ্চার করে শিল্পী বেগমের চরিত্র ও ভাব-ভাবনা ব্যক্ত করেছেন অতি মনোরম করে। মমতাজ ছিলেন প্রেমিকা স্ত্রী, স্নেহশীলা জননী, শান্ত ও মধুর প্রকৃতির নারী। এখানে সেই রূপটিই হয়েছে প্রস্ফুট। রাজৈশ্বর্য্যের গর্ব্বস্ফীতি নেই, অদ্বিতীয় পতিপ্রেমের উল্লাস অভিব্যক্তিও নেই। আছে ধীর, স্থির, প্রশান্ত ভাবমাধুর্য্য। ধৈর্য্য সহ্যের ভারে মন যেন ভারাক্রান্ত। জামা-জোড়া ও উড়নির বাহুল্য কিছু বেশী। তার ফলে বেগমের চেহারা ও সমগ্র পটখানিকেই মনে হয় গুরুভার। বেগম এখানে ধূমপানরতা।

হুকার নলের দীর্ঘায়ত ও সুবিস্তৃত রূপ ছবিতে কিছু বৈপরীত্য সঞ্চার ক'রে একটা স্বতন্ত্র রসমাধুর্য্য রচনা করেছে।

মুঘলযুগীয় নারী-চিত্র মালিকায় শোকমগ্না জেবউন্নিসার প্রতিচ্ছবি চিরায়ত করুণরূপের প্রতীক হয়ে আছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায়ও তিনি ব্যথাতুরা। তিনি সেখানে অবর্ণনীয় নৈরাশ্য ও বেদনায় দিনযাপন করছেন।

ঔরঙ্গজেব-দুহিতা জেবউন্নিসা ছিলেন বিদুষী নারী ও কবি। তিনি চমৎকার রোমান্টিক কবিতা রচনায় ছিলেন সুনিপুণা। অবনীন্দ্রনাথও তাঁকে দেখেছিলেন কাব্য-কবিতার রচয়িত্রী রূপেই। কল্পনা করলেন তাঁর কাব্যধর্ম্মী ব্যক্তিসত্তাকে। জেবউন্নিসা বসে আছেন এই চিত্রে বই ও কলম নিয়ে। এই ভঙ্গী তাঁর কাব্য-প্রতিভার দ্যোতক। অতি সংযত, স্বচ্ছ সুষমামণ্ডিত বেশবাস ও অঙ্গাভরণ। ঔরঙ্গজেব-তনয়ার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য ও বিলাস বৈভবের কোন ইঙ্গিত আভাস নেই এখানে। বাহুল্যবর্জিত, সারল্যস্নাত শুদ্ধসত্ত্ব রূপ। বিরল বিচিত্রতাই এর প্রাণ। জেবউন্নিসা সর্ব্বদাই ছিলেন ব্যথা-মৌন। কিন্তু এই চিত্রে দেখা যায় যে তা তিনি চিত্ততলে সুসংহত ও সঞ্চিত করে একটি বিদুষী নারীসত্তায় হয়েছেন রূপবদ্ধ।

বস্তুবিন্যাস অতি পরিচ্ছন্নও পরিপাটি। সূক্ষ্ম সুকুমার ছন্দান্বিত অথচ দৃঢ় রেখার টানে, জলে ধোয়া রঙের স্তিমিত আভায় জেবউন্নিসা তার সমকালীন চিত্রালেখ্যকে অনেক পেছনে রেখে আবার নবকলেবর নিয়ে, নতুন ভাবনায় মণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছেন অবনীন্দ্র-তুলিকার অনন্ত মায়াজালে। সমকালীন মুঘল চিত্রে জেবউন্নিসাকে দেখা যায় শোকমগ্নারূপে। তিনি সেখানে প্রিয়-বিরহকাতরা। শোক প্রকাশ করেই চলেছেন নিরন্তর। তার মধ্যে কিন্তু মুঘল ঐশ্বর্য্য সম্পদের ছাপও সুস্পষ্ট। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ জেবউন্নিসার কবিসত্তাকেই গ্রহণ করেছেন তাঁর চিত্ররূপের মুখ্য উপজীব্যরূপে। তার ফলে এই চিত্র আরও রমণীয় ও আকর্ষণীয়।

মুসলমান টাইপ সৃষ্টিতে অবনীন্দ্র প্রতিভার আর একটি সার্থক নিদর্শন হোল Mad Musician ছবি। এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে মূর্ত্তি রচনায় গতিশীলতা বা movement-এর চমৎকার প্রতিফলনে। গায়ক বা বাদক সুরে, তালে মশগুল। তিনি আত্মহারা, দিশেহারা। সেই ভঙ্গী ও ভাব প্রস্ফুট হয়েছে তার জামা পোশাকে, অঙ্গ সঞ্চালনে ও গাছপালার রূপায়ণে। সূক্ষ্ম কলমবাজী, বর্ণিকাভঙ্গের সুকৌশল ও দেহরূপ গঠনের নৈপুণ্যে সাধারণ একটি বিষয় শিল্পকৃতি হিসেবে অসাধারণের পর্য্যায়ে হয়েছে উন্নীত।

অবনীন্দ্রনাথের মুঘল বিষয়ক চিত্র রচনার মধ্যে তাঁর শিল্প সম্বন্ধীয় বিশ্বজনীন ভাবধারার প্রতিফলনও কিছু কম হয়নি। তিনি এ বিষয়ে কোন রক্ষণশীলতার ভাব পোষণ করেন নি। গোড়া থেকেই তিনি ইউরোপীয়, জাপানী ও দেশীয় প্রাচীন চিত্রের লক্ষণাবলী ও টেক্‌নিকের নানা সৌকর্য্য বৈশিষ্ট্যকে আহরণ, গ্রহণ করেছেন, আবার বর্জনীয়কে করেছেন বর্জন। মুঘল বিষয়ক চিত্রেও তিনি সেই নানা ভিন্ন রীতির সমন্বয়, গ্রহণ ও বর্জনের আদর্শই রক্ষা করে চলেছিলেন। তা সত্বেও সমসাময়িক মূল মুঘল চিত্রের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত বাদশা, বেগমদের মূর্ত্তি-চিত্রের প্রভেদ বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

প্রথমতঃ অবনীন্দ্রনাথ মুঘল মিনিয়েচারের মত আকার-আয়তনের ধারা অক্ষুন্ন রাখেন নি। তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী কখনও বিরাট, কোন সময় মাঝারি ও ছোট চিত্র রচনা করেছেন। তাঁর কল্পিত মূর্ত্তি-চেহারা মুঘলাই চিত্র অপেক্ষা সর্ব্বদাই বড় আকারের। আসল মুঘল চিত্রের রেখা রচনা calligraphic অর্থাৎ সাবধানে ধরে ধরে আঁকা। আর এ যুগের শিল্পাচার্য্য এঁকেছেন তুলির লম্বা টানে, ছন্দায়িত এবং হিল্লোলিত রেখায়। তিনি মুঘল রীতির সেই অতি সূক্ষ্ম তুলিকা, 'একবাল কলম'কে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সূক্ষ্মরেখার চরম যে প্রয়োগ-প্রেরণা তার মূলেও ছিল সেই মুঘলাই আদর্শ। কিন্তু তিনি সেই রেখার টানকে আরও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যান। আর minute detail-কে মুঘল পদ্ধতিতে আরোপ করেন নি।

অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁর তুলির টান কোথাও অতি বিস্তৃত, আবার কোথাও খণ্ড খণ্ড। তবে তা বিশেষ সুদৃঢ়। রঙের দিকে দেখা যায় মূল মুঘলাই চিত্রে সর্ব্বত্র সমান রেশ, সমস্তরে তার প্রয়োগ। Tempera রীতিতে প্রযুক্ত হয়ে ঔজ্জ্বল্যে ও দীপ্তিতে তা মনোহর। আর অবনীন্দ্র-চিত্রে তা ওয়াশ টেকনিকে বারবার স্নাত-ধৌত হয়ে স্তিমিত ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের প্রতীক। সেখানে জলুস নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। হঠাৎ আকর্ষণ ও অভিভূত করে না, কিন্তু অন্তরের ভাবসম্পদে ইহা অনুপম। দেহ-রূপের ডৌল সৃষ্টিতে তিনি স্থানে স্থানে কিছু আলো-ছায়া পাত করেছেন বটে, তবে তা মুঘল রীতির অনুকরণ নয়।

আর্ট স্কুলে কাজে যোগ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম তথাকার গ্যালারীতে মুঘল যুগের চিত্র দেখেছিলেন সেই দিনই তিনি একটি মহৎ দায়িত্ব

গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মধ্য যুগের ভারতীয় চিত্রে তিনি যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"ওমা কি দেখি, এতো সামান্য একটুখানি বকের ছবি নয়, এ যে আস্ত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাচের ভিতর দিয়ে দেখি, তার প্রতিটি পালকে কি কাজ! পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালো নখ, তার গায়ে ছোট্ট ছোট্ট পালক।·· মাথা ঘুরে গেল। তবে তো আমাদের আর্টে এমন জিনিসও আছে, মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল। পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রুপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে ঐশ্বর্য্যে ভরে, কোথাও কোনো কার্পণ্য নেই, কিন্তু ভাব দিতে পারেনি।···আমি দেখলুম এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে।"[১]

তিনি সেই ভাব দিতে প্রবৃত্ত হয়ে যথাযোগ্যতার সীমা লঙ্ঘন করেন নি এবং আদর্শ্যচ্যুত হননি। তাঁর এই সকল চিত্র জাতীয় ভাবৈষণা প্রসূত বটে, কিন্তু তার সঙ্গে রোমান্টিকতারও কিছু অভাব ছিল না। তবে সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্রণে তিনি রোমান্টিকতার আবেগ উচ্ছলতা বেশী প্রকাশ করেন নি। ভাব প্রকাশনা সর্ব্বত্রই সংযত ও সুসংহত। যেমন, আলমগীর অঙ্কনে তিনি হিংসাক্রূর কালিমার প্রলেপ দেননি, আবার হৃদয়-বৃত্তিরও কোন প্রকাশ নেই। তিনি প্রকাশ করেছেন সংঘাতশীল একটি প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ও শাণিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা।

মুঘল বাদশা-বেগমদের আরও কিছু চিত্র এঁকেছিলেন তিনি 'Charm of Kashmir' গ্রন্থকে অলঙ্কৃত করার জন্য। সেখানে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে আলেখ্যগুলি আরও সুন্দর ও সমুজ্জ্বল। কাশ্মীরের সাধারণ ও স্বাভাবিক রূপ-প্রকৃতি রচনায় তিনি বর্ণপ্রয়োগ রীতিকে একটু স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। রঙ এখানে উজ্জ্বলতর। তাকে আবার বিভিন্ন সুরেও পর্দায় ছন্দায়িত করে অপূর্ব্ব একতান করেছেন রচনা। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাজাহান অবনীন্দ্রকৃত অন্যান্য প্রতিকৃতি অপেক্ষা এখানে কিছু বেশী উজ্জ্বল রূপে হয়েছেন উদ্ভাসিত। এই গ্রন্থে জনৈক কবির চিত্র-চরিত্র মুসলমান টাইপ রচনার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। অবনীন্দ্রনাথ এখানে বস্তুতঃই 'মুঘল-সিদ্ধ'।

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১২৭-১২৮

নানা মিলন-মিশ্রণের ও গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-চেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে স্বর্গত ও. সি. গাঙ্গুলীর একটি উক্তি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

"It is a matter of utter despair to offer any analogies or parallels to Dr. Abanindra Nath Tagore's paintings. At the risk of being grotesque, one is inclined to characterise his work as a curious amalgam of Burne-Jones, Bizhad and Ogata Korin."[১]

অবনীন্দ্রনাথ যে দেশ-বিদেশ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান নি, সে সম্বন্ধেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন পূর্ব্বে উদ্ধৃত উক্তির বরেণ্য লেখক।

'Mad Musician' চিত্রটির ব্যাখ্যানে তিনি লিখেছেন—

"In his 'mad musician' we have another example of an attempt to develop the Indo-Persian manner. The spacing and the general feeling of the composition are, however more reminicent of the far East than the near East. He has never regarded the great Schools of Eastern painting as divided into water-tight compartments, but has sought the fundamental unity of purpose and method in a variety of local expression."[২]

মুঘল ইতিহাস অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-চেষ্টার মধ্যে তাঁর শিল্প-ভাবনার ও আঙ্গিক প্রকরণের ক্রমবিকাশ ও সুপরিণতি বিভিন্ন পর্য্যায়ে হয়েছে পরিস্ফুট। মুঘল যুগের বিভিন্ন ঘটনা, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতাকে তিনি স্বীয় মননে ও আঙ্গিক কৌশলেই যে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তা তাঁর চিত্রগুচ্ছ পর্য্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, খ্যাতনামা ইংরেজ সমালোচক W. G. Archer এই বিষয়েও অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

তিনি লিখেছেন—"For an artist to imitate Mughal style without belonging to the Mughal period was to invite

১. Visva Bharati Quarterly (May-Oct, 1942)
২. International Studio (May, 1924)

failure, and thus we find in the long series of 'Mughal' works which he (A. N. Tagore) now produced, a persistent weakness due to these very deficiencies. We can recognise such 'Mughal' qualities as minute attention to detail, an interest in characterisation, a concern for drama. The line, however, is hesitant, the colour drab, the composition inconclusive. Only infact, in certain superficial ways are these pictures 'Mughal'."[১]

আর্চার সাহেবের এই মন্তব্যগুলি নিতান্তই অসার। কারণ, অবনীন্দ্রনাথ 'মুঘল' চিত্র আঁকেন নি। তিনি মুঘল ইতিহাসের বিষয় ও ব্যক্তি বিশেষের রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। তাছাড়া সেই রূপচিত্র অঙ্কনে তিনি মুঘল যুগের রূপকল্পনা, রঙ-রেখার বিশিষ্টতা ও প্রভাবকে কোন চিত্রে অনুকরণ করার চেষ্টা করেন নি। তিনি যে রীতিতে তা এঁকেছেন তা 'অবনীন্দ্র-রীতি'। তা প্রকৃত মুঘল নয়, পারসীক নয়, জাপানীও নয়, ইউরোপীয় তো নয়ই। তা তাঁর নিজের, তাঁর ভাব, ভাবনার ও তুলি কল্পনার।

১. India and Modern Art : W. G. Archer. p. 84-85

॥ ৯ ॥

অবনীন্দ্র-তুলিকায় নিসর্গ দৃশ্যের চিত্ররূপ সংখ্যায়ও যেমন সুপ্রতুল, গুণ-মহিমায়ও তা তেমনি অতুলনীয়। রূপপ্রিয় শিল্পী সেখানে প্রকৃতিপ্রেমীরূপে প্রতিভাত। ইংরেজ শিল্পী-শিক্ষক মিঃ পামারের কাছে তেলরঙ ও জলরঙ-এ চিত্রাঙ্কন শিক্ষা সম্পূর্ণ করে কিছুদিন তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনেই ছিলেন ব্যস্ত। সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন যে, তখন ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে ঘাড়ে ইজেল ও বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনবরত। তখন মুঙ্গেরে গিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনেক দৃশ্যও এঁকেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরেনি। দিনরাত চলছিল তখন নতুনের সন্ধান। সময়টি তাঁর শিল্প-সাধনার প্রথম পর্ব্ব অর্থাৎ ১৮৯০-৯৫ সাল।

সেই সময়ে অঙ্কিত দৃশ্যপটের মধ্যে মুঙ্গেরের পীর পাহাড়ের ও অন্যান্য স্থানের চিত্র উল্লেখনীয়। পীর পাহাড়ের দৃশ্যে এবং আরও কিছু ছবিতে বাস্তব-বাদী রীতির সুষ্ঠু প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি তখনও দেশজ চিত্র-পদ্ধতির সন্ধান পাননি। মুঙ্গেরের দৃশ্যাবলীর সমুদয় অংশ বিশেষ খুঁটিনাটির সমাবেশে অঙ্কিত। আর সবুজ রঙের প্রয়োগাধিক্য।

কালক্রমে তাঁর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তনের সূচনা হলে তিনি ল্যাণ্ডস্কেপ রচনায়ও নিজস্বতা প্রকাশের চেষ্টা আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ওয়াশ-পদ্ধতির প্রয়োগে নিসর্গ দৃশ্য রচনায়ও এল নতুন ভাবভঙ্গী ও ক্রিয়া কৌশল। তখন বাস্তব দৃশ্যাবলীর রঙ ও রূপের সঙ্গে শিল্পীর আঙ্গিকশৈলীর মিলন ঘটলে প্রকৃতি নতুনতর ভাববৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশ পেল চিত্রপটে।

অবনীন্দ্রনাথ রচিত নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র বিভিন্ন পর্য্যায়ে বস্তুতঃই নানা ভিন্নতর ভাব-ভাবনা, টেক্‌নিক ও ক্রিয়া-কৌশলের পরিচয় বহন করছে।

প্রথম পর্য্যায়ে (১৮৯০-৯৫) তিনি পাশ্চাত্য রীতির শিক্ষা দ্বারা চালিত হয়ে মুঙ্গেরের দৃশ্যে যে ভাবধারা ও টেক্‌নিকের ছাপ রেখেছেন, তা পরবর্ত্তী কয়েক বছরে অঙ্কিত ল্যাণ্ডস্কেপে আর ততখানি দেখা যায় না।

দেশীয় রীতিতে প্রথম পর্য্যায়ের কৃষ্ণলীলার ছবিতে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড স্বরূপ যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা তিনি করেছিলেন, সেখানেও স্বভাববাদী রূপের কিছু প্রতিফলন হয়েছে। 'তাজের স্বপ্ন' ছবিখানিতেও মেঘের দৃশ্য এবং উন্মুক্ত প্রান্তরের যে দূরাভাস তিনি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, তার মধ্যে তখনও তাঁর স্বকীয়তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি। তাহলেও শিল্পীর দেশজ প্রথায় আত্ম-

প্রকাশের চেষ্টা এবং মধ্যযুগীয় রোমান্টিক ভাবধারা প্রস্ফুট করার প্রয়াস লক্ষণীয়। মমতাজ বেগমের সমাধিস্থলে গমনাগমনকালে অশ্বপৃষ্ঠে শাজাহান যে সুদূরের আহ্বান অনুভব করতেন, প্রেয়সী বেগমের স্মৃতিভার যে তাঁকে ব্যথাতুর করে তুলতো—শিল্পী বাস্তবানুগ দৃশ্যপটের মধ্যে সেই সুরতান প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। মনে হয় তিনি স্বপ্নবিভোর বাদশার মনকে পৃথিবী থেকে কোন এক অজানা গ্রহের মধ্য দিয়ে আর এক অজানা জগতের দিকে ধাবিত করতে প্রয়াসী। মেঘাচ্ছন্ন স্তিমিত চন্দ্রালোকে পর্ব্বত-প্রান্তরকে মোহময় পট-ভূমিকায় করেছেন তিনি রূপান্তরিত। ক্ষুদ্রাকার তৃণগুচ্ছ যেন ছুটন্ত ঘোড়ার উপরে বাদশাকে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা লুপ্ত করে এগিয়ে দিতে চাইছে। তিনি মৃত্যুর অতীত এক লোকের সন্ধান-যাত্রী। নিসর্গ দৃশ্য দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ এই ভাবটির সুপ্রকাশ করেছেন সার্থকরূপে।

স্বকীয় ধারায় চিত্রাঙ্কন পর্ব্ব শুরু হতে তিনি আরও অনেক কাব্য-কাহিনীর আখ্যান চিত্রে এই ধরনের দৃশ্যপট যোজনা করেছিলেন। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত হোল—মেঘদূতের নির্ব্বাসিত যক্ষ, ময়ূর, আকাশচারী সিদ্ধদম্পতি এবং বুদ্ধ সুজাতা নামক চিত্রাবলী। এই সকল চিত্রে পাহাড়, বনভূমি, বিশাল বনস্পতি, ছায়াতরু, আকাশ, মেঘ, তৃণগুচ্ছ যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তুভার কাব্য-কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। আলোচ্য চিত্র ব্যতীত পরবর্ত্তী আরও অনেক নিদর্শনে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যকে চিত্রের পৃষ্ঠপট (background) স্বরূপ স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল করেছেন। তন্মধ্যে হীরামন তোতা, চৈনিক পরিব্রাজক, ভুটিয়া মেয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানব-জীবন ও অরণ্য-জীবন, প্রাণের দুই মহান্ প্রকাশ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও ছিল একদিন অরণ্যনির্ভর। অবনীন্দ্রনাথ যেন সেই প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে অরণ্যের রূপে মুগ্ধ। তবে এই সকল ছবিতে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ ক্রমশঃ তাঁর নিজস্ব ভাববুদ্ধি ও চিত্রাঙ্কিকের প্রভাবে নতুনতর আকার-প্রকার ও রূপবৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়েছিল। পাহাড়-পর্ব্বত, গাছপালা, মাঠ ঘাট প্রভৃতির রূপায়ণে ও রঙ-রেখার বুনুনিতে শিল্পীর ক্রিয়া-কৌশল ক্রমশঃ যেমন স্বকীয়তামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি এল গভীর গহনা এক ভাবের স্রোত। পাশ্চাত্য পদ্ধতির বাস্তবধর্ম্মী আকাশ ও মেঘের খেল, পাহাড়ের কল্পনা, গাছপাতার সূক্ষ্মাংশের প্রতিরূপ তখন শিল্পীর তুলি চালনার কৌশলে নতুনতর ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে অলৌকিকতার পথে পদক্ষেপ করতে প্রয়াস করেছে।

সেই শুভযাত্রার অগ্রগতির চিহ্ন ছড়িয়ে পড়েছিল ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছে। তিনি যে বিশ্বপ্রকৃতির কিছু কিছু রূপ ধরে দিয়েছেন তার মধ্যে। সেখানে মানুষ, পশুপাখী, গাছপালা, তৃণগুল্ম আর এক নতুন রূপে করেছিল আত্মপ্রকাশ। দেখা-অদেখা ও জানা-অজানায় সংমিশ্রিত রূপ তা। 'চার্ম অব্ কাশ্মীর' গ্রন্থের চিত্রে দেবতাত্মা হিমালয় ও পার্ব্বত্য হ্রদ সমূহের রূপাবলী স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিল্পীর অভিনব কল্পনার প্রভাবপুষ্ট এক চিত্তহারী নিসর্গ দৃশ্য।

ওমর খৈয়াম চিত্রপর্য্যায় থেকেই (১৯০৮-১০) অবনীন্দ্রনাথ স্বকীয় ভাবধারায় সুসিদ্ধ শিল্পী। তার পরবর্ত্তী অধ্যায়েই দেখা যায় যে তাঁর চিত্রাবলীতে নরনারীর রূপাকৃতিও যেমন অনন্ত বৈচিত্র্য বিভবমণ্ডিত, তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির রূপাঙ্কনেও এসেছিল কত শত ভাব ভঙ্গী, গভীর কল্পনার অবাধ প্রবাহ, জলে ধোয়া রীতির অনবদ্য ক্রিয়া-কৌশল ও প্রয়োগ-চাতুর্য্য।

১৯১০-১২ সালে তিনি পুরী ভ্রমণে গিয়েছেন কয়েকবার। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি বার কয়েক দার্জ্জিলিং-কার্সিয়াংও ভ্রমণ করেছেন। আর প্রতিবারই সেখানকার পাহাড়-পর্ব্বত, গাছপালা ও জীবনযাত্রার বহু ছবি এঁকেছেন। মুসৌরীতে গিয়ে যে সকল দৃশ্য দেখেছিলেন, তাও পরে বাড়ীতে ফিরে এসে এঁকেছিলেন। দেওঘরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চিত্রে ধরে দিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে। রাঁচির দৃশ্যও তাঁর নিসর্গ চিত্রে স্থান পেয়েছে অনেকবার।

১৯১০ সাল থেকে অবনীন্দ্রনাথ রচিত নিসর্গ দৃশ্যের চিত্রে ক্রমান্বয়ে নানা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা চলেছিল অবাধ ছন্দে। নানা স্থানীয় প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য তাঁকে চিত্র রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ক্রমশঃ তিনি জাগতিক দৃশ্যের সামান্য খণ্ড খণ্ড রূপের অন্তরালে যে অসামান্য ভাবসম্পদ রয়েছে তাকে প্রত্যক্ষীভূত করার চেষ্টায় হয়েছিলেন ব্যাপৃত। সেই অসাধারণতা প্রকাশ করার প্রয়াসে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন বর্ণের মায়াজাল রচনা করে ও মোহিনী তুলির ললিত টান ও সুকোমল সূক্ষ্ম রেখার সাহায্যে। শত ধৌত রঙের পরতে পরতে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-লাবণ্যের অসীম রহস্য ফুটে উঠেছে কত নতুন ছন্দলহরীতে।

অবনীন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্রের সমগ্র ভাণ্ডার দেখলে মনে হয়, তিনি যেন প্রকৃতির রূপকে নিছক কৌতূহলের বশে দেখেন নি, বরং তার অন্তরের স্বরূপে দেখেছেন। কোথাও কোথাও তিনি যেন রূপাতীতের সন্ধান পেয়েছিলেন। আর তা দেখে দেখে তাঁর চোখ ও মন ক্লান্ত হয়নি কখনও।

মনে হয় তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখে আনন্দ ও ব্যথা-করুণ দুই ভাবেই আচ্ছন্ন হতেন। তবে তার মূলে তাঁর মনে কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রভাব বোধ হয় ছিল না। কারণ সুতীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিতে দেখা রূপেরই প্রতিফলন হয়েছে তাঁর চিত্রে। তাহলেও তিনি তাতে প্রকৃতির অন্তরস্থিত রহস্য ভেদ করে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্দ্ধেকার এক গভীর ভাব লোকের সন্ধান দিয়েছেন। শিল্পীর মর্মচক্ষুতে ও অন্তরে ধৃত বাস্তব রূপ তাঁর নিজের, ভাব, রস ও মনোবেদনে নিষিক্ত হয়ে চিত্রপটে আরও সুসংহত ও সুসমঞ্জস হয়ে উঠেছে।

শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে প্রকৃতিরানী তাঁর নিখুঁত রূপ নিয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন ও মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। অতএব, তখনকার চিত্রে তিনি প্রকৃতিকে বাস্তব করে তুলতেই ছিলেন সচেষ্ট।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ও পরবর্ত্তীকালে শিল্পীর জীবনে এল বিশ্বপ্রকৃতির আন্তর রহস্য উপলব্ধির প্রেরণা। তখন বিভিন্ন বস্তুর খুঁটিনাটি অংশের চেয়ে রূপের সমগ্রতা মধ্যে নিহিত রহস্য-ঘন ভাবের দিকে লক্ষ্য বেশী হয়েছিল। আরও দিন যেতে সেই রহস্যঘনত্ব হয়ে উঠলো অতলান্ত ভাব-প্রবাহী। সাক্ষাতে দেখা প্রত্যক্ষ দৃশ্যের অন্তরালে এক সুদূরের ইঙ্গিত হোল অনুভূত।

এই ধরনের নিসর্গ চিত্রে তিনি বর্ণিকাভঙ্গ ও রেখার কারুতাকে এমন এক স্তরে তুলেছিলেন, যা নানা পর্য্যায় অন্তে বিশ্ব-শিল্পে একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় রচনা করার উপযোগিতা অর্জন করেছিল।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপন হোল romanticism-এর একটি লক্ষণ। অবনীন্দ্রনাথের romantic ভাবধারা তাঁর নিসর্গ চিত্রেও হয়েছে পরিস্ফুট। রোমান্টিকতার আর একটি লক্ষণ—সুদূরের প্রতি ও অজানার প্রতি আকর্ষণ। অবনীন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্রে তাও হয়েছে প্রতিভাত।

পুরীর দৃশ্যাবলী ও পুরী থেকে কোণারক যাত্রার অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিত্রে বর্ণময় রূপের পাশে পাশে দেখা যায় হালকা 'সিপিয়া' রঙের টান-টোন দিয়ে অঙ্কিত অপূর্ব্ব ভাব-গম্ভীর চিত্র। স্বর্গদ্বার থেকে কোণারক সিরিজের ছবি শেষোক্ত প্রথায় রচিত। কী না আছে সেখানে! পাহাড়, বালির চড়া, মঠ-মন্দির, গ্রামীণ দৃশ্য, চালাঘর, পাকা বাড়ী, তাল তমাল গাছ, পালকী বাহক ও তাদের সঙ্গীদের দ্রুত চলার পদক্ষেপ ও ছন্দভঙ্গী—কিছুই বাদ পড়েনি। কিন্তু স্বল্প বর্ণনায় সামান্য রঙের টাচে ও সূক্ষ্ম মোলায়েম তুলির টানে সে রূপ হয়েছে উদ্ভাসিত। এ যেন ক্ষীণ কণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত। রূপ বিরূপ ও জানা অজানার মিশ্রিত রূপ। সবই একটু করে দিয়েছেন। একফালি সরু রাস্তা,

অস্পষ্ট একটু বেলাভূমি, বালুকাকীর্ণ জনশূন্য স্থান, ছোট্ট একটি গ্রাম। কিন্তু ভাবের দ্যোতনায় তা বিরাট। পাল্‌কী বহন করে বাহকরা সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি ধরে দ্রুত তালে চলেছে কোণারকের দিকে। জনশূন্য বৃক্ষ-পত্রহীন বালুকাময় ধুধু প্রান্তর। বাহকদের চেহারা খাঁটি দুলিয়া সমাজের। তারা সামান্য ধুতি পরিহিত। উত্তমাঙ্গ অনাবৃত। দেহের রূপ ও চলার ভঙ্গী অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনবদ্য চিত্র।

'পথে বিপথে' বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথ কোণারক যাত্রীর অনুভাব-অভিজ্ঞতার আক্ষরিক বর্ণনা দিয়েছেন অতি চমৎকার। সেই বর্ণনার মধ্যে এই সকল চিত্র-কল্পনার উৎস নিহিত রয়েছে।

"চক্রতীর্থ পার হইয়া আর অধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই, রহিয়াছে কেবল চিরন্তন নীরবতা—অন্তহারা অস্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের পদশব্দ সেখানে লুপ্ত, সাগর গর্জন স্বপ্নের প্রায়—পাই কি না পাই। এই শূন্যতা এত বিরাট যে, চাঁদের আলো সেও সেখানে অন্ধকারে ঠেকিতেছে। ছায়ার বৈষম্য দিয়া আলোকে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়া শব্দকে জাগাইতে সেখানে কিছুই নাই। অথচ মনে হয় না যে একা! সঙ্গে ছয় ছয় বেহারা চলিয়াছে বলিয়া নয়; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জীব নহে, সেটা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি বলিয়া।"

পুরীর কোন কোন দৃশ্যচিত্রে সূর্য্যালোকিত প্রকৃতির রূপও তিনি ধরে দিয়েছেন। তবে কোণারকের যাত্রাপথ বর্ণণায় গভীর শ্বাসরোধকারী ও গা ছমছমে ভাবেরই আধিক্য। সেখানে নিসর্গের ভাবমূর্ত্তিই মুখ্য। আর তা নিছক খেয়ালে কল্পিত রূপ নয়। অভিনব মনন ও কল্পনা চৈতন্যের মধ্যে প্রকৃতিকে নতুন রূপে ধরার ক্ষমতার প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ যে কেবল রম্য দৃশ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, তা এই জাতীয় অনেক দৃশ্যপট দেখে উপলব্ধি করা সহজ।

১৯২৩ সালে আঁদ্রে কার্পেলে 'রূপম্'-এ 'The Calcutta School of Painting'—নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত পুরীর দৃশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন এইভাবে—

"A storm at Puri is only a small water colour with a line of bright sand and in the distance the sombre sky and the threatening sea—but this was sufficient to suggest, all the tragedy that the unchained elements could hold in them in India."

'ই' নামে জনৈক ছদ্মনামী লেখক ১৩২০ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'ভারতশিল্পের পুনর্বিকাশ' শিরোনামাতে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি অবনীন্দ্রনাথের পুরীর দৃশ্য সম্বন্ধেও লিখেছিলেন—

"ঠাকুর মহাশয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র 'পুরীতে ঝড়'। এই ক্ষুদ্র ছবিখানিতে আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আভাস এবং ঘন ঘোর আকাশ। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট। ফলতঃ যিনি এই প্রদর্শনীতে (সোসাইটির) সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত দৃশ্যপট খুঁজিতে আসিবেন, তিনি নিরাশ মনে ফিরিবেন।"

অবনীন্দ্রনাথের পুরী থেকে কোণারক যাত্রার ছবিগুলি ১৯১৫-১৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। কলকাতার 'দি স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার রিভিউতে উক্ত চিত্রগুচ্ছ সম্বন্ধে মন্তব্য হয়েছিল—

"From Puri to Konarak a set of twelve ink drawings by Sjt. Abanindra Nath Tagore in which the artist with consummate skill presents not merely the appearance but the feeling of vast spaces with an irreducable minimum technique. An undulating line with a couple of palm trees is full of warm winds and salt air and wholly Indian."

মুসৌরীর দৃশ্যে অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন পাহাড়ের গম্ভীর রূপ। আবার দেখা যায় সেই পাহাড়ের উপর পড়েছে উজ্জ্বল আলোর তুলিকা। মেঘের রূপে নানা স্তর-বিন্যাস। বরফের স্তূপ ও তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের শিখরের কোমল প্রশান্তি এবং সুদূরব্যাপ্ত প্রসন্নতা লক্ষণীয়।

তাঁর তুলি-কল্পনায় ধৃত পুরী, দার্জ্জিলিং-কার্সিয়াং, মুঙ্গের-মুসৌরী সকলেই তাদের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ও রূপবৈচিত্র্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তবে প্রতিটি চিত্রেই তাঁর গভীর নিসর্গানুরাগ হয়েছে প্রতিফলিত।

অবনীন্দ্রনাথের দৃশ্যচিত্র মধ্যে উদাসীন ছন্নছাড়া ভাব নেই কোথাও। তিনি প্রকৃতিকে অনবগুণ্ঠিতা রূপেই এঁকেছেন সর্ব্বত্র। কিন্তু কোথাও তার ধ্বংসাত্মক বা সর্ব্বনাশী রূপ দান করেন নি। তাঁর চিত্রে সুরবিন্যস্ততা আছে এবং দুর্জ্জের ভাবেরও কিছু অভাব নেই। প্রকৃতি সেখানে ঐশ্বর্য্যময়ীও বটে। তবে তা অমূল্য অনুভূতি সঞ্চারক। অনেক সময় প্রকৃতির লীলারহস্য ও

বিলাস-বিভ্রম মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ সে-রূপ অঙ্কন করেন নি। তাঁর অধিকাংশ চিত্রের নিসর্গ শোভা মূলতঃ ইন্দ্রিয়ভোগ্য না হয়ে অপার্থিব সৌন্দর্য্যলোকের সন্ধান দেয়।

দার্জিলিং-কার্সিয়াং ভ্রমণের ফলশ্রুতিতে যে চিত্রসম্ভার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে যেমন আলোর খেলা, তেমনি ওয়াশ টেক্‌নিকের সাহায্যে রঙের গভীরতা। Space সৃষ্টির ক্ষমতাও প্রকাশ পেয়েছে উচ্চাঙ্গের। পাহাড়ের নানা পরিবর্ত্তিত রূপপ্রকৃতি, হিমগিরির তুষারাবৃত রূপ, সন্ধ্যার রক্তরাগরেখা, পার্ব্বত্য পথে পাহাড়ী মেয়ে, কালো পাহাড় প্রবাহিণী ঝর্ণাধারা ও তার অমল শুভ্র স্রোত রেখা, শৈলদেহে পাখীর বাসা (Eagle's nest), পুষ্প পত্রালি, কার্সিয়াং-এ বাড়ীর সামনে শিল্পীর আত্মমূর্ত্তি, বাড়ী থেকে বাজারের দৃশ্য, স্বগৃহ সম্মুখে পাহাড়ী মেয়ে, দার্জিলিং-এ সূর্য্যাস্ত এবং আরও কত ছবি এঁকেছেন তিনি, যার মধ্যে আছে পাহাড়, ঝোপ-ঝাড়, ক্ষীণ চাঁদের রেখা ও প্রকৃতির আরও কত খেলা। তার মধ্যে 'অতন্দ্র চন্দ্র' নামে ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুটি মাত্র বড় গাছ, তার একটি ডালে পাখী, আর আকাশে চাঁদ। বর্ণবিন্যাস ও আঙ্গিক-পদ্ধতি চৈনিক চিত্র-শৈলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দার্জিলিং-কার্সিয়াং-এর দৃশ্য তিনি সাদায়-কালোয় এবং বর্ণাঢ্য—দুইভাবেই এঁকেছেন।

এই সকল চিত্র দেখলে মনে হয় যে জীবনের চারপাশের বাস্তবতাকে তিনি স্বীকার করেছেন ঠিকই, কিন্তু শিল্পায়ণে তিনি আর বাস্তববাদী ছিলেন না। বস্তুতান্ত্রিকতার উর্দ্ধে, সুন্দরের সুনির্ম্মল আকাশে তাঁর চিত্রকল্পনার ব্যাপ্তি ও বিস্তার ঘটেছিল অতি সুমোহন রূপে।

দেওঘরের কিছু দৃশ্য এঁকেছিলেন তিনি ১৯২৮ সালে। আর তা জলরঙ-এ এবং ওয়াশের ধারায়। সেখানে রঙ-রেখায় আবদ্ধ হয়ে আছে উন্মুক্ত প্রান্তর, বনভূমি, শৈলমালা ও গাছপালা। কোথাও রয়েছে স্বর্ণ-সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের নীচে, নীল পাহাড়ের কোলে বৃক্ষরাজি। সামনে ধূসর ক্ষেত্র। এখানেও শিল্পীর রঙ-তুলির যথেষ্ট প্রয়োগ-চাতুর্য্য হয়েছে পরিস্ফুট। দেওঘর চিত্র সিরিজে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সম্বন্ধীয় একটি নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯২৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর ছোট একখানি পটে তিনি লাল রঙের একটি হাঁস এঁকে পাশে সামান্য কিছু তুলির টান লাগিয়ে ছবিতে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তার নীচে লিখে রেখেছেন, "আলো অন্ধকারের রহস্য যে জানে—শিল্পীকেও সেই জানে।" শিল্পীর নাম সহি আছে ইংরেজী ও বাংলাতে।

রাঁচির দৃশ্যাবলীও তিনি এঁকেছিলেন জলরঙের মাধ্যমে ও ওয়াশ পদ্ধতিতে। সেই দৃশ্যেও তিনি ধরে দিয়েছেন সাঁওতাল পরগণার উন্মুক্ত প্রান্তর ও অনুচ্চ শৈলমালা। দেওঘর ও রাঁচি ভ্রমণের পরে তিনি আরও অনেক ছবিতে সাঁওতাল সমাজের নরনারীর রূপাঙ্কন করেছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে। তাঁর প্রখ্যাত চিত্র 'মাটির মেয়ে' মনে হয় সেই ভ্রমণ যাত্রারই ফলশ্রুতি। আরও কয়েকটি ছোট ছোট দৃশ্যপটেও সাঁওতাল সমাজের চেহারা ও কর্ম্মধারার ছাপ সুস্পষ্ট। ধান বোঝাই গরুর গাড়ী চলেছে ধূধূ মাঠের পথ ধরে। গাড়ীর চাকা solid, বলদ দুটি, চালকের চেহারা সাঁওতাল শ্রেণীর মানুষের মত। আকাশে অস্তরাগরেখার ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ। 'গীতাঞ্জলি'র 'বাঁশি' কবিতার চিত্রায়ণেও আছে তিনি এই ধরনের রূপ ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। দেখে মনে হয় সাঁওতাল পরগণা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-প্রসূত চিত্র।

অবনীন্দ্র-তুলিকায় বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক রূপও অতি রমণীয় ও প্রাণবন্ত। পল্লীগ্রামের মানুষ না হয়েও তিনি এমন পল্লী-প্রকৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন, যে মনে হয় তিনি যেন তার সঙ্গে একাত্ম। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সাহাজাদপুরের দৃশ্যাবলী। তার মধ্যে পাওয়া যায় নদীমাতৃক বাংলার রূপচ্ছবি। তাতে কোন জটিল ভাব নেই, অথচ চমকপ্রদ ক্ষিপ্রগভীর এক অনুভূতি হয়েছে প্রকাশিত। তিনি সাহাজাদপুরের দৃশ্য এঁকেছিলেন কুড়ি একুশখানি। সেই সকল দৃশ্যপটে পল্লী-বাংলার সবুজ শ্যামল বর্ষাস্নাত রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে। ভরা বর্ষার নদীবক্ষে দেখা যায় নৌকার ক্ষীণ রূপ, মাঝে চড়াতে বাড়ীঘরের আভাস। আবার কোথাও চড়াতে বড় বড় গাছপালা ও মাঝি-মাল্লাসহ বজরা। কোনও পটে সামান্যতম নীল ও কালোর ছোঁয়া, আর হলদে-বাদামীকে ধুয়ে ধুয়ে জলে জলময় রূপ। কোথাও সবুজের সঙ্গে লাল ও কালো রঙের মিশ্রণে রহস্যাবৃত ভাব হয়েছে পরিস্ফুট। কাছারি বাড়ীর আশেপাশে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা ও নদীর রূপ সবুজে সবুজময়। বর্ষার দৃশ্য—সর্ব্বত্র অঢেল সবুজ। শিল্পীর চোখে তখন আর সব রঙ যেন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

উলাপাড়া স্টেশনের চিত্রেও সূক্ষ্মতার আবেশে অস্ফুট প্রাকৃতিক পরিবেশ। গাছপালা ঘেরা নাপিতের বাড়ীটি যেন একটা আলোর ঝলকানি। একফালি আকাশের নীচে বাড়ীটি আলোয় উদ্ভাসিত। তার আশেপাশে সবুজ ও কালোর রেশে গভীর গহন ভাব এসে গিয়েছে।

গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘন সবুজের মেলায় বিলে জলপানরত ঘোড়ার একটি ছবি অত্যুজ্জ্বল। চোখ ও মনকে বিরতি দান করার জন্যই যেন এই চিত্র-কল্পনা। সাহাজাদপুরের দৃশ্যাবলী মুখ্যতঃ সূক্ষ্ম তুলির টানে সবুজ রঙের সৃষ্টি। মাঝে মাঝে হলদে আভার চমক। শ্যামল সৌন্দর্য্যধারায় চারিদিক প্লাবিত। অদ্ভুত কৌশলে ধুয়ে ধুয়ে সেই রঙের গহনতা এনেছেন তিনি। বাংলার পল্লীজননী যেন গাছে-গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে সবুজের আলপনা এঁকে দিয়েছেন। আর শহরবাসী শিল্পীগুরু রূপসী বাংলার রূপসাগরে অবগাহন করে করে তার শ্যামল শোভার রূপ-নির্য্যাসকে করেছেন আকণ্ঠ পান।

গঙ্গা নদীর সঙ্গে সম্পর্ক অবনীন্দ্রনাথের আশৈশব। গঙ্গাতীরে পিতার বাগানবাড়ীতে গিয়ে শিশু অবনীন্দ্রনাথ নদী কিনারে কত খেলা করেছেন, কত বেড়িয়েছেন। যুবা বয়সে স্টীমারে চড়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ ছিল তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। মুঙ্গেরে গিয়ে কষ্টহারিণী ঘাটের ছবি এঁকেছেন তিনি কত রূপে ও ভাবে। কিন্তু পরিণত বয়সে, শিল্পভাবনার চরম উৎকর্ষের দিনে তিনি আবার যে গঙ্গার রূপ দেখলেন আর তাকে চিরায়ত সৌন্দর্য্যের প্রতীক করে তুললেন, তা তুলনাহীন। আত্মস্মৃতি কথনেও তিনি গঙ্গার আকর্ষণের কথা বলেছেন বার বার। এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

"সে কী শোভা, সেই ভরা গঙ্গার বুকে ভরা পালে চলেছে জেলে নৌকো, ডিঙি নৌকো। রাত্তির বেলা সারি সারি নৌকোয় নানা রকম আলো পড়েছে জলে। জলের আলো ঝিলমিল করতে করতে নৌকোর আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলত। কোনো নৌকোয় নাচ গান হচ্ছে, কোনো নৌকোয় রান্নার কালো হাঁড়ি চেপেছে, দূর থেকে দেখা যেত আগুনের শিখা।"[১]

এই বর্ণনারই চিত্ররূপ তিনি এঁকেছেন। নদীর ভরা স্রোতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাসমান পালতোলা নৌকা; আবার কোন ঘাটে অনেক নৌকা বাঁধা। প্রকৃতির আলোর খেলা নেই সেখানে। কোনও নৌকাতে হয়ত লণ্ঠন জ্বালানো। এই সকল চিত্রে কৌমুদীস্নাত, জ্যোৎস্না পুলকিত দৃশ্য অপেক্ষা শিল্পীর যেন অন্ধকারময় প্রকৃতির রূপের দিকে কোথাও কোথাও বেশী আকর্ষণ দেখা যায়। কয়েকখানি ছবিতে তিনি দেখিয়েছেন পাল তুলে নৌকা চলেছে। কিন্তু নৌকার আকৃতি তত স্পষ্ট নয়, তবে পালটি সুস্পষ্ট।

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১১২

সাদায়-কালোতে রূপরেখা। ব্যাকগ্রাউণ্ডের অতলে ক্ষীণ সবুজ আভা। কোথাও এঁকেছেন কালো-সাদায় অনেকগুলি নৌকার অস্পষ্ট রূপ। ছবির সারা অঙ্গ যেন রহস্যাবৃত।

এতদ্ব্যতীত তিনি গঙ্গাকে তার দ্বিতীয় স্বরূপেও প্রতিফলিত করেছেন অনেক চিত্রে। সেখানে আছে আকাশের উদার প্রসন্নতা ও আলোকস্নিগ্ধ পটেতে গঙ্গার জলের টানা রূপমূর্ত্তি। বিচিত্র বর্ণচ্ছটা নেই, নেই তরঙ্গমালা ও উদ্দামতা। কেবল একটানা স্বচ্ছ জলরাশি। দূরে, বহুদূরে হয়ত নৌকার ক্ষীণ আভাস। কোথাও বা হয়ত তাও নেই—শুধু জল, আর জল। এই ধরনের চিত্রে গহন গম্ভীর চিরনিদ্রাবৃত অন্ধকারময় ভাবের বিপরীত আর এক আলোকময় অসীমতার হয়েছে প্রকাশ। এই চিত্রও নয়নাভিরাম এবং সুদূর ও সুবৃহতের সন্ধান দেয়। অমূল্য অনুভূতি-সঞ্চারকও বটে।

সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হোল বর্ণপ্রয়োগ পদ্ধতি। অতি সামান্য কয়েকটি মাত্র রঙের টাচে এবং তাকে আবার ধুয়ে ধুয়ে সুনির্ম্মল স্বচ্ছ করে এমন দিগন্তবিস্তৃত রূপে করেছেন উদ্ভাসিত যা দেখে মনে হয় যে প্রকৃতির মহা-সঙ্গীতের দ্বিতীয় আর একটি তান ও সুর মূর্চ্ছনায় যেন সমস্ত বিশ্বজগত পরিপ্লাবিত হয়ে চলেছে। আরও মনে হয় যে অসীম অনন্তের সঙ্গে যোগে যে আনন্দ বা মুক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়, শিল্পাচার্য্য যেন সেই ধারণা ও উপলব্ধি নিয়েই এই চিত্র রচনা করেছেন। তাঁর আত্ম বিস্তারের ইহা আর একটি বিকল্প পন্থা। এর মধ্যে কেবল তাঁর বর্ণপ্রয়োগ ও তুলি চালনার অভিনব কৌশল ও শিল্প-চিন্তার স্বচ্ছ স্বরূপই প্রকাশ পায়নি, আরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে চরম এক চিত্তোৎকর্ষের মহিমা মাধুর্য্যের।"

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নদ-নদী, পাহাড়-প্রান্তর, বনশ্রী, পাখী পাখালী, বৃক্ষ পত্রাদির রূপরহস্য যেমন তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন, তেমনি আবার কলকাতা শহরের বাড়ীঘর ও গলি ঘেরা আবদ্ধ প্রকৃতিও তাঁর কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে একটি অদ্ভুত মোহিনী রূপে ধরা দিয়েছেন কতবার। তার ফলে তিনি তাঁর পিতৃপিতামহের প্রাচীন আবাসকেও যেমন চিত্রবদ্ধ করেছেন, তেমনি আরও দু'একখানি পটে ধরে দিয়েছেন অন্যান্য পুরানো জীর্ণ বাড়ীঘরের আলোকোজ্জল ছবি। এই পাষাণপুরীর ইট পাথরের কঠিন বাধা অপসারণ করে যে আলোর ঝলকও এখানে আসে তাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়েছেন কোন কোনও চিত্রে।

শেষ বয়সে যখন আরব্য রজনী ও কবিকঙ্কণের চিত্র সিরিজ রচনা

করলেন তখন তিনি সেই চিত্রে মানুষ, পশুপাখী, গাছপালা এবং আরও সব প্রাকৃতিক বস্তু সামগ্রীকে একাত্মতার স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করে চমৎকার জীবন্ত-রূপের প্রেক্ষাপট বা ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড তৈরী করেছিলেন। তার ফলে অর্থাৎ গল্পাংশের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির নানা অঙ্গ অবয়বের সহজ মিলন ছন্দে চিত্র মধ্যে অদ্ভুত একটি মরমী ভাব ও স্বতন্ত্র এক জীবন চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের অনন্যতা ও অসাধারণত্ব এইখানে যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেমন যাবতীয় পার্থিব বিষয়বস্তু, জীবসত্তা ও প্রকৃতিসত্তার রূপায়ণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমনি তাদের এক সুরে-ছন্দে ও মিলনের রাখী-বন্ধনে আবদ্ধ করতেও ছিলেন সুকৌশলী ও সুনিপুণ।

বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে দা-ভিঞ্চি, র‍্যাফেল, কোরো, টার্ণার, কনস্টেবেল, ল্যাণ্ডসীয়র, বাইজাদ, মনসূর প্রমুখ প্রতিভাধর শিল্পীরা যে রকম এক একটি বিষয় রূপায়ণে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে অমর হয়ে আছেন, অবনীন্দ্র-প্রতিভাকে তদনুরূপ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাঁর শিল্প-প্রতিভা বহুমুখী ও বিচিত্র পথগামী। তাঁর স্বর্ণতুলিকা যা স্পর্শ করেছে তাই হয়েছে মননদীপ্ত, অপূর্ব, অভিনব ও অনবদ্য।

॥ ১০ ॥

বাংলার তথা ভারতের পশুপাখী বিশ্ব-প্রকৃতির রূপরাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্যময় একটি বিশেষ মনোহর অংশ। প্রকৃতিপ্রেমী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সেই মনোরম রূপজগতের সৌন্দর্য সুষমাকেও তাঁর চিত্রপটে অক্ষয় করে রেখেছেন কত অনবদ্য ভাব-রসে মণ্ডন করে। তাঁর হাতের 'কুটুম কাটামে'ও পশুপ্রাণী নানা অদ্ভুত ও অভিনব রূপে হয়েছে প্রাণবন্ত। চিত্রপটের পশুপাখী সুচারু রেখার সুমোহন ছন্দে ও নয়নাভিরাম বর্ণ বাহারে আরও রমণীয়, আরও চিত্তাকর্ষক। পশুপাখীর বাস্তব রূপাকৃতি তাঁর মন-মাধুরীতে রঞ্জিত হয়ে নতুনতর রূপ-প্রকৃতি লাভ করেছে। তাঁর পশুপাখীর চিত্র অনেক সময় রূপান্তরের পথে গিয়ে অভিনব ও অতিপ্রাকৃত রূপে হয়েছে আবিষ্ট।

তাঁর অন্যান্য চিত্র-রচনায় যেমন আঙ্গিক, শৈলী ও ভাব-ভাবনার দিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর বিভাগ ও পর্যায় দেখা যায়, পশুপাখীর রূপায়ণেও তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়াবর্তনে স্বতন্ত্র টেক্‌নিক ও চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট।

যেমন, প্রথম পর্বের মেঘদূতের ময়ূর চিত্রে পাখী ও বনভূমির যাবতীয় অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ধরে ধরে এঁকে তুলির সূক্ষ্মতায়, রেখার কারুতায় ও বর্ণের বিচিত্রতায় চূড়ান্ত সৌন্দর্য্যের প্রতীক করে তুলেছেন, তেমনি হয়েছে বাস্তবতার প্রকাশ।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যখন রঙ ধুয়ে ধুয়ে ছবিতে কুহেলিকা সৃষ্টির পর্য্যায় এল, তখন পশু-প্রাণীর দেহরূপেও দেখা গেল সেই গূঢ় অর্থের দ্যোতনা-ভাবনা। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হোল উটের মৃত্যু, লম্ফমান হরিণ প্রভৃতি। এই সকল ছবিতে পশু-প্রাণী এক স্বপ্নময় গহন গভীর অর্থবহ পরিবেশে স্থান পাওয়ার ফলে নতুনতর রূপ লাভ করেছে। সাধারণ পশুপাখীর চেহারা-চরিত্র আলোচ্য চিত্রপটে নতুন এক বার্ত্তা বহন করে এনেছে।

এই পর্য্যায়ে অঙ্কিত অনেক পাখীর ছবিও অতি রমণীয়। জলরঙ ও প্যাস্টেল—দুই মিডিয়ামেই তিনি পশুপাখীর চিত্ররূপ দিয়েছেন। কিন্তু প্রভাব সৃষ্টিতে দুই মাধ্যমই সমান সার্থকতা ও অভিনবত্ব প্রকাশ করে বিরাট ও বিচিত্র এক রূপভাণ্ডার গড়ে তুলেছে।

আবার কিছুদিন যেতে অবনীন্দ্রনাথ আর এক নতুন ধারায় এক সিরিজ পশুপাখী অঙ্কন করলেন, যাকে খানিকটা impressionistic ধাতের

বলা যেতে পারে। তবে এই ইম্‌প্রেশনবাদী ভাবধারা পশ্চিমী 'Ism'-এর অনুগামী নয়। তিনি পশুটি বা পাখীটির সমগ্র রূপকে রঙ ধুয়ে ধুয়ে সুগভীর ভাবপ্রবাহে অবগাহন করিয়ে অনন্ত অভিনবত্বের প্রতীক করে তুলেছেন। তাছাড়া আর একটি ধারায় ঘন রঙের চিত্রক্ষেত্রের মধ্যে হালকা রঙের আমেজে এবং তাকেও ধুয়ে ধুয়ে এমন কোমল তনু রচনা করেছেন যে সেই পশুপাখী কোন দেশের, কোন যুগের তা বলা কঠিন। এই পশু-পাখীর অঙ্গবিন্যাস বা পালকাদি কিছুই স্পষ্ট নয়। একটি গোটা রূপচ্ছবি মাত্র। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হোল—শ্বেত ময়ূর ও কুকুর ভুলু। ভুলুর ছবি দেখে মনে হয় তুলার তৈরী দেহ। শ্বেত ময়ূর মেঘদূতের ময়ূর থেকে পুরোপুরি ভিন্ন চেহারার, ভিন্ন রীতির ও ভিন্ন স্বাদের রচনা।

রঙ ধুয়ে ধুয়ে এই রকম আরও কিছু পশুপাখীর রূপ তিনি ধরে দিয়েছেন যাকে এক কথায় মনোচ্ছায়াবাদী বলা চলে, অর্থাৎ পাখীটির রূপাভাস স্পষ্ট, কিন্তু আলাদাভাবে প্রতিটি পালক ও পরতে পরতে তার স্বাভাবিক রঙের খেলাটি হয়ত নেই, কিন্তু আছে তার সমগ্র রূপচ্ছায়া ও প্রকৃত ভাব সত্তাটির নিখুঁত প্রকাশ।

এই পর্য্যায়ের বহুসংখ্যক চিত্র মধ্যে উল্লেখনীয় হোল বাঁদর ও ছাগল, সারস নীল বিড়াল, পায়রার ঝাঁক এবং আরও অনেক পাখীর চেহারা।

চূড়ান্তভাবে 'ওয়াশ' চালিয়ে আরও প্রচুর পাখীর ছবি তিনি এঁকেছেন যার মধ্যে স্পষ্টতা ও গহনতা, দুই-ই বিদ্যমান। সে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ও আবহমণ্ডল। যেমন, গহন অন্ধকারে পাহাড়ের কোলে জলের ধারে লাল-মোহন পাখী। কি অদ্ভুত দৃশ্যপট! কত ভাব-ভঙ্গীর যে পায়রা এঁকেছেন তার হিসেব করা যায় না। লাল হলুদের সামান্য পোঁছ দিয়ে যে পায়রা এঁকেছেন তা অপূর্ব্ব বললেও সবটা যেন বলা হয় না। দাঁড়ে সবুজ টিয়াপাখী। আর কোনও আয়োজন নেই, কোনও বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি, তার প্রকৃতি বর্ণনার বিষয় নয়। সে যেন কোন রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত। রাতের অন্ধকারে গাছের মরা ডালে বউ-কথা-কও পাখী। সামনে এক ঝলক আলো। তা গাছের ডালে ও পাখীর গায়ে পড়েছে। অনির্ব্বচনীয় রহস্যে ভরা ছবি!

একটি গাছের গুঁড়িতে ও ডালে ডালে সাতটি পাখী-ভাই। নীল, বাদামী, হালকা হলদের মিশ্রণে সাতটি ভিন্ন বর্ণের স্তর ভেদ করে তিনি পাখীগুলির রূপ রচনা করেছেন। স্তরে স্তরে বড় ও ছোটো পাখীর সমাবেশ। যেমন অদ্ভুত

সৃষ্টিশক্তি তেমনি স্তর বিন্যাসের কৌশল। কোনও ছায়াবাদের প্রভাব নেই, সব স্পষ্ট। সাধারণ পাখীর ছবি, কিন্তু কমপোজিশনের গুণে ও বর্ণ সমাবেশের নৈপুণ্যে অসাধারণত্বের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

আকাশচারী ও অরণ্যবাসী এই পক্ষীকুল যেন তাঁর কাছে কোন এক অজানা রূপলোকের বার্ত্তা বহন করে নিয়ে আসত। পাখী আঁকতে বসে তিনি পাখীর রূপ ও রূপক দুই-ই করেছেন রচনা। সাধারণ একটি চড়াই পাখী বা একটি কাদাখোঁচার রূপ যা তিনি দিয়েছেন, তা প্রকৃত রসবস্তু হয়ে উঠেছে।

কালো কাক—সে তো অতি পরিচিত প্রতিদিনকার দেখা পাখী। কিন্তু অদ্ভুত এক জটিল ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে সে যে কত অর্থপূর্ণ, কত রহস্যময় হয়েছে তা বর্ণনাতীত। অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে রঙেতে একটি কালো কাক (ভারত কলাভবন, বারাণসী) গাছের ডালে বসে নিজের লেজ ঠোক্‌রাচ্ছে। কাকটির দেহ ঢালাও কালো রঙের পোঁচে আঁকা। তবে রঙের স্তরভেদে পাখীর শরীরের ডৌল ও গড়ন ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। জোয়ালো ধরনের মোটা তুলির কয়েকটি টানে পালকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গাছের ডালটি বাদামী রঙের। অধিকাংশ পাতা কালো রঙের। ফাঁকে ফাঁকে বাদামী রঙের টাচ্‌। ছবির ক্ষেত্রপট সবুজ ও ধূসর রঙের মিশ্রণে রচিত। চিত্রপটের উপরিভাগে ডান দিকে লম্বালম্বি ভাবে মোটা তুলির টানে শিল্পীর নামাঙ্কিত। সামান্য একটি কাকের ছবি, কিন্তু তার দেহভঙ্গী ও বর্ণ রঞ্জনের অসাধারণত্বে তা একটি উচ্চ পর্য্যায়ের শিল্প-নিদর্শনে হয়েছে উন্নীত।

প্যাস্টেলে অঙ্কিত লক্কার ঘুঘু বসে আছে পাহাড়ে। নিবিড় ভাবময়। পাখীটি ঘুমন্ত, কি চিন্তামগ্ন বোঝা যায় না। কালো প্রেক্ষাপটে সাদার আমেজে একটি পাখী, তার নীচে হলদে ও লালের বর্ণ প্রবাহে ঝোপের ছবি। তাতে রূপ-রঙের বৈপরীত্য স্রোতের মধ্যে স্বচ্ছন্দের একতান বা harmony সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার!

সজারু এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। তাও অতীব সূক্ষ্ম তুলির কয়েকটিমাত্র আঁচড়ে। কিন্তু জীবটি অদ্ভুতভাবে হয়েছে জীবন্ত রূপের। খোলা মুক্ত দৃশ্যপটখানিও অত্যন্ত মনোরম। প্রেক্ষাপটও বিশেষ উপযুক্ত পরিবেশ এনে দিয়েছে।

মরুভূমিতে মৃগরূপ অঙ্কনে অপূর্ব space বা ক্ষেত্রভূমির প্রতিফলন হয়েছে। মৃগটি ছুটে চলেছে অতি দ্রুতগতিতে।

অবনীন্দ্রনাথ বাজপাখী এঁকেছেন কয়েকটি। কিন্তু মুঘলযুগের প্রসিদ্ধ চিত্রকলায় যে বাজপাখীর বিশ্ববিশ্রুত রূপকল্পনা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি অঙ্কন করেন নি।

অর্থাৎ ধরে ধরে নানা রঙ দিয়ে প্রতিটি পালকের সূক্ষ্ম রূপ ফুটিয়ে তোলেন নি। তবে সমগ্ররূপে ও পাখীর শ্যেনদৃষ্টিতে অভূতপূর্ব্ব কৌশল হয়েছে পরিস্ফুট। রাতের বাজপাখীর রূপ ভয়ালও বটে, আবার স্বপ্নের জালে ঘেরা। কি গভীর চিন্তার ছাপ! কেবলমাত্র সাদা-কালোর খেলাতেই সেই কুহকজাল সৃষ্টি হয়েছে।

রাতের শকুনির রূপও অতল রহস্যে ভরা। বর্ণের যাদুকরী খেলাতে পাখীর রূপ—অবাস্তবতার শীর্ষে উঠেছে। কালো প্যাঁচার অস্পষ্ট আবছা দেহাকৃতি অবনীন্দ্রনাথ ধরে দিয়েছেন পটেতে। কিন্তু তার চোখ? তা যেন বলে চলেছে জগতের সমস্ত রহস্য-কথা। সে রহস্য অভাবনীয় এবং অতলান্ত প্রবাহের।

Playmate series-এ আছে নানা রকমের পশুপাখীর চিত্র। প্রতিটি প্রাণীর আকার-আকৃতি বিচিত্র বর্ণময় ও অস্বাভাবিক ভাবগুণান্বিত। প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণজাত পাখীর স্বাভাবিক রূপচ্ছবি নয়। একটা ছায়াবাদী রীতিতে রঙ ধুয়ে ধুয়ে এঁকেছেন। তদুপরি আবার মোটা রঙের পোঁছ দিয়েছেন। কোথাও আবার একটু ঘষাঘষির চিহ্ন। ছবিগুলি সম্ভবতঃ ১৯২৫ সালের রচনা।

এখানে যাকে 'ছায়াবাদ' বলে আখ্যাত করা হোল, অবনীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন "হারানো রূপ আর তার স্মৃতি।" অর্থাৎ বিগতকালে কোন এক দিন-ক্ষণে হয়ত দেখেছিলেন, কিন্তু তাকে হুবহু রূপে মনে ধরে রেখে আঁকেন নি। এঁকেছেন তার স্মৃতি-ছায়া মাত্র। এই ধরনের ছবি আঁকার মূলে যে ভাবটি ক্রিয়াশীল ছিল, তা তাঁর নিজের কথাতেই সুস্পষ্টভাবে হয়েছে ব্যাখ্যাত—

"গত তিন মাস ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ছবিতে এই রূপ-অরূপের ঠিক যোগাযোগটা কি ভাবের তা ধরার চেষ্টায় রইলেম। দেখতেম পর্ব্বতের সামনে যখন কুয়াশা তখন অরণ্য নেই, পাহাড়ের ঝরণা নেই, চোখের কাজ ফুরিয়ে গেছে তখন, মনের এবং কানের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। জলের শব্দ শুনছি, পাখীর গান শুনছি আর ভাবছি কত কি, কিন্তু এটা যে পাখী গাইছে ওটা যে ঝরণা ঝরছে তার মনে ধরা রূপ সমস্ত কুয়াশা হবার আগে

থেকেই জানিয়েছে আমাকে। আবার পর্ব্বতের উপরে অমাবস্যায় রাত্রি যে কি ভয়ানক অন্ধকার তা পাহাড়বাসী মাত্রই জানেন, পায়ের তলা থেকে মনের কাছ থেকে পথ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, অরূপ ঘিরে নেয় চারিদিক, দূরত্ব নৈকট্য আর থাকে না, বিষম ভ্রান্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে খুঁজে বেড়ায় চোখ আর মন দুজনেই হারানো রূপ আর তার স্মৃতি।"[১]

অবনীন্দ্রনাথের 'চিত্র-দর্শনের' মূল কথাই ছিল চোখ খুলে জগৎ-সৌন্দর্য্যকে দেখা। ছাত্রকে বলতেন, "Study কর, চোখ দিয়ে ভালো করে দেখ্, ওদের কথা শোন্।"[২]

তিনি নিজেও চোখ খুলে সব দেখেই চিত্রাঙ্কন করতেন। তবে বিশ্ব-প্রকৃতির বাস্তব রূপের রঙ-রেখা, অঙ্গ-অবয়ব সমূহের স্বরূপের সঙ্গে কিছু নিজস্ব ভাব-ভাবনা, কিছু অবাস্তবতা ও প্রত্যক্ষাতীত কিছু জুড়ে দিয়ে রূপভেদের আলো-আঁধারি প্রথায় তাকে শিল্পের সুমিষ্ট রসে নিষিক্ত করে তুলতেন। শিল্পী যা দেখবেন তাই পটে ধরে দেবেন, এমন কথা নয়।

প্রকৃতির নিয়মে, বিধাতার নিয়মে জগতে আলো আছে, রূপ আছে, প্রাণ আছে। তারা তাদের নিজেদের নিয়মে চলছে। তারপর এগিয়ে এলেন মানুষ; আর সে মানুষ হলেন শিল্পী। তিনি এসে বললেন; বললেন অবনীন্দ্রনাথও—

"কেবলই নেবো, কিছু কি দেবো না? দেবো এমন জিনিস, যা নিয়তির নিয়মেরও বাইরের সামগ্রী। তোমার রস, আমার শিল্প। এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্ম্মিতি—এই মালা ধরো।"

এই কথা বলে শিল্পী নিজের অস্তিত্ব, কর্ত্তব্য ও জয় ঘোষণা করে বললেন যে তাঁর সৃষ্টি হোল—"নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতা।"

অতএব অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-কাননের বিহঙ্গকুল ও পশুপ্রাণীর রূপকে বুঝতে হয় নিয়তির নিয়মবিহীন অপরূপের ছায়া সুন্দর স্নিগ্ধ আলোকের কিরণে। সেখানে বিভিন্ন উপমা ও রূপকের মাধ্যমে ধরা দিয়েছে অনুপম ও অপরূপ। বিধাতার সৃষ্টি সংকেতের মধ্যে স্বতন্ত্র একটি সূত্র ভাবার সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি যার দ্বারা 'রূপভেদে'র চরম পরিণতি দেখিয়েছেন পশুপাখীর চিত্র-কল্পনায়। জগতে ছড়ানো আলোর কিরণজালের মধ্যে আরও কত নতুন আলোর ঝলকি দিলেন তিনি ছড়িয়ে। জাগতিক জীবনের নিঃশব্দ,

---

১. অরূপ না রূপ : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. অবনীন্দ্রচরিতম্ : প্রবোধেন্দু ঠাকুর।

নিঃসীম সুর ছন্দের রেশকে ধরে দিয়ে—চিত্রপটের পশুপ্রাণীকে নব জীবনছন্দে করলেন জীবন্ত।

১৯১৫-১৬ সালে তিনি এক সেট্ পশুপ্রাণীর চিত্র অঙ্কন করেন। সেই ছবিগুলি ১৯১৫-১৬ সালের সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। ১৯১৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী 'দি স্টেট্স্‌ম্যান' পত্রিকার রিভিয়ুতে সেই সম্বন্ধে মন্তব্য—

"The little 'Animal Life' in a picture catalogue does not usually evoke curiosity. One has seen dogs couchant and lions rampant *ad Nauseum*. Sj Abanindranath Tagore makes it different. He realises that a creature out of its environment is not a subject for a picture—but for a museum. He gives us in a dozen small studies just sufficient of the natural habitat to make his creatures live. We do not merely see his vulture moon silvered on the pinacle of the temple ; we are on the pinacle with it. Companion to the screen of animal studies there is another of "impressions", beautifully felt and told."

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পশুপাখীর ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ কোনও নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা টেকনিকে কাজ করেন নি। সেখানে দেখা যায় রঙকে ধুয়ে ধুয়ে প্রয়োগ করেছেন বার বার। তদুপরি আবার রঙের ঘন পোঁছ দিয়ে তাকে কখনও উজ্জ্বল, কখনও গহন গভীর ভাব-রসে করেছেন আবিষ্ট। তার ফলে বিহঙ্গমের দেহে ও রূপে একটা অনির্ব্বচনীয়তার প্রবাহ এসেছে। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে পাখীগুলির চোখের দৃষ্টিতে। এই অনন্য বিশিষ্টতা প্যাস্টেল ও জলরঙ—দুই মিডিয়ামের চিত্রেই সমভাবে সুপরিস্ফুট। সুনির্দ্দিষ্ট রেখাঙ্কনের স্থলে কেবল দু'একটি রঙে তুলির মোলায়েম পোঁছে, কখনও সেই রঙকে ধুয়ে ধুয়ে কোমল পেলব রূপের অনেক পশুপ্রাণীর রূপাঙ্কন করেছেন। তার মধ্যে বাঁদর ও ছাগল এবং পার্ব্বত্য ছাগলের চিত্র বিশেষ উল্লেখনীয়।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পর্য্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের পশুপ্রাণীর চিত্র-ভাবনা সুদূর বিগত শৈশব কল্পনার রসগুণে সুদুর্লভ এক অবাস্তব নির্ম্মিতি কৌশল, অসীম সাহস, শক্তি ও তুলি চালনা ও বর্ণলেপের অবাধ গতিছন্দের প্রকাশ পটুত্বে অভূতপূর্ব্ব চিরায়ত একটি রূপ রসের জগত রচনা করেছে।

কবিকঙ্কণ ও কৃষ্ণমঙ্গল চিত্র সিরিজে নানা আখ্যান প্রসঙ্গে বহুতর ও

বিভিন্ন ধাতের পশুপ্রাণীর অবতারণা অনিবার্য্য হয়েছিল। কৃষ্ণমঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিনাশপ্রাপ্ত পশু দেহধারী অসুরাদির রূপচিত্র পুরোপুরি নবতর এক ভাবকল্পনা ও আঙ্গিক টেক্‌নিকের সৃষ্টি। সেই পশুপাখী অর্থাৎ অঘাসুর, বকাসুর ও অন্যান্য পশুপ্রাণীর মূর্ত্তিতে অদ্ভুত জোরালো ও জীবন্ত ভাব দেখা যায়। গতিছন্দের প্রকাশ হয়েছে চূড়ান্ত রূপে। তুলির টান অতি বলিষ্ঠ, কিন্তু এত সাবলীল ও ছন্দোময় যে চিত্রকলার ক্ষেত্রে তা নতুনতর এক ভাব প্রবাহ দিয়েছে এনে। এই চিত্রগুচ্ছে পশুপাখীর দেহাবয়ব গঠনে অনেক সময় দুটি রঙের টাচে রেখাঙ্কন হয়েছে। তার ফলে ডৌল ও পেশীর গড়ন দেখা যাচ্ছে অতি স্বাভাবিক ভাবে। পশুগুলি যে শক্তিমান তাও হয়েছে পরিস্ফুট।

বাংলার প্রাচীন জড়ানো পটের কৃষ্ণ-কাহিনীতে যে পশু ও অসুরাদির চিত্র-কল্পনা দেখা যায়, এখানে ততখানি আদিম রীতিসূচক সারল্য নেই। গল্পাংশ বর্ণনায় সামান্য সাদৃশ্য দেখা গেলেও অঙ্গবিন্যাসে ও বস্তু সমাবেশে মার্জিত ভাবের প্রকাশ বেশী। Force বা ওজঃগুণ অধিকতর প্রকটিত। চিত্রপটের সর্ব্বাঙ্গ জুড়ে শিক্ষিত পটুত্ব ও দীর্ঘ সাধনার ছাপ।

কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলের চিত্র রচনায় হাত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর তুলিকাকে একেবারে লাগামহীন করে ছেড়ে দিয়েছিলেন পটের বুকে। সৃষ্টি হয়ে গেল কত জানা-অজানা পশুপ্রাণীর বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্রিত অদ্ভুত ও অনাস্বাদিত রূপাবলী। ছোট ইঁদুরটি থেকে শুরু করে বাঁদর, শৃগাল, শূকর, চিতা বাঘ, সিংহ, মহিষ, ভালুক, গণ্ডার ও হাতী কিছুই বাদ যায়নি।

ব্যাধ কালকেতুর আখ্যান। ব্যাধ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাণীজগত সেখানে শিল্পীর চিন্তা-ভাবনা, রঙ তুলি সব কিছুকে সমাচ্ছন্ন করে অভিনব এক পশুশালা রচনাতে নিবিষ্ট করে রেখেছিল কিছুকাল। সময়টি ১৯৩৮ সাল।

জলরঙ এর মাধ্যমে কি এক অভাবিত বর্ণ সমারোহে তিনি এই প্রাণী-জগতকে বাস্তবায়িত করেছেন, যার সঙ্গে একাল সেকাল, এদেশ বিদেশ কোনও স্থানকালের শিল্পীর রচনা ও ভাবনার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আদিশিক্ষা ও মৌল প্রেরণায় কোথাও কারোর সঙ্গে ক্ষীণ যোগসূত্র থাকলেও সৃষ্টি কর্ম্মে, নির্ম্মিত কৌশলে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যান প্রসঙ্গে রূপায়িত পশুপ্রাণী বহুলাংশে তাদের স্বাভাবিক রূপ ও চরিত্রানুগ নয়।

বনের পশুকে তিনি বনেও রাখেন নি, ঘরেরও করেন নি। অরণ্যচারী জন্তু-জানোয়ার, অরণ্য পরিমণ্ডলের বাইরে সামান্য ধরনের ইঙ্গিতময়

পাহাড়, জলাভূমি, মাঠ-ঘাট, প্রান্তর ও বিরল বৃক্ষপত্র বনের প্রেক্ষাপটে শিল্পীর কল্পনার রসে সঞ্জীবিত, কখনও মৃদু বাস্তবতার স্পর্শন সিক্ত, কখনও আবার পুরোমাত্রায় বাস্তবরিক্ত রূপে হয়েছে চিত্রায়িত।

বার্দ্ধক্য প্রভাবিত শিল্পীর মন যেন তখন দ্বিতীয় শৈশব কল্পনায় সমাচ্ছন্ন, তাঁর হাতের তুলি অবাধগতিতে সতত দ্রুত সঞ্চরমান। স্বাভাবিকভাবে ও মার্জিতরূপে রেখা টেনে, রঙের মোহিনী মায়াজাল বিস্তার করে কিছু করার চেষ্টা ছিল না তাঁর। যত্রতত্র যেমন খুশী রূপ রচনা করেছেন, আর প্রাণোচ্ছলতায় আপ্লুত রঙের খেলা খেলেছেন তিনি। পশুপ্রাণীর দেহরূপ ও গাত্রবর্ণকে তিনি মোটামুটি আদলে রেখে, নির্দিষ্ট রূপাকৃতির বন্ধনকে ছিন্ন করেছেন বারে বারে। ছবি দেখলে বুঝতে কষ্ট হবে না কোন জন্তুটি, কোথায় রয়েছে, কোথায় চলেছে, কি কাজে ব্যাপৃত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হবে এ কোন অজানা জগতের জীবজন্তু। 'চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি'—এমন ভাব।

সিংহ এঁকেছেন কয়েকটি। তাদের কেশর সম্পূর্ণ ছন্দোবদ্ধ ও আলঙ্কারিক রীতির। স্থূলরেখার টানে পাহাড় এঁকে তার মধ্যে ছুটিয়ে দিয়েছেন কুকুর, শৃগাল এবং আরও কত কি! চিতা বাঘ, সে যে কি বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় চলেছে তা বর্ণনাতীত। অথচ তার রূপ নির্ম্মিতিতে কোন বিশেষ চেষ্টা বা স্বাভাবিকতা সৃষ্টির চেষ্টা নেই। হাতী—তার ফর্ম বা নির্ভেজাল আকার আকৃতির প্রশ্ন নেই। আছে দেহভঙ্গীর অপূর্ব্বতা ও গজরাজ-সুলভ মহিমার ব্যঞ্জনা। এইভাবে প্রতিটি চিত্রে আলোছায়া পাত করে, রেখার সৌকুমার্য্য সাধন করে মনোহারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা না থাকলেও শিশু সুলভ তুলির টানটোন, জোরালো রঙের পোঁছ ও বর্ণ মিশ্রণের ধারা, ফর্ম গঠনের স্বতঃস্ফূর্ত্ততায় তা অপরিমেয়ভাবে হয়েছে আকর্ষণীয়।

অবনীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে এই যে পশুপ্রাণীর রূপরাজ্য গড়েছিলেন, তা পর্য্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্বীকার করতে হবে যে তাঁর শিল্পচিন্তার সুদীর্ঘ খরস্রোত, রূপ-বুদ্ধির তীব্র প্রখরতা, বর্ণবৈচিত্র্য আনয়নের অসীম ক্ষমতা, অতুল প্রজ্ঞা দৃষ্টি ও তুলি চালনার অবাধ ছন্দোগতি অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককালে অনাবিল মুক্তধারায় প্রবাহিত হয়ে তাঁর বার্দ্ধক্যের পূর্ণতার দিনে, দ্বিতীয় শৈশবকালে, আবার নতুন এক ক্রীড়া চঞ্চলতায় উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এই চিত্র নিচয়ে যতই ছেলেমোভাবের প্রকাশ হোক না কেন, রচনার বিশেষ ভঙ্গী ও সৌকর্য্য যে শিক্ষিত পটুত্ব ও দীর্ঘ সাধনার সুফলশ্রুতি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম; বরং সহজে উপলব্ধির বিষয়।

॥ ১১ ॥

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আর্টের তিনটে স্তর তিনটে মহল আছে— একতলা, দোতলা, তেতলা। একতলার মহলে থাকে দাস-দাসী, তারা সব জিনিস তৈরী করে। তারা সার্ভিস দেয়, ভালো রান্না করে দেয়, ভালো আসবাব তৈরী করে দেয়। তারা হচ্ছে সার্ভার, ক্রাফ্‌ট্‌সম্যান। তারা একতলা থেকে সব কিছু করে দেয়। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে ঝাড় লণ্ঠন, ভালো পর্দা, কিংখাবের গদী, চারদিকে সব কিছু ভালো ভালো জিনিস, যা তৈরী হয়ে আসে একতলা থেকে, দোতলায় বৈঠকখানায় সে-সব সাজানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, আসেন সব বড়ো বড়ো রসিক পণ্ডিত। সেখানে সব নটীর নাচ, ওস্তাদের কালোয়াতি গান, রসের ছড়াছড়ি—শিল্প দেবতার সেই হ'ল খাস দরবার। তেতলা হচ্ছে অন্দর মহল, মানে অন্তর মহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিল্পকে পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছে মতো শিশু শিল্পকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে।"[১]

জীবন-রবি মধ্যাহ্ন গগন পরিক্রমা করে যখন সন্ধ্যা-সায়াহ্নের দিকে এগিয়ে চলেছিল, অবনীন্দ্রনাথ তখন ব্যাপৃত হয়েছিলেন, নিমগ্ন হয়েছিলেন কাঠ কুটা দিয়ে মূর্তি পুতুল গড়ার কাজে। তিনি সেই পুতুল গড়াকে বলেছেন শিল্পের তেতলার অর্থাৎ অন্দর মহলের ব্যাপার। জীর্ণ, ছিন্ন ও ভগ্ন বস্তুর সমাবেশে তিনি যে অভিরূপ, অপরূপ সৃষ্টি করে চলেছিলেন সে সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত এই যে, তিনি আজীবন যে যত্ন নিয়ে প্রাণ ঢেলে ছবির পর ছবি এঁকেছেন, ঠিক তদনুরূপ ও সমতুল্য যত্ন সহকারেই তিনি পুতুল গড়েছেন, তাদের সাজিয়েছেন ও সাবধানে সযত্নে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"আমার এই যে এখনকার পুতুল গড়া, এও হচ্ছে ওই অন্দর মহলেরই ব্যাপার। আমি তাই এক এক সময় ভাবি, আগে যে যত্ন নিয়ে ছবি আঁকতুম এখন আমি সেই যত্ন নিয়েই পুতুল গড়ছি, সাজাচ্ছি, তাকে বসাচ্ছি কত সাবধানে।"[২]

জীবন সায়াহ্নে তিনি এই কাজ করেছেন অবিরত। গড়েছেন কত শত বিচিত্র রূপ; কিন্তু মন তাঁর নিঃসংশয় ছিল না। তার মধ্যে আবার একদিন

১, ২. ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৪-১৫

তাঁর পুরনো চাকর এসে বললো, বাবু, এসব ফেলে দিন। দিনরাত কাঠকুটো নিয়ে কি যে করেন, সবাই বলে আপনার ভীমরতি হয়েছে। তাকে তিনি এই বলে বোঝালেন যে ভীমরতি নয়, বরং বাহাত্তুরে বলা যায়। কারণ দু'দিন বাদে তো তাই হবেন। তাছাড়া ছেলেবেলায় মায়ের কোলে এসে তো এই ইট, কাঠ, ঢেলা নিয়েই খেলা করেছেন। আবার সেই মায়ের কোলে ফিরে যাবার সময় এসেছে, তাই সে পুরনো ইট-কাঠ, ঢেলা নিয়ে পুনরায় খেলা শুরু করেছেন।

অতঃপর তিনি একদিন প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসুকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সেই কাজ তিনি ঠিক করছেন কিনা। তদুত্তরে শিষ্য বললেন, "আপনি এখন দূরবীনের উল্টো দিক দিয়ে পৃথিবী দেখছেন।"

উল্টো দিক দিয়ে দেখার কথা শিল্পাচার্য্যই একদিন শিষ্যকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দূরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে দেখলে মজার সব খুদে খুদে রূপ দেখা যায়। সে সব তাঁর ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা। অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় আর এক কাণ্ড করতেন। হাতের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচু করে, পা-দুটোকে উপরে তুলে তার ফাঁক দিয়ে গাছপালা সব দেখতেন আর ভারী মজা লাগতো তাঁর।

সেই উল্টো করে দেখাকে তিনি একটা 'শখের' মধ্যে ধরতেন।

যাবতীয় শিল্পচর্য্যাকেই তিনি 'শখের' কারবার বলে অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্পসৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে গাইতে, নাটক লিখতে—যাই বলো।"[১]

'শখ' সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মত ছিল এই যে তার মধ্যে ঠিক বা ভুল বলে কিছু নেই। শখ কোন বাঁধা নিয়ম-কানুনে চলে না। শখ হোল ভেতরের জিনিস। তা আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে। নিজের পথ করে নেয়। তার জন্য কাউকে ভাবতে হয় না।

শেষ বয়সের সেই ভাঙাচোরা জিনিসপত্র দিয়ে কিছু তৈরী করা ও গড়ে তোলার কাজও তাঁর একান্ত শখের জিনিস। কোন গভীর তত্ত্বাদর্শ বা বিশেষ কোন উচ্চ ভাবানুভূতি সঞ্জাত রূপ সৃষ্টি এ নয়। সেই অভিনব সৃষ্টি-রাজির তিনি নাম দিয়েছিলেন, "কুটুম-কাটাম"।

১. ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১

তাঁর শিল্পী-জীবনের শেষ পর্য্যায়ে কুটুম-কাটাম তৈরীর পালাটা ক্রমশঃই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। তা কিন্তু শেষ বয়সের একটা খেয়ালমাত্র ছিল না। অল্প বয়স থেকেই কিছু না কিছু খুঁজে বেড়ানো ছিল তাঁর সাধারণ, স্বাভাবিক ও নিয়মিত অভ্যাস। বেশী খুঁজতেন তিনি পাথর। বলতেন, "হীরে খুঁজছি।" ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু। কলকাতার বাইরে গিয়েও সে খোঁজার শেষ ছিল না। পথ চলার সময় পায়ের কাছে যা দেখতেন তা অতি যত্নে কুড়িয়ে নিতেন। তাঁর চোখে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসও অপরূপ হয়ে ফুটে উঠতো।

ছেলেবেলা থেকে তাঁর আর একটি অভ্যাস ছিল সব জিনিসকে ভেঙ্গে তার ভিতরে কি আছে তা দেখার চেষ্টা। অনেক খেলনা পুতুল ভেঙ্গে-ভেঙ্গে দেখেছেন তখন। বাল্যকালের সহজাত সেই ভাব ও প্রবৃত্তি অর্থাৎ জিনিসের অভ্যন্তরে ও অন্তরে কি আছে তা জানার অদম্য আগ্রহ ও চেষ্টা শিল্পের ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর সৃষ্টি সমূহের মধ্যে আন্তর বৈভব ও রসসঞ্চারে সহায়তা করেছিল নিঃসন্দেহে।

তাঁর কুটুম-কাটামের উপাদান বহরও নেহাৎ কম নয়। সেখানে দেখা যায় কাঠের টুকরো, বাঁশের গাঁট, গাছের শিকড়, নারকেলের মালা, সুপারী গাছের খোলা, গাছের মরা ডালপালা, ভাঙ্গা খণ্ড পাথর, কাঁচের ফালি, খড় কুটা, ছেঁড়া কাপড়, দড়ি, সুতা, সেলাই-এর সুতার রীল এবং আরও কত পরিত্যক্ত ও কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস।

একবার তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে পড়ে একখানি পাথরের রেকাব ভেঙ্গেছিল। তা দিয়েই শিল্পীর হাতে নতুন জিনিস তৈরী হয়েছিল। শেষ পর্য্যায়ে কিছুকাল তাঁর ছবি আঁকার কাজ বন্ধ ছিল। তখন লেখাজোখার কাজ চলতো মাঝে মাঝে। আর সকাল-বিকেল বাগানে ঘুরে বেড়াতেন লাঠি নিয়ে। খুঁটি-নাটি তুচ্ছ জিনিস যা নজরে পড়তো, তাই কুড়িয়ে এনে রেখে দিতেন কুটুম-কাটামের রূপ-ভাণ্ডারকে বড় করে তোলার জন্য। সময়মত সেই তুচ্ছ জিনিসকে রূপান্তরিত করতেন অদ্ভুত বিচিত্র সব মূর্ত্তি ও পুতুলে।

শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে তিনি ছিলেন আড়ম্বর প্রিয়তার বিরোধী। উপাদান ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে কোন জাঁকজমক ও সমারোহ তিনি পছন্দ করতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "Art-এর একটা লক্ষণ

আড়ম্বর শূন্যতা—simplicity। অনাবশ্যক রঙ, তুলি, কলকারখানা, দোয়াত কলম, বাজনাবাদ্যি সে মোটেই সয় না। এক তুলি, এক কাগজ, একটু জল, একটি কাজললতা—এই আয়োজন করেই পূবের বড় বড় চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন।"

কুটুম-কাটাম তৈরীর জন্য তাঁর নানারকম যন্ত্রপাতি ছিল। তিনি ছেনি, বাটালি প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। যন্ত্র চালাতেন, কিন্তু তার নিয়ম ছিল বাঁধা। সর্ব্বদা সব জিনিসকে কেটে কুঁদে রূপান্তরিত করতেন না। কুড়িয়ে পাওয়া মরা ডাল, ভাঙ্গাচোরা জিনিসের মধ্যে তিনি স্বাভাবিকভাবেই পেতেন নানা অভিনব সব রূপের আভাস। কোন গাছের গুঁড়িতে দেখতেন কুকুরের মুখ। একটা বাঁশের গাঁটে হয়ত ফুটে উঠতো পাখীর ঠোঁট। তার সঙ্গে আর সামান্য কিছু জুড়ে দিলেই হয়ে যেত পুরো একটি পশু বা পাখী।

কুটুম-কাটামের আসরে যে সকল অদ্ভুত মূর্ত্তি, পশু-পাখী ও জন্তু-জানোয়ারকে তিনি রূপায়িত করেছেন, তাদের তিনি নানারকম বিচিত্র সাজসজ্জায় মণ্ডিত করে আরও জীবন্ত এবং আকর্ষণীয় করে তুলতেন। তবে সেই সাজানোর কাজ তিনি যদৃচ্ছা ও যেমন তেমন করে করেন নি। প্রকৃতির বুকে তারা যে রূপে ঘুরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়, তেমনি করেই সাজাতেন। মহান্ শিল্পীর দৃষ্টিতে এমন সব খুঁটিনাটি রূপ ধরা পড়তো, যা সাধারণের চোখে কখনই পড়ে না। তার ফলে কুটুম-কাটাম একদিকে যেমন স্বাভাবিক, অন্যদিকে তেমনি আবার রহস্যময়, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। এই জিনিস চির-শিশু স্বভাবের সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা সঞ্জাতই কেবল নয়, এর মধ্যে আছে স্বতোৎসারিত একটা নির্ম্মল আনন্দানুভূতি ও রসোল্লাস। ইহাতে বাহ্য সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য নেই, কিন্তু আছে এক অনন্ত বিচিত্রতা।

এই অভিনব শিল্প যেন প্রবীণ শিল্পীর রঙ-রূপের রাজ্যে বহু বিচরণের পরে অসীম ক্লান্তির অবসান মানসে জরাগ্রস্ত মনের অবাধ মুক্তির নবীন সাধনা। তাঁর অন্তরচারী কল্পনা লীলা সেই সময় রঙ-রেখায় পল্লবিত না হয়ে জীবনে জগতে স্থানচ্যুত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপাদান সংগ্রহ করে, তার মধ্যেই আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল। আদর্শ ও বাস্তবের সূক্ষ্ম ভেদাভেদ নেই সেখানে। কোন অত্যুচ্চভাব ও নিবিড় কল্পনার স্পর্শ লাগেনি কোথাও। আবার বাস্তবের রূঢ়তার কোনও তীব্র প্রভাবও পড়েনি। এ এক স্বতন্ত্র বিশ্ব-চেতনার অবারিত পথে মুক্তির সন্ধানে যাত্রা। এই অদ্ভুত সৃষ্টি নিছক রূপ-মোহ সম্ভূত নয়। এ হোল অতিমাত্রায় রূপাবগাহনের পরে এক অনির্দ্দেশ্য অপরূপ ও অভিরূপের পথে পদচারণায় ইঙ্গিতসূচক।

কোন কোনও নিদর্শনের মধ্যে শিল্পীর বৃদ্ধ মনের উদ্ভট কল্পনার বিকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু রসের বিচারে তা শিল্পহুমিত। আবার কোথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্লান্ত করুণ ভাবানুভূতি। মনে হয় তা বিশেষ একটি মুহূর্ত্ত ও মন-মেজাজের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। সেই অভাবিত অপূর্ব্ব ভাবটি বাস্তবরূপ পেয়েছে শিল্পীর জীবনে দ্বিতীয় শৈশবলীলার নিগূঢ় মৌলিক প্রেরণায়। শিশু ও বৃদ্ধের একত্রে খেলা চলছিল এই শিল্পায়ণ পর্ব্বে। সৃষ্টিসমূহ বিষয়-গৌরব-রিক্ত এবং তত্ত্ববর্জিতও বটে, কিন্তু ওরা নিজ ভাব গরিমায় ও স্বমহিমায় দর্শক ও রসিকের অন্তরকে আন্দোলিত করে। আনন্দ কৌতূহলের রসে করে নিবিক্ত।

কি না স্থান পেয়েছে সেই অভিনব রূপের রাজ্যে! সারস পাখীর রূপটি এমন হোল ঠিক যেমনটি জলের ধারে মাছের জন্য তাক্ করে বসে থাকে এক পায়ে ভর করে। উটের মূর্ত্তিটি কেমন হোল? সাধারণ উট নয় কিন্তু। সে 'হজ্' থেকে ফিরে এসেছে। কি দিয়ে শিল্পী তাকে তৈরী করলেন? কাঠের টুকরো, গাছের গুঁড়ি ও দড়িদড়া দিয়ে। আরোহী রয়েছে উটের পিঠে। তার দু'পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন মালপত্রের বোঝা। কারণ লোকটি তো 'হজ' করে সবে ফিরেছে। পাখীর রূপ বহু বিচিত্র। গাছের বাকল দিয়ে যে ঈগল হোল তা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আবার বর্ণনাতীত অদ্ভুত। তাকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে শুকনো গাছের ডালেতে। ভাঙ্গা পাথর দিয়ে গড়েছিলেন প্রজাপতি ও চাঁদের মেয়ে। কাঠ দিয়ে করেছিলেন ঝিঁঝি পোকা, ফড়িং, মাছরাঙা, অস্ট্রিচ্ এবং আরও কত কি! ফলের আঁঠি ও খোসা, তার সঙ্গে কাঠকুটা জুড়ে দিলেন। রূপ পেল বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা এবং রামায়ণের দৃশ্য পর্য্যন্ত। রাম ও কৌশল্যা রূপায়িত হলেন কাঠে, রাম জুতা পরলেন আমের আঁঠির। বনবাস থেকে রাম ফিরে আসবেন; অপেক্ষায় কাতর হয়ে বসে আছেন মা কৌশল্যা।

শুকনো ডালপালার ডাইনী বুড়ীও অতি অপূর্ব্ব! একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপরে আর একটি বসিয়ে হোল অদ্ভুত প্যাঁচা; দু'রকম ডাল দিয়ে যোদ্ধা, তার হাতের অস্ত্র তৈরী হয়েছে আরও সরু ডাল দিয়ে। চারপাই-এর উপরে যে মানুষটি শুয়ে আছে তার দেহ তৈরী হয়েছে গাছের ডাল ও তালশাঁসের শুকনো মাথাতে। অনেক মাঝির চেহারা শুকনো সরু কাঠ ও ডালের। নর্ত্তকের চেহারা-চরিত্র প্রমূর্ত্ত করেছেন জীবন্তভাবে মাটির ঢেলার উপরে দাঁড় করিয়ে। শরীর আর গাছের ডালের। গায়ে-গতরে কাপড় জড়ানো।

মাথায় পটি বাঁধা। সারেঙ্গিবাদকও দাঁড়িয়ে আছে মৃত্তিকা পীঠে। গাছের ডাল দিয়ে হয়েছে তার দেহ রচনা, দাড়ি তার গাছের আঁশের। খয়েরী রঙের পুরোনো শাড়ীর পাড় ও ছিট্ কাপড়ের জামা পোশাক তার। দারুময় সারেঙ্গিটিকে সে বাজিয়েই চলেছে। অপূর্ব্ব ভাব ও ভঙ্গিমা! জড়ানো, দুমড়ানো গাছের ডালের উপাদানে গঠিত গাধা ও তার আরোহী অতি চমৎকার। আরও কত বিচিত্র পাখীর রূপ দেখা যায় কুটুম-কাটামের আবাসে। খেলনা ঘোড়া দুটি। একটি শুকনো সরু ডালের। আর একটি গাছের গুঁড়ি ও সরু ডালপালার। একটির পায়েতে সেলাই-এর সুতার রীল বাঁধা।

এই সকল কারুশিল্প রচনায় অনুষঙ্গ যোজনার দিকে শিল্পীর বিশেষ একটা প্রবণতা ছিল মনে হয়। সেই প্রবণতা তাঁর সৃষ্টিসমূহকে শিল্প-গুণান্বিত ও রসাবিষ্ট করতে সহায়তা করেছে অধিক পরিমাণে।

যেমন—কুকুর বানালেন। কিন্তু তাকে শিকল পরাতে ভুলে যাননি। কারণ ছাড়া পেলে তো দৌড়ে পালাবে সুনিশ্চিত। তাঁর চোখে গাছের বাকলের স্বাভাবিক স্তর সমূহের মধ্যে প্রতিভাত হোল বালুকাময় মরুভূমির তরঙ্গায়িত রূপচ্ছবি। সেই ঢেউ খেলানো স্বাভাবিক বাকলের উপরে গাছের ডালে তৈরী হরিণ দিলেন ছুটিয়ে। সৃষ্টি হোল অপূর্ব্ব দৃশ্যপট। গাছের গুঁড়ি ও ডাল দ্বারা নির্ম্মিত কয়েকটি জিনিসের ভাবাভিব্যক্তি বাস্তবিকই অতি স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। গতিময়তা ও ছন্দশীলতায় তা বস্তুতঃই প্রাণবন্ত। তাব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কাঠের টুকরো, গাছের ডাল ও বাকল এবং লতা দিয়ে রচিত এ. আর. পি. অফিসারের চলমান রূপাকৃতি। গিরগিটির ছুটন্ত রূপ, হাঁটার প্রতিযোগিতায় রত দীর্ঘাকার মানুষ, লম্ফমান খরগোশ প্রভৃতির গতিভঙ্গী উচ্চ পর্য্যায়ের ভাস্কর্য্য-গুণান্বিত। যেমন এদের অভিনব রূপ ও আকৃতি, তেমনি চলনভঙ্গী ও ছন্দবৈভব।

কুটুম-কাটামের রূপদানে শিল্পী তাঁর আশেপাশে ছড়ানো প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পশুপ্রাণীকে যেমন স্থান দিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন; তেমনি দেখা যায় তৎকালীন সমাজ সচেতনতার আভাস-ইঙ্গিত। সমকালীন চলমান জীবনের ছবি পাওয়া যায় এ. আর. পি অফিসারের মূর্ত্তিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালীন একটি অভিজ্ঞতার উদ্ভট ও অদ্ভুত রূপায়ণ।

এই জাতীয় কিছু নিদর্শনে স্থানে স্থানে অসম ছন্দ বিন্যাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও, কতিপয় রচনায় আবার প্রভূত ছান্দস প্রণালী হয়েছে পরিস্ফুট। কতকগুলি জিনিসে জীবন্তভাব এসে গিয়েছে অতি চমৎকার রূপে। শিল্পীর

হাতে পড়ে শুকনো মাধবীলতা একদিন তার মাধুর্য্যের অন্তরাল হতে বের করে দিল অভাবিত এক ভয়ঙ্কর রূপ। তা রূপান্তরিত হোল গোখরো সাপে। সে জীবন্ত হয়ে উঠলো শিল্পীর হাতের যাদুস্পর্শে। মনে হয় বাস্তবিকই একটি সাপ ফণা তুলে আছে। হঠাৎ দেখলে ভয় পেতে হয়। আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছিল চরকা-বুড়ী। কি দিয়ে শিল্পী তাকে রূপদান করেছিলেন? কাঠ-কুটা তো নিশ্চয়ই। তার সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছিল নারকেলের মালা। চাঁদের দেশের চরকা-বুড়ী অবশেষে নেমে এলেন অবনীন্দ্রনাথের কুটুম-কাটামের রাজ্যে।

শিশু-বৃদ্ধ শিল্পী ভাবলেন, তাঁর কুটুম-কাটামের দেশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে না! নিয়ে এলেন তিনি শিয়াল পণ্ডিতকে। পণ্ডিত মশায়ের চেহারা গড়ে তুললেন তিনি কাঠ-কুটা দিয়ে। খালি গায়ে থাকলে তার ইজ্জৎ নষ্ট হবে যে! শেষ পর্য্যন্ত সুপারীর খোলায় তৈরী হোল তার কোট।

এই কুটুম-কাটাম তৈরীর ব্যাপারে শিল্পীর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ ও বাঁধা নিয়ম ছিল। ডালপালা, কাঠ, পাথর, শিকড় যাই হোক না কেন, তাকে বেশী কেটে কুঁদে কিছু করা হোত না। যেখানে যেটুকু বাড়তি ও অতিরিক্ত তাকে কেটে বাদ দিয়ে স্বাভাবিক যা থাকবে তা থেকেই নতুন রূপ বের করতে হবে। পাথরের টুকরোতেও বেশী মাত্রায় ছেনি চালাতেন না। অল্প কিছু কেটে কুঁদে যে রূপটি পাওয়া যেত, তাকেই মনে করতেন সঠিক রূপ।

আর একটি ব্যাপার হোত। তিনি হয়ত একটা কিছু তৈরী করতে বসেছেন, কিন্তু সমস্ত খুঁটিনাটির সমাবেশ করার মত উপাদান তাঁর সংগ্রহে নেই। তখন তিনি সেটিকে অসম্পূর্ণ রেখে আবার খুঁজতে বেরোতেন তাকে সম্পূর্ণ করার উপযুক্ত জিনিসকে। তখুনি হয়ত তা পাওয়া যেত না, অথবা দেরি হয়ে যেত। তাহলেও আপত্তি ছিল না। অপেক্ষায় থাকতেন দিনের পর দিন। অবশেষে তা পেলে তবে কাজটি শেষ করতেন। না হয়তো সেই ভাবে অসম্পূর্ণই তা পড়ে থাকতো।

শেষ বয়সের এই অদ্ভুত সৃষ্টিরাজির প্রতি তাঁর মায়া মমতা ও প্রাণের টান ছিল অসীম। কোন একটি জিনিস এদিক-ওদিক হলে বা দেখতে না পেলে, খুব ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। সে যেন পরম আত্মীয় বিচ্ছেদের ব্যথা-বেদনা! এমন ব্যাকুল হতেন যে মনে হোত যেন কোন প্রিয়জন চলে গিয়েছেন। ওদের নিয়েই চলতো তাঁর আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার লীলালহরী। এই রকম একটি ঘটনার কথা জানা যায় শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ-র একদিনের অভিজ্ঞতা-জনিত বর্ণনাতে।

একদিন তিনি গিয়েছেন গুরু অবনীন্দ্র সকাশে। গিয়ে দেখেন শিল্পাচার্য্য সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। তখনকার কথা বলতে গিয়ে শ্রীযুক্তা চন্দ বলেছেন—

"দৌড়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালুম। অনেক সিঁড়ি পর্য্যন্ত উঠেছেন। ডান হাতে লাঠি গাছটি, বাঁ হাতে না জ্বালানো সিগারেটটি দু'আঙুলে চেপে অন্য অন্য আঙুলগুলি দিয়ে হাঁটুর লুঙ্গিটা টেনে তুলে ধরে, মুখ নীচু ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে খটমট করে উপরে উঠতে উঠতে বলে চলেছেন,—না এ কখনো চুরি নয়, এ একেবারে ডাকাতি, ডাকাতি করেছে।

"হ'ল কি? ঘাবড়ে গেলাম। কি আর করি, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি উপরে উঠে এলেন। প্রণাম করে উঠতে তিনি বল্লেন—জানো, কাল আমার ওখানে ডাকাতি হয়ে গেছে—একেবারে ডাকাতি—সব লুটে নিয়ে গেছে।...

"চেয়ার একটা এগিয়ে এনে দিলুম। তিনি অত্যন্ত অস্থির মন নিয়েই বসে বল্লেন—কাল সন্ধ্যেবেলাও ঘরে যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠিক আছে। ভৈরবীকে ছোট আলমারীটার উপরে বসিয়ে রেখেছিলুম—সাঁঝের আলো তার মুখটিতে এসে পড়লো। মুখখানি যেন ভৈরবীর হাসিতে ভরে গেল। ......ভৈরবীকে দেখেতো আমার মনটা ভারি খুশি—লক্ষ্মী পেঁচাকেও বল্লুম—তাহলে তুমিও থাকো এইখানে। ওদিকে মুকুট মাথায় সিংহটা ডেকে উঠলো। বল্লে—আমি বুঝি তবে একলাটি এই কোণে প'ড়ে থাকব? বল্লুম—দরকার নেই বাপু, তুমিও এসো এইখানে—বলে সব ক'টিকেই আলমারীর উপরে, এনে বসিয়ে দিলুম।...... মনটা বড় খুশিতে ছিল কাল—রাতে ঘুমটাও ভালো হোল। সকালে আজ একটু অন্ধকার থাকতেই উঠেছি। বারান্দায় এলুম আমার কুটুম-কাটামদের খোঁজ নিতে। দেখি তারা কেউ নেই সেখানে। এ্যাঁ। কি হলো—বাদশা, বীরুকে ডাকলুম—বল্লুম তোরা কেউ নিয়েছিস? তারা বল্লে—না। বৌমাদের বলি—তোমরা দেখেছ কি, কে নিল? তারাও বল্লে—না। চাকরবাকরদের ধমক ধামক দিলুম—তারাও বল্লে—তারা কিছু জানে না। বাগানে নেমে গেলুম তাড়াতাড়ি, ছেলেদেরও নিয়ে গেলুম। বল্লুম, খুঁজে দেখ সবাই মিলে, কি জানি যদি কেউ ফেলে দিয়ে থাকে। নিজেও কত খুঁজলুম। কোনো নিশানা পেলুম না তাদের। কি করে পাব, ডাকাতি হয়ে গেছে—লুটে নিয়ে গেছে—একি আর পাব কখনো।...... আহা, তোমাকেও যদি দিতুম, তবে থাকতো। বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

"তিনি চুপ করে থাকার লোক ছিলেন না। সকলকে বলে সারাদিন খুঁজে খুঁজে 'ভৈরবী', পেঁচা ও সিংহের সন্ধান চললো। অনেক খোঁজার পরে তিনতলার চিলে ছাদের ভাঙা কার্নিশের উপর পেলেন সিংহ ও ভৈরবীকে। পেঁচাটিকে পাওয়া গেল নীচে বাগানের এক কোণে ময়লা আবর্জনার মধ্যে। খুব সম্ভব বাঁদরের উপদ্রবে এই রকমটা হয়েছিল।"[১]

আরও একদিন একটি কুটুম হারিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কত যে ব্যস্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীযুক্তা চন্দ-রই লেখনীতে।

তিনি একদিন জোড়াসাঁকোর ৫নং বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, শিল্পগুরু যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "না, ও আর পাওয়া যাবে না। একেবারে গর্ত্তে পালিয়েছে।"

প্রশ্ন হোল—কি খুঁজছেন আপনি? শিল্পী বললেন, "একটা ইঁদুর জ্যান্ত হয়ে আমার হাত থেকে লাফিয়ে কোথায় যে পালাল। ও ঠিক গর্তে গিয়ে ঢুকে বসে আছে। কাল বিকেলে একটা ইঁদুর করলুম, কাঠের, এই এতটুকু, বেড়ে ইঁদুরটি হয়েছিল, কেবল লেজটুকু জুড়ে দেয়া বাকি! ভাবলুম, এটা শেষ করেই আজ উঠব। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না—চৌকিটা বারান্দায় রেলিঙের পাশে টেনে নিয়ে ওই যেটুকু আলো পাচ্ছি তাইতেই কোনো রকমে তারের একটি লেজ যেই না ইঁদুরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটা—মোচড় দিয়েছি—টক্ করে হাত থেকে লেজ সমেত ইঁদুরটি লাফিয়ে পড়ল। কোথায় গেল, এদিকে খুঁজি ওদিকে খুঁজি, বাদশাকে বললুম, আলোটা আনতো একটু খুঁজে দেখি কোথায় পালাল। না, সে কোথাও নেই। রাত্রে ভালো ঘুম হল না,—ভোর হতে না হতেই উঠে পড়লুম, ভাবলুম যদি নীচে বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে। দেখি সেখানে যত পোড়া বিড়ি আর দেশলাই এর কাঠি ছড়ানো; চাকররা খেয়ে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমার ইঁদুরের আর সন্ধান মিলল না। ও জ্যান্ত হয়ে একেবারে গর্ত্তে ঢুকে বসে মজা দেখছে। কী আর করা যাবে।"[২]

কিন্তু সে খোঁজার পালা একদিনেই শেষ হয়নি। তিনদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন বাগানের আনাচে-কানাচেতে। ভাবতেন, যদি মিলে যায়।

কুটুম-কাটামদের জন্য ছিল তাঁর এমনি দরদ ও ব্যাকুলতা! যেমন নাম দিয়েছিলেন, তেমনি তাদের সঙ্গে ব্যবহার। আত্মীয় কুটুম্বের মতই ছিল

---

১. শ্রীযুক্তা রাণী চন্দ-র বিবৃতি অনুসারে।
২. ঘরোয়া (ভূমিকা): অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এদের আদর ও কদর। অতি যত্নে, প্রাণ ঢেলে ও দরদ দিয়ে যেমন গড়তেন, তেমনি আদরে যত্নে কুটুম্বের মতই তাদের রাখতেন। চিত্রাঙ্কনের চেয়ে কম নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল না একাজে। ইঁদুরের ছুটে পালিয়ে যাবার ঘটনাটি দ্বারা উপলব্ধি করা সহজ যে তিনি এই খেলনা-পুতুল গড়ে তাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতেন। তিনি তাদের জীবন্ত মনে করতেন।

অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তু নিয়ে খেলার ছলে এই উদ্ভট ও অদ্ভুত রূপ সৃষ্টির মূলে কিছু চাপা দুঃখ-বেদনার প্রভাব ছিল মনে হয়। এই বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার একটি বিবৃতিতে। শেষ জীবনে এক সময় তিনি চিত্র রচনার কাজ প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। এমন সময় তাঁর জীবনে এল ঘোর দুর্দিন। জোড়াসাঁকোর বাড়ী ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয় বরানগরের 'গুপ্ত নিবাসে'। এর অবশ্যম্ভাবী ফল শিল্পীর মনকে উদাস ও ব্যথাতুর করে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। সেই উদাস বিচ্ছেদ-কাতর মনকে তিনি নিবিষ্ট করেছিলেন কুটুম-কাটামের কারুকলার মধ্যে। অবশ্য জোড়াসাঁকোতেই তিনি এই কাজের প্রথম সূচনা করেছিলেন। অনেক আগে থেকেই তিনি নানা অকেজো জিনিস দিয়ে অদ্ভুত সব খেলনা ও মূর্ত্তি তৈরী করতেন। তারপরে ক্রমে ক্রমে যখন ছবি আঁকার হাতটি ও রঙ-তুলির স্থানটি এসে ছেনি-বাটালি ও কাঠ-কুটা পুরো দখল করে বসলো, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা একদিন জিজ্ঞেস করলেন—

"বাবা, তুমি আর ছবি আঁকোনা কেন?" তদুত্তরে তিনি উদাসভাবে বলেছিলেন—

"মনে আর রঙ ধরেনা তো আঁকবো কী? এখন আমার এই কুটুম-কাটামই ভালো।"

'মনে আর রঙ ধরেনা'—কি বেদনা-মথিত উক্তি! অদ্ভুত ভাবান্তর এসে গেল তাঁর জীবনে। চিরনবীন শিশু-প্রাণ আর এক নতুন স্বপ্নে বিভোর হলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন-বিভোরতা তাঁকে নিষ্ক্রিয় করেনি। তিনি তাঁর ক্রিয়াশীল শিল্পীসত্তাকে আর এক নতুনতর ও অংশতঃ কিছু লঘু চেতনায় উদ্দীপিত করে এই রূপ-বিরূপের মধ্যে করালেন পুনর্বিচরণ। ইহাকে অবনীন্দ্র-মানসের দ্বিতীয় স্বরূপের বিকাশ বলা যায়।

এই দ্বিতীয় স্বরূপ কিন্তু বহু পূর্ব্বেই তাঁর অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। চিত্রাঙ্কনের ফাঁকে ফাঁকে ইতিপূর্ব্বেও তিনি কিছু কিছু কারুকর্ম করতেন বলে জানা যায়। পাথর কেটে কুঁদেও কিছু রূপসৃষ্টির অভ্যাস তাঁর ছিল।

জ্যেষ্ঠা কন্যার কাছে পাথরের ভাঙ্গা চাকি চেয়ে নিয়ে তাতে দাসীর কোলে শিশু নাতির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করেছিলেন অতি যত্ন সহকারে।

একবার কোথায় একটি কষ্টিপাথরের নোড়া পেলেন কুড়িয়ে। ঘটনাটি জোড়াসাঁকোতেই ঘটেছিল। নোড়াটি পেয়ে তিনি খুব উল্লসিত হয়ে বসে গেলেন একটি কচ্ছপ তৈরী করতে। ওটির আকার আয়তন হয়েছিল এক বিঘত আন্দাজ। সেই সৃষ্টি-নিদর্শনটি খুব কৌতুকরসের প্রবাহ এনে দিয়েছিল তখন সকলের মনে। কচ্ছপ তৈরী হচ্ছে। এমন সময় এসে পড়লেন শিল্পগুরুর ছাত্র প্রবোধেন্দু ঠাকুর। তিনি তখন শিলাময় কূর্ম্মটিকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মজা করে ছাত্রকে বললেন—

"দেখেছিস্, খাসা কাটা হয়েঁগেছে রে······কচ্ছপের দাঁড়া, যেন বর্ম্ম এঁটে খাড়া হয়ে উঠেছে। চলতে চাইছে। আমার দেখেছি এবার পুরীর সমুদ্দুরের ধারে যেতে হল।"

এই জাতীয় শিল্পায়ণে তিনি কখনই অতিরিক্ত কাটাছাটা ও পালিশ করা এবং তৈরী জিনিসে চাকচিক্য আনয়নের চেষ্টা করতেন না। অতএব কচ্ছপও গড়ে উঠলো স্বাভাবিক নিয়মে। অল্পস্বল্প ছেনি হাতুড়ি চালিয়ে যে রূপটি বেরোল তার মধ্যে তিনি বোধহয় খানিকটা পুরাবস্তুর আমেজ অনুভব করেছিলেন। তাই আবার শিষ্যকে সকৌতুকে বলে উঠলেন—

"এই গ্যাখনা, এবার কচ্ছপটার পিটে একটা 2000 B. C, কি বলিস্ নরুণ দিয়ে লিখেদি। আর তারপরে পুরীতে গিয়ে এই কূর্ম্ম অবতারটিকে পাথারের জলে দিই ছেড়ে। জলের লাবণ্য মেখে ওটা ফুলতে থাকুক। তারপর একদিন 4000 A. D.-তে, বুঝেছিস, প্রত্নতাত্ত্বিকদের চোখ টাটিয়ে অবন ঠাকুরের কমঠ বাবাজী পিঠ জাগিয়ে ভেসে উঠবেন।"[১]

অবনীন্দ্রনাথ কোন জিনিস, কোন উপাদানকেই তুচ্ছ মনে করতেন না। তুচ্ছ ও সামান্যতম উপাদানে মহৎ সৃষ্টির প্রেরণায়ই যে তিনি কুটুম-কাটাম রূপায়ণ করতেন তা সহজেই অনুমেয়। এই বিষয়েও তাঁর একটি শিল্পাদর্শ ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। সেই উচ্চ আদর্শটিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল করে সহজ ভাবে ও ভাষায়।

"নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর; যার মন অসুন্দর সেও এইভাবে চলে ভাল থেকে মন্দে।

---

১. অবনীন্দ্রচরিতম্ : প্রবোধেন্দু ঠাকুর।

আর্টিস্ট, কবি ভক্ত এঁদের মন এমনিই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্য দিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ।"[১]

অবনীন্দ্রনাথের মহান্ শিল্প প্রতিভার স্পর্শে সমস্ত তুচ্ছ ও সামান্য অনুরূপ ভাবেই মহৎ ও অসামান্য হয়ে উঠতো। একটা নতুন ও অভিনব কিছু গড়তে হবে এই ছিল তার সর্বদার চিন্তা ও চেষ্টা। এই জগতে কিছুই অকেজো বা ফেলে দেবার জিনিস নয়, সব কিছুকেই কাজে লাগানো যেতে পারে—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবনাদর্শ। তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতার ছিল বুক্ বাইণ্ডিং-এর কারখানা। সেখানে গিয়ে দেখলেন, পেস্ট বোর্ডের ছাট্গুলি পড়ে রয়েছে অকেজো জিনিসের মত। তিনি বলে এলেন ওগুলো যেন ফেলে দেয়া না হয়। কি হবে তা দিয়ে? সকলের মনে সেদিন এই প্রশ্ন। তিনি বললেন—আগেকার মত অ, আ, লেখা তাস বানানো যাবে। তিনি তার এক পিঠে ছড়া লিখে দেবেন, আর তদনুযায়ী উল্টোপিঠে ছবি করিয়ে নিলে বেশ চাহিদা হবে তার! তাঁর ইচ্ছানুযায়ী 'ছাট্'গুলি তাঁকে পাঠিয়ে দিতে, তিনি তাদের প্রতিটিতে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ধরে ধরে এক একটি ছড়া লিখে দিতেন। তাও হয়েছিল এক একটি নতুন সৃষ্টি।

প্রবীণ শিল্পাচার্য্যের সেই নব-সৃষ্টিরাজির অভিনব ও উদ্ভট রূপায়ণ দেখে রসিকজন সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন এবং উচ্চ প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। চিন্তাশীল মনীষীরাও এই সৃষ্টিরাজির অভিনবত্ব দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছেন। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জনক এই কারুকলার মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় আর একটি নবতর শিল্পীমানসের যে পরিচয় রাখলেন তা জাতির জনক গান্ধীজীরও দৃষ্টি এড়ায় নি।

অবনীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কুটুম-কাটাম আজ শান্তিনিকেতন কলাভবনের সম্পদ। তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার সময় সেখানে তৈরী এই জাতীয় সৃষ্টি-সম্পদ কলাভবন সংগ্রহে উপহার দিয়ে আসেন। তার কিছুদিন পরেই মহাত্মাজী শান্তিনিকেতনে গিয়ে তা দেখতে পান। সেখান থেকে তিনি আসেন সোদপুরে। ওখানে এসে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে কুটুম-কাটাম প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছিলেন তা যেমন কৌতুহলকর, তেমনি গৌরবের বিষয়। চিঠিখানির কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ:

১. সৌন্দর্য্যের সন্ধান: বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।

প্রিয় অবনীবাবু,

…কাল সকালে আমি নন্দবাবুর মিউজিয়ম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি কাঁচের আলমারীতে আপনার কয়েকটি অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন তিনি আমাকে দেখালেন। সেগুলি নানা সামান্ত ও তুচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরী, এমনকি নগণ্য কাঠকুটো থেকেও। আপনি যাতে ভারতকে তথা সারা জগতকে এমন জিনিস আরও দিতে পারেন তার জন্যে আপনাকে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতে হবে।

চিঠিখানির তারিখ—২১.১২.৪৫।[১]

অবনীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করে গান্ধীজী এই চিঠিখানি লেখার পরে তিনি আর ছ'টি বছর মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি কুটুম-কাটামের খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে চলে যান অনন্ত অরূপের রাজ্যে। মহাত্মাজীর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী আরও দীর্ঘদিন ধরে কুটুম-কাটাম সৃষ্টি করে দিয়ে যেতে না পারলেও তিনি যা দিয়ে গিছেন, যা রেখে গেছেন তা বিশ্ব-শিল্পের ভাণ্ডারে যেমন নবতম অবদান, তেমনি তা বিস্ময়কর, চিন্তা উদ্রেককারী ও অপূর্ব্ব রসসঞ্চারী।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পী-জীবনের উন্মেষক্ষণ থেকেই খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ প্রেরণা লাভ করেছিলেন অফুরন্ত ধারায়। চিরকাল কবি ও শিল্পীর দুই জীবন একটি সুমধুর সহযোগিতার বন্ধনে ছিল আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথকে 'যুগ প্রবর্ত্তক' বলে আখ্যাত করেছিলেন। তিনি শিল্পীর শেষ বয়সের কুটুম-কাটাম দেখেও অতিমাত্রায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। শিল্প নিদর্শন হিসেবে এদের তিনি বিশেষ একটি উচ্চস্থানও দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্তা রাণী চন্দকে বলেছিলেন—

"অবনের খেলনাগুলো দু'তিনজন করে না দেখিয়ে একটা পাবলিক একজিবিশন করতে বলিস্। খুব ভালো হবে। সবাই দেখুক, অনেক কিছু শিখবার আছে। লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয় দেখ্! ছবি আঁকত, তারপরে এটা থেকে ওটা থেকে এখন খেলনা করতে শুরু করেছে, তবুও থামতে পারছে না, আমার লেখার মতো। না,—সত্যিই অবনের সৃজন-শক্তি অদ্ভুত।"[২]

---

১. অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত 'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর' পুস্তক থেকে গৃহীত।

২. ঘরোয়া (ভূমিকা): অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥ ১২ ॥

রূপতাপস, রূপের পূজারী অবনীন্দ্রনাথের রূপাভিসার হয়েছে কত বিচিত্র ও অনন্ত পথে। কিন্তু নিছক রূপরচনা করেই শিল্পসৃষ্টি হয় না। তার সঙ্গে চাই রসসঞ্চার। রসই শিল্পের প্রাণ। যিনি রূপরচনা ও রস সঞ্চারে সমান সুনিপুণ তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আর প্রকৃত শিল্পরূপ গড়ে ওঠে বাইরের রূপ ও অন্তরের অরূপ দুই মিলিত হলে। তা আবার গভীর কল্পনা ও আবেগ অনুভূতির রসে সিক্ত হয়ে উঠলে তবে হয় রস-রূপ। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"রূপ ফোটানো এবং রস-গছানো এই দুই কাজ হল শিল্পীর।"

রস কোন্ উপায়ে, কি ভাবে সঞ্চারিত হতে পারে তাও তিনি বলে দিয়েছেন অতি সহজ কথায়—

"ছবি ও কবিতায় মনের বেদন ঠিক নিবেদন করা গেলে তবেই রস জাগল।"

'মনের বেদন'কে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য যেমন চাই একটি সংবেদনশীল মানসিকতা, তেমনি চাই বিশেষভাবে দেখার চোখ। এই চোখ ও মনের সঙ্গে আরও প্রয়োজন হোল সাধনার। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় যথার্থরূপেই হয়েছিল এই ত্রিস্রোত ধারার সম্মেলন। তাঁর সহজাত রূপবুদ্ধি, অদ্ভুত সৃজনী প্রতিভা ও হৃদয়ানুভূতি নিষিক্ত রসধারাকে তিনি জীবনভর কত অনন্তখাতে প্রবাহিত করেছেন অপরিসীম সাধনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গ্রহণ-বর্জনের নানা পালা পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে। তাঁর চিত্রায়িত রূপমালার মূল রহস্য আরও নিহিত আছে তার স্বাজাত্যাভিমান, চিরাগত ঐতিহ্যধারায় দৃঢ় বিশ্বাস ও বিশ্বজনীনতার আদর্শের মধ্যে।

তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রতিটি পর্য্যায় আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রতি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপবৈশিষ্ট্যের মূলে এক একটি বিশেষ ভাবধারা ও প্রেরণা ছিল কার্য্যকর। তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে চিত্রবিদ্যায় নিয়মানুগ শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় ও বিদেশী শিক্ষকের কাছে। সুতরাং সেই শিক্ষানীতিতে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও তার সঠিক রূপায়ণ ছিল অবশ্যকরণীয়। তার ফলে নিসর্গ চিত্র ও মনুষ্য মূর্ত্তি রচনায় তিনি অবিলম্বে

একজন সিদ্ধ-শিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শিক্ষা অন্তে নেচার স্টাডি করে দৃশ্যচিত্র অঙ্কন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"এখন ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে ঘাড়ে ইজেল, বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু কতকাল আর চলবে এমনি করে? তবু মুঙ্গেরের ওদিকে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি দৃশ্য এঁকেছিলুম।"

"কতকাল আর চলবে এমনি করে।"—এই উক্তিটির মধ্যে কিছু হতাশা ও বেদনার ভাব আছে। কারণ তিনি পাশ্চাত্য প্রথায় তাঁর শিক্ষাকে সার্থক ও সুন্দর করে তুললেও, মন তাঁর ভরেনি একেবারেই। কিছুদিন বিদেশী রীতির সাধনাচর্চ্চা চলার পরেই তিনি অকস্মাৎ একদিন সন্ধান পেয়ে গেলেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতকলার ঐশ্বর্য্যময় অজানা জগতটির। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোল তাঁর স্বকীয় সাধনা ও স্বদেশের চিত্ররীতির রসরহস্য উদ্ধারের চিন্তা ও চেষ্টা। ভারতীয় চিত্রের মুখ্য বিশিষ্টতা হোল, তা রেখা প্রধান। তিনি সেই রেখার কারুতা ও বর্ণ মিশ্রণের স্বতন্ত্র রীতি-পদ্ধতিকে আয়ত্ত করে তাঁকে নতুনভাবে ও ভাষায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপাদর্শে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তিনি তাঁর শিল্পী-জীবনের উষালগ্নে যে শিক্ষালাভ করেছিলেন, যেখানে তিনি বাস্তববাদী প্রথায় আলোছায়াপাত, শারীর-বিজ্ঞান ভিত্তিক রূপাকৃতি রচনার পাঠ নিয়েছিলেন, তাকে উপেক্ষা-অবহেলা করেন নি কখনও। পরবর্ত্তী-কালে তাঁর তুলিকায় যে সকল মনুষ্যমূর্ত্তি প্রতিকৃতি রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে জগৎজোড়া খ্যাতিলাভ করেছিল তাদের রূপরহস্য বিশ্লেষণ করলে তাঁর চিত্র-কলার আদি পাঠ গ্রহণের পর্য্যায়টিকে অস্বীকার করা যায় না।

তাঁর স্বকীয় সাধনা কিছুদূর অগ্রগতি লাভ করার পরেই তিনি জাপানী চিত্র-পদ্ধতির সঙ্গে সুপরিচয় লাভের এক অপূর্ব সুযোগ পান। জাপানী প্রথায় চিত্রপটকে জলে ধুয়ে ধুয়ে বর্ণলেপের রীতিকে তিনি সাদরে গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হননি। কিন্তু তাকে তিনি অবিকল গ্রহণ করে কাজে লাগান নি। এই প্রথায় তিনি তাঁর চিত্রাবলীতে এনে দিলেন কুহেলি মাখা, স্বপ্নময় নতুন এক জগতের সন্ধান। অতিসূক্ষ্ম সুকুমার রেখার সঙ্গে মিলিত শতধৌত রঙের মায়াজালে তাঁর চিত্রপট অদ্ভুত এক অতলান্তভাবের গভীরতা ও অসীম রহস্য-ঘনরূপের রাজ্যে হোল পরিণত।

রঙ-রেখায় করণ-কৌশলের সঙ্গে মিলিত হোল অভিনব ও অপূর্ব সব রূপমালা। কত যে বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ তিনি পটের বুকে ধরে দিয়েছেন তার সঠিক সীমা সংখ্যা আজ আর নির্ণীত হওয়া সম্ভব নয়। যত পট, তত

ভিন্নরূপ। প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষ, পশুপাখী সব কিছুই ভিন্ন ভিন্ন পটে ভিন্ন রূপে ও ভাবে-ভাষায় করেছে আত্মপ্রকাশ।

স্বকীয় রীতিতে প্রথম যাত্রাপথে পদক্ষেপ করে তিনি যে কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলী রচনা করেছিলেন তার মধ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি রূপায়ণ, আঙ্গিক প্রকরণ, বর্ণ সমাবেশ ও পরিবেশ সৃষ্টিতে একটির সঙ্গে আর একটির মোটামুটি মিল ও সাদৃশ্য দেখা যায়।

কিন্তু তারপরেই ক্রমশঃ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও যেমন সুপ্রতুল হয়েছিল, আঙ্গিক শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বিচিত্র পথগামী হয়ে উঠলো, তেমনি দেখা গেল নানা অভিনব রূপের বিকাশ ও প্রকাশ। ঋতুসংহারের চিত্রাঙ্কন পর্ব্ব শেষ হতেই সেই অতি বিচিত্রতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো নানা নতুন বিষয়ের চিত্র মধ্যে। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর মেঘদূতের চিত্র নিচয়। তিনি এই সকল চিত্রে যে মূর্ত্তিরাজি ও পরিবেশ রচনা করেছেন, তা কোন পূর্ব্বসূরী সৃষ্ট নিদর্শনের অনুগামী নয়। এই সৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে বহুদিনের নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রূপবৈচিত্র্যের অস্ফুট ব্যঞ্জনা, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির চিরাগত প্রবাহ প্রসূত অকৃত্রিম এক নবীন রূপের সাধনা। আরও বলা যায় যে, এ হোল শিল্পীর অতল অনুভূতির স্পর্শনসিক্ত এক অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক রূপের সাধনা। এই জাতীয় বিচিত্রভাব আরও নবতর হয়ে প্রকটিত হয়েছিল ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছে।

সাধারণ অর্থে সুন্দর ও মনোরম বলতে যা বোঝায় অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রেখে কখনও তাঁর চিত্ররূপ রচনা করেন নি। চিত্রায়িত রূপাবলীর উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য্য বিচার যদি বহিরঙ্গ দেখে করা যায়, তাহলে অবনীন্দ্রনাথের অনেক চিত্রকে হয়ত মনোরম বলা যাবে না। আপাতঃ-রমণীয়তার অভাবই হয়ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র সাধন-মার্গের পথিক।

এই বিষয়ে তাঁর আদর্শ ও ক্রিয়া-পদ্ধতি ছিল আলাদা; অন্য কারোর সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তিনি ছবিতে রূপ ফুটিয়ে তাকে নয়নাভিরাম করে আবার তাকে ঢাকা দিয়ে চাপা দিতে চেয়েছেন নানা রঙের আবরণের অন্তরালে। এ হোল বহিরঙ্গকে অন্তরঙ্গের মধ্যে নিয়ে স্থাপনা করা। রঙ ও রেখাকে সুসমঞ্জস করে একটি আত্মস্থ রূপের প্রকাশ করাই ছিল তাঁর চিত্র সাধনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর ধ্রুপদী ধারায় চিত্র রচনার গোড়ার কথাও এই।

শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে মতি বুড়োর (ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারী) সমালোচনার উত্তরে তিনি নিজেই এই কথা বলেছিলেন। সাধারণ দর্শক তো

চান ছবিতে সুস্পষ্ট সৌন্দর্য্যাভাস। অতএব, সাধারণ মানুষ মতি বুড়ো বলেছিলেন—

"দেখুন, ছোটোবাবু, আপনার ছাত্র নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী, ওরা ছবি আঁকে, দেখে মনে হয় বেশ যত্ন করে ভালো ছবিই এঁকেছে। কিন্তু আপনার ছবি দেখে তাতো মনে হয় না।……আপনার ছবি দেখলে মনে হয় আঁকা হয়নি মোটেই।"

শিল্পী বললেন, "সে কি কথা! আপনার কাছে বসেই আঁকি আমি, আর বলছেন, আঁকা বলেই মনে হয় না।"

—"না, মনে হয় যেন ওই কাগজের উপরেই ছিল ছবি।"

সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "এঁকেছি, চেষ্টা করেছি, এ সমস্ত ঢাকা দেওয়াই হচ্ছে ছবির পাকা কথা। আকাশের পাখি যখন উড়ে যায়, বাতাসে কোনো গতাগতির চিহ্ন রেখে যায় না।…ছবির বেলাও সেই একই কথা।"

মানুষের রূপকে ছবিতে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার কথায় অবনীন্দ্রনাথ আর একবার ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর নিজ আদর্শ ও চিন্তা চেষ্টার কথা।

একদা কবি জসীমউদ্দীন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনার ছবির পাত্র-পাত্রীদের আপনি সুন্দর করে আঁকেন না কেন? লোকে বলে আপনি ইচ্ছে করেই আপনার চরিত্রগুলোকে এবড়ো-খেবড়ো করে আঁকেন।"

তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি সুন্দর করেই আঁকি। আমার কাছে আমার সুন্দর! তোমাদের কাছে তোমাদের সুন্দর। আমি ইচ্ছে করে কোন ছবি অসুন্দর করে আঁকিনে।"[১]

সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের চিত্তে শিল্পীর নিজের সুন্দরই বড় কথা এবং শেষ কথা। তাহলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অপরের চোখে সুন্দর হয়ে, রসিকের হৃদয়ে রসসঞ্চার করে, ক্ষণিক ও তাৎক্ষণিক থেকে তা চিরন্তনে উত্তীর্ণ হয়ে চিরসুন্দরের আসন করেছে লাভ।

এই চিরায়ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মূল রহস্য অনেকাংশে নিহিত আছে শিল্পীর আবাল্য দেখা চারিভিতের রূপরাজির মধ্যে। তবে নিজস্ব পন্থায় চিত্রকর্ম শুরু করে তিনি কোনদিন এবং কখনই তাঁর আশেপাশে ছড়ানো রূপরাজি ও দৃশ্যাবলীকে পর্য্যবেক্ষণ করে তখুনি তাকে অবিকল পটে স্থান দেননি।

---

১. ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়ঃ জসীমউদ্দীন। পৃঃ ৬২

তিনি আশৈশব দেখা তাঁর গৃহ পরিবেশ, বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্ম এবং সুখ-দুঃখের স্মৃতিকে নিজ হৃদয়পটে মুদ্রিত করে, অন্তরের মণিকোঠায় আবদ্ধ রেখে ভাবীকালের এক একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে তাদের স্মৃতিছায়াকে তুলে ধরেছেন চিত্র-লিখনে।

'কনে সাজানো' ছবিটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "প্রসাধনের বেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অন্দরমহলে যে সুন্দর মুখ সব, যে ছবি সব সংগ্রহ করলে মন, আমার 'কনে সাজানো' ছবিখানিতে তার অনেকখানি পাবে।"

বাল্যকালের আনন্দ ও সুন্দরের স্মৃতিকে যেমন বড় হয়ে পটে ধরে দিয়েছেন, তেমনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে যে সত্য অনুভূতিগুলি হয়েছিল, যৌবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের নানা পর্য্যায়ে যে সুখ দুঃখ ও বেদনা ব্যথার পালা চলেছিল তারও প্রভাবপুষ্ট অনেক চিত্র পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।

প্রথম জীবনে তাঁর একটি বালিকা কন্যার মৃত্যুর শোক ঢেলে দিয়ে তিনি এঁকেছিলেন শাজাহানের অন্তিম অবস্থার ছবি।

'ক্ষীরের পুতুল'-এ যে ষষ্ঠী বুড়ী এঁকেছিলেন তার রূপচিত্রের নেপথ্যেও আছে শিল্পীর ছেলেবেলাকার অভিজ্ঞতা ও কল্পনার প্রভাব। বালক অবনীন্দ্রনাথ দুপুরের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁদের বাড়ীর আশেপাশে ও আনাচে-কানাচেতে যে সকল শব্দ শুনতেন তার মধ্য দিয়ে মনে গড়ে উঠতো নানা গল্প ও ভুতুড়ে ভাবরাশি। সেই গল্পের মধ্যে তিনি পশুপ্রাণীর চলার ছন্দ ও শব্দ যেমন অনুভব করতেন, তেমনি যেন দেখতে পেতেন ব্রহ্মদত্যি হাঁটছে, জটে বুড়ী আসছে। এই কথা বলতে গিয়ে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন—

"জটে বুড়ী সত্যিই ছিল, লাঠি ঠক্ ঠক্ করে আসত; ময়ূরে তার চোখ উপড়ে নিয়েছিল। 'ক্ষীরের পুতুল'-এ যে ষষ্ঠী বুড়ী এঁকেছি ঠিক সেই রকম ছিল সে দেখতে।"

প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে আঁকলেন তিনি 'পদ্মপত্রে শিশির বিন্দু'। সে ছবিতে প্রতিবিম্বিত করলেন জীবনের নশ্বরতার প্রতিরূপ। সুখদুঃখের খেলায় স্রোতবাহী জীবনধারার প্রতীকধর্ম্মী রূপ ওটি। এই ছবিখানির কথা বলতে গিয়ে শিল্পী বলেছেন, "পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সে সব সুখের দিন গেল, তার স্বাদ পাওনি কি ওই নামের ছবিতে আমার?"

আবাল্য তিনি মনের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে এসেছিলেন কত শত সুখদুঃখ, আনন্দ ও সুন্দরের স্মৃতি। পরবর্ত্তীকালে তা কাজে লাগিয়েছেন নানাভাবে,

বিশেষ করে চিত্র রচনায়। সে কথাও তিনি অনেকবার বলেছেন তাঁর স্মৃতিচারণাতে। এক স্থানের কিয়দংশ হ'ল—

"সেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে। তখনই যে সে সব সঞ্চয় কাজে লাগাতে পেরেছিলুম তা নয়। ধরা ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় কাজে এল ; আমার লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, গল্প বলার কাজে।"

বাড়িতে গহনাওয়ালী, চুড়িওয়ালী আসত। বোষ্টমী আসত ভক্তিতত্ত্বের গান শোনাতে। বালক অবনীন্দ্রনাথ তাদের ক্রিয়াকলাপ ও ভাবভঙ্গী মনে গেঁথে রেখে পরে ছবি আঁকার সময় তা কাজে লাগিয়েছেন অনবরত। তাঁর মুখেই শোনা গিয়েছে তা। তিনি বলেছেন—

"কোন্ রঙের পর কোন্ চুড়ি মানাবে বড় চিত্রকরীর মত বুঝত তার হিসেবে চুড়িওয়ালী। তোমরা বঙ্কিমবাবুর বেলায় নভেলে যে সব ছবি পাও সে সব ছবি স্বচক্ষে দেখেছি আমি খুব ছেলেবেলায়। এখনো চুড়ি পরানো ছবি আঁকতে কোন রঙের পর কোন্ রঙের টান দিতে হবে জানি, সেজন্য আর ভাবতে হয় না। তুমি যে সেদিন বললে, সাঁওতালনীদের খোঁপা আপনি কেমন করে ঠিকটি এঁকে দিলেন ? খোঁপার কত রকম প্যাঁচ সেই চুল বাঁধার ঘরে বসে শিশু দৃষ্টি শিশুমন ধরেছিল।"

ছেলেবেলায় অবনীন্দ্রনাথ দেখতেন ছোট পিসীমা ঠাকুর ঘরে বসে মহিম কথকের মুখে পুরাণের গল্প শুনছেন। কথক ঠাকুর লাল বনাত গায়ে দিয়ে বলতেন, হাতে তাঁর রূপোর আংটি। হাত নেড়ে নেড়ে কথকতা করতেন। বড় হয়ে তিনি কথক ঠাকুরের ছবি করেছিলেন। তাঁর মুখেই শোনা গেল—

"রূপোর আংটির ঝক্‌ঝকানি এখনও দেখতে পাই। আঁকতে শিখে সে ছবি একখানা এঁকেও ছিলুম।"

পরবর্ত্তীকালে আর একজন কথক এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের গৃহে। নাম তাঁর ক্ষেত্রনাথ কথক। শিল্পীর চিত্র রচনার কাজে তিনিও কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর মুখে বর্ণনা শুনেই তিনি 'লীলাকমল' অর্থাৎ পদ্ম ফুলের উপরে বালক কৃষ্ণের দাঁড়ান রূপটি এঁকেছিলেন।

তাঁর স্বগৃহে গানের আসর বসত প্রায়ই। একবার এক গায়িকা এসেছিলেন কাশী থেকে, নাম তাঁর সরস্বতীবাঈ। চমৎকার গান গেয়েছিলেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথ তখন পাকাপোক্ত শিল্পী। সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তিনি গায়িকার ছবি এঁকে নিলেন তখুনি। এই রকম প্রত্যক্ষদর্শনজাত ছবি তিনি যে করতেন তা তাঁর রচিত অসংখ্য প্রতিকৃতি চিত্র দেখেই বোঝা যায়। তবে

আলোচ্য ছবিতে তিনি বাস্তবিক আলেখ্য ধরে রেখেছিলেন, না মোটামুটি একজন গায়িকার রূপচিত্র করেছিলেন তা বোঝা যায় না। তিনি কেবল বলেছেন, "সব স্তম্ভিত। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর ছবি আঁকলুম, পাশে গানটিও লিখে রাখলুম।"

চিত্রাঙ্কনের মৌল প্রেরণা সম্বন্ধে তিনি দুঃখ-বেদনা ও ব্যর্থতার কথাই বেশী বলেছেন। তিনি বলেছেন যে মনে যে রঙ, রূপ ও রস আসতো, চোখে যা তাঁর ভেসে উঠতো, তার অনেকখানিই তিনি ছবিতে সর্ব্বদা দিতে পারতেন না। তবে দু'একবার যে আনন্দে মগ্ন হয়ে ছবি আঁকার অবকাশ পাননি তা নয়। একবারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, কৃষ্ণ চরিত্রের ছবিগুলি রচনার সময় সেই আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—

"সারা মন প্রাণ আমার কৃষ্ণের ছবিতে ভরে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই চারিদিকে ছবি দেখি, আর কাগজে হাত ছোঁয়ালেই ফস্‌ফস্ করে ছবি বেরয়।"

শিল্পীর মাতৃবিয়োগ হোল। কিন্তু মায়ের কোনো মূর্তিচিত্র তিনি করে রাখেন নি। একদিন ধ্যানমগ্ন হয়ে অন্ধকারে বসে মাতৃরূপ কল্পনার চোখে দেখে এঁকে ফেললেন। সে রূপের উৎস ও প্রেরণা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিজাত। প্রতিমূর্ত্তি চিত্র হিসেবে সেটি অনবদ্য। অমন সূক্ষ্ম তুলির টানে অঙ্কিত মূর্ত্তিচিত্র বিরল। তিনি নিজেও বলেছেন—

"এত ভালো মুখের ছবি আমি আর আঁকিনি।"

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ও পাহাড়-পর্ব্বতে তিনি বেড়িয়েছেন, ভ্রমণ করেছেন বারে বারে। তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, মানুষের চেহারা, চরিত্র ও সংস্কৃতির স্বরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অসংখ্য পটেতে। পুরী, রাঁচি, দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও মুসৌরী ভ্রমণের ফলশ্রুতি দেখা যায় কত শত চিত্রপটে। কিন্তু তার অধিকাংশই সেই সকল স্থানে অঙ্কিত হয়নি। দেখে-শুনে এসে পরে কোন একদিন নিজ অন্তরের অনুভাব দিয়ে তাকে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন বিভিন্ন ছবিতে, বিচিত্র রূপে ও ভঙ্গীতে।

পুরীর দেবদাসীর চিত্র তার সার্থক নিদর্শন। ওড়িষী 'টাইপ' আরও সুন্দর ও সার্থকভাবে মূর্ত্ত হয়েছে কাজরী চিত্রে। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"পুরীতে বসে সমুদ্র দেখেছি, নাচ দেখেছি, সেখানে আঁকিনি। বহুকাল পরে কলকাতায় বসে আঁকলুম সে সব ছবি।"

পুরী ভ্রমণ করেছেন অনেকবার। রাতের অন্ধকারে পাল্‌কী করে কোনারক যাত্রার গা ছম্‌ছমে ভুতুড়ে ভাবটিও প্রস্ফুট করেছেন তিনি। কিছু

সংখ্যক পটের বিচিত্র দৃশ্যাবলীতে। সেই চিত্রাবলীও—অবশ্যই ভ্রমণ পথে অঙ্কিত হয়নি। ভ্রমণ অন্তে গৃহ কোণে বসেই তিনি তার রূপ দিয়েছেন। তার মধ্যেও পাল্‌কী বাহকদের চেহারা, চরিত্র ও বিরল বৃক্ষপত্র, বালুকাময় ভূখণ্ডের নিঃস্তব্ধ সুবিস্তীর্ণ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পীর বহু পথ প্রবাহিনী কল্পনা ধারার সুষ্ঠু, সুমার্জিত ও ভাবগম্ভীর প্রযুক্তি কৌশলে।

গঙ্গা নদীর সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক আবাল্য, আর তা ছিল অত্যন্ত গভীর। পিতার বাগানে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে স্টীমারে ভ্রমণের কাল পর্য্যন্ত তিনি গঙ্গাকে দেখেছিলেন নানা বিচিত্র রূপে ও ছন্দে। স্টীমারের সেই সকল অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'পথে বিপথে' বইখানিতে। তারপরে অনেক দিন গত হলে তিনি সেই গঙ্গার দৃশ্য বিশেষতঃ বর্ষাকালের ভরা-গঙ্গার ছবি এঁকেছিলেন কয়েকখানি। তার একটি ছবি রুমানিয়ার রাজা কিনে নিয়েছিলেন। এই কথা বলার সময় তিনি মন্তব্য করেছেন—

"গঙ্গার ছবি রুমানিয়ার রাজা নিয়ে চলে গেলেন, দেশী লোকের নজরই পড়ল না তাতে, অথচ মা গঙ্গা, মা গঙ্গা বলে আমরা চেঁচিয়ে আওড়াই খুব।"[১]

মুসৌরী পাহাড়ের চিত্র-লিখন প্রসঙ্গেও সেই একই কথা, একই রীতি। তিনি বলেছেন—

"দেখলুম আর আঁকলুম, আমার ধাতে তা হয় না। অনেক দিন ধরে মনের ভিতরে যা তৈরী হ'ল, তাই ছবিতে বের হ'ল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে চুপচাপ। আর সবই কি ঠিকঠাক বের হয়? মুসৌরী পাহাড়ের একটি সন্ধ্যের পাখি আঁকলুম, কিভাবে সে ছবিটা এল?"[১]

কিভাবে এসেছিল তা তাঁর বর্ণনাতেই জানা যায়। বাংলাদেশে সেদিন বিজয়া। তিনি হঠাৎ দেখলেন মুসৌরীর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে লাল আলোর ঢেউ চলে যাচ্ছে। আর তাতে পাহাড়ের উপরে ঘাস পাতা সব ঝিলমিল করে উঠছে। তাঁর মনে হোল যেন মা দুর্গা কৈলাসে ফিরে গেলেন। তাঁর আঁচল থেকে সোনার কুঁচি সব ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু ছবি তিনি সেখানে আঁকেন নি। আঁকলেন কলকাতায় ফিরে এসে। এই বিষয়ে তাঁর বর্ণনা—

"তখনি ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে এই ছবি আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেইভাবেই কি বের হল ছবি? তাতো নয়, মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালি রূপোলি রং নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধ্যের পাখি—সে

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১৩৬

বাসায় ফিরছে। মনের এ কারখানা বুঝতে পারিনে। এত আলো, এত ভাব, সব তলিয়ে গিয়ে বের হল একটি পাখি, একটি কালো পাহাড়ের খণ্ড, আর তার গায়ে একগোছা সোনালি ঘাস। অনেক ছবিই আমার তাই—মনের তলা থেকে উঠে আসা বস্তু।"[১]

মুসৌরীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত ছবি সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন—

"মুসৌরীতে দেখেছি, ঘুরেছি। অনেককাল বাদে বের হল পাখির ছবিগুলি। সেখানে থাকতে ছবি আঁকিনি ; ঘুরে ঘুরে দেখেছি, পাখির গান শুনেছি।"[২]

শিল্পী-জীবনের শেষপর্য্যায়ে অবনীন্দ্রনাথ যে চণ্ডীমঙ্গলের চিত্র সিরিজ করেছিলেন, তার কোন কোন নিদর্শনের মূলেও মুসৌরী ভ্রমণের নেপথ্য প্রভাব বিদ্যমান। চণ্ডীমঙ্গলের চিত্র রচনার সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে তিনি মুসৌরীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মনের মণিকোঠায় যে রূপমালার স্মৃতি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, তা জীবনের শেষলগ্নে উজাড় করে দিয়েছিলেন কবিকঙ্কণের ছবিতে। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ—

"কবি কঙ্কনে এঁকেছি সব শেষের ছবি—দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঘট হাতে আসছে একটি মেয়ে। মুসৌরী পাহাড়ে বিজয়ার দিন ওই অমনি ছবির খসড়াই লিখেছিল মন, এও বুঝি তাই। সেই মুসৌরী পাহাড়ের কথা কতকাল বাদে বের হল কবি কঙ্কনের পটের ছবিতে।"[৩]

অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত আরব্য রজনীর চিত্রগুচ্ছে বহু মানুষের ভিড়। তিনি মানুষ ও পশুপ্রাণীর সমাবেশটি এক একখানি চিত্রে অতি মনোরম ভঙ্গীতে করে তাদের একাত্মতার সূত্রে করেছেন গ্রথিত। আরব্য রজনীর চিত্রের রূপরাজির মধ্যে শিল্পীর চেনা মহলের অনেক রূপস্মৃতির স্বাক্ষর বিদ্যমান। এমনকি দুই একটি ছবিতে তাঁর আত্মরূপেরও সন্ধান পাওয়া যায়। আর তা বিশেষ অস্পষ্টও নয়।

কৃষ্ণমঙ্গলের চিত্রাবলীতে তিনি যে রূপ রচনা করেছেন তার মধ্যে আপাতঃ-দৃষ্টিতে প্রাচীন পটচিত্রের কিছু রূপাভাস লক্ষিত হলেও, সে ফর্ম্মসমূহ তাঁর নিজের। কালীঘাটের পটানুযায়ী রেখা, ডৌল নয়। তিনি এই চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন রঙের স্থূল রেখা সংযোগে রূপ রচনা করেছেন। তাঁর অঙ্কিত এই রূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল গতিময়তা। কিছু সংখ্যক ছবির মধ্যে প্রস্ফুট হয়েছে শিল্পীর সহজাত রহস্যবোধ। তবে আবাল্য দেখা বাংলার পটচিত্র তাঁর

---

১. ২. ৩. ৪. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১৪৭, ১৪৪. ১৪৮

শিল্পচেতনার মর্ম্মমূলে কিছু রসসঞ্চার যে করেছিল তা এই চিত্রনিচয়ের রূপ বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত নয়।

আখ্যানধর্ম্মী চিত্রে তাঁর আখ্যানপ্রিয়তা বহুমুখী হলেও, তা কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের গ্রন্থাদির বিষয় অবলম্বনে তিনি যে চিত্রাঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে বিষয় গৌরবের মধ্যে বরণীয় ও বর্জনীয়ের প্রভেদ জ্ঞান। আরও পাওয়া যায় আখ্যান কেন্দ্রিকতা অপেক্ষা প্রাণসত্তা ও রূপতৃষ্ণার বহু বিস্তার। কিন্তু সেই রূপতৃষ্ণা নেহাত ইন্দ্রিয়ানুগ নয়। তার মধ্যে অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে শিল্পীর গভীর জীবনবোধ, অন্তর্দৃষ্টি ও অধ্যাত্ম চেতনা।

'চার্ম অব্ কাশ্মীর' গ্রন্থের চিত্রায়ণে তিনি সেখানকার যে প্রাকৃতিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি চিত্তহারী। সেই নিসর্গ শোভা যে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নয়, তাও সম্যকরূপে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। সেই ব্যাখ্যানে প্রথমেই বলতে হয় যে, কাশ্মীরের সেই রূপচিত্রের রহস্য নিহিত আছে শিল্পীর কল্পনার অতলস্পর্শ প্রবাহ এবং বিশেষ রকমের ও অভিনব ধরনের একটি মানসিকতার মধ্যে। চিত্রাঙ্কন কর্ম্মে তিনি স্পষ্টতঃই রঙ-তুলির সঙ্গে মনকে সমান স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"কালি কলম মন, লেখে তিনজন। এই তিন নইলে ছবি হয় না।"

তাঁর মতে চোখ যত কিছুই দেখুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। মন যা ধরতে পারবে তাই কেবল ছবিতে, পটেতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু মন আবার চোখে দেখা সব কিছুকে সমভাবে ধরে রাখতে পারে না। তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে বলা যাক—

"আঁখি যত জনে হেরে সবারে কি মনে ধরে?" তারপরেই তিনি বললেন—

"চোখ যত জিনিস দেখছে সে বড় কম নয়। কিন্তু সব কি আর মনে ধরছে। তা নয়। মনের মত যা তাই ধরছে, সেইগুলিই কাজে আসছে আমাদের ছবিতে।"[১]

কাশ্মীরের চিত্র ব্যতীত অন্যান্য 'স্থান চিত্রে'-ও দেখা যায় যে, বাস্তব প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তিনি স্বীয় ভাবানুভূতি ও মানস মননের আধারে প্রথমতঃ স্থান দিয়ে, পরে তাকে রহস্যময় গহন এক রসবেদনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাই তাঁর তুলিকায় প্রতিটি দৃশ্যচিত্র স্বপ্নালু ভাব ও গীতিময়তায় পরিপূর্ণ।

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১৪৬

অবনীন্দ্রনাথ সৃষ্ট শিল্পরূপের মর্ম্মকথা আলোচনা সূত্রে তাঁর তুলিকার প্রতীকধর্ম্মী চিত্রের কথাও উল্লেখনীয়। তিনি বিশেষ কোন গূঢ়ার্থক বিষয় ও জীবন-চেতনাকে প্রতীকতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে নির্জলা নৈর্ব্যক্তিক বা বিমূর্ত্ত পন্থা অবলম্বন করেন নি। বরং তা করেছেন অদ্ভুত ও অভিনব সব রূপভঙ্গীর মাধ্যমে। আর সেই রূপ পুরোপুরি তাঁর মনঃকল্পিত। বিষয়বস্তু সাধারণ হলেও তা স্থূলের সীমা ছাড়িয়ে সূক্ষ্মতার উর্দ্ধলোকে উঠে ঐশ্বর্য্যসিক্ত রস নিবিড়তায় হয়েছে অভিষিক্ত। এই জাতীয় চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল 'উটের মৃত্যু'।

সুবিদিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তা সমূহের রূপচিত্র অঙ্কনেও তিনি সেই একই পন্থা ও নীতির অনুগামী ছিলেন। মুঘল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকাদের রূপাঙ্কন করেছেন তিনি নানা পটেতে। কিন্তু সমসাময়িক মুঘলাই তস্‌বীরের কোনও ভাব-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা কিছুরই প্রতিফলন নেই সেখানে। অতএব, তাঁর তুলিকার মুঘল চরিত্র-চিত্র ইতিহাস নিষ্ঠার সীমাকে উল্লঙ্ঘন না করলেও, সে যুগের বাদশাহী বিলাস ঐশ্বর্য্যের মহিমাকে সাদরে তিনি পটের বুকে লালন-পোষণ করেন নি। পরন্তু তিনি সেই সকল ব্যক্তিসত্তার আন্তর প্রকৃতিকে স্বীয় বেদনের রসে অভিসিঞ্চিত করে সম্পূর্ণ নতুন রূপে, স্বতন্ত্র ভাব ও ভাষায় প্রতিবিম্বিত করলেন তাঁর অনবদ্য তুলির টানে, বর্ণিকাভঙ্গের সুমধুর আবেশে। তাহলেও সে রূপাবলী সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। কোনও আলো-আঁধারি খেলা নেই, কোনও কুহকের মায়াজাল বিস্তীর্ণ হয়নি সে রূপের মধ্যে।

অবনীন্দ্রনাথ কল্পিত দেহরূপ বিচিত্রপথগামী। তা দেখা-অদেখার মিলন-সম্ভূত। প্রতিকৃতি অঙ্কনে বাস্তবিকতা মুখ্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে রূপবদ্ধ ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন ও ভাবমূর্ত্তি প্রকাশের দিকে তাঁর অধিক আয়াস লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনীত বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর, বিশেষতঃ কবির অভিনয়াংশের অনেক রূপচিত্র তিনি এঁকেছিলেন। এই সকল চিত্রে অবনীন্দ্রনাথ অভিনেতার রূপ রচনা প্রত্যক্ষ দর্শনজাত পন্থায় না করে, কিছু পরিমাণে মনোচ্ছায়াবাদী (Impressionism) রীতির প্রয়োগে করেছেন। তার ফলে চিত্রপটে একটা বাস্তব ও অবাস্তবের মিলন হয়ে অপূর্ব্ব এক রসভারে তা সমৃদ্ধ হয়েছে। এই অভিনব রূপসৃষ্টির রহস্য-কথা আরও নিহিত আছে শিল্পীর বর্ণ-বিন্যাসের কৌশল মধ্যে। অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের চিত্রেও কোনও গতানুগতিকতা বা সুনির্দিষ্ট পথে রূপ-কল্পনার প্রথা-পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি।

তিনি অতীত-মুখী হয়ে প্রাচীন ভারতের রূপাদর্শ কোথাও অনুসরণ করেন নি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং শিল্পশাস্ত্রে বিধৃত মনুষ্যমূর্ত্তির আদর্শ ও লক্ষণাবলী তিনি অধীত করেছিলেন গভীরভাবে। কিন্তু নিজের চিত্র-চেষ্টায় ও রূপ-কল্পনায় তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন নি কথনও।

তাঁর লিখিত 'Artistic Anatomy', 'ষড়ঙ্গ' ও 'ভারত শিল্পে মূর্ত্তি' বই তিনখানিতে তিনি দেবদেবী ও নরনারীর নিখুঁত দেহরূপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংস্থান ও গঠনের নিয়ম সূত্র আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন পূর্ণাঙ্গ রূপে। আর তা করেছেন অনবদ্য সব রেখাচিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলীতে তদনুরূপ অঙ্গবিন্যাস ও রূপ-রচনায় প্রত্যক্ষ কোন আরোপ দেখা যায় না। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে নারীদেহের নিখুঁত গঠন ও গড়ন সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তারও কোন অপরিবর্ত্তিত প্রয়োগের চেষ্টা তিনি কোথাও করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর রচিত মেঘদূত ও ঋতুসংহারের চিত্রপটসমূহ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

সীমাহীন, সংখ্যাতীত তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্য। সুবিশাল তাঁর রূপ-ভাণ্ডার। কিন্তু সেখানে কোন ছায়াবাদ বা নৈরূপ্যের কুহেলিকা নেই। সব কিছুই প্রত্যক্ষ রূপ, রূপাভাস ও রূপাধার। তার মধ্যে স্থানে স্থানে আবার হয়েছে রূপ ও অরূপের মিলন, সীমাতে অসীমকে বন্ধনের চেষ্টা ও শিল্পীর অমল ভাবানুভূতির সুপ্রকাশ, তাঁর মানস চেতনার অন্তরঙ্গ রূপটির অবাধ অভিব্যক্তি। আর তা প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে শিল্পীর যাদুকরী রঙ-তুলির চারুতা ও কারুতার মাধ্যমে এবং তাঁর নিগূঢ় মরমী হৃদয়ের আবেগানুভূতির প্রলেপনে। তবে তা চিরাগত ধারায় প্রবাহিত শিল্প-লক্ষণার অবক্ষয়িত রূপের জাবর কাটা নয়। তা মহৎ উপাদান প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। শিল্পী হিসেবে ও রসিক রূপে তিনি অপরিসীম রসবোধ, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন প্রতিটি রচনার মধ্যে। কোথাও কোন ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। গ্রহণ-বর্জনের অস্বীকৃতির আড়ালে কিছুকে চাপা দেবার চেষ্টা করেন নি কথনও। জীবনভর পাথেয় সঞ্চয়ের অপূর্ব্ব কৌশল প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর কল্পিত প্রতিটি চিত্রে। কিন্তু তিনি কোথাও আত্মসত্তাকে নিলীন হতে দেননি। পরন্তু যে কৌশলে তা করেছেন তা যেন ঐন্দ্রজালিকের কৌশল। এ বিষয়ে অবনীন্দ্র-চিত্রের শ্রেষ্ঠ মর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা ও. সি. গাঙ্গুলীর একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্য্য বহন করে—

"Yet he is nothing but himself—a wizard of form and a magician of colour."

Tradition-এ ছিল অবনীন্দ্রনাথের গভীর ও অকপট বিশ্বাস। তাকে অস্বীকার করে তিনি কখনও শিল্প-পথে অগ্রসর হননি। কিন্তু তার ফলে পুরাতনকে কপি বা নির্জলা অনুকরণ করেও কিছু সৃষ্টি করেন নি।

তিনি তাঁর ছাত্র অসিত হালদারকে একখানি চিঠিতে একবার লিখেছিলেন—

"বোঁটা ছাড়া ফল যেমন অসম্ভব, Tradition ছাড়া art-ও তেমনি অসম্ভব।"

Tradition-কে অস্বীকার না করে, দেশের মহৎ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক চিত্ররীতির যে বিরাট সৌধ রচনা করলেন, যে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন অগণিত চিত্রপটে, তা আজ একটা 'চ্যালেঞ্জের' সম্মুখীন।

তিনি লোকান্তরিত হওয়ার পরে তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে সহৃদয় ও প্রশংসাসূচক আলোচনা যা হয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর হয়েছে উহার অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে।

দেশ-বিদেশের কিছুসংখ্যক সমালোচক কয়েক বছর ধরে একটি ধ্বনি তুলেছেন যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার রাজ্যে নতুন কিছু দিতে পারেন নি, নতুন সৃষ্টি করার শক্তি-প্রতিভা তাঁর ছিল না এবং চিত্র রচনার শিক্ষাই তাঁর সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি কেবল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কলা-পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর তুলি কল্পনায় ভারতের লুপ্ত ও মৃত শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়েছে মাত্র। সুতরাং তিনি হলেন পুরাদস্তুর একজন 'Revivalist'।

এই উক্তিগুলি আজ আর ধ্বনি মাত্র নয়। পুঁথি-পুস্তকে, বক্তৃতা-আলোচনায় সর্বত্র চলেছে অবনীন্দ্র-প্রতিভাকে মসীলিপ্ত করার দুরন্ত অভিযান। তাকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা।

হ্যাভেল সাহেব যখন এই শতকের প্রারম্ভে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে লিখতে ও বলতে শুরু করেন, তখন তিনি দু'একবার 'revival' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ তারই পুনরাবৃত্তি আজ চলছে অনেকের মুখে ও লেখনীতে। পরে কিন্তু হ্যাভেল সাহেবও আর 'revival' কথাটির পুনরুল্লেখ

কোথাও করেন নি। পরন্তু তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় শিষ্যদের রচনাবলীকে নানাভাবে মৌলিক ও সম্পূর্ণ নতুনতর সৃষ্টি বলে আখ্যাত করেছেন।

১৯০৮ সালে লিখিত গ্রন্থ এবং ইংলণ্ডের ওয়েম্বলীতে প্রদর্শিত বাংলার চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর রিভিউতে এ বিষয়ে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হ্যাভেল সাহেব সম্ভবতঃ ভারতীয়দের মধ্যে দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে তখন যে সচেতনতার অভাব ছিল এবং সে যুগে তার যে পুনর্জাগরণ হয়েছিল, আর অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-সাধনার ফলে যে নতুনতর ভাব-ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার কথাই বলেছেন। তিনি স্পষ্টতঃই জানতেন যে, অবনীন্দ্রনাথ মুঘল চিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং রাজস্থানী-পাহাড়ী চিত্রের গভীর আবেগ অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তিনি নকলনবিসি করেন নি। যা সৃষ্টি করলেন তার মধ্যে দেশী-বিদেশী, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কারোর কোনও স্মৃতিচিহ্ন আর রইল না।

তা সত্ত্বেও ভারতের মধ্যযুগীয় রাজস্থানী ও মুঘল চিত্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ হার্মান গোয়েট্‌স্‌ও অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। তাঁর মতে বাংলাদেশজাত আধুনিক চিত্র-পদ্ধতি বহুলাংশে অজন্তার চিত্রধারায় প্রভাবিত। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, অবনীন্দ্রনাথ কখনই অজন্তার চিত্র থেকে কোন উপাদান, লক্ষণাবলী ও ভাবভঙ্গী গ্রহণ করেন নি। তিনি কখনও অজন্তা ভ্রমণে যাননি। তিনি ছাত্রদের পাঠিয়েছিলেন লেডি হেরিংহামের কাজে সহায়তা ও উক্ত চিত্রের রস-রহস্য অনুশীলন করার জন্য। অজন্তার সাবলীল বলিষ্ঠ রেখারীতি ও বর্ণিকা ভঙ্গের কোন ক্ষীণ লক্ষণ বৈশিষ্ট্যও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকে প্রভাবিত করেনি। তাঁর ছাত্রদের কারোর মধ্যে গোড়ার দিকে তা মূল প্রেরণারূপে লক্ষণীয় হলেও, তাঁরা তা অবিলম্বে কাটিয়ে উঠে নিজ নিজ পন্থা ও পদ্ধতি তৈরী করে নিতে সক্ষম হন।

ভারত শিল্পবেত্তা, ডঃ স্টেলা ক্রামরীশ কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে কখনও 'Revivalist' বলেন নি। তিনি বরং বলেছেন—

"Abanindra Nath Tagore is the first modern Indian painter. His genius relies on his personal authority.······ He has not received it from any tradition.······The quest of Abanindra Nath Tagore was the meaning of Indian Art and how to make it an Indian painting."

কিন্তু মিঃ আর্চার বলেছেন—

"Abanindra Nath was sensitive tentative, gentle—a complement to Havell rather than a revolutionary—and in his painting his character stands revealed."

দেশীয় লেখকদের মধ্যে এ বিষয়ে অগ্রদূত হয়ে এগিয়ে এলেন ডঃ মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ। তিনি ডঃ আনন্দকুমার স্বামীর 'Introduction to Indian Art' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব লাভ করে 'Modern Indian Painting' নামে একটি অধ্যায় নিজ দায়িত্বে যুক্ত করে অবনীন্দ্র-চিত্র রীতিকে যে ভাবে নিছক revival-এর পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন তা ডঃ কুমারস্বামীর পুস্তকে বিধৃত হওয়া সঙ্গত হয়নি এবং বিভ্রান্তিকর হয়েছে। কারণ ডঃ কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতির সঙ্গে প্রারম্ভ থেকেই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি অবনীন্দ্র-চিত্রকে যোগ্য সম্মান দিতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। এই শতকের গোড়াতে যাঁরা অবনীন্দ্র-চিত্রের প্রচার ও উৎকর্ষ ব্যাখ্যানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন কুমারস্বামী তাঁদের অন্যতম।

১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে ডঃ কুমারস্বামী এলাহাবাদে Christian College-এ চিত্র সহযোগে একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন History of Indian Painting সম্বন্ধে। সেই বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশজাত নব্যচিত্র রীতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অবনীন্দ্রনাথের চয়নশীল মনোভঙ্গী অর্থাৎ বিভিন্ন দেশী-বিদেশী শিল্পাদর্শ থেকে গ্রহণ-বর্জনের কথা বলেছেন এবং দেশজ অনুপ্রেরণার মূল উৎস কোথায় তাও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু কোথাও বলেন নি যে, ইহা পুরাতনের নব-উত্থান মাত্র। বরং তিনি বলেছিলেন—

"It was unspoilt by other ideals, and had the genuine manner, though perhaps it was not so accomplished. The excellence and the power it had attained showed the astonishing way in which it had surmounted the great difficulties that faced it "

সেই সময়েই তিনি শিল্পাচার্য্যের 'বন্দিনী সীতা' ছবিটি সংগ্রহ করে নিয়ে যান। ছবিখানির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন তিনি এলাহাবাদের বক্তৃতায়। পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নির্দেশে ছবির নামকরণ করেছেন এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রতিফলিত

'Indianness'-কে সর্ব্বদাই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে মন্তব্যাদি করেছেন। গোড়ার দিকে আঙ্গিক-প্রকরণে যা দোষ-ত্রুটী লক্ষ্য করেছেন, তাও অকপটে বলে পথ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু কখনই কোন প্রসঙ্গে একথা বলেন নি যে, তাঁর কোন মৌলিক প্রতিভা ছিল না বা তিনি কেবল পুরাতনকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

অথচ তাঁরই লিখিত প্রখ্যাত গ্রন্থে একালের আধুনিক ভাবধারার অন্যতম প্রবক্তা লিখলেন যে, অতীতকে স্বীকার করা অন্যায় নয়; কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির মহতী ঐতিহ্যই দেশের মানুষের মধ্যে জাগরণ ও দেশাত্মবোধ এনে দিয়েছে। তারপরেই বলেছেন যে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাধর ছাত্রদের অজন্তার চিত্র কপি করা কোন কোন দিকে সুফলপ্রসূ হলেও তা আবার হয়েছে 'disastrous'। আর লেডি হ্যারিংহ্যামের অজন্তার অনুলিপি প্রস্তুতের মুখে যে শিল্প-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তাকে নবজাগরণ বলা হয় বটে, কিন্তু—"It would be more adequate to call it revival." তারপরেই তিনি ইংলণ্ডের প্রি-র‍্যাফেলাইট্ ভ্রাতৃসঙ্ঘের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত চিত্রান্দোলনের তুলনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। স্পষ্টতঃ তিনি এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত কোন সাদৃশ্য খুঁজে না পেলেও এই কথা লিখেছেন—

"But the whole atmosphere of both the movements was similar in Romantic escapist mentality of the chief actors, who were out, consciously, to revive the vigour of an earlier art period."

এখন প্রশ্ন হোল— ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কোন্ শিল্পধারাটিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন? কথার প্রত্যুত্তরে কথা সাজিয়ে এ বিষয়ে পূর্ণ সত্য আবিষ্কার ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ দুরূহ এবং প্রায় সম্ভাবনা বহির্ভূত। কারণ যাঁরা এই সকল বিরোধী মন্তব্য করেন, তাঁরা অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনার সমগ্র ধারা ও বিশিষ্টতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যোগ্য অবকাশ পাননি। কারণ তাঁর চিত্রাবলীর অনেক নিদর্শন, বিশেষতঃ তাঁর শিল্পী-জীবনের মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে ভাস্বর অনেক চিত্রকলা আজ সন্ধানের সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে। শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি যা তা সাধারণ রসিকজনের নাগালের মধ্যে নেই। কিছু প্রারম্ভিক ও শেষ পর্য্যায়ের নতুন পরীক্ষার চিহ্ন সম্বলিত চিত্ররাজি বিশেষ বিশেষ সংগ্রহে সংরক্ষিত হলেও, স্বাধ্য বিচার

বিশ্লেষণ করে যাচাই করার সুযোগ বিশেষ নেই। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের উচ্চাঙ্গের নিখুঁত প্রতিলিপির সংখ্যা অতি সামান্য। অধুনা নির্ম্মিত বর্ণপঞ্জীর প্রতিলিপি অত্যন্ত অপার্থক। তার মাধ্যমে ও পুস্তকে মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখে যাচাই করলে সুবিচার অপেক্ষা অধিকতর অবিচার হওয়ারই সম্ভাবনা। কার্য্যতঃ হয়েছেও তাই।

তাঁর চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও তার রসাস্বাদনের ধারাও চলেছে নানা ভিন্ন পথে ও পন্থায়। কোন কোনও সমালোচক বলেন, তিনি নতুন রীতির প্রবর্ত্তক। নিছক ঐতিহ্যানুগ শিল্পী নন। আবার অন্য মতাবলম্বীরা বলেন যে, তিনি নতুন সৃষ্টির প্রয়াস করেন নি। পুরাতনকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সাধারণ মানুষ ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধেই অধিকতর আগ্রহী। টেক্‌নিক্ ও স্টাইল সম্বন্ধে তাঁদের কোন আগ্রহ থাকে না।

তাঁর চিত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে যে, ভারতবর্ষে নবজাগরণোত্তর কালে আর্ট সম্বন্ধে তিনিই প্রথম নবচেতনা ও জাগৃতি সঞ্চার করেন। তিনি দেশের মানুষের সুপ্ত সৌন্দর্য্য-চেতনার রুদ্ধদ্বারে আঘাত করে দেশীয় ভাব-ভাবনা ও রূপাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। কিন্তু অতীতকে, বিস্মৃতকে আবার ঠিক সেইভাবই এনে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যে তাঁর অনুরাগ-আকর্ষণ তা কিছু পরিমাণে রোমাণ্টিক ভাবধারা সম্বন্ধীয়। তাহলেও তাঁর কাব্যময় রূপসাধনাপদ্ধতি তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতেই চলেছিল বরাবর। এই প্রসঙ্গে ডঃ ক্রামরীশের আর একটি মন্তব্য উল্লেখনীয়। তিনি বলেছেন—

"He had to look back in order to remember. In pictures he brought the India of his own vision before the modern minds in Calcutta and other towns."[১]

এই প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য বিষয় এই যে, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বিধৃত চিরায়ত নিয়ম-সূত্রাবলীকে অধীত ও আয়ত্ত করেছিলেন পূর্ণরূপে। তাকে ভাষান্তরিত করে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাও করেছেন অতি প্রাঞ্জলভাবে। 'ষড়ঙ্গ' ও Artistic Anatomy তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু শিল্পী হিসেবে তিনি কখনও সেই 'কারিকা' অনুযায়ী রূপ রচনা করেন নি।

তিনি পুরাতনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না।

১. Visva-Bharati Quarterly (May, 1942)

কিন্তু প্রাচীনকে পুনরাবর্ত্তন করানোও সমর্থন করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মত তিনি প্রকাশ করেছেন অতি সরল ভাষায়—

"মানুষের বয়সের যেমন পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় না তেমনি শিল্পের ক্রিয়া যে সময়ে একটা সপ্তম আশ্চর্য্য সৃষ্টি করলে তার পুনরাবৃত্তি হবে না আর, হয়ত হবে অষ্টম আশ্চর্য্য প্রকাশ, এর মধ্যে বহুযুগ কাটবে।"[১]

এই উক্তির তাৎপর্য্য ধরে বলা যায় যে, প্রতিভাদীপ্ত কোন সৃষ্টি কর্ম্মের কখনও পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। যেখানে যথার্থ প্রতিভা, সেখানে নতুন সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এই সূত্রে আলোচনার যোগ্য। জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে দেশের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব বিষয়ে একদা নতুন ভাবধারার প্রবল বেগ আসে। সেখানে অতীতের উচ্চ আদর্শ-সমূহ জাতীয় ভাব-ভাবনা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল নিশ্চয়ই। জাতীয়তাবাদী জনসমাজ অবশ্যই অতীত ভারতের উন্নত ক্রিয়াকলাপ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা বলা সঙ্গত হবে না যে, তাঁরা প্রাচীনকে সামগ্রিকভাবে ফিরিয়ে এনে এ যুগের জীবন ও কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। পরন্তু সেখানে এগিয়ে চলার, প্রগতির পথ তৈরী করার ও জীবনকে নতুনরূপে গঠন করার চেষ্টাই ছিল বেশী। সেক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের কোন প্রভেদ পার্থক্য বিবেচিত হয়নি। আধুনিকতা ও প্রগতিবাদের প্রতিভূ ভারতের বিশেষ এক জনসমাজ এই বিষয়ে বিদেশ থেকেও যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেন। কেবলমাত্র দেশের প্রাচীন ধারাকে অবলম্বন করেই প্রগতির পথে তাঁরা অগ্রসর হননি।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-চর্চ্চা সম্বন্ধেও এই একই কথা। তাঁর মৌলিক প্রতিভা যে কত উচ্চ পর্য্যায়ের এবং তা যে প্রাচীন ও সমকালীন কোন আদর্শ নিদর্শনকে অনুকরণ করার পথে চলেনি তার আরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্যকৃতিতে।

অবনীন্দ্র-সাহিত্য তাঁর নিজ খেয়াল, অসীম কল্পনা, আনন্দানুভূতি, রসোল্লাস এবং রচনা সৌকর্য্যের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে অনন্য ও অসাধারণ। তাঁর চিত্রকলা ও সাহিত্য-রচনা এক ভাবসূত্রে গ্রথিত এবং এক প্রাণধর্ম্মে পুষ্ট। তাঁর শিশু-সাহিত্য সম্পূর্ণ চিত্রধর্ম্মী একটি বিশাল কল্পনার রাজ্যের সন্ধান দেয়। তাঁর সমুদয় সাহিত্যের পশ্চাতেই রয়েছে চিত্রকল্পের প্রভাব। শিশু ও কিশোরদের

১. শিল্পায়ণ—৮: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্য যা লিখেছেন এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত জাতীয় রচনাবলী সমস্তই পুরোমাত্রায় চিত্রানুগ। তার ভাব, ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও চিন্তাধারা কোন দিকেই রবীন্দ্রানুসারী কোন চেষ্টা চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই। অতএব নিজ পরিবারে যাঁর উৎসাহ-প্রেরণার প্রাণস্পর্শ ছিল, তাঁর সব কাজের মূলে, সেই 'রবিকা'-র প্রভাবমুক্ত হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অনন্যতা রক্ষণে সমর্থ হলেন, আর মুখ্য জীবন-সাধনা যে চিত্রাঙ্কন তাতে অপর কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিকে পুরো স্বীকার করেছেন বা প্রাচীনকেই মাত্র পুনঃ সঞ্জীবিত করেছেন, এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে যে দেশের মাটিতে জীবনবৃক্ষের মূল প্রোথিত, যেখানকার ঐতিহ্য-রসে প্রাণসত্তা পরিপুষ্ট তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জীবন-সাধনা প্রকৃত মানবধর্ম্ম নয়।

অবনীন্দ্রনাথ নতুন যুগে ভারতীয় চিত্রকলাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন কিনা—এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় চমৎকার একটি জবাব দিয়েছেন—

"Abanindra Nath has created nothing in Indian traditional line. But by dint of his wonderful talent he effected a fusion of western and oriental technique and evolved a new style in painting."[১]

এই বিষয়ে প্রখ্যাত কলা-সমালোচক ও. সি. গাঙ্গুলীর একটি মন্তব্যও উদ্ধৃতির যোগ্য। তিনি লেখেন—

"Many people wrongly believe that he is a Revivalist, repeating the formulas of the ancient school of painting. His genius consists of an uncanny power of assimilating methods and manners from all countries and schools. He has freely adapted secrets of pictorial art from East Asiatic as well as from European masters in a liberal spirit of eclecticism and in his experimental creations he has used and utilized both eastern and western points of view in a mysterious fusion of a happy and well assimilated harmony."[২]

১, Visva-Bharati Quarterly (May, 1942)

২. Visva-Bharati Quarterly (May, 1942)

অবনীন্দ্রনাথ যে নিছক পুনঃ প্রবর্ত্তনকারী ছিলেন না সে সম্বন্ধে আরও কিছু যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার অবতারণা করা যাক্।

সর্ব্বাগ্রে উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, মৃতকে সঞ্জীবিত করলে ও ভাঙ্গাচোরাকে জোড়াতালি দিয়ে নতুন করলে তার মৌল রূপটি, গোড়ার কাঠামোটি পরিবর্ত্তিত হয় না। অবনীন্দ্রনাথ যদি জীর্ণ পুরানো রীতি-পদ্ধতিকেই নতুন করে রূপায়ণ কর্ম্মে প্রয়োগ করতেন, তা'হলে চিত্রের চেহারা-চরিত্রে তার কিছু না কিছু আমেজ-আভাস পরিলক্ষিত হোত।

অযৌক্তিকতায় ভর করে বলা যেতে পারে যে, তিনি রাজস্থানী-পাহাড়ী চিত্রের মত কৃষ্ণলীলা এঁকেছেন, অজন্তার ন্যায় বুদ্ধের জীবনালেখ্য করেছেন রচনা, আর মুঘল চিত্রের মত বাদশা-বেগমের রূপ কল্পনা করেছেন।

এই সকল বিষয়ে চিত্রাঙ্কন করেছেন ঠিকই, তবে তা কোন পূর্ব্ব আদর্শকে অনুসরণ করে করেন নি। প্রথম কৃষ্ণলীলার রূপ দিতে বসে দিনরাত অদম্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন নতুন পথ ও পন্থা আবিষ্কারের জন্য। নিজেই বলেছেন—দারুণ অতৃপ্তিতে তখন দিন কাটতো তাঁর। কৃষ্ণলীলার প্রথম চিত্র কল্পনায় মূর্ত্তির দেহরূপ রচনা, তুলি চালনা ইত্যাদিতে কিছু দুর্ব্বলতার ছাপ প্রস্ফুট হলেও পুরাতনকে অনুকরণের কোন চিহ্ন নেই। বিষয়-বিন্যাস, স্থাপত্য সংস্থান ও নরনারীর রূপ রচনাতেও তিনি নিজস্বতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। রাজস্থানী ও পাহাড়ীশৈলীর কৃষ্ণ-কাহিনীর চিত্রাপেক্ষা ইহা ভিন্ন রূপের ও ভিন্ন স্বাদের। আর এই চিত্র সিরিজের back ground, প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ গাছপালা, আকাশ মাটির রূপাঙ্কনে শিল্পীর পাশ্চাত্য প্রথায় আদি শিক্ষা কিছু ক্রিয়াশীল হওয়াতে সেখানে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও স্বতন্ত্র মনোহারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে যে জামা পোশাক ও ভাবভঙ্গীতে কোথায় যেন পুরোনো ছবির মত লক্ষণ আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মৌল আদর্শ জানা থাকলে এবং তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে এই সারূপ্যের যুক্তি উপলব্ধি করা কঠিন নয়। কারণ অবনীন্দ্রনাথ যখন কৃষ্ণলীলার এই রূপাবলী রচনা করেছেন তখন ভারতের আত্মা ও সংস্কৃতি তার স্বরূপ ত্যাগ করেনি। মূল জন-জীবনে আজও তা অপরিবর্ত্তিত। সুতরাং ভারতের ধর্ম্মীয় বা সামাজিক বিষয়ের রূপারোপে দেশীয় পরিবেশ, চিন্তা ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রতিফলন অনিবার্য্য। তাঁর কৃষ্ণলীলার চিত্র সিরিজকে কাংড়ার প্রখ্যাত কৃষ্ণ-কাহিনী ও ভাগবত ধর্ম্মীয় চিত্রের সঙ্গে চাক্ষুষভাবে তুলনা করলে একটি বিষয় অবশ্যই সুস্পষ্ট হবে যে, বিষয়বস্তু এক হলেও ভাবে কল্পনায়, রূপ-রচনায় ও আঙ্গিক

প্রকরণে উভয় চিত্র কত ভিন্নধর্ম্মী এবং অবনীন্দ্রনাথের চিত্রনিচয় একেবারে মৌলিকত্ব বর্জিত নয়। এবং মধ্যযুগীয় চিত্রের পুনরাবৃত্তির পথে তিনি চলেন নি।

বুদ্ধ সুজাতা এঁকেছেন তিনি। তার মধ্যেও প্রাচীন ভাস্কর্য্য বা চিত্রের কোন আদল আভাস নেই। তা সম্পূর্ণ মৌলিক। কৃষ্ণলীলার পরবর্তী চিত্রে, বিশেষ করে সুজাতার মূর্ত্তি রূপায়ণ এবং দীপাবলী, অভিসারিকা প্রভৃতি চিত্র রচনার সময়ে তিনি উত্তর ভারতীয় বেশ-বাস সমন্বিতা একটি বিশেষ ধরনের নিজস্ব কল্পনার নারীরূপ প্রবর্ত্তন করেছিলেন যার সঙ্গে মধ্য যুগীয় কোন চিত্রশৈলীর নারীরূপের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। রঙ-রেখার প্রয়োগেও কোন অনুকরণের চিহ্ন দেখা যায় না। বুদ্ধ সুজাতার চিত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছপালা ও মূর্ত্তির দেহসজ্জায় বরং পাশ্চাত্য-রীতির আলোছায়াপাত বা ওজন সম্পন্ন বর্ণালির প্রয়োগ দেখা যায় যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু অজন্তা-রীতির ক্ষীণতম আভাস-ইঙ্গিত সেখানে নেই।

ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিত্রশৈলী সমূহের বিশিষ্টতা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি যুগের প্রতিটি শৈলীর লক্ষণাবলী যেন ছকে বাঁধা। সুনির্দিষ্ট ফরমুলা অনুযায়ী সব কিছুর রূপারোপের প্রথা। যুগানুসারে ও শৈলীভেদে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করা খুব সহজ। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সহস্র ছবিকে সহস্রধারায় ভাগ করা যায়। প্রতিটি চিত্র স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা সম্পন্ন। এক একটি চিত্রে এক এক প্রকার ভাবভঙ্গী, রঙ-রেখার খেলা চলেছিল স্বতন্ত্র পথে ও পন্থায়।

রেখাই ভারতীয় চিত্রের প্রাণ। অবনীন্দ্রনাথও শুরু থেকে সেই আদর্শ গ্রহণ করে রেখার সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর তা স্বতন্ত্র কারুকৌশল সম্পন্ন এবং তা দেখে তাঁকে 'Revivalist' বলা চলে না। বরং বলা যায় যে তিনি অধিকাংশ ছবিতে জলে ধোয়া রীতির মাধ্যমে রেখা রচনায় নতুনতর অদ্ভুতঃএক কোমল ও অস্পষ্ট মাধুর্য্যের প্রবাহ এনে দিয়েছেন।

এখন colour scheme-এ আসা যাক্। রাজস্থানী, পাহাড়ী, মুঘল ও পালযুগীয় চিত্রে রঙের সংমিশ্রণ অর্থাৎ colour blending যাকে বলা হয় তাতে চড়া সুরের উজ্জ্বল ও ঘন বর্ণের প্রয়োগ বেশী। মনুষ্য মূর্ত্তির দেহরূপ, ভাবভঙ্গী ও অভিব্যক্তি প্রায় প্রতিটি ছবিতে সমভাবাপন্ন। আর অবনীন্দ্র-চিত্রের মুখ্য বিশিষ্টতা হোল—রঙে-রঙে মিতালি, রেখা-বর্ণে সুরের

একতান। Tempera colour-এর ব্যবহার বিশেষ নেই। নানা রঙের মিলনে-মিশ্রণে কুহেলিকা সৃষ্টি, স্বপ্নের জগতে বিচরণ। রঙের মৌল রূপকে শত ধৌত করে স্তিমিত রূপে পরতে-পরতে তাকে কাগজে-পটে ধরিয়ে দিয়ে তিনি গভীর ভাব এনেছেন, মায়ার খেলা খেলেছেন অনবরত।

আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। মধ্যযুগীয় চিত্রে বস্তুভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক প্রথায় কল্পিত। গাছপালা, পাহাড়, মাটি, জল, আকাশ সমস্ত কিছু ছকে বাঁধা। অনেক সময় মনে হয় যেন একটি নকশা থেকে ট্রেস্ করে ড্রইং-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর 'থাকা'র মাধ্যমে তা করার প্রথা রাজস্থানী চিত্রে একদা ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে কিন্তু দৃশ্যপট রচনায় বা অন্যান্য বিষয়ে কোথাও গতানুগতিক রীতিতে আলঙ্কারিক ভাবধারার প্রয়োগ হয়নি। তিনি দৃশ্যমান জগতের নানা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে নিজের মনের ভাব রসে সঞ্জীবিত করে প্রকৃতির রূপ রচনা করেছেন। তা পুরো বাস্তববাদী নয়, আবার অবাস্তব রূপের আলঙ্কারিকও নয়। রাজস্থানী, মুঘল, পাহাড়ী ও পাল যুগের চিত্রে দেখা যায়—গাছ, পাহাড়-পর্ব্বত, তৃণ ঘাস, পুষ্পগুচ্ছ, জলধারা, জলের ঘূর্ণিপাক, পোশাক-আসাকের নকশা, প্যাটার্ণ বিশেষ একটি ধরনে ও রূপাকৃতিতে চিরকল্পিত। ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে বিষয়, আখ্যান ও ব্যক্তিসত্তা স্বতন্ত্র হলেও, উপযুক্ত বিষয়গুলিতে কোন প্রভেদ বা পার্থক্য নেই। সেখানে এক একটি বিশেষ স্কুল বা শৈলী লক্ষণাকে চিহ্নিত করা আয়াসসাধ্য বিষয় নয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের দেহরূপ রচনা, প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের অবতারণা ও অনুষঙ্গ সৃষ্টিতে গতানুগতিকতা ও একঘেঁয়েমির কোনও প্রশ্ন নেই। চিত্রার্পিত বিষয় স্বতন্ত্র, ভাববুদ্ধির প্রতিফলনও আলাদা। বিষয়বস্তু এক হলেও শেষ পর্য্যায়ের অনেক চিত্রে ভিন্নতর ভাব আনয়নেও সার্থক প্রচেষ্টার ছাপ দেখা যায়। গোড়ার দিকে কৃষ্ণলীলার চিত্রগুচ্ছ একই ভাবধারা ও টেক্‌নিকের যে সৃষ্টি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই প্রথম প্রচেষ্টা ও দুরন্তভাবে নতুনের সন্ধানে চলার সময় কাটিয়ে পরবর্তীকালে যা রচনা করলেন তার প্রতিটি চিত্রে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। ক্রমশঃ তিনি যখন সিদ্ধির পথে এগিয়ে গেলেন তখনকার রচনাসমূহ যুগপৎ গভীর ভাবময়, রহস্যঘন, বুদ্ধিদীপ্ত, আবার হৃদয় সংবেদ্যে পরিপূর্ণ। মনুষ্য মূর্ত্তিতেও যে কত ভাব-ভঙ্গী, কতশত রূপারোপ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তারা আমাদের চেনা মহলের হয়েও যেন অজানা, অচেনা। ছেলেবেলা থেকে যেখানে যা দেখেছেন তার রূপস্মৃতিকে তিনি

অভিনব পন্থায় পটের বুকে ধরে দিয়েছেন। নিজেই বলেছেন, "সেই কবে দেখেছি এখানে-ওখানে যেটুকু মনে ধরেছিল তাই দিলুম পটের গায়ে ধরে।" জগত ও জীবন, দেশ ও সমাজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তিনি আবাল্য ছিলেন গৃহ পরিবার, প্রাকৃতিক পরিবেশ-আবেষ্টনী ও সমাজ-সংসার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তার ফলে সেকালের কথা রূপায়ণ করতে গিয়ে একাল ও আশপাশের বিষয়বস্তুকে অনেক সময় বর্জন করতে পারেন নি।

প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর বিষয় রূপায়ণে তাঁর আগ্রহ অধিক ছিল ঠিকই কিন্তু সেই চিত্রায়ণে তিনি প্রাচীনপন্থী হয়ে বা প্রাচীনের দিকে মুখ করে কখনও চলেন নি। মেঘদূত ও ঋতুসংহারের চিত্রাবলী তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ঘাড়োয়ালী চিত্রশৈলীতে রুক্মিণীর আখ্যান চিত্র বস্তুতঃই সুন্দর ও সার্থক। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ রুক্মিণীর রূপাঙ্কনে মধ্যযুগীয় চিত্রের ভাব ও লক্ষণাকে আদৌ অনুকরণ করেন নি। তাঁর রচিত রুক্মিণীর বেশবাস স্বতন্ত্র এবং নেহাত ঘরোয়া ভাবের রূপ ও ভাবভঙ্গী। বিগত যুগের আদর্শ অনুসরণ না করে, পুরোনো দিনের স্মৃতিমন্থন না করে, তিনি এই জাতীয় চিত্র এঁকেছেন প্রচুর।

তাঁর মুঘল বিষয়ক চিত্র সম্পর্কেও এই একই কথা। মুঘল চিত্র অনুশীলনের পথ ধরেই তাঁর দেশীয় ও নিজস্ব চিত্ররাজ্যে প্রথম প্রবেশ। কিন্তু শিল্পী-জীবনের উষালগ্ন কাটিয়ে মধ্যাহ্নের দিকে মুখ করে, তিনি আবার যে নতুন এক সিরিজ মুঘল বিষয়ক চিত্র করেছিলেন, তার সঙ্গে সমসাময়িক মুঘল চিত্র কেন তাঁর নিজের প্রারম্ভিক মুঘল বিষয়ের ছবিরও কোন সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চিত্রে দেখা যায় মুঘল বাদশা-বেগম আবার নতুন এক রূপ ও মহিমা মর্য্যাদায় উপস্থিত। তিনি যে ভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর মানস কল্পনায় তাঁরা যে রূপে ও ভাবে ধরা দিয়েছিলেন, তিনি সেই রকমটিতেই তাঁদের চিত্রপটে উপস্থিত করেছেন। মুঘল যুগের চিত্র বাস্তববাদী, ব্যক্তিসত্তার রূপায়ণ ও চরিত্র-চিত্রণের চেয়েও সেখানে রাজৈশ্বর্য্যের প্রকাশ বেশী। বর্ণবাহার ও সাধারণ জাঁক-জমক জলুসের সমাবেশ অধিকতর। তুলি-কলমের মুনশীয়ানা সেখানে সুপ্রতুল।

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু সে পথে যাননি। ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের বালাই না রেখে, অলঙ্কারভূষণ নামমাত্র যোজনা করে, 'বিরল বিচিত্রতা'র পথ ধরে সূক্ষ্মরেখা ও পটকে জলে ধুয়ে বর্ণের মায়াজালে মুঘল বাদশা-বেগমদের যে চিত্র রচনা করলেন, তা এক একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই শতকের গোড়াতে 'শাজাহানের

মৃত্যু' ছবিটিতে মুঘল স্থাপত্যের অলঙ্করণ-রীতি অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তার আর কোন চিহ্ন পড়েনি কোথাও।

মুঘল রেখা রচনা colligraphic, অর্থাৎ সাবধানে ধরে ধরে আঁকা। আর অবনীন্দ্রনাথের রেখা-ভঙ্গী যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি ছন্দায়িত। মুঘল চিত্রের বর্ণ-রঞ্জনের রীতিও স্বতন্ত্র। সেখানে Tempera বা গাঢ় রঙের প্রয়োগ বেশী। আর অবনীন্দ্রনাথ রঙকে শত ধৌত করে তাতে গভীরতা সৃষ্টিরই প্রয়াস করেছেন।

বিরোধী মতাবলম্বীদের যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে আবার কৃষ্ণকথায় একটু ফিরে যাওয়া যাক্। শিল্পীর জীবন-সূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে দীপ্যমান, তখন তিনি আবার কয়েকখানি কৃষ্ণ-কাহিনীর চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। সে এক নতুন পর্ব্ব। অভিনব তার রূপবৈচিত্র্য, আঙ্গিক রীতি চূড়ান্তভাবে নবতর ও পরিপক্ক এবং স্বকীয়তার সার্থক নিদর্শন। কোন কোনও চিত্রে ভাবের গভীরতা অতলাস্তিক। যেমন, সচকিতা রাধা ও দাসখৎ। এছাড়া এই সিরিজে আরও আছে—পুষ্প রাধা, রাধার চিত্র দর্শন প্রভৃতি ছবি। এই সকল চিত্রে শিল্পী এমন রেখাবর্ণের চাতুর্য্য দেখিয়েছেন, যার তুলনা একাল, সেকাল, প্রাচীন ও মধ্য কোন যুগেই মেলে না। জগদ্বিখ্যাত কাংড়া ও বাশোঁলী কলমের রাধাকৃষ্ণ যে জগতের অধিবাসী অবনীন্দ্রনাথ সে জগতের সন্ধান করেন নি। শিল্পী-জীবনের সন্ধ্যা-সমাগমে তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার রূপদান করলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতিতে। কৃষ্ণ-কাহিনীর রূপায়ণ হয়েছে তিন পর্য্যায়ে। আর তা পুরোপুরি ভিন্নাদর্শের ও স্বতন্ত্র রীতির। প্রতিটি পর্য্যায়ের মধ্যে পনের থেকে বিশ বছর আন্দাজ সময়ের ব্যবধান। এই ব্যবধানে যেখানে নিজের বিগত রীতি-পদ্ধতির এতটুকু প্রভাব স্পর্শ পড়েনি, সেক্ষেত্রে শত শত বছরের ব্যবধানযুক্ত প্রাচীন শিল্পাদর্শের কি চিহ্ন-চেষ্টার ছাপ দেখা গেল তা ছবি ধরে ধরে বিশ্লেষণের বিষয়।

তিনি প্রাচীন কাব্য-কাহিনীর ছবি যেমন এঁকেছেন, তেমনি এ যুগের অনেক গ্রন্থ-পুস্তকের জন্য illustration হিসেবেও অনেক ছবি করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছ ব্যতীত ভগিনী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থনিচয়ের চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পুঁথি চিত্রায়ণেও তিনি মধ্যযুগের ভারতীয় পুঁথিচিত্রের কোন আদর্শ অনুভাবকে গ্রহণ করেন নি।

ওমর খৈয়ামের চিত্রাঙ্কনে তিনি আর এক নতুন মনুষ্যমূর্তির Type সৃষ্টির শক্তির পরিচয় দিলেন ১৯০৭-৮ সালের মধ্যেই। চেহারা আকৃতি সমস্ত কিছু

নতুনের স্পর্শে সঞ্জীবিত। ইরাণ দেশের কবির রচনার রূপচিত্র আঁকলেন, কিন্তু চিত্রের সুন্দর চিত্তহারী বর্ণবাহার ও দেহাকৃতিকে বা মুঘল-শৈলীর বিশিষ্টতাকে পারসীক গ্রহণ ও আরোপ করেন নি। জলেধোয়া রীতির মাধ্যমে চিত্রপটে ভাবের গভীরতা ও রূপবৈচিত্র্য আনয়নই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতার রূপায়ণও তাঁর স্বকীয়তায় সমুজ্জল। সে চিত্র কবির কবিতার প্রাণধর্মের নিষিক্ত রূপ। কোন পূর্ব্বসূরীর প্রভাব-পুষ্ট চিত্র নয়। নিবেদিতার গ্রন্থে বৌদ্ধকাহিনীর যে রূপদান করেছেন তা তাঁর প্রারম্ভিক বুদ্ধ-সুজাতার সঙ্গেও সমগোত্রীয় নয়। এই বৌদ্ধচিত্র আবার এক নতুন রূপসাধনা ও ভাব-ভাবনার ফলশ্রুতি। প্রাচীন পাষাণ ফলক ও প্রাচীর-চিত্রের সীমা পেরিয়ে তা শিল্পের নতুন রাজ্য গঠনে প্রয়াসী।

'চার্ম অব্ কাশ্মীর' গ্রন্থে তিনি যে চিত্রাঙ্কন করে দিয়েছেন, তাও তাঁর মানসনেত্রে দেখা ও হৃদয়ানুভূতিতে পাওয়া এক নতুন রূপের প্রতিফলন। প্রকৃতির রূপ রচনায় যে তিনি কতখানি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা কাশ্মীর ভ্রমণ করেছেন যাঁরা তাঁদের কাছে অবশ্যই বিস্ময়ের বিষয়।

Fairy Tales-এর ছবি সম্বন্ধেও সেই মৌলিক গুণের কথা উল্লেখনীয়। প্রতিটি চিত্রে স্বতন্ত্র করণ-কৌশল প্রয়োগ করে তিনি গল্পের মূল সুর যেমন এনে দিয়েছেন, তেমনি প্রকাশ করেছেন আবহমণ্ডল। যেখানে গ্রামীণ জীবনের কথা ও কাহিনী, সে চিত্র আরও আকর্ষণীয় ও রমণীয়। আজন্ম শহরের জীবন-যাপন করে তিনি যে গ্রামীণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, গ্রামের সামাজিক জীবনের যে বাস্তব চিত্র এঁকেছেন তা যেমন মৌলিক, তেমনি বাস্তব। আর তা ততোধিক প্রতিভাদীপ্ত।

পশুপাখীর চিত্র এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ অগণিত। তার মধ্যেও ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের কোন যুগানুসারী প্রভাব প্রতিপত্তির চিহ্ন নেই। পশুপাখীর চিত্রের মধ্যে কিছু সংখ্যক বরং বাস্তবধর্ম্মী। একই পাখীকে কত বিচিত্ররূপে তিনি চিত্রার্পিত করেছেন! যেমন, ময়ূর পাখী। তিনচার রকমের ময়ূর এঁকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের প্রকাশনা দেখিয়েছেন। 'উটের মৃত্যু' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটি। মুঘলচিত্রেও উটের রূপ খুব জীবন্ত ও সুন্দর। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের উট মুঘলাই ছবির কপি নয়।

আরব্য রজনীর চিত্রমালার দুই একটি নিদর্শনে মানুষের সঙ্গী যে পশুর পাল তার রূপবৈচিত্র্য অঢেল। মানুষের সঙ্গে তাদের মানানসই করে তিনি কোমলভাবের আরোপ করেছেন। আরব্য রজনীর চিত্রে তিনি মানুষের রূপ

যা দেখিয়েছেন, তা বহু বিচিত্রতার পথ ধরে চূড়ান্ত বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিয়েছে।

তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং সবকিছুকেই আত্মসাৎ করে নতুন সৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তিনি পুরাতনকে পুনরাবর্ত্তনের চেষ্টা করেন নি। স্বদেশের মাটির রস নিষ্কাশন করে, দেশজ শিল্পরসধারায় স্নাত হয়ে, অজস্র ও বিচিত্র ভঙ্গীতে যে সংখ্যাতীত সৃষ্টি সম্পদের শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, সেখানে তিনি সার্ব্বভৌম ও স্বরাট্। তাঁর চিত্ররীতি একান্তভাবে তাঁরই আত্মসম্পদ।

চিত্রাঙ্কন, পুতুল গড়া ও সাহিত্য রচনা ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভা আরও একটি দিকে অতি চমৎকারভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। তা হচ্ছে নাটকাভিনয়, এস্রাজে সুরসঞ্চার, নাট্যমঞ্চের পরিকল্পনা ও নাটকে বর্ণিত চরিত্রসমূহের রূপসজ্জা সম্বন্ধে নির্দেশনা। নানা রসের ও নানা স্বাদের যাত্রার পালাও লিখেছেন তিনি বহু সংখ্যক। তার মধ্যে তাঁর সাহিত্য-কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের গান, আর তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের এস্রাজের সুর ও তাল তখনকার শ্রোতাদের মনে অবিরত আনন্দ দিয়েছে। কবিগুরুর নাটকাভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ অনেকবার অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি অভিনয়ই বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কোন কোনও চরিত্রে তাঁর অভিনয় নাট্যকলার ইতিহাসে স্থান লাভেরও যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

অভিনয়কলায় অবনীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য ও নাট্যকলার প্রয়োগ কৌশলে তাঁর যে অবদান সে সম্বন্ধে যতটুকু যা জানা যায় তা তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থেই প্রায় নিবদ্ধ। তার বাইরে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে যাঁরা তাঁর নাটকাভিনয় দেখেছেন, তাঁদের কাছে। কিন্তু এখন সেই রকম প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যাও যেমন স্বল্প, তেমনি তদুপায়ে অভিনয়ের সময় কাল ও তাঁর নাট্যপ্রতিভার যথার্থ প্রকৃতি, লক্ষণ ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভের অবকাশ অত্যন্ত সীমিত।

অতএব, শিল্পীর স্মৃতিচারণ-এ বিধৃত সামান্য উপাদান অবলম্বনেই তাঁর অভিনেতা ও শিল্প-উপদেষ্টার রূপটি রচনা করতে হবে। তবে এই প্রকারে তাঁর শিল্পী-জীবনের আর একটি স্বতন্ত্র আলেখ্য রচনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ তিনি স্মৃতিমন্থনকালে কোন ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়কালের দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু বলেন নি বা লেখেন নি। এই বিষয়ে তাঁর ভাবাদর্শ ছিল ভিন্নতর।

ঠাকুরবাড়ীতে গানবাজনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারুকলার চর্চা প্রাক্-অবনীন্দ্র যুগেও ছিল পুরোমাত্রায়। অবনীন্দ্রনাথের পিতা ছবি আঁকতেন, গানবাজনার আসর বসাতেন নিয়মিত। বাড়ীর দোতলার হলে থিয়েটারেরও আয়োজন করেছিলেন দু-একবার। বালক অবনীন্দ্রনাথ সেই পরিবেশেই মানুষ। কালক্রমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হয়েই অবনীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্যের

পথে অগ্রসর হয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভার বিভিন্নমুখী বিচিত্র বিকাশের মূলে কবির প্রেরণা সুবিদিত।

যতদূর জানা যায় 'খামখেয়ালি সভা'র আগেই কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় হয়েছিল মহর্ষি ভবনে। তখনকার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কোন্ চরিত্রে তা সঠিক জানা যায় না। স্টেজ রচনা ও সীন আঁকবার দায়িত্ব পড়েছিল 'হ.চ.হ'-র (হরিশচন্দ্র হালদার) উপরে। তরুণ অবনীন্দ্রনাথ তখন তাঁর সহযোগীরূপে কাজ করেছিলেন। সাহেব পেণ্টার এনে সীন্ আঁকানো হয়। আর ইলোরা গুহার স্তম্ভ অনুকরণ করে কালী মন্দির তৈরী হয়েছিল। মুঘল পেণ্টিং দেখে রাজসভা নির্ম্মাণ করেছিলেন। সেই দিনটিই মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের প্রথম নাটকাভিনয় ও মঞ্চসজ্জার কাজে অংশ গ্রহণ।

অবনীন্দ্রনাথ স্কুল ছেড়েছেন, বিয়েও করেছেন, অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স প্রায় আঠার বছর। সেই সময় আর একটি ড্রামাটিক ক্লাবের পত্তন হয় তাঁদের বাড়ীতে। একবার সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' অভিনীত হয়। তাতেও অবনীন্দ্রনাথ ব্রজদুর্লভের ভূমিকায় অভিনয় করেন। উক্ত নাটকে তিনি পিস্‌নী দাসীর পার্টও নিয়েছিলেন। কিরকম পোশাক পরে তিনি ব্রজদুর্লভ সেজে স্টেজে নেমেছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁর নিজের ফুলশয্যার 'নীল গাজে'র জামা। বুকে সোনার গার্ড-চেন, কোঁচানো ধুতির কোঁচাটি ফুলের মত করে বুক-পকেটে গোঁজা। শিঙের ছড়ি হাতে নিয়ে সেটি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজে ঢুকেছিলেন। সেই পার্টে রবীন্দ্রনাথের সুরে একটি গান ছিল—

আগে কী জানি বল
নারীর প্রাণে সয়গো এত
কাঁদাব মনে করি
ছি ছি সখি কাঁদি কত।

রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সুরে অবনীন্দ্রনাথ সেই গান গাইতে পারবেন না বলতে নিজের সুরে গাইবার অনুমতি পেয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রাধানাথ দত্ত নামে সুরাসক্ত একটি লোক প্রায়ই তাঁদের ওখানে আসতেন। তাঁকে তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে গান করতে শুনেছিলেন। আর তিনি হাতের

ছড়িটি ঘুরিয়ে চলতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠিক তাঁর মত করে গান গেয়েছিলেন এবং স্টেজেও প্রবেশ করেছিলেন সেইভাবে। গানের অংশ—

আয় কে তোরা যাবিলো সই
আনতে বারি সরোবরে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"এই দুই লাইন গাইতেই চারদিক থেকে হাততালির উপর হাততালি। রাধাবাবুর মুখ গম্ভীর। সবাই খুব বাহবা দিলে। রবিকাকা খুব খুশি, বেড়ে করেছ অবন, ও গানটা যা হয়েছে চমৎকার। আর সত্যিই আমি খুব ভালো অভিনয় করেছিলুম।"

কিন্তু তাঁদের ড্রামাটিক ক্লাব আর বেশীদিন টিকলো না, ভেঙে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন একটু খেয়ালী ধরনের মানুষ। নিজের খেয়ালে চলতে ভালবাসতেন। কৈশোর থেকে অনেক দিন নিয়মিত লেখাপড়া ও চিত্রকর্ম্ম করেন নি। ছেলেবেলায় যেমন ছিলেন দুরন্ত, তেমনি জিদী। বড় হয়েও সে ভাব তাঁর কাটেনি অনেক কাল। রবীন্দ্রনাথও বলতেন—'অবন একটা পাগলা'।

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ও নির্দেশেই অবনীন্দ্রনাথ একবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'-র তিনকড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অভিনয়াংশে এই কথাটি ছিল, "জন্মে অবধি আমার জন্যেও কেউ ভাবেনি, আমিও কারো জন্য ভাবতে শিখিনি।"

তিনকড়ির পার্টে অভিনয় প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য অতি সরল ও সুন্দর। তিনি নিজেই বলেছেন—

"এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের রূপ। রবি-কা আমাকে ঠিক ধরেছিলেন তাইতো তিনকড়ির পার্ট অমন আশ্চর্য্যরকম মিলে গিয়েছিল আমার চরিত্রের সঙ্গে। ওসব জিনিস অ্যাক্টিং করে হয় না। করুকতো কেউ তিনকড়ির পার্ট, আমার মত আর হবে না। ওই তিনকড়িই হচ্ছে আমার আসল রূপ।"[১]

তিনকড়ি সাজতে গিয়ে তিনি পোশাক পরেছিলেন বোতাম খোলা বড়ো একটা ছিটের জামা, তার উপরে বুকময় পানের পিচ। এই দেখে তাঁর মা বলেছিলেন—

"তুই এমন একটা হতভাগা বেশ কোত্থেকে পেলি বলতো।"

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ৭৬

এই বেশে হাতে সন্দেশের ঝুড়ি নিয়ে তা খেয়ে চলেছেন—এইভাবে তিনি স্টেজে ঢুকেছিলেন। আর একবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় প্রসঙ্গ তুলে তিনি স্মৃতিচারণায় বলেছেন—

"একবার 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় হল, বাড়ির ছেলেদের দিযে করিয়েছিলুম।"

তাতে মনে হয় তিনি নিজে সেবারে অংশ গ্রহণ করেন নি। তবে বাস্তবানুগ রীতিতে স্টেজের পরিকল্পনামূলে হয়ত তাঁর কিছু অবদান ছিল। সে এক অদ্ভুত বাস্তববাদী পদ্ধতি। অবনীন্দ্রনাথের গৃহের গাড়ীবারান্দায় মস্ত বড় স্টেজ হয়েছিল। ঘোড়াসুদ্ধ গাড়ী সোজা এসে ঢুকল স্টেজে। টং টং করে অফিস ফেরত অবিনাশবাবু এসে নামলেন। সে ব্যাপার দেখে তো দর্শকরা সকলে অবাক!

কবিগুরুর 'বাল্মীকি প্রতিভা' একবার হয়েছিল আদি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য টাকা তোলার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়বারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেডি ল্যান্সডাউনকে যে পার্টি দিয়েছিলেন, তদুপলক্ষে অভিনীত হয়। তখন অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ অভিনেতাদের উপরেই ভার পড়েছিল সাজ-পোশাক তৈরী করার ও সেট সাজাবার। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সেইটিই তাঁর এ জাতীয় কাজের প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ।

উক্ত নাটকে অবনীন্দ্রনাথ সেজে ছিলেন জনৈক ডাকাত। গোড়াতে ঠিক ছিল যে ডাকাতরা গায়ে কোন জামা পরবে না। কিন্তু লাট সাহেবের মেম আসবেন। সুতরাং খালি গায়ে অভিনয় করা চলবে না। ডাকাতদের নাচ কি রকম হবে তা শেখার জন্য কাবুলীদের এনে নাচ দেখার ব্যবস্থা হয়েছিল। কাবুলীদের মত পাঞ্জাবী-পাজামার ব্যবস্থা হোল দস্যুদের জন্য।

স্টেজও তৈরী হয়েছিল নানা অভিনব পন্থায়। দস্যুদের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যের কথা বর্ণনা করেছেন অতি জীবন্তরূপে। তা'হোল—

"দিনুকেও সেবারে নামিয়েছিলুম। দিনু তখন ছোটো, ওর একটা পোষা ঘোড়া ছিল, রোজ ঘোড়ায় চড়ত। সেই ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে দিনু স্টেজে এল। আমরা সব লুটের মাল ভাগ করলুম, একজন আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাস-টাস খাওয়ালে। সে কী অ্যাক্‌টিং; যদি দেখতে। তারপর চললো আমাদের মদ খাওয়া, খালি শূন্য মাটির ভাঁড় থেকে মদ ঢালাঢালি করছি, গান হচ্ছে—

'তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্-ঢাল্-ঢাল্'। আর খালি ভাঁড় মুখের কাছে

ধরে ঢক্ ঢক্ করে হাওয়া পান করছি। এই সব করে কালীমূর্ত্তির কাছে আমাদের নাচ ”১

প্রথম ‘রাজা’ অভিনয়েও অবনীন্দ্রনাথ অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ভূমিকায় তা তিনি শেষ বয়সে নিজেও স্মরণে আনতে পারেন নি। স্টেজ ডেকোরেশনের ভারও তিনি নিয়েছিলেন।

একবার ‘শারদোৎসব’ অভিনয় হোল। অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন তাতে। কিন্তু সমস্যা হয়েছিল যে অভিনেতারা পার্ট ভুলে যাচ্ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ তখন তাঁর রবি-কা’কে বললেন যে, তাঁদের বয়স হয়ে গেছে, পার্ট মনে থাকছে না। প্রম্পটারকে স্টেজে নামালে হয় না। তাঁদের সাজিয়ে-গুজিয়ে স্টেজে নামাবার ভার নিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

তিনি প্রম্পটার দুটিকে বেশ ‘নীলচিটে, কালচিটে পাতলা কাপড়ের বোরকার মতো গেলাপ পরিয়ে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত’ দিলেন ঢেকে। চোখ ও মুখের জায়গাটুকু ফাঁক রইল। তাঁদের হাতে দেয়া হয়েছিল বাঁশের ডাণ্ডা। সোনালী-রুপোলী কাগজ দিয়ে চক্কোর মতো লাগিয়ে দিলেন সেই ডাণ্ডাতে। ডাণ্ডা হাতে নিয়ে দুই প্রম্পটার স্টেজে অ্যাক্টরদের সঙ্গে ও পিছনে ঘুরে ঘুরে প্রম্পট্ করে চলেছিলেন। দর্শকরা বুঝতেই পারেন নি যে ব্যাপারটা কি! পরে অবশ্য অভিনেতারাই সেই রহস্য ভেদ করে দিয়েছিলেন। স্টেজ সাজানোর পরিকল্পনা অবনীন্দ্রনাথের, কিন্তু কাজটি তিনি করিয়েছিলেন নন্দলাল বসুকে দিয়ে। সবচেয়ে সুন্দর হয়েছিল শরৎকালের আকাশে প্রতিপদের চাঁদ।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই ‘ফাল্গুনী’র অভিনয় হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই দাদা তাতে পার্ট নিয়েছিলেন। সেবারেও স্টেজ সাজাবার ভার পড়েছিল অবনীন্দ্রনাথের উপরে। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা তোলাই ছিল সেই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। কাজেই যত কম খরচে হয় তার চেষ্টা ছিল। ব্যাক্গ্রাউণ্ডে দিলেন নীলরঙের মখমলের বনাত। বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলা টাঙানো হোল। উপরে কিছু ডাল-পাতা দেখতে পাওয়া যায় এমন করে সাজানো হয়েছিল। তাতে মনে হোল যেন উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলাটা টাঙানো আছে। তখন থেকেই তিনি স্টেজ সাজানোর কাজ কিছু কিছু নন্দলাল বসুকে দিয়ে করাতেন। তবে শেষ টাচ্‌টা দিতেন সকল

১. ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৭৮

সময়েই নিজের হাতে। তাতে আর এক রূপ ফুটে উঠতো। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"এই স্টেজ সাজানো এ কি আর দু'দিনের কথা। কবে থেকে কত এক্স্‌-পেরিমেণ্ট্‌ করে তবে আজকের এই দাঁড়িয়েছে।"[১]

'ফাল্গুনী'তে অবনীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন শ্রুতিভূষণ। তাঁর ছাত্র মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের কোন পার্ট নেই দেখে তিনি তাঁকে চেলা বানিয়ে সঙ্গে নামিয়ে নিলেন। তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপ—

"ছোট্ট ছেলেটি গোলগাল মুখখানা লাল চেলি পরিয়ে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে নন্দলাল সাজিয়ে দিয়েছিল। বেশ দেখা যাচ্ছিল।"

তিনি নিজে পরেছিলেন শুঁড়তোলা চটি, গায়ে পণ্ডিতদের মত নামাবলী, ধুতি গরদের। সে ধুতি নিয়ে হয়েছিল ভারী মুস্কিল! বারবার ফস্‌ করে খুলে যেত। তিনি নন্দলালকে বললেন দড়ি দিয়ে ধুতিটা ভাল করে কোমরে বেঁধে দিতে। নিজের অভিনয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"আচ্ছা করে কোমরে লম্বা দড়ি তো জড়িয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে নিলুম। মনীন্দ্রভূষণ থেকে থেকে নস্যির ডিবেটা এগিয়ে দিত—আচ্ছা করে নস্যি নাকে দিয়ে সে যা অভিনয় করেছিলুম।···

শেষ গান হল 'সবার রঙে রং মেশাতে হবে' সেই গানে নানা রঙের আলোতে সকলের এক সঙ্গে হুল্লোড় নাচ। আমি ছোটো ছোটো ছেলেগুলোকে কোলে নিয়ে পুঁথিপত্র, নস্যির ডিবে হাতে, নামাবলী ঘুরিয়ে নাচতে লাগলুম।"

আর এক জায়গায় বলেছেন—

"বাঁকা সাপের মত লাঠি হাতে,·· সেই লাঠি হাতে ছেলে ছোক্‌রাদের ধমকাচ্ছি।"

রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন অন্ধ বাউল। সেবারে কিনা ঠিক বলা যায় না। হয়ত পরবর্ত্তী কোন অভিনয়কালে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ বাউল রূপটি কয়েকখানি আলেখ্য চিত্রে ধরে রেখেছিলেন! আঙ্গিক, টেকনিক্‌ ও ভাবমূর্ত্তি রচনায় তা অনবদ্য নিদর্শন।

'ডাকঘরে'র অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ মোড়ল হয়েছিলেন। সেই কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"ডাকঘরে আমি হয়েছিলুম মোড়ল। ও-রকম মোড়ল আর কেউ সাজতে

---

১. ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৮৭

পারেনি। আমি তখন মোড়ল সেজেছিলুম, সেই মোড়লি করেই চলেছি এখনো।"

'ডাকঘর' অভিনয়ে স্টেজ সাজানোর ভার পড়েছিল নন্দলাল বসুর হাতে। কিন্তু ফিনিশিং টাচ্ দিয়েছেন স্বয়ং শিল্পাচার্য্য।

স্টেজে একখানি দরমার বেড়াতে আলপনা আঁকা হয়েছিল। খড়ের চালাঘর তৈরী হয়েছিল। তক্তায় লাল রঙ, ঘরে কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা—সব দেখা গেল। এক পাশে আচার্যের নির্দেশে পাখীর দাঁড় ঝুলিয়ে দিয়ে নন্দলাল বসু গুরুকে জিজ্ঞেস করলেন, যে পাখী থাকবে কিনা।

তিনি বললেন, "না, পাখি উড়ে গেছে, শুধু দাঁড়টি থাক।"

অবশেষে দোকান থেকে রঙচঙে পট আনিয়ে ছাত্রকে তিনি বললেন, উইঙের গায়ে আঠা দিয়ে সেটিকে পটি মেরে দিতে। তাতে ঘরের রূপ বদলে গেল, তা সত্যিকারের পাড়াগেঁয়ে ঘর হয়ে উঠলো।

স্টেজ সাজানো ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ অল্প আয়াসে সামান্য কিছু টাচ্ দিয়ে অতি মনোরম ও জীবন্ত করে পরিবেশ সৃষ্টি করতেন।

ঠাকুরবাড়ীতে আর একবার 'শারদোৎসব' অভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ স্টেজ সাজানোর ভার নিয়েছিলেন। ছাত্রদের বললেন, একটা কাপড়ে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে আনতে হবে। খড়িমাটি দিয়ে কাপড়টিকে টেনে ধরতে বললেন। তারপর তিনি স্বহস্তে এক সার বক এঁকে ছেড়ে দিলেন। তাঁর ভাষায় দেখা যায়, "তারা (বক) ডাকতে ডাকতে স্টেজের উপর দিয়ে যেতে লাগল।"

অভিনেতাদের সাজসজ্জাও তিনি ইচ্ছে মত অদল-বদল করে দিতেন।

'তপতী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ রাজা হবেন। তখন তাঁর চুল দাড়ি অনেকখানি সাদা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাকে কালো করার একটা সমস্যা দাঁড়িয়েছিল। কবি নিজ হাতে নিজের রূপসজ্জা করতেন। রবীন্দ্রনাথ রাজা সাজতে গিয়ে নিজেই রঙ-তুলি দিয়ে চুল দাড়ি কালো করতে বসে মুখেও কালি মেখে ফেললেন। তা দেখে অবনীন্দ্রনাথ আপত্তি তুলে বললেন, সে হবে না। মুখের স্বাভাবিক বর্ণকে বিবর্ণ করা চলবে না। তখন তিনি ভার নিলেন খুল্লতাতের চুল দাড়ির রঙ ফেরানোর। আরও বললেন, যদি সুন্দরভাবে করা না যায় তো চুল দাড়ি সাদাই থাকবে। অল্পবয়সে কারোর কি চুল পাকে না?

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি কালো রঙের পাতলা গজের কাপড় আনিয়ে

অভিনয়ের আগে তা রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে গেলাপের মত করে কানের দু'পাশে বেঁধে দিলেন। গোঁফেও আর খানিকটা কাপড় লাগিয়ে কেটেকুটে বসিয়ে দিলেন। সকলের চিন্তা হয়েছিল, কি হবে, কেমন দেখাবে।

স্টেজে আলো পড়তে সবাই দেখে অবাক। সকলেই বলেছিলেন যে চমৎকার কালো দাড়ি হয়েছে।

পরবর্ত্তীকালে অভিনীত 'তপতী' নাটকের অনেক ছবি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

রূপসজ্জায় অবনীন্দ্রনাথের একটি কৃতিত্ব অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

বাসুদেবন্ নামে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী একবার একটি নাটকে তাণ্ডব নৃত্য করবেন কথা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনও কারণে তাঁর নৃত্য বাতিল করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তাঁর নাচ অন্যান্যদের সঙ্গে মিশ খাবে না। আর ওঁর গায়ের রঙ বড় বেশী কালো। তদুত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, তিনি তাঁর গায়ের রঙ ইত্যাদি ঠিক করে দেবেন।

কি করে রঙ ফেরালেন তিনি? নন্দলাল বসুকে তিনি বললেন যে, বাসুদেবের গায়ে সাদা রঙ দিয়ে তারপরে হলদে রঙ মাখানো হোক। ভিতর থেকে নীল আভা বেরোবেই। তারপর গেরিমাটি এনে শরীরের যে সব জায়গায় কালো রঙ রুখো হয়েছিল, সেখানে লাগিয়ে দিতে বললেন। হাঁটুতে, কনুইতে বেশ করে গেরিমাটির গুঁড়ো ঘষে দেয়া হয়েছিল। কালো রঙের উপরে গেরি পড়তে চমৎকার একটা আভা ফুটে উঠলো।

অবশেষে শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুকে বললেন, চোখ ও ভ্রূ এঁকে দিতে। ধুতি মালকোচা বেঁধে পরিয়ে, মাথায় পট্‌কা বেঁধে, গলায় কিছু গয়না দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হোল। স্টেজে তাঁর চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বাতি জ্বলল, সীন উঠল—বাসুদেব যখন স্টেজে ঢুকল কী বলব তোমাকে—মনে হল যেন ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিটি৷ মনে ভয় ছিল বাসুদেব এবার কী করে, শেষে না রবিকাকার তাড়া খেতে হয়।

অন্য সব নাচ কানা সেদিন। বাসুদেবের নাচে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে রইল—যেন ব্রোঞ্জের নটরাজ জীবন্ত হয়ে স্টেজে নেচে দিয়ে গেল। শুধু রং মাখালেই স্টেজে খোলতাই হয় না। রং মাখানোর হিসেব আছে। ভগবান দত্ত চামড়াকে বাঁচিয়ে তবে রং মাখাতে হয়। এ কি সোনার উপর গিল্টি করা—খোদার উপর খোদকারি?—যার যা রং তা রেখে সাজাতে হবে।"

আলোচ্য অভিনয়ে স্টেজ সাজিয়েছিলেন শিল্পী সুরেন কর। তাঁকেও অবনীন্দ্রনাথ অনেক উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে তাঁর কাজকে উচ্চাঙ্গের করে তুলেছিলেন।

দিন এগিয়ে যেতে এমন একটি সময় এল যখন অবনীন্দ্রনাথ আর অভিনয়ে অংশ নিতে পারতেন না। রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার কাজেও হাত দিতেন না। শিষ্য-প্রশিষ্য ও শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয় দেখে আনন্দ পেতেন, তাঁদের চূড়ান্ত উৎসাহ দিয়েছেন অনবরত। নন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরী দেবীর 'নটীর পূজা'তে নটীর অভিনয় দেখে নিজের গায়ের জোব্বা খুলে পুরস্কার দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। 'তপতী' নাটকে তপতী সেজে অমিতা দেবীর অগ্নিতে প্রবেশের দৃশ্য তাঁর প্রাণে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু তারপরে আর সেরকম উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখতে না পেয়ে এবং বিগত দিনের স্মৃতি-মন্থন করে করে বোধহয় মনে বেদনা অনুভব করতেন।

তখন তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "করলে কি রবিকাকা, ঘরের পিদিম নিভিয়ে ফেললে এখন বাইরের পিদিম জ্বালিয়ে কি করবে।"

তদুত্তরে কবিগুরু বলেছিলেন, "তা আর কী করা যায়, চিরকালই কি আর ঘরের পিদিম জ্বলে।"

মানুষের লিখিত পড়িত বিদ্যার বিভিন্ন ফলশ্রুতির মধ্যে চিঠিপত্র একটি। তবে কোন্ দিন থেকে মানুষ চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিল তা সঠিক জানা যায়নি। তা'হলেও খৃষ্টপূর্ব্ব আমলেরও অনেক চিঠি ঐতিহাসিক উপাদান হয়ে আছে। যেমন দারায়ুসকে লেখা আলেকজান্দারের চিঠি। খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ থেকে কত বিচিত্র রকমের চিঠি লিখিতে হয়েছে বিশ্বের সর্ব্বত্র। তা ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেও যেমন, মানুষের চিন্তা-মননের অভিব্যক্তি ও সাহিত্যকৃতি রূপেও তেমনি মূল্যবান ও আকর্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যের রাজ্যে পত্র-সাহিত্যেরও একটি সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক স্থান আছে। সেই ব্যাপ্তি-বিস্তারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দান সুবিপুল ও সর্ব্বজন-বিদিত।

সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রানুসারী না হয়েও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকৃতিকে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল করেছেন। চিঠিপত্র লেখাতেও তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থী ভাবধারার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের চিঠি একাধারে চিত্রপট, সংবাদ আদান-প্রদানের বাহক এবং শিল্পকলা সম্পর্কিত নির্দেশ-উপদেশের স্মারক চিহ্ন। তদুপরি তাঁর লেখা অনেক চিঠি বিশেষ ভাবে রহস্য-মধুর। তাঁর সহজাত রহস্যবোধ এবং পরিহাস-প্রিয়তাও ব্যক্ত হয়েছে অনেক চিঠিতে।

অবনীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতেন খুব সংক্ষিপ্ত। তার অধিকাংশ আবার পোষ্ট-কার্ডে। কার্ডের একদিকে স্বহস্ত অঙ্কিত ছবি, অন্য দিকে ক্ষুদ্র অংশে যেটুকু না লিখলে নয় তা। আত্মীয়-স্বজন ও ছাত্রদের ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনের চিঠি সর্ব্বদাই হোত চিত্রান্বিত।

তাঁর শিল্পাদর্শ সম্বন্ধীয় দীর্ঘ পত্রের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও, কিছু সংখ্যক যা পাওয়া যায় তাতে তাঁর শিল্পীসত্তা, নিবিড় কল্পনা প্রবণ মন, চিত্র রচনার নানা সমস্যা ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক তথ্যবহুল নির্দেশ-উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে।

১৯২৪ সালে নন্দলাল বসু কবিগুরুর সঙ্গে চীন-জাপান ভ্রমণে যান। তখন তিনি তাঁর গুরুকে কিছু চীনের পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন। তদুত্তরে শিল্পাচার্য্য তাঁকে দীর্ঘ পত্র লেখেন। তার মধ্যে তিনি ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব ও তৎসঙ্গে পশুপাখী রূপায়ণের সমস্যা আলোচনা করেছেন। সেই সময় তিনি তাঁর পৌত্রের জন্য কতকগুলি পশুপাখীর ছবি আঁকছিলেন। সেকথা উল্লেখ

করে তিনি মন্তব্য করলেন যে, ভারতীয় শিল্প-শাস্ত্রকারগণ দেবমূর্ত্তির ধ্যান-কল্পনা করতেই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই সুনির্দিষ্ট পন্থায় জাগতিক সমস্ত প্রাণীর রূপদান সম্ভব নয়। যেমন, বানর আঁকতে বসে পাখী, ছাগল আঁকলে চলে না। তাতে বরং মুস্কিল বাঁধে।

যে কোন শিল্পীরই তাঁর স্বদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে চলা উচিত—এই ছিল অবনীন্দ্রনাথের দৃঢ় মত। আলোচ্য চিঠিখানিতেও তিনি তা ব্যক্ত করেছেন—

"মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে শুধু হাত বাড়ালে artist কোন ফল পাবে না, আকাশকুসুম দু'চারটে পেয়ে কি হবে তার ঠিক নেই। চীন মাটির বাসনে সিদ্ধহস্ত হল তবেই না এতটা দূর থেকে তার নাম শুনে লোক ছুটলো China দেখতে। আর্টিস্ট মাটি ছাড়া হলেই বিপদে পড়ে এটা ভারি সত্যি অতএব চীনের শিল্পশাস্ত্র জল মাটি হাওয়া এই তিনের সম্বন্ধে যে উপদেশ দেয় তার মধ্যে মাটিকেই প্রথম স্থান দেওয়ার কথা আছে।"[১]

নন্দলাল বসুকে লেখা আর একটি চিঠিতে তিনি রঙের তত্ত্ব, বিশেষতঃ গিরিমাটির রহস্য করেছেন ব্যাখ্যাত। তাঁর মতে এই রঙটি রূপ ও রঙের মধ্যে বৈরাগীর মত নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকে। নানা রূপের পরশ ও রঙের আভা তার উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু সে কাবু হয় না। তিনি আরও বলেছেন যে, গিরিমাটির রঙের একটা আভিজাত্য আছে। এই রঙটি একভাবে স্থির থাকে—তার কোন পরিবর্তন নেই। সে মাটির মতোই স্থির, উদার। অন্যান্য রঙের খেলাকে সে বাধা দেয় না। নিজের জায়গায় নিজে ঠিক হয়ে বসে থাকে। এই চিঠিতে তিনি ছাত্রকে তাঁর একটি বচন উপহার পাঠিয়েছিলেন—

"পুতুলী গড়তে চারদিক দেখি
পট্‌টি লিখতে একদিক লেখি।"[২]

অর্থাৎ চিত্র একমুখী আর ভাস্কর্য্য চারমুখী।

আর একটি চিঠিতে তিনি নন্দলালকে শিল্পের ক, খ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পাথরে ও কাঠে কুঁদে তোলা ছবি, আর পটে আঁকা ছবির মধ্যে তুলনা করে তিনি বলেছেন যে, কেটে কুঁদে তোলা ছবি মানুষের শক্তির নাগাল ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু পটের ছবি সত্যিকার হয়ে ফোটে—কারোর চেষ্টায় যে সে সৃষ্টি হয়েছে তা লোপ পেয়ে যায় চিত্রীর কাজের নৈপুণ্যে। যে কোটায়

১, ২. বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২ শক) পৃঃ ৯০-৯১

সে যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়। তাঁর মতে একমাত্র চিত্রপটেই 'সুকুমার সমস্ত পরশ দিয়ে এইভাবে রস ফোটানো চললো—অন্য কিছুতে নয়।' চিত্রশিল্পী যেখানে রস ফুটিয়ে নিজে মিলিয়ে যায়, সেখানেই চিত্রবিদ্যার চরম সার্থকতা আসে। অবশ্য তা সকলে পারেন না।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য অসিত হালদারকে লিখিত চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কলা শিক্ষায়তনের সঙ্গে ছোটখাট একটি আর্ট-গ্যালারী স্থাপনের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অসিতবাবু বিশ্বভারতীর কলা-ভবনে অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি তাঁকে ওখানে একটি আর্ট-গ্যালারী তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন পত্রের মাধ্যমে।

তিনি তাঁকে আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, নিজেকে গুরুর আসনে বসিয়ে ছাত্রদের ভয় পাইয়ে যেন দেয়া না হয়। লিখেছিলেন, "মনে রেখো যে পাখি পড়াতে হলে পাখির সঙ্গে নিজেও পাখি হতে হয়।"

এই উক্তিটির মধ্যে তাঁর নিজের স্কুল-জীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার স্মৃতি এবং পরবর্ত্তীকালে শিক্ষাগুরুর শিক্ষানীতির সমগ্র আদর্শটি প্রস্ফুট হয়েছে। তিনি বরাবর এই নীতি অনুসরণ করেই তাঁর আচার্য্যের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেছেন।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সহায়তায় শিল্পীর কৃতিত্ব প্রচার থেকে তিনি ছাত্রদের দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন চিঠি লিখে। খবরের কাগজের সার্টিফিকেট অর্থাৎ রিভিউতে লিখিত প্রশংসাকে তিনি তত মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

অসিতবাবুকে লেখা আর একটি চিঠিতে শিল্পীগুরু ছাত্রকে বলেছেন—

"বীজের ভিতর যেমন গাছ, real-এর আড়ালে ideal তেমনি লুকাইয়া থাকে, খুঁজিলেই পাইবে।"

এই মন্তব্যটি তিনি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে sketch করার প্রসঙ্গে। তিনি এখানে গল্পে বর্ণিত বাস্তবানুগ ঘটনাকে চিত্রায়ণের সময় সেই বাস্তবতার মধ্যে অপ্রাকৃত ভাব-সৌন্দর্য্যকে খুঁজে নিতে শিষ্য-শিল্পীকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি অবনীন্দ্র-চিত্রকলার একটি মৌল আদর্শ। তিনি কখনও বাস্তবকে পুরো অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করতে উপদেশ দেননি, নিজেও করেন নি। কিন্তু বস্তুবাদী প্রথায় অঙ্কন বা প্রকৃতির রূপকে সঠিক নকল করার পক্ষপাতী তিনি আদৌ ছিলেন না। বাস্তবের অন্তরালে, প্রকৃতির

বুকের মধ্যে যে অতিপ্রাকৃত ও আদর্শ ভাবটি লুকোনো আছে তাঁকে খুঁজে বের করাই শিল্পীর যথার্থ কর্তব্য—

Tradition বা ঐতিহ্য সম্বন্ধেও তাঁর সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মত তিনি প্রকাশ করেছেন অসিত হালদারকে লেখা একটি চিঠিতে।

"বোঁটা ছাড়া ফল যেমন অসম্ভব, tradition ছাড়া art-ও তেমনি অসম্ভব। মৌচাক tradition-মতো গড়া হয় মধুও তৈরী হয় traditional প্রথায়; নতুন নতুন বাগানের ফুলে নতুন নতুন মৌমাছি মধু রচনা করে, এই তো জানি।......আমাদের প্রত্যেকের অস্থি মাংস মজ্জা সবই tradition মতো ধরে, তবেই হয়েছি তুমি, আমি, এ, ও, সে; ওটা বাদ দিয়ে spirit নিয়ে ভূতগত ব্যাপার সৃষ্টি হতে পারে। পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশই নেই, কোনো art নেই যার tradition নেই, খালি আমাদেরই থাকবে না—এ কেমন কথা?"[১]

খেলনা পুতুল সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও কৌতুহল তাঁর গোটা জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই কোন শৈশবে তাঁর ছোট পিসীমার ঘরে সাজানো কৃষ্ণনগরের পুতুলগুলি দেখার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে বারবার যেতেন সেখানে। তাঁর শিল্পৈষণার প্রথম স্ফুরণ হয়েছিল ছোট পিসীমার ঘর, পিতার পোষা পশুপাখী, লাল মাছ, লাল চটি জুতাকে ঘিরে। কিন্তু জীবন-পথের অনেকখানি অতিক্রম করেও তিনি খেলনা-পুতুলের আকর্ষণ ও মোহ কাটাতে পারেন নি। শেষ জীবনে তো কুটুম-কাটাম গড়তেই ছিলেন সম্পূর্ণ নিমগ্ন। তাও তো একপ্রকার খেলনা পুতুলই বটে।

লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র অসিত হালদার। গুরু লক্ষ্য করলেন যে আর্ট স্কুলের দায়িত্বভার নিয়ে তাঁর ছাত্র তথাকার পুতুল সম্পর্কে যেন উদাসীন। অতএব তাঁর (ছাত্র) দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করলেন পত্রাঘাত করে। কেবল দৃষ্টি আকর্ষণই করেন নি—তিনি তাঁকে দুই সেট্ ক্ষুদ্রাকার পাখীর মূর্ত্তি কিনে পাঠাতে লিখলেন। আর লক্ষ্ণৌর আর্ট স্টুডেণ্ট্দের মধ্যে সে জিনিসের প্রচার ও প্রসার করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। খেলনাগুলি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা—

"এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটির গড়া নানারকম পাখীর মূর্ত্তি, অতি মজাদার খেলনা।...জাপানীদের তৈরী ছোট চিনে মাটির মানুষ, পশুপাখী ইত্যাদি

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২) পৃ: ১৪

দেখেচ তো ? ঠিক সেই art, কেবল পোড়া মাটিতে হাত রং করে গড়া, এই তফাৎ। খেলনাগুলো একেবারে বাজারের রকমে—cheap, কিন্তু art শেখার পক্ষে ভারি কাজের।"[১]

আর্ট-এর আলোচনাতে অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বড় পাওয়া যায় না। অবনীন্দ্রনাথের লেখানে ইংরেজী শব্দ ব্যবহারে আপত্তি ছিল না। এই প্রসঙ্গে তিনি অসিত হালদারকে চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বাস্তবিক আভিধানিক শব্দ সংগ্রহ করতে হলে গাঁয়ের মিস্ত্রী ও শহরের কারিগরের কাছে গিয়ে 'বোলচালগুলো' শিখে নিতে হবে। এই প্রস্তাবের মূলে সুরসিক গুরুর রহস্যপ্রিয়তার কিছু প্রভাব আছে। 'কলার বোল' কথাটি নিয়েই তিনি অত সুর লিখেছিলেন। আরও লিখলেন, "বিধির নিয়মে যেমন আগে বোল পরে আম, বা আগে মোচা পরে কলা, art সম্বন্ধে তার উল্টোটা ঘটে, যথা :—আগে কলা, তারপর কলাভবন, শেষে সেখানে বসে বোলচাল।...চলিত কথার মধ্যে অনেকখানি আমাদের অনাবিষ্কৃত, সেই জন্তেই বলি বসে থেকো না। চলে ফিরে কথাগুলি সংগ্রহ কর।"[২]

শেষের নির্দেশটি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় আর একটি স্বরূপ প্রকাশ করছে। তিনি যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় শিল্প সম্বন্ধীয় সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, গ্রামীণ লোকয়াত কারুকলা ও ব্রতকথার রস-রহস্য উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন, সেই ভাববুদ্ধিতেই ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করেন চিঠির মাধ্যমে।

ছাত্র-শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ-আচরণে গুরু অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ। তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকে চিঠিতে তিনি অনেক সময় সম্বোধন করতেন, 'ওগো গুপ্তশিল্পী' বলে।

মণীন্দ্রবাবু একবার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৩০) 'জাপানী আর্টের যৎকিঞ্চিৎ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটি পড়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে সাতটি প্রশ্ন করে চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে নিসর্গ চিত্র বা landscape আঁকতে হলে তা জীব যুক্ত না মুক্ত হবে, ভারতীয় চিত্রে দৃশ্য-চিত্র আছে কি নেই, landscape-এর বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে এবং জাতীয় শিল্প বলে কিছু হতে পারে কিনা—এই সকল প্রশ্ন ছিল।

এই ঘটনা ১৯২৪ সালের। ছাত্র যথাযথ উত্তর দিয়ে যে গুরুকে খুশী করেছিলেন তাও জানা যায় চিঠির মধ্যে দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন,

১, ২. বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্ত্তিক-চৈত্র, ১৮৮১-৮২) পৃঃ ৯৪

যে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ছাত্র সাফল্য অর্জন না করলেও তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দিতেন। এই কথা বলে তিনি শিল্পীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে দিয়ে তা ছাত্রের অন্যান্য সহপাঠীদেরও জানাতে বললেন। আরও লিখলেন, "যে artist হারতে ভয় পায় সে কোনদিন কিছু জিতে নিতে পারে না।"[১]

Landscape-এর ঠিক প্রতিশব্দ কি তাও তিনি সেই চিঠিতে জানিয়ে দিলেন ছাত্রকে। তা হোলে—'স্থানচিত্র'। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে ছয় প্রকার চিত্রের কথা যে উল্লিখিত আছে, তিনি তা উক্ত পত্রে বিবৃত করেছিলেন। যেমন, চিত্র, বস্তুচিত্র, আকারচিত্র, গতিচিত্র, স্থানচিত্র, বর্ণচিত্র, স্বরচিত্র। অবশ্য এগুলির বৈশিষ্ট্য তিনি চিঠিতে ব্যাখ্যা করেন নি।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদগ্ধ শিল্পী ও প্রাজ্ঞ শিল্পশাস্ত্রবিদ। তিনি পুরাতাত্ত্বিক প্রথায় শিল্প আলোচনা করেন নি কখনও, এবং কাউকে সে বিষয়ে উৎসাহও দিতেন না। তাঁর কাছে মুখ্য ছিল কলা নিদর্শনের আন্তর-সম্পদ ও রসগুণ। এই ভাবধারাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন ছাত্র চারু রায়-কে লিখিত একটি পত্রে। লিখেছিলেন—

"তোমার বয়সের হিসেব নিয়ে যদি তোমাকে ছেড়ে দিই কিম্বা তোমার জাতের খবরটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকি তবে তোমাকে জানা একেবারেই হল না, তেমনি এই চীন দেশের ছবি মূর্ত্তি ইত্যাদির বেলায় শুধু এগুলো কত দিনের এবং কোন দেশের ইত্যাদি জেনে আর্টিস্ট রস পায় না।"

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পীসত্তা, তাঁর ভাবৈষণা ও চারুকলা সম্বন্ধে তাঁর সত্য আদর্শ নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন পুঁথি, পুস্তক, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের মধ্যে। সাধারণ আলাপচারিতার মধ্যেও তাঁর শুদ্ধ রসিক রূপটি প্রতিভাত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। চিঠি লিখতে বসেও তিনি মনে হয় অপরাপর অনেকের মত সচেতন ও সংহত না হয়ে বরং আত্মভোলাভাবে স্বরূপের প্রকাশ করেছেন সহজ ছন্দে। তাঁর অধিকাংশ চিঠি সুরসাল আলাপচারিতার প্রতিচ্ছবি। কিছু সংখ্যকের মধ্যে পাওয়া যায় যে, তিনি দূর অতীতের স্বপ্নে বিভোর। কোথাও দেখা যায় তিনি বিশ্ব প্রকৃতির লীলাছন্দের লহরীতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন নব নব অভিনব সব রূপের অভিসার পথে। তাঁর চিঠিপত্রের ভাষা ও ভঙ্গী দুই-ই অত্যধিক আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট নিজের ভাব-ভাবনা, হৃদয়ের নিবিড় আকুতি, ললিতকলার বিবিধ সমস্যা সবই অনায়াস গতিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে পত্রগুচ্ছের মধ্যে।

---

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্ত্তিক-চৈত্র : ১৮৮১-৮২) পৃঃ ৯৫-৯৬

তারুণ্যের পক্ষ হয়ে তিনি বার্দ্ধক্যের অবধারিত বুদ্ধি-বিভ্রমকে ব্যাখ্যাত করেছেন রহস্যসিক্ত মধুর ভাষা ও ভঙ্গীতে। তদুপলক্ষে লেখা তাঁর চিঠি প্রাপকের কাছে বস্তুতঃই এক সরস ভাবস্রোতের উৎস।

গোমতী নদীর স্মৃতিভার চিঠির পাতায় অক্ষরের আঙ্গিকে প্রাচীন ভাবাবেশ পুষ্ট এক হারানো সুরের আবেগ মূর্চ্ছনায় যেন কেঁদে উঠেছে বার বার। শাহী মহলের সুন্দরী পরিচারিকার ওড়না-বোরখার আড়াল থেকে বেরিয়ে শিল্পীর কলমবাহী হয়ে ছড়িয়ে পড়লো কত সুখ-দুঃখ, কত রঙবেরঙ ও কত আলোর ঝর্ণাধারা। আর রূপসাধক মরমী পত্রলেখক সেই আলোর স্রোতে নিজেকে ভেসে যেতে দেখলেন কল্পনার চোখে। তিনি একা যাত্রী। নৌকাতে একা ভেসে ভেসে তিনি সুদূর অতীতের লক্ষ্ণৌ নগরীর বাদশাহী মহলের সানাইয়ে করুণ রাগিণীর সুর-মূর্চ্ছনায় হলেন আচ্ছন্ন। কখনও দেখলেন শাহী মহলের আলোকোজ্জ্বল ও মজলিস-মুখর ছবি, কখনও দেখেছিলেন নদীর জলে বাদশার নিস্তব্ধ কবরের বিষণ্ণ ছায়াটি। শিল্পীর শূন্য তরী ঘাটে ফিরে এল। তিনি 'ঘুমতি' নদীর শীতল জলের সুস্নিগ্ধ স্পর্শে তার দু-কূলকে আপনার করে নিলেন। আর চিরকাল তাঁর (অবনীন্দ্রনাথ) বুকের বাঁশীতে সেই করুণ রাগিণীর সুর বেজেই চলেছিল জীবনের বাকী দিনগুলি জুড়ে।

অবনীন্দ্রনাথ দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিলেন অনেকবার। কত ছবি এঁকেছিলেন তিনি সেই পার্ব্বত্য-প্রতিমার। কার্শিয়াংকেও ধরে দিয়েছেন কত চিত্রপটে কত রূপে ও ছন্দে। তিনি আগ্রাতে গিয়ে তাজমহলও দেখেছিলেন। পাহাড় ও তাজমহল দুই-ই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু উভয়ের সৃষ্টি মূলে ও রূপবৈশিষ্ট্যে যে প্রভেদ ও ভিন্নতা লক্ষ্য করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন ভগিনীকে (বিনয়নী দেবী) লিখিত একখানি পত্রে। তাতে লিখেছিলেন—

"আগ্রার শুভ্র স্বপ্ন আর হিমাচলের তুষার তরঙ্গ দুই-ই দেখিবার সামগ্রী। এক মানুষের সৃষ্টি, অন্যটি ভগবানের খেলা—অতি অনির্ব্বচনীয়।"

শিল্পী বারাণসীর সন্নিকটে অবস্থিত সারনাথ দেখেছিলেন একবার। তার বহুদিন পরে তাঁর ভগিনী বিনয়নী দেবী কাশীধাম ভ্রমণে গেলে তিনি তাঁকে চিঠি লিখে সারনাথের পুরোনো স্মৃতি মন্থন করেন। তাঁর শিল্পীসত্তা অতীত জীবনের স্মৃতিচিহ্ন সমূহের সন্ধান পেলেন সেখানে। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য মহিমায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে

তার সামিল করে নিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে পূর্ব্ব-জীবনেও তিনি ছিলেন শিল্পী ও কারিগর। ওখানেই ছিল তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র।

মিউজিয়মে সাজানো পুরাবস্তুর মধ্যে স্বীয় শিল্পীসত্তাকে নিলীন করে তিনি আত্মমূর্ত্তির সন্ধান পেলেন কারুকৎ রূপে। কিন্তু ইহজীবনে তিনি চিত্রকার; সেখানে (সারনাথে) চিত্রকলার গ্যালারী নেই। অতএব চিত্রপটের স্মৃতিভার ওখানে তিনি নামাতে পারেন নি। তাতে কিছু হতাশা অনুভব করেছিলেন মনে হয়। দীর্ঘপ্রবাস জীবন কাটিয়ে মানুষ স্বগৃহে ফিরে এলে যে আনন্দ-উল্লাসের ভাবটি হয়, সারনাথে গিয়ে তাঁর মনের ভাবটি ঠিক তদনুরূপ হয়েছিল।

এই চিঠিখানি অবনীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রবণতা ও ঐতিহ্যানুরাগের চমৎকার দৃষ্টান্ত। তবে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে তিনি সারনাথের প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্রের সঙ্গে নিজের পূর্ব্বজীবনকে ধ্যান-ধারণায় যুক্ত করলেও, বর্তমান জীবনের শিল্পসাধনায় অতীতমুখী ছিলেন না। যুগোপযোগী ভাব-ভাবনায় ছিলেন উদ্বুদ্ধ। রূপ সৃষ্টিও করেছেন এ যুগের রুচি ও আদর্শ অনুসরণ করে। তবে পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নি কখনও। এই চিঠিতেও সেই শ্রদ্ধা ও হৃদয় সংবেদ্য পরিস্ফুট হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ঘরমুখো, গৃহকোণে আবদ্ধ শিল্পী। সাধারণতঃ শিল্পীরা যা চান অর্থাৎ দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে চিত্র উপাদান সংগ্রহ করা, তা তিনি বিশেষ করেন নি। তবে মাঝে মধ্যে দু-চারবার বাংলা দেশের বাইরে ভ্রমণ যাত্রা যে করেন নি তা নয়। কলকাতা যতই ঘিঞ্জি, যত কল-কোলাহলময় ও বাড়ীঘর খিলানো হোক্ না কেন, তিনি তাঁর শিল্পীমনের খোরাক এখানেই প্রভূত পরিমাণে পেতেন।

তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপাদেবী একবার ঘাটশীলায় গিয়ে পিতাকে সেখানে যাবার জন্য লিখেছিলেন। তদুত্তরে তিনি কন্যাকে যা লিখেছিলেন তার মধ্যে তাঁর কলকাতা প্রীতি ও গৃহকাতর মনটির ছবি বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—

"যতই লোভ দেখাও, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে। বেশ লাগছে কলকাতা, আহা এমন স্থান কি আর আছে!…আহা, এই শহরের বাড়ি ঘেরা দৃশ্য কি চমৎকার! সকালের একটু একটু কুয়াসার মধ্য দিয়ে বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ আর ছায়া পড়ছে। দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্ব্বতের গায়ে আলোছায়ার ঝরণা ঝরছে।"—ইত্যাদি।

এই রকম পুরোনো জীর্ণ বাড়ীর গায়ে বিকীর্ণ আলোর ছবিও তিনি এঁকেছেন। কলকাতা শহর তাঁর পবিত্র জন্মস্থান। তার আকর্ষণ তো স্বতন্ত্র হবেই। অধিকন্তু, তিনি যে মহৎ শিল্পী ছিলেন তাও প্রকাশ পেয়েছে এই কলকাতার কথা বর্ণনাতে। কারণ সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে উপলব্ধি করা, অসুন্দরকে সুন্দর করে তোলাই মহৎ শিল্পের লক্ষণ। অবনীন্দ্রনাথের চিঠিতে কলকাতার রূপ বর্ণন তাঁর সেই ভাবানুসারী তো বটেই, পরন্তু নিজের গৃহাবাস, পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি সহজাত প্রাণের টান লক্ষণীয়।

বারাণসীর রায় কৃষ্ণদাসজী ভারতের কলারাজ্যে একটি স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতশিল্প এবং অবনীন্দ্ররীতির চিত্ররত্নরাজির তিনি প্রকৃত জহুরী। শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ ও তার উৎকর্ষ বিচারের শক্তিও তাঁর অপরিসীম। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় শিষ্যদের কলাকৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হন। সেই পরিচয়ের ফলে তিনি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারার একজন প্রকৃত দরদী সমঝদার ও সংগ্রাহক হয়ে ওঠেন।

রায়সাহেব তাঁর সংগ্রহ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতেন সাক্ষাতে দেখা শোনা করে ও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে। ভাষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। অবনীন্দ্রনাথের চিঠি অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত।

কৃষ্ণদাসজী এক সময় 'ভারত কলা পরিষদ' নামে বারাণসীতে একটি সংস্থা তৈরী করে সেখানেই তাঁর সংগ্রহালয়ের পত্তন করেন। উক্ত পরিষদের জন্ত সীলমোহরও প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

১৯২০ সালে কৃষ্ণদাসজী তাঁর পরিষদভুক্ত কলা শিক্ষালয়ের জন্য অবনীন্দ্রনাথকে তিন বছরের যোগ্য একটি পাঠ্যসূচী তৈরী করে দিতে অনুরোধ জানান। সেই বছরের ২০শে আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ একখানি চিঠির সঙ্গে একটি পাঠ্যতালিকা রচনা করে পাঠিয়েছিলেন। তাতে দেখা যায় যে তিনি ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের ছয়টি কারিকা (conons) অনুসরণ করেই ইংরেজীতে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করেছিলেন। তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ—

প্রথম বর্ষ

রূপভেদ প্রমাণানি—আকার, পরিমাপ প্রভৃতি

ক. সাধারণ জিনিস ও মডেল দেখে ড্রইং।

খ. সরল প্রকৃতির দূরাভাস (perspective)।

গ. বস্তু সামগ্রীকে বড় ও ছোট করে ড্রইং। •

ঘ. কালি ও ফ্লাট ধরনের রঙ দিয়ে তুলির কাজ।

ঙ. মাটি দিয়ে মূর্ত্তি রচনা।

দ্বিতীয় বর্ষ

ভাবলাবণ্য যোজনম্

ক. ফুল-ফল প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসের আলোছায়াযুক্ত রূপাকৃতির স্টাডি।

খ. মানুষ ও পশুপাখীর রেখাচিত্র।

গ. রঙ ও তুলিতে স্থাপত্যাংশ অঙ্কন।

তৃতীয় বর্ষ

সাদৃশ্যম্ ও বর্ণিকাভঙ্গ

ক. প্রাচীন চিত্র দেখে কপি করা ও প্রকৃতির রূপ দেখে অঙ্কন।

খ. মৌলিক রূপের কম্পোজিশন ও নকশা রচনা।

গ. পৌরাণিক আখ্যান, ইতিহাস ও সাহিত্য-পাঠ।

এই সিলেবাসটি দেখে উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে অবনীন্দ্রনাথ শিল্প-শিক্ষার্থীদের জীবনে কিছুকেই ত্যাজ্য বা পরিহার যোগ্য মনে করেন নি। নেচারস্টাডি, পার্সপেক্টিভ, প্রত্যক্ষভাবে বস্তু সামগ্রী স্টাডি, আলোছায়া পাতের চর্চ্চা, স্থাপত্যাংশের অঙ্কন থেকে শুরু করে দেশের প্রাচীন ছবি নকল করা ও মৌলিক রচনা—কিছুই বাদ দেননি তিনি। দেশের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য এবং ইতিহাস পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি ছাত্র-শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল কাঠামো তৈরীতে দেশী ও বিদেশী প্রথায় কোন বিভেদ সৃষ্টি করতেন না। তবে শেষ লক্ষ্য মৌলিক সৃষ্টি ও দেশজ ভাবভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করা।

রায়সাহেবকে প্রেরিত শিল্পাচার্য্যের আর একখানি পত্রে তিনি ছবি করার জন্য কি ধরনের কাগজ ব্যবহার করতেন তা জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে, কখনও তিনি চীন বা জাপান থেকে কাগজ সংগ্রহ করতেন না। পরন্তু তিনি ছাত্রদের ভারতজাত কাগজে কাজ করাতেন। 'তুলট' কাগজ সম্বন্ধে পত্রোত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, বারাণসীর বাজারেই তা প্রচুর পাওয়া যাবে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বরাবর চিঠি লিখে বলেছিলেন যে তিনি যেন ভারতকলা পরিষদের শিক্ষায়তনে প্রতিভাবান শিল্পীকে শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন। না হলে তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পী তৈরী হবে সেখানে। অবনীন্দ্রনাথ তথায় কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীকে নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ছু-তিনখানি চিঠিতে তিনি নবনিযুক্ত শিক্ষকের গুণ ও কর্ম্মধারা জানতে চেয়েছিলেন এবং রচনাবলীও দেখতে চেয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি শৈলেন দে-কে ওখানে শিক্ষকপদে বহাল করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ফাণ্ডের অভাবে তা করা সম্ভব হয়নি।

অবনীন্দ্র-তুলিকার রূপ-রসে সিক্ত অনেক ছোট ছোট চিঠিতে যেমন সুন্দর ছবি দেখা যায়, তেমনি পাওয়া যায় আনন্দময় রসিকপ্রবর শিল্পীর মনোজগতের সন্ধান।

পুরী ভ্রমণে গিয়েছেন তিনি কয়েকবার। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি জ্যেষ্ঠ জামাতাকে একটি পোস্টকার্ড লিখে তথাকার স্বগৃহ 'পাথারপুরী'-র বারান্দার দৃশ্য এঁকে পাঠান। একটি সিংহমূর্ত্তি ছিল সে বারান্দায়। চিঠি অতি ক্ষুদ্র। কুশল-বার্ত্তা পাঠিয়েছিলেন মাত্র। আর একবার পোস্টকার্ডে এঁকে পাঠালেন সমুদ্রে স্নানরত আত্মীয় স্বজনের চেহারা। কার্শিয়াং থেকে একবার চিঠিতে বড়মেয়ে ও নাতিকে ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানালেন নিজের পলা বসানো অঙ্গুরীমণ্ডিত হাতটির ধানদুর্ব্বাযুক্ত রূপ অঙ্কন করে। ছোট চিঠি ; ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ ও কুশলবার্ত্তা মাত্র লিখিত।

তিনি শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে ১৯৪৩ সালের ১২ই অক্টোবর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদসূচক চিঠিতে এঁকে পাঠিয়েছিলেন সাদায়-কালোয় ঘাসের গুচ্ছের পাশে একটি কালো মেয়ে। অল্প কথায়, স্বল্প চেষ্টায় রচিত এই ধরনের পত্র-চিত্রের অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে আত্মীয়, বন্ধু ও ছাত্রদের হাতে।

তন্মধ্যে প্রিয় ছাত্র নন্দলাল বসুকে লিখিত কয়েকটি ছোট চিঠি বিশেষ কৌতুকজনক এবং চিত্র হিসেবে ব্যাঙ্গাত্মক। ১৯১৫ সালের ১৪ই আগস্ট নন্দলালকে চিঠি লিখে সেই সঙ্গে এঁকে দিয়েছিলেন 'ঈদ' প্রসঙ্গ।

ছবিতে দেখা যায় ঈদ, সেখানে ছাতা মাথায় অনেক মুসলমান। বকরীদ-এ পৈতেধারী ব্রাহ্মণ ; তাঁর হাতে খাঁড়া, পাঁঠার মাথা নিয়ে তিনি চলেছেন। পেছনে হাড়িকাঠের ছবি। ছবি তুলিতে-কালিতে অঙ্কিত। লিখেছিলেন—
"বরষেতে এক ঈদ, বারোমাসই বকরীদ।"

আর একটি চিঠি—

প্রিয় নন্দলাল,

তোমার ছবি দুইটা পাইয়াছি। নববর্ষে তোমার আপদ বালাই দূর হউক। খোঁড়া ময়ূরের এই আশীর্ব্বাদ।

১৯শে এপ্রিল, ১৯১৬।

চিঠিতে তিনি এঁকেছিলেন কালো রঙের একটি ময়ূর, তার একটি পা ছোট, অর্থাৎ সে খোঁড়া, আর মুখে সাপ।

একবার দার্জ্জিলিং থেকে (১৯১৭) পোস্টকার্ডে সেখানকার দৃশ্য এঁকে লিখেছিলেন, "আমরা শুক্রবার নামছি। এখানে হাট খুব জমে।"

নন্দলাল বসু ১৯১৭ সালে কিছুদিন পুরীধামে গুরুর আবাস 'পাথারপুরী'তে' ছিলেন। তখন আচার্য্য তাঁকে যত চিঠি লিখেছিলেন তার প্রায় সব ক'টিতেই সমুদ্র ও জলের দৃশ্য অঙ্কিত। ষ্টীমারের ছবি এঁকে একটি কার্ড পাঠিয়ে লিখেছিলেন—

প্রিয় নন্দলাল, আমরা ভাল আছি। তোমাদের জায়গাটা বেশ ভাল লাগলোতো? তোমার পোস্টকার্ড পেয়েছি।

১৯২১ সালের ১৫ই এপ্রিল জলেতে নৌকার ছবি এঁকে লিখেছিলেন—

প্রিয় নন্দলাল,

পাথরের বন্দীর নববর্ষের আশীর্ব্বাদ লও।

কোন তত্ত্ব নেই, উপদেশ নেই, গুরুগম্ভীর চিন্তার আবেশও নেই এই সকল ক্ষুদ্রাকার চিত্রায়িত চিঠিপত্রে। ছবিগুলিও অতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সুস্পষ্ট। কিন্তু কলমবাজীর ও রসরূপের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পোষ্টকার্ডের ছবিতে চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার নবতর ও অভিনব আর একটি স্বরূপ হয়েছে প্রতিফলিত।

অবনীন্দ্রনাথ মহাশিল্পী, মহাগুরু। নন্দনতত্ত্বের মহৎ ব্যাখ্যাতা এবং এ যুগের কলা-আন্দোলনের ও নবীন চিত্র-সাধনার প্রধান হোতা। ছবির পর ছবি এঁকে যে শিল্পী-জীবনের গোড়াপত্তন, সেই জীবনধারা যে আরও কত বিচিত্র পথে কত শত রূপে প্রবাহিত হয়েছিল তার সম্যক পরিচয় লাভ ও বিশ্লেষণ আজও অপেক্ষমান। বহু বিচিত্রতার পথ ধরে তা চলেছিল সুদীর্ঘকাল। আর সেই সঙ্গে তিনি যে দ্রুত লেখনী চালিয়েছিলেন তার ফলশ্রুতিও অতি অসাধারণ ও অনবদ্য।

তাঁর লেখনীপ্রসূত সৃষ্টিসম্ভারেও চিত্রপটের মত অনন্ত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। 'দেশী মতে' ছবি আঁকা আরম্ভ করে কি আঁকবেন এই সমস্যায় যখন পড়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথই তাঁকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই অবনীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর কবিতাকে ছবির বিষয়রূপে গ্রহণ করেন। তদনুরূপ লেখার বেলায়ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এসে গেল অনিবার্য্যভাবে। অবনীন্দ্রনাথ বরাবরই চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। তা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখবার জন্য উৎসাহ দিতেন। সেই কথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "একদিন আমায় উনি (রবি কা) বললেন, 'তুমি লেখোনা, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' শিল্পী ভাবলেন যে কস্মিনকালেও তাম্বারা তা হবে না। কিন্তু কবি আবার বললেন—'তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি'।"[১]

এই কথায় শিল্পীর মনে জোর এল। এক হাতে তো তুলি ছিলই, তখন আর এক হাতে ধরলেন কলম। 'এক ঝোঁকে' লিখে ফেললেন 'শকুন্তলা'। নিয়ে গেলেন সেটি রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি আগাগোড়া বইটি পড়লেন। একটি সংস্কৃত শব্দ 'পল্বলের জল' সংশোধন করতে গিয়েও তিনি তা করেন নি। বইটি অনুমোদিত হোল। শিল্পী বিশ্বকবির ছাড়পত্র পেয়ে সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করলেন। সেই ঘটনার কথায় অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় স্ফুর্তি হোল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন, 'ভয় কি আমিই তো আছি', সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।"[২]

১, ২. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ১১৮-১১৯

এই যে খুলে যাবার কথা বলেছেন তা সাধারণ খোলা নয়। অতি অসাধারণ ও অভূতপূর্ব্ব। চিত্রকলার মত সাহিত্যক্ষেত্রেও এক নতুনতর ভাব ও আঙ্গিকের শুভ সূচনা হোল সেদিন। যুগপৎ চললো চিত্ররচনা ও শিশু-কিশোরদের জন্য, তাদের কল্পনা প্রবণতার পুষ্টি ও বিকাশের সহায়ক বিচিত্র স্বাদ ও ভাবভঙ্গীর সব গল্প ও কাহিনী-কথা লেখা, যার মধ্যে ছবি, ছবি ভাবটাই বেশী। রূপকথার গল্পে, রাজস্থানের কাহিনীতে তাঁর বর্ণনাভঙ্গীই এনে দিয়েছে বর্ণাঢ্য চিত্রের রূপাক্ষর। তুলির টানে, রঙের পোঁছে পটের গায়ে তিনি যেমন রূপ-অভিরূপের জগত সৃষ্টি করেছেন, তেমনি কলমের আথরে, শব্দের ঝঙ্কারে যা রচনা করেছেন তাও এক-একটি বাঙ্ময় চিত্র। তাঁর ছবি আঁকা ও গল্পলেখা দুটি একাত্ম ও এক প্রাণ-রসে সঞ্জীবিত।

'বুড়ো আংলা'য় তিনি লিখেছেন, 'ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।' বস্তুতঃই তিনি ভাষার মাধ্যমে পুঁথি-পুস্তকে ও গল্প-কাহিনীতে ছবির পর ছবি ফুটিয়েছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে।

ছোটবড় যার জন্যই যা লিখেছেন তা প্রকৃত অর্থে চিত্র না হলেও চিত্রকল্প, চিত্রময়। তাঁর সাহিত্যকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে নানা ভিন্নধর্ম্মী ও নানা রসের চিত্রাভাসের সন্ধান পাওয়া যায়। শিল্পী-লেখক তিনি। অতএব তাঁর চিত্রাবলীর মত লেখার মধ্যেও দেখা যায় রূপবৈচিত্র্য, আঙ্গিকশৈলীর অপূর্ব্ব স্তরভেদ, ও ভিন্নমুখী নানা ভাবধারার অনন্ত প্রবাহ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"অবন কি আশ্চর্য্য মানুষ, সত্যিই আর্টিস্ট। ওর তুলিতেও ছবি, কলমেও ছবি। একেবারে নিজস্ব স্টাইল।" (বাইশে শ্রাবণ)

অবনীন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ সমূহের অধিকাংশই শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' সহ শতাধিক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। এই প্রবন্ধসম্ভারে তিনি বাংলাভাষাতে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন দিগ্‌দর্শন করিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দী পথিকৃৎ।

তাঁর নান্দনিক অনুভূতি ও তার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যানের মৌল আদর্শও তাঁর চিত্ররীতির ন্যায় দেশজ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তবে সেই ব্যাখ্যান ও আলোচনার ক্রমধারায় তাঁর স্বীয় অনুভাব, অভিজ্ঞতা ও রসোপলব্ধির প্রকাশও হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বিধৃত নিয়ম সূত্রকে তিনি বিশেষভাবেই অধীত ও আয়ত্ত করেছিলেন। তার মধ্যে নিহিত শিল্প সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও শৈল্পিক আদর্শের গোড়ার কথা তিনি স্থানে স্থানে

আলোচনা ও উদ্ধৃত করেছেন বটে, কিন্তু রূপকলা সম্বন্ধে তাঁর স্বমত ও আদর্শ এবং অভিজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন সুস্পষ্টভাবে।

আর সেই প্রকাশ তাঁর আবাল্য চিত্র-সাধনা, জগত ও জীবনকে বিশেষ একদৃষ্টিতে দেখা এবং স্বতন্ত্র একটি হৃদয়ানুভূতিসঞ্জাত ও রসোল্লাসজনিত অভিব্যক্তি।

তিনি শিল্পশাস্ত্র অধীত করলেও শিল্পায়নে শাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিল্পশাস্ত্র আলোচনার সূত্রপাতেই (ষড়ঙ্গ) তিনি সেই কথাটি বলে নিয়েছেন যে, 'আগে শিল্পী ও তাঁর সৃষ্টি, পরে শিল্পশাস্ত্র ও শাস্ত্রকার—শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র। আগে মূর্ত্তি রচিত হয়; পরে মূর্ত্তি লক্ষণ, মূর্ত্তি বিচার, মূর্ত্তি নির্ম্মাণের মান-পরিমাণ নির্দিষ্ট ও শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হয়।'

তিনি আরও বলেছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে কেউ যেমন ধার্ম্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করে বা তার গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ থেকে কেউ শিল্পী হয় না।

মূর্ত্তিতত্ত্ব, প্রতিমা-লক্ষণ ও চিত্রকলার ষড়ঙ্গকে তিনি যে কত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর লিখিত ষড়ঙ্গ, ভারত-শিল্পে মূর্ত্তি ও 'Artistic Anatomy' নামক বই ক'টি। শেষোক্ত নিবন্ধে দেবতা ও নানা স্তরের মানুষের মূর্ত্তি রচনায় ও অঙ্গ-অবয়ব গঠনের অতি চমৎকার নির্দেশনা আছে যার সমন্বয়ে সুন্দরতম ও প্রকৃত দেবভাবাপন্ন মূর্ত্তি প্রতিমায় রূপ দেয়া যায়। তিলে তিলে সমস্ত শাস্ত্রীয় লক্ষণাবলীর প্রয়োগ-প্রযুক্তিতে তিলোত্তমার রূপ রচিত হতে পারে!

এই বিষয়েও অবনীন্দ্রনাথের মত ছিল স্বতন্ত্র। তিনি তত্ত্বগত ভাবে প্রাচীনকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু সুন্দর সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা ছিল ভিন্ন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, শাস্ত্রসম্মত মূর্ত্তিই সুন্দর। কিন্তু তিনি বলেছেন, 'সুন্দর যা, তা হৃদয়কে টানে, প্রাণে দোলা দেয়।'

ভারতীয় চিত্রনির্ম্মিতির ষড়ঙ্গ—

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাব লাবণ্য যোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের টীকায় যশোধর পণ্ডিত চিত্রকলার এই ছয়টি অঙ্গ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ এই সূত্রটির প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এমন অনেক নতুন কথা শুনিয়েছেন যা তাঁর নিজ অনুভূতি ও

অভিজ্ঞতা প্রভৃত। চিত্রচর্চ্চার পথে সুদীর্ঘকাল চলার পরে এবং অজস্রধারায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে রূপ, ভাব, লাবণ্য, বর্ণিকাভঙ্গ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর যে সত্য উপলব্ধি তাও তিনি এই শাস্ত্র ব্যাখ্যানে সংযোজিত করেছেন অতি সহজ ভাবে ও ভাষায়। এই উপলব্ধির গোড়াতে তাঁর শাস্ত্র ও অনুশীলনের প্রভাব থাকলেও নিজ অনুভূতির প্রবাহকে তিনি রুদ্ধ রাখেন নি। তারও অবাধ প্রকাশ হয়েছে স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে।

ষড়ঙ্গের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে উত্তম চিত্রের লক্ষণাবলী আলোচনা করে তিনি আবার যা বলেছেন তা তাঁর নিজের প্রাণের কথা। সে কথা হোল, "চিত্র হয় তখন, যখন চিত্রকরের অন্তর্নিহিত উদয় বাসনা বা প্রকাশ বেদনা ছন্দের নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়া অন্তর্বাহ্য দুইরূপে নিজেকে সঙ্গত করিয়া রসোদয়ে পরিণত হয়।"

রস ও ছন্দকেই তিনি চিত্রের প্রাণ বলেছেন। আর সেই ছন্দ চিত্রকারের চিত্ত থেকে চিত্রে এবং তা থেকে রসিকের প্রাণে বাহিত হয়। সেই ছন্দই গিয়ে রসে পরিণত হয়। এই রস ও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত এই যে, তা চোখে দেখা ও হাতে ছোঁয়ার জিনিস নয়। তা প্রাণ দিয়ে দেখা ও প্রাণ দিয়ে স্পর্শ করার জিনিস।

রূপভেদ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনের বিষয়। তাঁর মতে দর্শকের চোখের উপর নির্ভর করে রূপভেদের তাৎপর্য্য সম্যক বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। রূপের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের রুচি অধিক ক্রিয়াশীল। কিন্তু আর্টিস্টের কাছে এ-রূপ ও সে-রূপ-এর মধ্যে তেমন কোন দুস্তর প্রভেদ কিছু নেই। নীরসের স্বাদ পেয়েও আর্টিস্টের মনে রসের সঞ্চার হয়—এইটুকুই তফাত আর্টিস্ট ও সাধারণ মানুষে।

রূপের রাজ্যে সু ও কু নির্দিষ্ট হয় বস্তুরূপের সঙ্গে দর্শকের রুচি ও চোখের দীপ্তির যেমন যোগ-সংযোগ ঘটে তদনুরূপ। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ শুক্রাচার্য্যের মতকে গ্রহণ করে বলেছেন যে, শুধু চোখের দীপ্তি দিয়ে রূপকে দেখা নয়, দেখানো নয়, মনের দীপ্তি দিয়ে তাকে দেখতে হবে এবং প্রকাশও করতে হবে।

প্রমাণ প্রসঙ্গে তিনি পরিমিতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। গজ-ইঞ্চি দিয়ে প্রমাণ নির্ণীত করা যায় না—এই তাঁর সুস্পষ্ট মত। শিল্পবস্তু সুন্দর হয় শিল্পীর পরিমিতি বোধে। 'রূপ' সম্বন্ধেও যেমন তিনি মনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি বলেছেন যে ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগূঢ় ভাবটিও কেবল মন দিয়ে অনুভব

করা যায়। যে ভাব ব্যঞ্জনাটি কি রকম? তদুত্তরে তিনি বলেছেন যে, ফুলের মধ্যে সৌরভটুকু যেমন, চিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জনাটুকুও তেমনি।

লাবণ্যকে তিনি শব্দের তাৎপর্য্য ধরে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, চিত্রের সমস্ত ভাবভঙ্গীতে লাবণ্য একপ্রকার শীতলতা ও শোভনতা দিয়ে চিত্রটিকে নয়নস্নিগ্ধকর ও মনোহর করে তোলে। কিন্তু তাঁর নিজের মতে লাবণ্য লেখাটি হচ্ছে সকল সময়েই 'শুচি এবং সংযতা'। আর 'লাবণ্য চিত্রের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আড়ম্বরটি তার সবচেয়ে কম। লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা, সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন, তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন।'

অবনীন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গের মধ্যে বর্ণিকাভঙ্গ অর্থাৎ বর্ণ যোজনার প্রভাবটিই মানুষের উপর মনের অধিকতর ক্রিয়াশীল বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"চিত্রে মনের রঙকে ফলাইয়া তোলা, মনের অন্ধকারকে ঘনাইয়া আনা, মনের আলোকে জ্বালাইয়া দেওয়া এবং মনের ষড়ঋতুর বিচিত্রচ্ছটাকে প্রকাশিত করাই হইতেছে বর্ণিকাভঙ্গে বর্ণজ্ঞান।"

আবার বলেছেন—"বর্ণ মেশায়না চোখ, বর্ণ মেশায় মন।···আমি কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি যদি মনের রঙটুকু সেই কালিতে আনিয়া মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে না যদি মন তাহাকে রাঙায় আপনার বর্ণে।"

ষড়ঙ্গ ও শাস্ত্রানুগ মূর্ত্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণের (রেখাচিত্রসহ) পরে তিনি আর একবার যে তাঁর নন্দনানুভূতি প্রকাশের অপূর্ব্ব সুযোগ পেয়েছিলেন, তা বিধৃত হয়ে আছে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' ও 'শিল্পায়ণ' নামক দুটি গ্রন্থে। এতদ্‌ব্যতীত আরও কিছু সংখ্যক প্রবন্ধের মধ্যেও তাঁর শিল্পীসত্তার রসবেদন অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী বক্তৃতাদানের সময়টি (১৯২১-২৯) তাঁর চিত্র নির্ম্মিতির মধ্যাহ্নলগ্ন। তাঁর নিজস্ব ও সৃজনী প্রতিভার অভিনবত্ব সে সময় চূড়ান্ত সিদ্ধির শিখরে সমারূঢ়। তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে তৎকালীন মতামত, আলোচনা, নিন্দা-প্রশংসা তাঁর মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা সম্যকরূপে জানার অবকাশ স্বল্প। তা'হলেও একটি কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত ও অভিভূত না হয়ে নিজের সৃষ্টির আনন্দেই বিভোর ছিলেন। রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতন খোঁজাই ছিল তাঁর শিল্প-সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

চিত্ররচনা করেছেন স্বীয় ক্রিয়া-কৌশল, আন্তর সম্পদ, ভাব-ভাবনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা। কিন্তু মাঝে মাঝে বোধহয় শিল্পের তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশকালের প্রভেদ, যুগলক্ষণা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবেদন সম্পর্কে তাঁর মনে আলোড়ন সৃষ্টি হোত। বাগেশ্বরী বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি উপর্যুক্ত সমস্যারাজি সম্বন্ধে আলোচনা ও মীমাংসার পথ পেয়েছিলেন। তখন তিনি দুটি ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রথমে শিল্পী ও স্রষ্টা; দ্বিতীয়, শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা ও সুরসিক সমঝদার। এ যেন সব্যসাচীর ভূমিকা। এক হাতে তুলি, আর এক হাতে লেখনী।

এই বক্তৃতামালায় নিবন্ধাকারে বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে প্রায় ত্রিশটি। তার মধ্যে শিল্পের সংজ্ঞা, ভাষা উৎকর্ষ-অপকর্ষ, মান-পরিমাণ, সৌন্দর্য্যরুচি, সুন্দর-অসুন্দরের প্রভেদ, রূপ-অরূপ এবং শিল্পরস আস্বাদনের রীতি-পদ্ধতি সবই হয়েছে আলোচিত। এই আলোচনায় ভাষাভঙ্গী স্বকীয় বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। তাঁর অনন্য বর্ণনা ভঙ্গিমায় চারুকলার নিগূঢ় তত্ত্বকথা সহজ সরলতায় ও কবিতার রসমাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়েছে। কাব্যগুণান্বিত ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন গদ্যরচনা। এর মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গী ও গীতিকাব্য সুলভ রচনাশৈলীর মিলন হওয়াতে অদ্ভুত এক অনাস্বাদিত রস-প্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ণনাবিন্যাসে আবার সেই উনবিংশ শতকীয় আমিরী মেজাজ ও বৈঠকীচালেরও আমেজ অনুভূত হয়। ইহা বিশেষ এক অবনিন্দ্রীক লিখন-রীতি। এর মধ্যে চিত্রনিপুণ, রসজ্ঞ, স্বতন্ত্র আভিজাত্য মণ্ডিত, খেয়াল-খুশীর সওদাকারী ও নিয়ম-অনিয়মের লাগামহীন বিশেষ এক অবনীন্দ্র-মানসিকতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে।

দেশী-বিদেশী শিল্পতত্ত্ব, কাব্যকাহিনী ও রসশাস্ত্রের সমুদ্রমন্থন করে তিনি যে রত্নাবলী সংগ্রহ করেছিলেন, তাকে নিজের ভাব-ভাবনা ও আদর্শের সূত্রে গ্রথিত করে উপহার দিয়েছেন বঙ্গভাষাভাষী রসিক সমাজকে। অনেক ব্যাখ্যান বিশ্লেষণে শিল্পশাস্ত্র ও প্রাচীন সাহিত্যের নজির এবং নন্দনতত্ত্বের বিদেশী লেখকদের মন্তব্যাদিও উল্লেখ করেছেন। আর তন্মধ্যে নিহিত নীরস তত্ত্বকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন অতি সরসভাবে।

শিল্পচর্চ্চার গোড়ার কথা অবনীন্দ্রনাথের মতে হচ্ছে 'শিল্পবোধ'। শিল্পকার ও রসিক উভয়েরই চাই শিল্পবোধ। এই বোধসম্পন্ন মানুষই শিক্ষা ও চর্চ্চার সাহায্যে শিল্পের জগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। এই অধিকার অর্জ্জন করতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে, পুরুষানুক্রমে ধন-সম্পদের

অধিকারের মত শিল্পজ্ঞানও সৃজনীশক্তি অনায়াসে লাভ করা যায় না। শিল্প আবার 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা'। বিধাতার নিয়মের মধ্যে ধরা দিতে চায় না। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে এই কথাটি বাস্তব হয়ে উঠেছিল তাঁর চিত্র-রচনার বিচিত্র ভাবভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তিনি আদর্শে ও বাস্তবে একই ধারা অবলম্বন করে চলেছিলেন। অর্থাৎ 'নিয়তির থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র নিয়ম হল আর্টিস্টের নিয়ম।' তবে জীবন ও পরিবেশকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এই সূত্রে তাঁর একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"শিল্প বল, সভ্যতা বল, ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, সবই জীবন থেকে রস টেনে তবে বাঁচে।" (শিল্পবৃত্তি : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী) অর্থাৎ কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ভাস্কর, গায়ক সকলেই নিজ নিজ অন্তর ও প্রবৃত্তি নিয়েই কেবল মশগুল থাকে না। বহির্জগৎ ও নানা সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ থেকেও তাঁরা প্রেরণা ও শিক্ষালাভ করেন। দেশ, কাল, ধর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েই তাঁরা চলেন।

শিল্প ও শিল্পীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, সেখানেও তিনি মানুষ ও সমাজকে সমান স্থান দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হোল—

"জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি বিষয়ে, এই হল শিল্পের কাজ। রসভোগের অধিকার শিল্পীর সত্য অধিকার। শিল্পের নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হল, মানব জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ভোগাধিকার ও নানা ক্ষমতা অধিকার বিস্তৃত হল, মানব শিল্পের ইতিহাস এই কথাই জানায়।" (শিল্পায়ণ—১)

তবে সেই আর্টকে পেতে, তাঁর মতে, তপস্যা আছে,—প্রক্রিয়া অর্জ্জনের তপ, মননের তপ, দর্শনের তপ, শ্রবণের তপ। এই তপস্যাগুলিকে আরও প্রাঞ্জল করে বলেছেন তিনি 'আর্ট ও আর্টিস্ট' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন—

"রসগ্রাহিতা, ভাবুকতা, বিচারশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, উৎসাহ, একাগ্রতা, সংযম, জ্ঞান পিপাসা, স্বদেশের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং চিত্র করণে নৈপুণ্য—এমনি বহুতর গুণ লইয়া Artist-এর সৃষ্টি হয়।···বহু সাধনায় বহু জ্ঞান লাভ না করিলে Artist হওয়া দুষ্কর।"

তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস ও জীবনচর্য্যা আলোচনা করলে উপর্যুক্ত গুণাবলীর

যে তিনি যথার্থ অধিকার লাভ করেছিলেন তা অনস্বীকার্য্য। তাঁর এই নন্দনতত্ত্ব বস্তুতঃই তাঁর জীবনে উপলব্ধ ও পরীক্ষিত সত্য বললে অত্যুক্তি হবে না।

অবনীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও শিল্পসাধনা এক ও অভিন্ন। তাঁর সেই সাধনা বস্তুতঃ পরম সুন্দরকে আবিষ্কারের দুরূহ চেষ্টা। যুগে যুগে কত মানবাত্মাই তো পরম সুন্দরকে লাভ করতে চেয়েছে। কিন্তু পূর্ণ সাফল্য আসেনি কোনদিন। সাধনারও শেষ নেই। ইহাকে আর এক কথায় বলা যায় রূপ খোঁজার পালা। একে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন খেলা। আর সে খেলা সবচেয়ে প্রাচীন। তিনি বলেছেন—

"এ কি রহস্য এ কেমন খেলা! মানুষ কোন্ কালে ছবি লিখে লিখে খেলতে সুরু করেছে—আজও সেই সেই খেলাই চল্লো; মানুষের এ খেলায় অরুচি হ'ল না কেন?"—রূপবিদ্যা, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।

এই রূপবিদ্যার চর্চ্চাকে তিনি আবার আখ্যাত করেছেন 'লীলা' নামে। কারণ যা খেলা তা নেশা ছুটলে থেমে যায়। কিন্তু লীলার অবসান নেই। অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদে রূপশিল্পীরা রঙ-রেখার মাধ্যমে সেই অরূপ লোকের, কল্পলোকের পরম সুন্দরকেই পটে, মূর্ত্তিতে ধরে রাখবার চেষ্টায় ব্যাকুল। দিনরাত তার জন্য কত না চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে শিল্পীর মনে ও ক্রিয়াকলাপে। সেখানে অনবরত চলেছে গ্রহণ-বর্জন, এগিয়ে চলা ও পেছনে যাবার পালা। এই প্রসঙ্গে তাঁর মত হোল যে আজ যেখানে মনে হয় যে আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হতে পারে তাই হোল, ফলে দেখা যাবে সেইখানেই শিল্পী দাঁড়িয়ে আছেন, আর বলছেন, হয়নি, আরো এগোতে হবে, কিম্বা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হবে।

শিল্পীর এই সাধনা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে তিনি রসগ্রাহিতা ও ভাবুকতাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। 'রূপ ফোটানো এবং রস গছানো দুয়ের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মিল হ'ল, পরিণয় হ'ল, তবে হ'ল আর্টের জন্ম।' (রস রচনার ধারা: বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী)

রসসঞ্চারে তিনি 'নালমতিবিস্তরেণ' আদর্শের পক্ষপাতী। কারণ তিনি মনে করতেন যে, অতিবিস্তারে অপর্য্যাপ্ত রস সঞ্চারিত হয় না। উচ্চস্তরের সামান্য রস সঞ্চার হলে তাতেই অনন্ত তৃপ্তি হয়। অর্থাৎ 'অমৃত হয় একটি ফোঁটা, তৃপ্তি দেয় অফুরন্ত।' তবে রস-সঞ্চারে তিনি বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করেন নি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনও বিভিন্ন। অতএব রসও বিচিত্র ধরনের।

এই কারণেই দেশ ও জাতির বিভিন্নতায় শিল্পচিন্তা ও তার আয়োজনে পার্থক্য দেখা যায়। শিল্পকে অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'অনন্য-পরতন্ত্রা'। আর অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রসপরতন্ত্রতাই' হোল প্রধান আয়োজন, আর একমাত্র আয়োজন। তবে তিনি দেশ জাতি ও মানুষ ভেদে শিল্পচিন্তায় যে প্রভেদ তাকে অস্বীকার করেন নি। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য এই—

"প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিল্পরসকে ধরবার যে আয়োজন করে নিলে সেইটেই হ'ল ঠিক আয়োজন, তাতেই ঠিক জিনিসটি পাওয়া যায়।" (শিল্পে অধিকার)

তিনি প্রকৃত আর্ট বলতে বুঝিয়েছেন যে আর্টিস্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিতি (infinity) এবং তাঁর (শিল্পীর) স্বতন্ত্রতা (individuality)—ইহার নির্ম্মিতি নিয়ে যেটি হয় সেটি ঠিক Art। আর অন্যের নির্ম্মিতির ছাপ, এমন কি বিধাতারও নির্ম্মিতির ছাঁচে ঢালাই হয়ে যা সৃষ্টি হবে তাকে নকল বই আসল বলা চলবে না।

আর্ট-এর মুখ্য লক্ষণ রূপে তিনি আড়ম্বরশূন্যতা বা simplicity-কে প্রথম স্থান দিয়েছেন। কারণ রসের তৃষ্ণা ও শিল্পের ইচ্ছা যার মধ্যে জাগে সে কোন আয়োজন, আড়ম্বরের অপেক্ষা করে না। রসের প্রেরণাই তাকে চালিয়ে নেয়।

রস ব্যতীত কল্পনাবৃত্তিও শিল্পীকে এবং তাঁর সৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যকে নিয়ন্ত্রিত করে বিশেষভাবে। এই অভিমত প্রকাশ করে তিনি মন্তব্য করেছেন—"শিল্পের প্রাণ হচ্ছে কল্পনা, 'অবিদ্যমানের নিশান'।… মানুষের সমস্ত কাজে, কর্ম্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কল্পনাটা প্রথম তারপর বাস্তব—এই হ'ল রচনার ধারা ও রীতি। কল্পনাটা মানুষের মধ্যে প্রবল শক্তিতে কাজ করে।" (অন্তর ও বাহির)

কল্পনা প্রবণতা ও রসসঞ্চার হোল শিল্পের অন্তরের কথা। কিন্তু তার বাইরের আকার আকৃতি প্রসঙ্গে সুরূপ ও কুরূপ, সুন্দর অসুন্দরের একটা সমস্যা ও প্রশ্ন চিরকালের। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আর্ট যা তা সুন্দর ও সত্য। আর ভান যা তা অসুন্দর এবং অসত্য। অসুন্দর নিজেকে মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদন করে রাখে। কিন্তু সুন্দর ধরা দেয় অনাবৃত রূপে। তার স্থান সত্যের উপরে। বাস্তবিক সুন্দর কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে তা নির্দ্দেশ করেছেন তিনি এই উক্তি দ্বারা—

"সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর

আত্মা—যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্ত্তমান হল।"

রূপের অন্তর-বাহির দুটি অংশ। অর্থাৎ "রূপের আড়ালে অরূপ বীণা"। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বাইরের রূপটি সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্তু রূপের মাধুরী সবার কাছে ধরা দেয় না। তিনি বলেছেন, "ফুলটা দেখলাম, ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে ফুলের সৌরভ কেমন তাও জানলাম, কিন্তু এই হলেই যে ফুলের মাধুরীটিও পেয়ে গেলাম এমন নয়।"

সেই মাধুরীটি পাওয়া গেলেই রূপের তিনটি অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। এই জন্তই তিনি রূপের মধ্যে তিনটি অংশের সন্ধান দিয়েছেন। তা'হোল, বস্তুর আকার-প্রকার, তারপরে তার ভাব। রূপাকার ও ভাবসম্পদ মিলে ফুটে ওঠে সেই মাধুরী। এই মাধুরীকে মৌখিক বিশ্লেষণে বুঝিয়ে দেয়া যায় না। বাইরের রূপ চোখে দেখেই বোঝা যায় কি জিনিস, কি তার কাজ ইত্যাদি। কিন্তু মাধুরী অন্তরের জিনিস, তা উপলব্ধির বিষয়। রূপদক্ষ ব্যক্তিরা নিজেরা তা জানেন, কিন্তু অন্তকে জানাতে পারেন না। সেইটিই হচ্ছে তাঁর মতে Art-এর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা। তা artist-এর অনুভূতির বিষয়। আর তা অসাধারণ বলেই সকলকে বুঝিয়ে দেয়া যায় না।

তিনি আরও বলেছেন যে, যাঁরা বাস্তবিক রূপদক্ষ তাঁদের আনন্দের শেষ নেই, চোখ মন সব দিয়ে একটি রূপকে তাঁরা বিচিত্রভাবে দেখে যাচ্ছেন নতুন নতুন ভাবে। তা আবার চির নতুন। এই কারণেই সাধারণ মানুষ ও রূপদক্ষের দৃষ্টিতে দুস্তর ব্যবধান।

ভারত-শিল্পের মূলসূত্র হোল—'রূপের সঙ্গে রূপাতীত এক হয়ে গাঁথা'। তিনি রূপসৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা বলেছেন তাও ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্বের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ মূর্ত্তিশিল্পের চরম লক্ষ্য হোল পাষাণে দেবতার অবির্ভাব।

'রূপদক্ষ' শব্দটিকে তিনি 'আর্টিস্ট' কথার সঠিক প্রতিশব্দ হিসেবে স্থান দিয়েছেন। কেন না, আর্টিস্টের কাজ হোল রূপের ভেদাভেদ ও রহস্য প্রকাশ করা। এখানেই উপাদান-উপকরণ, আঙ্গিক-শৈলী ও করণ-কৌশলের প্রশ্ন ওঠে।

এই রূপদক্ষতা অর্জন হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মন্তব্য, "রূপ দক্ষতা সেইখানে যেখানে রূপে-রেখায়, রূপে-ভাবে, সুরে-কথায় এবং এক রেখায় অন্য রেখায়, এক রূপে অন্য রূপে, এক সুরে অন্য সুরে,

একাত্ম হয়ে রসসৃষ্টি করে। রেখা ছাইলো রূপকে, রূপ ছাইলো রেখাকে এমনভাবে যে কেউ কাউকে মারলে না কিন্তু মিল্লো সহজ ছন্দে—তখনি হ'ল রস, না হলে বিরস হ'ল ব্যাপারটি।" (রূপদেখা : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী)

ভারতীয় চিত্ররেখা প্রধান। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথও রূপ গঠনে রেখার প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন অনেকবার। তিনি বলেছেন, "রূপ এবং রেখা দুয়ের যথার্থ মিলন সপ্রমাণ করে রূপবতী রেখা, সেখানে রূপকেও পাই, রেখাকেও পাই, রসকেও পাই এক সঙ্গে মিলিয়ে।" (রূপদেখা : বা. শি. প্র.)

কিন্তু রেখা কেবল রূপকে বা মূর্ত্তিকে 'তারের খাঁচার মতো' করে আটকে রাখবে তা তিনি সমর্থন বা যোগ্য কাজ মনে করেন নি। এই বিষয়ে মিশরের ভাস্কর্য্য ও বাংলাদেশের তালপাতার পুঁথির চিত্রকে তিনি রেখার বন্ধনে আবদ্ধ বলেছেন। মানুষের মূর্ত্তি বা প্রকৃতির রূপ যেখানে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিদর্শন হয়ে ওঠে, সেখানে দেখা যাবে যে রেখা যেন থেকেও নেই। অর্থাৎ রূপের মাধুর্যে, ভাবের হিল্লোলে রেখা আত্মনিলয় করে রূপের গরবে গৌরবান্বিত হয়ে রয়েছে। রূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, নিলীন হয়ে যে রেখা চলতে পারবে, প্রতিভাধর শিল্পী তাকেই সন্ধান করেন। যুগ যুগ সঞ্চিত সাধনার ফলে সেই রেখা আবিষ্কৃত হয়।

চিত্রের মূল কাঠামোটি তৈরী হয় রেখার দ্বারা। তারপরেই আসে রঙ বা বর্ণের কথা। এই বিষয়েও তাঁর মত সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

"লাইনই হ'ল আকৃতির বন্ধন—এই রেখার বেষ্টনে প্রকৃতি বিচিত্র নক্সা তৈরী করেছে, কিন্তু যেখানে অ্যাবসট্রাক্ট্ আইডিয়া বা ভাবরাজ্যের কথা এসে পড়ে সেখানে লাইন আর এগোতে পারে না। তখন রঙের অসীমতার মধ্যে তাকে ডুব দিতেই হয়।···আকৃতির ভাবকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য রঙেতে আলোছায়ার প্রয়োজন। রঙের নিজস্ব নিবিড়তা ও বিশিষ্টতা রক্ষা করতে না পারলে ছবিতে ভাব ফোটানো কঠিন হয়।" (স্মৃতিচিত্র)

সুতরাং রেখার পরে রঙের আবশ্যকতাকে তিনি নানাভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্ণিকাভঙ্গের (ষড়ঙ্গ) যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন, তাও বাস্তবে তাঁর চিত্রপটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসূত উক্তি মনে হয়। যেমন—

"বর্ণ শুধু রঞ্জিত করে না, বর্ণ চিত্রকে বর্ণিত করে। শুধু ফুলের রঙটুকু নয়, তাহার সৌরভটিও; শুধু সূর্য কিরণের রঙটুকু নয়, তাহার উত্তাপের স্পর্শটি পর্য্যন্ত; সকালে কিরূপ, সন্ধ্যায় কিরূপ, দ্বিপ্রহরে কতটা—বর্ণ দিয়া এ সমস্তই বর্ণন করিতে শেখা চাই।" (ষড়ঙ্গ)

বর্ণ দিয়ে বর্ণনা করার কথা বলেছেন। কি বর্ণনা করবেন শিল্পী? বর্ণনা করবেন তাঁর নিজ আত্মাকে। শিল্পীর আত্মা চিত্রপটে প্রতিফলিত হলেই তা চিত্র হয়। অবনীন্দ্রনাথের মতেও চিত্র হয় তখন, যখন চিত্রকারের অন্তর্নিহিত 'উদয় বাসনা ও প্রকাশ বেদনা' রঙ-রেখার ছন্দের নিয়মে চালিত হয়ে অন্তর বাহির দুই রূপে এবং বিশেষ করে রসরূপে পরিণত হয়। চিত্রে প্রতিফলিত ছন্দকে তিনি বলেছেন 'অভিপ্রায়'। কেন না, চিত্রপটে শিল্পীর অভিলাষ বা মনোভিপ্রায় ব্যক্ত হয় ছন্দের মাধ্যমে। এই অভিলাষ বা মনন-ক্রিয়াই তো শিল্পীর অন্তর-ব্যঞ্জনার রূপধর্ম। অন্তরের ক্রিয়া-ব্যঞ্জনা না থাকলে কোন সৃষ্টিকর্ম্মই রসোত্তীর্ণ ও শিল্প পদবাচ্য হয় না। এই জন্যই তাঁর মতে—"অন্তর বাজেতো যন্তর বাদে। মনের স্পর্শ নইলে গাওয়াও বৃথা, বাজানো বৃথা, ছবি আঁকাও বৃথা।" (জোড়াসাঁকোর ধারে)

আর ছবি আঁকার ব্যাপারে তিনি এই যুক্তিতেই টেক্‌নিক্, স্টাইলকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে প্রস্তুত হননি। তাঁর মতে আসল জিনিস হোল মানুষের ভিতরের শখ। যাবতায় সৃষ্টি কর্ম্মের মূলে তিনি এই শখকেই উৎসরূপে বিবেচনা করেছেন। ভেতরের শখ আবার মনকে নাড়া দেয় ও উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তুলি-রঙ, কালি-কলম প্রভৃতির সঙ্গে মন যুক্ত হলে তবেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয় আবির্ভূত।

এই ত্রয়ীর মিলনে চিত্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও, পরিপূর্ণতা সাধনে আরও কিছুর প্রয়োজন। শিল্পী ও রসিক দু'জনার মিলনে ও সমন্বয়ে অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টি প্রয়াস ও রসিক দর্শকের উপভোগ ও রসগ্রহণে শিল্পচর্চ্চার ক্রিয়া হয় পূর্ণাঙ্গ। শিল্প যিনি রচনা করেন, তাঁরও দেখার বিশেষ চোখ চাই; সেই বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তিনি জগৎ সংসারকে দেখে তাঁর শিল্পায়ণের পথে অগ্রসর হন। আবার তাঁর সৃষ্টি প্রেরণার ফলশ্রুতি রসিক ও ভাবুককে যখন অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত করে, তখনই তাঁর প্রয়াস ও শ্রমসাধনা সার্থক বিবেচিত হয়। আর তাঁর সৃষ্টবস্তুকে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ মনে হয়। এই জন্যও প্রয়োজন বিশেষ একটি মন ও দেখার চোখ। অবনীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"শিল্পকর্ম্মীর দেখা এবং শিল্প রসিক, ভাবুকের দেখা এই দুই দেখার ফলে পায় শিল্পরচনা পরিপূর্ণতা।" (শিল্পায়ন-২)

অতএব, শিল্পসৃষ্টির দু'ধারে দু'জনার ক্রিয়া চলে। একদিকে আর্টিস্ট কাজ করে চলেছেন নানা উপকরণ-প্রকরণ নিয়ে। তিনি তাঁর করণ কৌশল দ্বারা ও রসভাব সঞ্জাত করে গড়ে চলেছেন কত বিচিত্র রূপরাজি। আর অন্যদিকে আছেন 'রস উপভোক্তা' রসিকজন। দু'জনার জীবনেরই

মূল লক্ষ্য আনন্দ। শিল্পী তাঁর ক্রিয়াবিলাসে মগ্ন হয়ে আনন্দের প্রস্রবণে প্রতিনিয়ত: অবগাহন করেন। আর দর্শক ও সমঝদার তা দেখে ও তার রস আস্বাদন ক'রে আনন্দ পান। দর্শক ও প্রদর্শক এই দুই নিয়ে জমে ওঠে শিল্পের মজলিস।

তবে এই আনন্দ লাভের জন্য দু'জনারই চাই সাধনা। অবনীন্দ্রনাথ তাকে আখ্যা দিয়েছেন তপস্যা। তাঁর মতে এ তপস্যা কেবল শিল্পীর একারই নয়। এই বিষয়ে শিল্পী-গুরুর অভিমত, "আর্টকে পেতে তপস্যা, আর্টকে বুঝতে তপস্যা, কারিগরের তপস্যা, সমঝদারের তপস্যা। এই তপস্যার ফলে দু'জনের মন রসের গোপনধারা বয়ে মিলতে চলে। শিল্পী পেলে ঠিক সমঝদার, সমঝদার পেলে ঠিক শিল্পী, রসের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হল তবেই।" (শিল্পায়ন-৮)

আবার প্রশ্ন করা যায় যে শিল্পী কি কেবল ক্রিয়াজনিত আনন্দই লাভ করেন? আর কিছু তাঁর প্রাপ্য নেই কি? অবনীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন—

"যে রচয়িতা নয় সে শুধু ভোগের অধিকারী। আর যে রচয়িতা (শিল্পী) সে ভোগ এবং ক্রিয়া দুই নিয়ে ঐশ্বর্য্যবান।" (রস ও রচনার ধারা)

অর্থাৎ কোন একটি শিল্পকর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আর্টিস্টের আর কিছু করার থাকে না। অন্য লোক সেটিকে নিয়ে উপভোগ করে। নিজের সৃষ্টি যে আর্ট আর্টিস্ট তা ভোগ করে না। সৃষ্টি প্রকরণের মধ্যে যে আনন্দ তাই তার প্রাপ্য। সৃষ্টির কাজ শেষ হয়ে গেলে স্রষ্টাও দর্শকের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। অন্যান্যদের পাশে সেও দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখে নিজের সৃষ্টিকে।

শিল্প, শিল্পী ও সমঝদার—এই ত্রয়ীকে নিয়ে কত মতামত, কত সমস্যা। তদুপরি আরও একটি সমস্যা দেখা যায় শিল্পের জাতি বিভাগ নিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের এই জাতি বিভাগ সম্বন্ধে মাথা ঘামান নি। আর্টকে বাজারের দর কষাকষির হট্টগোলের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে নিয়ে যেতেই তিনি প্রয়াসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে কলা সরস্বতী আর্টের এমন একটি উচ্চ স্তরে বাস করেন যাকে 'পদ্মবন' বলা যায়।—"সেখানে আর্টের জাতিভেদ নেই, দেশ-বিদেশ সব সেখানে সমান, সবাই নিজের নিজের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে সেখানে চলেছে।...আছে কেবল বিচার—আর্ট কিম্বা আর্ট নয়, নকল কিম্বা আসল, আপনার কিম্বা পরের, এমন কি নিজের আর্ট ও পূর্ব্বপুরুষের ধার করা—পরখ কিনা, এই বিচারই সেখানকার কথা; অন্য তর্কও নেই, কথাও নেই, ঝগড়াঝাটিও নেই।" (উনোছনো)

দেশ ও জাতি অনুসারে তিনি শিল্পের স্তর বিভাগ করতে উৎসাহ না দেখালেও, বাস্তববাদিতা ও আদর্শবাদিতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন বিশেষ প্রাঞ্জলরূপে। ১৩১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে 'দুইদিক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "Realism-টা যেন কাচখণ্ডে ফোটো তুলিয়া লওয়া, আর Idealism যেন মণিদর্পণে খর কিরণ গ্রহণ করিয়া অমৃত উৎপাদন করা। Realist-এর বুলি হইতেছে 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং'। Idealist বলিতেছেন, ওগো তা নয়। 'যন্মনসানুভূতং তল্লিখিতং"—এই শেষোক্ত আদর্শটি ভারতীয় শিল্পের মূল মর্ম্মবাণী।

এই প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য্য আরও প্রাঞ্জল করে শিল্পীকুলের উদ্দেশ্যে বলে-ছিলেন—

"মন দিয়া দেখ, দৃশ্য বস্তুটার অন্তরে তাহার স্বরূপ বা তেজ লুকাইয়া আছে। চন্দ্র সূর্য্যের আলো গ্রহণ করিয়া জ্যোৎস্নায় রূপান্তরিত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিতেছে। স্বরূপের খর তেজ তেমনি তোমার মনোদর্পণে গ্রহণ করিয়া সেটাতে সম্পূর্ণ একটা নতুন গুণ অর্পণ করিয়া প্রেরণ কর, তবেই বলিব তুমি artist এবং তবেই জানিলাম তুমি নবগুণে মণ্ডিত একটা নূতন সামগ্রী সৃষ্টি করিলে।"

অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে তাঁর শিল্পী-জীবনের, তাঁর চিত্র সমূহের মৌল আদর্শের সার্ব্বিক রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়।

দুই প্রকার দু'খানি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিলিপি দ্বারা তিনি বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।—"Realism গান্ধার বুদ্ধের দীন অংশটাকেই সার বলিয়া গ্রহণ করিল। আর Idealism বুদ্ধের (সিংহলীয়) সম্যক প্রবুদ্ধ হইবার সতেজ উপাদানগুলাকেই বাছিয়া লইয়া ধন্য হইল।"

চিত্রার্পিত বিষয় ও তার নামকরণ সম্বন্ধেও শিল্পাচার্য্যের মতাদর্শ জানার কিছু অবকাশ পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম ও অন্যতম প্রিয় ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নামক একটি ছবি এঁকে একদা (১৯০৮) অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। স্নেহশীল গুরু আর স্থির থাকতে পারেন নি। তিনিও লেখনীর সাহায্যে নানা সরস কৌতুক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সহযোগে ছাত্রের সম্মান রক্ষা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন ছবিটির বিষয়বস্তুর যাথার্থ্য ও সত্যতা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তার মধ্যে সাধারণ ভাবে শিল্পীর কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত পরিস্ফুট হয়েছে—

"শিল্পীর আর কবির লক্ষণই হচ্ছে কটু হইতে মধু, হীনতা হইতে মিষ্টতা

বাহির করা ; সেটাকে পরিবর্তন করাও নয়।…শিল্পীরই বল, কবিরই বল, মন লইয়াই কারবার। দর্শকের বা পাঠকের মন আর নিজেরের মন—দুই দিকে দুই কূল, মাঝে সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতির খর স্রোত দুই মনকে পৃথক রাখিয়াছে ; এই খরস্রোতের উপরে বর্ণের ও ভাবের সেতু বাঁধিয়া দুই মনে সংযোগ স্থাপনেই শিল্পীর ও কাব্যের সার্থকতা।"[১]

এই উক্তির মধ্যে পুনরায় শিল্পী ও দর্শকের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। রূপ থেকে রূপাতীতে যাওয়া, অসুন্দরের অন্তর থেকে সুন্দরকে খুঁজে নেয়া, তুচ্ছকে মহৎ করে তোলাই এ দেশের যুগ যুগ প্রবহমান শিল্পধারার মূল প্রেরণার উৎস। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনায় ও তুলির খেলায় এই আদর্শ বারে বারে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানব সমাজ, সংস্কার ও শিক্ষাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি কোনদিন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রই তার প্রমাণ। অধিকাংশ ছবিতেই দেখা যায় তাঁর আবাল্য দেখা ও অনুভূত বিষয় সমূহের রূপাবলী ও মনের বেদন প্রকটিত হয়েছে বারে বারে। আর তা প্রতিবারেই বিচিত্র ও ভিন্নতর। একটি বিশেষ উল্লেখনীয় বিষয় হোল এই যে, নানা ভিন্ন স্তরের অভিনব কল্পনার চিত্র যেখানে, সেখানেও অংশতঃ বাস্তবের স্পর্শ অনুভূত হয়। পৌরাণিক আখ্যান ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তা ও ঘটনার রূপায়ণেও অতি কাল্পনিকতা অপেক্ষা কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণ হয়েছে সমধিক। তিনি তাঁর অভিনব আঙ্গিক কৌশলে ও প্রকরণ মাধ্যমে তাকে বর্ত্তমান ক্ষেত্রপট ছাড়িয়ে, নিকট থেকে দূরে, একাল থেকে সেকালে নিয়ে গিয়েছেন। রূপ রচনায় বিশিষ্ট ভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর যাদুকরী তুলির টান ও রঙের গভীর অনুভাব চিত্রপটে সুদূর অতীত ও অজানার ইঙ্গিত আভাস এনে দিয়েছে। কিন্তু তিনি কোন নতুন চেষ্টায়, কোন ভাবভাবনা প্রকাশে নিজত্বকে বিসর্জন দিয়ে চলেন নি ; দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য-বৈভবকে অস্বীকার করেন নি। ছিন্নমূল, বিচ্ছিন্নতা-কাতর শিল্পী-সত্তার প্রকাশ দেখা যায় না কোথাও। চিরাগত প্রথার সঙ্গে নিজ আদর্শের সূত্রটিকে গ্রন্থিবদ্ধ করেই জীবনভর এগিয়ে চলেছেন।

অতএব, তাঁর Tradition সম্বন্ধীয় তত্ত্বও আলোচনার যোগ্য। তিনি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পুরাতনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করে চলার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বিষয়ে তিনি পুরাতনের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করা এবং নতুনের

---

১. নামকরণ রহস্য : বঙ্গদর্শন (বৈশাখ, ১৩১৬)

দিকে এগিয়ে না-চলা—দুটিকেই সমান অনিষ্টকর বলেছেন। তিনি ছিলেন পুরাতনের ভিত্তিতে নতুন সৃষ্টির প্রয়াসী। তিনি আরও বলেছেন যে, যে দেশ ও জাতির জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে, সেখানেই শিল্পে জড়তা ও মৃত্যু হয়েছে অনিবার্য্য। নদীর গতি দিকে দিকে প্রবাহিত হলেও উৎস নির্ঝরের সঙ্গে যোগ হারায় না; যদি হারায় তা'হলে তার বিস্তৃতি রুদ্ধ হয়, প্রাণশক্তি হয় অকালে নিঃশেষিত। অবনীন্দ্রনাথ এই সকল উপমা দ্বারা Tradition সম্বন্ধে তাঁর সত্য মত প্রকাশ করে এক বাক্যে বলেছেন, "শিল্পের গতিও সেইরূপ; পুরাতনকে ছাড়িলেই সর্ব্বনাশ।" ('পরিচয়', 'ভারতী': চৈত্র, ১৩১৫)

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন, "এক কথায় শিল্পেতে হউক, সভ্যতাতে হউক যে দিন হইতে আমরা adopt করিতে শিখি, adapt করিয়া লইতে ভুলি সেইদিন হইতেই আমাদের সভ্যতা কি শিল্প দুই-এরই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।"

তাঁর ছাত্র অসিত হালদারকেও তিনি এই সম্বন্ধে একটি চিঠিতে কিছু মতামত জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, প্রকৃতির জগতে ও মনুষ্য সমাজে সর্ব্বত্রই দেখা যায় ধারাবাহিকতা ও চিরাগত প্রথার প্রভাব। মৌমাছি মৌচাক গড়ে চিরন্তন প্রথায়, মধুও সৃষ্টি হয় তার চিরকালের গতি-প্রকৃতি নিয়ে। মাতালের জন্য তাড়ি প্রস্তুতের কাজও চলে নিয়মিত পন্থায়। গুড় তৈরী করার সময়ও সেই প্রাচীন নিয়ম চলে। মানুষের অস্থি, মজ্জা, মাংস সবই তো Tradition মতো ধরে। তার ফলেই তো বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টি। পরিশেষে তাঁর দুটি চমৎকার মন্তব্য উল্লেখনীয়। তা হোল—

"পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশ নেই, কোনো art-ই নেই যার Tradition নেই, খালি আমাদেরই থাকবে না—এ কেমন কথা?"

কিন্তু তার জন্য তিনি অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট মত পাওয়া যায় 'জাতি ও শিল্প' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন "বর্ত্তমান ধরে তবে বর্ত্তে থাকে শিল্পকলা, অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু অতীত-মুখীও নয় শিল্প।"

শিল্পী হলেন স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করে যান মনের আনন্দে। ভালোমন্দ বিচার কে করবে, কে তা দেখবে, কি, না দেখবে—একথা চিন্তা করেন না তিনি তাঁর রচনাকর্ম্মের সময়। অন্তরের আবেগে ও প্রেরণায় তিনি কাজ করে যান। বিচার-বিশ্লেষণের ভার রসিকের হাতে।

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু একবার সেই বিচারের ভার নিয়েছিলেন। সমালোচক অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়টি বিধৃত হয়ে আছে তাঁর 'প্রিয়দর্শিকা' নামক একটি নিবন্ধে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে স্থান প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ছবির গুণাগুণ আলোচনা করাই ছিল প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। ছবিগুলি ধরে ধরে আর্টিস্টের নাম, এমন কি, তিনি তরুণ কি বালক, তাও উল্লেখ করেছেন আলোচনার প্রারম্ভে। শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর ছাত্র। তাঁদের মধ্যে পরিণত প্রতিভার শিল্পী ছিলেন তিনজন—নন্দলাল বসু, শৈলেন দে ও ক্ষিতীন মজুমদার। নন্দলাল বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র 'মদন ভস্মের পরে উমার শোক', ক্ষিতীন মজুমদারের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট রচনা, যেমন স্বরসপ্তক, গঙ্গা, যমুনা এবং শৈলেন দে'র দোললীলা এই আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। এই আলোচনাতে শিল্পচার্য্যের চিত্র বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রস্ফুট হয়েছে চূড়ান্তরূপে। তদুপরি তাঁর সরস কৌতুকস্পৃষ্ট বর্ণনাভঙ্গী ইহাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

চিত্র বিচার সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের মতাদর্শ কি ছিল তাও জানা যায় এই নিবন্ধে। এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন—

"শিল্পী ছোট হোক্, বড় হোক, সম্পূর্ণ শিক্ষা পাক অথবা না পাক, কোনো বাঁধা ধরা দস্তর বা শিল্পশাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে তাদের কাজের বিচার করতে যাওয়া একেবারে ভুল।"

রূপাত্মক ও ভাবাত্মক ছবির মধ্যে পার্থক্য কি তাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। রূপাত্মক চিত্রের কাজ রূপ-রঙ ইত্যাদি দিয়ে কোনো এক বিশেষ ভাবের উদ্রেক করা। রূপ, রেখা ও বর্ণের সাহায্যে দর্শকের দৃষ্টিকে সমস্ত ছবিতে বা কোনো একটি বিশেষ অংশে আকৃষ্ট করা। কিন্তু ভাবাত্মক ছবির কাজ তা নয়। সেখানে ঐশ্বর্য্য ও কারিগরীর বাহুল্য অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য। ভাবটিই প্রবল হয়ে দর্শকের মনকে আকর্ষণ করে। এই সূত্রে তিনি বলেছেন, "রঙ দিয়ে ছবি যত সহজে লেখা চলে, রঙের অভাব দিয়ে ছবি লেখা তার চেয়ে চতুর্গুণ কঠিন।"

নন্দলাল বসুর 'উমার শোক' ছবিটির গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত মন্তব্যাদি করে তিনি শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

এই নিবন্ধে তিনি ছাত্র ক্ষিতীন মজুমদারকে ভক্ত ও শিল্পী বলে আখ্যাত করে তাঁর 'স্বরসপ্তক' ছবিটি বর্ণনা করে এই মন্তব্য করেছেন, "ছবিটা ভালো করে দেখলেই, ছবিকে সুরে ভরে তুলতে হয় কি উপায়ে তা শিখে নিতে পারি।

ভাব ও কারিগরী ফুল ও পরিমলের মতো কেমন এক করে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এই চিত্রে।"

ছাত্র-শিষ্যের পক্ষে গুরুর এই প্রশস্তি শিল্পীর কাছে শাহী শিরোপার চেয়েও ঢের বেশী মূল্যবান। ক্ষিতীন্দ্রনাথ সারা জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন গুরুর এই প্রশংসাবাণীর মধ্যে। তাঁর অন্যান্য ছবি সম্বন্ধেও অবনীন্দ্রনাথের মতামত উচ্চ প্রশংসাসূচক। তিনি 'প্রিয়দর্শিকা'তে লিখেছেন—

"শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রগুলিতে দেখা যাবে ভাবকে ছাড়িয়ে উঠছে না রূপ, রূপকে ঠেলে এগিয়ে আসছে না রস, সমস্তই সুসঙ্গত, সুসংযত। কারিগরী চাও তাই পাবে এসব ছবিতে, ভাব চাও তাও আছে এগুলির মধ্যে; এগুলি চোখও জোড়ায়, মন ও জোড়ায় এক সঙ্গে। এ হ'ল শিল্পের রাজবেশ; শিল্প দেবতা এখানে বিচিত্র শৃঙ্গার বেশে দর্শককে দর্শন দিচ্ছে না।"

এ কেবল ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রশস্তি নয়। এর মধ্যে শিল্পী গুরুর ছবির উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্বকীয় আদর্শ কি তা প্রতিফলিত হয়েছে অতি সুন্দরভাবে।

তিনি সর্ব্বদাই ছবির নানা অংশের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সাধনকে প্রধান কাজ মনে করতেন। রূপ ও ভাব দুই যেন পরস্পরকে ছাড়িয়ে না যায়। দুই-এর মধ্যে মিলনের রাখীবন্ধন হওয়া চাই। এই কারণেই অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রধান লক্ষণীয় গুণ হোল—সংযম, পরিমিতিবোধ ও উচ্ছ্বাস-আবেগের প্রাবল্য-বর্জন। ভাবের গভীরতা আছে, কিন্তু প্লাবন নেই। বুদ্ধির দীপ্তি আছে, কিন্তু আবার মিতরূপে আবেগপুষ্ট। রঙ আছে তবে অনাবশ্যক ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির প্রখরতা নেই। কোমলে-কঠিনে, ভাবে-বুদ্ধিতে, আবেগে-সংযমে তা উচ্চস্তরে উন্বর্ত্তিত।

চারুচিত্রের মহত্তম স্রষ্টা ও মহাগুরু অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু কারুকলাকে কখনও নিম্ন পর্য্যায়ের মণ্ডনশিল্পের কোঠায় ফেলে অবজ্ঞা-অবহেলা করেন নি। তিনি এই শিল্পের মধ্যে একটি চিরায়ত লোকাচারমূলক শিল্প-ভাবনা ও সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয় পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের পূজা-পার্ব্বণ ও ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত মণ্ডন-শিল্প, আলপনা প্রভৃতির মূলানুসন্ধান করেছেন অত্যুগ্র-জিজ্ঞাসা ও আগ্রহ নিয়ে। প্রতিটি ব্রত ও পূজার সঙ্গে স্বতন্ত্র নক্সা প্যাটার্ণের সম্পর্ক নির্ণয় ও তার গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যানে তিনি পথিকৃৎ। দেশ-বিদেশের মণ্ডন নক্সার সঙ্গে তুলনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, একই চিন্তা, একই মণ্ডনরীতি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবেই উৎপত্তি লাভ করেছিল। মানব ইতিহাসে তা একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা। ব্রত-

পার্ব্বণের আলপনার নক্সাসমূহের গূঢ় অর্থ তিনি ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পেয়েছেন নানা গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

তার ফলে বাংলার গ্রামীণ জীবনের ও লোক-সংস্কৃতির বিশেষ একটি অংশ অবনীন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টি, উচ্চ মনন ও সরস ব্যাখ্যানের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে শহরের অভিজাত মহলে ও শিক্ষিত সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও অধুনা তা নতুন ভাবভঙ্গীতে রূপায়িত হয়ে ভিন্ন প্রয়োজনেও ব্যবহৃত হচ্ছে, তা'হলেও আলপনার কারুকলা আজ শহর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের বৃহত্তর ও ব্যাপক অংশেও স্থান অধিকার করার উপযুক্ত মর্য্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই প্রচার ও প্রসারের মূলে শিল্পীগুরুর পূত স্পর্শের প্রভাবও অনস্বীকার্য্য এবং বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

চিত্র রচনার সুপ্রভাতের বহুদিন পরে তিনি শিল্পতত্ত্ব আলোচনা-বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন। ১৯১৪ সালে তিনি 'ষড়ঙ্গ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। সেই সময় নন্দলাল বসু অসিত হালদারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"অবনীবাবু অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।...তিনি শিল্প সম্বন্ধে চমৎকার একটি পুস্তক লিখছেন। আমাদের জন্য বজ্রের মত অচ্ছেদ্য বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিতেছেন।"

১৯১৪ সালের কথা। তখনও তাঁর ছাত্রদের প্রতিষ্ঠার আসন লাভ করার মত প্রকৃত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি। তাই নন্দলাল বসু গুরুর নতুন অবদান তাঁদের আরও নতুন পথের সন্ধান দেবে, তাঁরা আত্মপুষ্টির আরও নতুন নতুন খোরাক পাবেন—এই আশাতে সতীর্থকে সেই শুভবার্ত্তা পাঠিয়েছিলেন মনে হয়। কিন্তু যিনি ক্রমশঃ শৈল্পিক সাহিত্যের রসধারার প্রস্রবণ খুলে দিলেন, নন্দনতত্ত্বের নতুন ও অভিনব ব্যাখ্যানে বাংলা ভাষাকে রসসিক্ত করলেন, তিনি কিন্তু সেই শাস্ত্রীয়-তত্ত্বের (ষড়ঙ্গাদি) বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি যেমন ছবির তুলি, তেমনি লেখনীকে চালিয়ে গেছেন অবাধগতিতে। তাঁর কল্পনা স্বচ্ছন্দচারিতার ডানা মেলে উড়ে চলেছিল দিগ্‌দিগন্তরে। তা শিল্পের সৌরভ ছড়িয়েছে আকাশে-বাতাসে, দেশে-বিদেশে। তিনি নিজেই বাগেশ্বরী-বক্তৃতা, প্রসঙ্গে বলেছেন, "যাত্রীতে যাত্রীতে পথ চলতে চলতে কথার মতো করে গাঁথা হয়েছিল এই সমস্ত প্রবন্ধ।...যেমন খুশী, যা খুশী বলে যাওয়া চলে সহযাত্রীদের মধ্যে ..।"

মিঃ ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আলাপ-পরিচয় ও তাঁর চিত্রকলার প্রতি হ্যাভেলের শ্রদ্ধা-অনুরাগ ভারতীয় চিত্রকলার রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছিল। কিন্তু সমগ্রভাবে যুগসন্ধিক্ষণের পালা বাংলা দেশে শুরু হয়েছিল আরও ঢের আগে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম্মাদর্শ ও চিন্তন-মননের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ-প্রবাহ যখন প্রবল বেগে দেশকে প্লাবিত করে চলছিল, তখন অর্থাৎ ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষ পদে ব্রতী হন। তাঁর শিক্ষাব্রতীর আসন গ্রহণ দেশজ চিত্রকলার জগতে একটি সুদূরপ্রসারী নবদিগন্তের ইঙ্গিত-আভাস এনে দিয়েছিল।

হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথকে সহকারী ও সহযোগীরূপে পেয়ে চিরায়ত ভারত-কলার সাধনা-চর্চ্চার ধারাকে নানা নতুন খাতে প্রবাহিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, এদেশের মানুষকে বৈদেশিক রীতিতে শিল্প-শিক্ষাদানের কোনও প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কিছু নেই। এই বিষয়ে তাঁর প্রকৃত মনোভাব আর্ট স্কুলের বাৎসরিক রিপোর্টেও দু'একবার প্রতিফলিত হয়েছে (এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তিনি এই প্রসঙ্গে বিলেতের প্রখ্যাত 'স্টুডিয়ো' পত্রিকায়ও সুস্পষ্টভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে। তিনি সেখানে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলেছেন—

"We have succeeded in pursuading educated Indians that they have no art of their own. Though evidences of its existence are many and great, indeed much more extensive than those of British Art. Twenty four years ago, I was sent out to India to instruct Indians in Art, and having instructed them, and myself to the best of my ability, I returned filled with amazement at the insularity of the Anglo-Saxon mind, which has taken more than a century

to discover that we have far more to learn from India in Art, than India has to learn from Europe."

ক্লাস-রুমে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আয়োজন ব্যবস্থার পূর্বেই মিঃ হ্যাভেল নানাভাবে ভারতকলার অনুশীলন ও রস-গ্রহণের সুব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। এই বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হয়েছিল স্কুল সংলগ্ন আর্ট গ্যালারীর সংস্কার ও পুনর্গঠনে। তিনি কলকাতায় কর্মভার গ্রহণ করে এসে দেখলেন যে, আর্ট গ্যালারীর কক্ষ পরিপূর্ণ হয়ে আছে প্রাচীন ইতালীয় এবং বিলিতী শৈলীর কিছু নিকৃষ্ট নিদর্শন ও পুরোনো চিত্রের কপির দ্বারা। তা দেখে তিনি ক্রমে ক্রমে উঁচু দরের কিছু মৌলিক ভারতীয় চিত্রের নিদর্শন সংগ্রহ করার কাজে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নতুন সংগ্রহ-কর্মের পশ্চাতে তাঁর যে উদ্দেশ্য ছিল তা সহজে সিদ্ধ হয়নি। তিনি ১৯০৪ সালেও দেখলেন যে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা বিলিতী চিত্র অনুকরণ করতেই অধিক আগ্রহী।

আর্ট স্কুলের ১৯০২-৩ থেকে ১৯০৬-৭ সালের রিপোর্টে হ্যাভেলের আদর্শ ও তৎকালীন অবস্থার কথা জানা যায় অতি স্পষ্টভাবে।

"The object of having an art gallery attached to an art School is to mould the taste and direct the imagination of the students by means of the works of art exhibited, and yet though the students were Indian and the object of the school was, or rather should have been, the improvement of Indian art and not the introduction of European art, the collection of pictures which was got together for the art gallery consisted almost entirely of copies of the old Italian and early English School, while Indian art was practically ignored."

উপর্যুক্ত অবস্থার মধ্যেই তিনি সেই সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। ১৯০৪ সালে তিনি আর্ট গ্যালারীর অধিকাংশ বিদেশী ছবি বিক্রী করে দিয়েছিলেন। আর তৎপরিবর্তে ভারতীয় চিত্রকলার মৌলিক নিদর্শন সব সংগ্রহ করে সেখানে স্থান দিলেন।

১৯০৫ সালে দেখা গেল যে আর্ট গ্যালারী সার্বিক রূপে পরিবর্তিত হয়েছে ভারতীয় চিত্রের গ্যালারীতে। সেই আমূল পরিবর্তন তখন এক

শ্রেণীর ছাত্র ও নাগরিককে প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদে মুখর করে তুলেছিল। তাঁদের প্রতিবাদ তখনকার পত্র পত্রিকায়ও হয়েছিল প্রতিধ্বনিত। আর্ট গ্যালারীর পরিচালক সমিতির কর্ণধার ছিলেন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন। হ্যাভেল সাহেব কিন্তু গ্যালারীর পুনর্বিন্যাস ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের যে ব্যক্তিত্ব ও মনোভাব দেখা গিয়েছিল তার তুলনায় সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টা ছিল ভিন্নরূপ। অবশ্য এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। প্রাচীন ভারতীয় কীর্ত্তিকলা সংরক্ষণ আইন প্রণয়নে ভারতশিল্পের উচ্চ কলাকৌশল ও মৌল আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগই হয়েছে প্রতিফলিত।

দিল্লীর একবার ভাষণ দান কালে ভারতীয় শিল্পের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বিদেশীয় ভাবগ্রহণ করে কখনই ভারতশিল্পের পুনরুদ্ধার হতে পারে না। তিনি একবার অবনীন্দ্রনাথের ছবি কিনবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে ছবির দাম সম্পর্কে মতের মিল না হওয়াতে তা আর কেনা হয়নি।

আর্ট গ্যালারীর সংস্কারকার্য্যে হ্যাভেলের সাফল্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের সামনে মহৎ অনুপ্রেরণাদায়ক অভিনব এক অজানা শিল্প-রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন।

আর্ট স্কুলের নতুন কর্ম্ম-সংগঠন, শিক্ষানীতিতে কিছু পরিবর্ত্তন ও আর্ট গ্যালারীর পুনর্বিন্যাসের কাজ যখন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছিল সেই সময় হ্যাভেল সাহেবকে ঘিরে সেখানে আর্ট ক্লাব ধরনের একটি সমিতি গড়ে উঠেছিল। সেই সমিতি গঠনের পশ্চাতে কারোর কোনও বিশেষ চেষ্টা বা পরিকল্পনা কিছুই ছিল না। শিল্পী ও কলারসিকদের অবসরকালীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আলোপ-আলোচনার অবকাশেই তার সূচনা হয়েছিল। মিঃ হ্যাভেলের বন্ধুমহলের অনেকেই ছিলেন শিল্পী ও শিল্পপ্রেমী। ইউরোপীয় ও ভারতীয় দুই সমাজের মানুষের সঙ্গেই ছিল তাঁর প্রীতির সম্পর্ক। তাঁরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত আর্ট স্কুলে এসে সমবেত হতেন। তাঁদের আলাপ-আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল ভারতের চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য। এই জাতীয় পরিবেশ ও সুধী সমাবেশ হ্যাভেল সাহেবের আদর্শে ও কর্ম্মনীতিতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

সেই সময় অর্থাৎ ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন বিভাগের শিল্পী ও

রসিকজনদের নিয়ে সৃষ্টি হোল 'বঙ্গীয় কলা সংসদ' নামে একটি সঙ্ঘ। এই সংস্থাও পরোক্ষভাবে হ্যাভেল সাহেবকে কিছু না কিছু সহায়তা দান করেছিল। সংসদের প্রতিষ্ঠা দিন থেকেই অবনীন্দ্রনাথ তার সম্পাদকরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সংস্থাটি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"হ্যাভেল সাহেবের একটা সোসাইটি ছিল জনকয়েক সাহেব, মেম আর্টিস্ট নিয়ে। সন্ধ্যেবেলা আর্ট স্কুলেই তাঁরা ঘণ্টা দুয়েক কাজ করতেন, আলোচনা সমালোচনা হত, মাঝে-মাঝে খাওয়া-দাওয়াও চলত, অনেকটা আর্ট ক্লাব গোছের। মার্টিন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার থর্নটন সাহেবই দেখাশোনা করতেন। তাঁর উপরেই ছিল ওই আর্ট ক্লাবের সমস্ত ভার।"[১]

কিছুকাল পরে সেই আর্ট ক্লাব গেল ভেঙ্গে। থর্নটন সাহেবও কিছুদিনের জন্য দেশে চলে যান। তখন আবার বাংলা দেশের সমস্ত জমিদার মিলে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাম—'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন'। কবিগুরুর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উক্ত সমিতির একজন বিশেষ উৎসাহী সভ্য। তাঁর একবার ইচ্ছে হোল একটি চিত্র প্রদর্শনী করবেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উড্রফ ও নর্মান ব্লাণ্ট নামে আর একজন কলারসিক সাহেব সেই সমিতিতে আসতেন। সমিতির একটি বড় বাড়ী ছিল। তার নীচের তলায় ছিল বিলিয়ার্ড রুম, রিডিং রুম, গেস্ট রুম ইত্যাদি। ব্যবস্থা হয়েছিল বিলিয়ার্ড রুমে চিত্র প্রদর্শনী হবে। অবনীন্দ্রনাথের কয়েকখানি ছবি, ওকাকুরা আনীত কিছু জাপানী চিত্রের প্রতিলিপি এবং আরও এদিক-সেদিক থেকে সংগৃহীত কয়েকটি ছবি একত্র করে প্রদর্শিত হয়েছিল বিলিয়ার্ড রুমে। কিন্তু সমিতির সভ্যদের মধ্যে খেলাধূলায় যাঁরা উৎসাহী ছিলেন, তাঁরা বিলিয়ার্ড রুমকে বেশীদিন আটকে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। কয়েকদিন যেতেই তাঁরা প্রকাশ্যে আপত্তি জানালেন। তখন তাড়াতাড়ি দেয়াল থেকে ছবি সব খুলে নেয়া হোল।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির সেইটিই প্রথম প্রদর্শনী। আর সেই প্রদর্শনী উপলক্ষ করেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে উডরফ্ সাহেব ও নর্মান ব্লাণ্টের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ক্রমশঃ তা গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

প্রদর্শনীটির পরে বেশ কিছুকাল অর্থাৎ প্রায় তিন বছর কেটে গেল। আর কোনও চেষ্টা ও পরিকল্পনা কিছুই হয়নি যাতে চিত্র প্রদর্শনী হতে পারে।

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃষ্ঠা ৮৮

তখন হ্যাভেল সাহেব বললেন যে, তাঁদের সেই পুরোনো ছোট আর্ট ক্লাবটিকে আবার পুনর্গঠন করা হোক। তখন নতুন আর একটি কমিটি গঠিত হোল। অবনীন্দ্রনাথও তাতে যোগ দিলেন। ল্যাণ্ড হোল্ডার্সদেরও অনেকেই তার সভ্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়মের লর্ড কিচেনার হলেন সভাপতি। হ্যাভেল সাহেব প্রস্তাব করলেন অবনীন্দ্রনাথকে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমে কিছুতেই সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হননি। তবে হ্যাভেলের অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত নর্মান ব্লাণ্টের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

নতুন সমিতি তো হোল। নাম কি হবে? কোন কোন মেম্বার প্রস্তাব দিলেন, নাম হবে, 'ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি'। অবনীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি তুলে বললেন, নাম হোক্—'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট'। এই নামটিই সকলের অনুমোদন লাভ করেছিল। এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৭ সালে। সেই সোসাইটিতে শিল্পকলা সূত্রে শিল্পী ও রসিক সমাজ একটি প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আর ইঙ্গ-বঙ্গের মধ্যে একটি সুমধুর মিলন পর্ব্বের শুভ সূচনা হোল। অবনীন্দ্র-অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই সোসাইটির কর্ম্মধারায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। অনেকে স্থায়ী সভ্যপদও গ্রহণ করেছিলেন। সোসাইটির জন্য প্রথমে বাড়ী ভাড়া নেয়া হয়েছিল পার্ক স্ট্রীটে। ব্যবস্থা হোল, শিল্পীরা সেখানে বসে কাজ করবেন। প্রয়োজন হলে সেখানে তাঁদের জন্য বাসস্থানেরও ব্যবস্থা থাকবে। তবে প্রথম পর্য্যায়ে কিছুকাল সর্ব্বতোভাবে সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরে প্রথমে যে মিটিং হয় তার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার 'দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকায়। তারিখ ১৯০৭ সালের মে মাসের ২০শে কি ২২শে। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল, 'The New Indian Society'। তার প্রারম্ভে লেখা হয়েছিল—

"A meeting of the newly inaugurated Indian Society of Oriental Art was held in the rooms of the Indian School of Arts attached to the Museum yesterday afternoon. Mr. Justice Rampini presided, and there were present among others, Mr. Justice Woodroffe, Mr. A. Chowdhury, Mr. Larmour, Mr. Abanindranath Tagore, Mr. G. N. Tagore and Mr. Blount, the Secretary.

The objects of the Society are the cultivation by its members and the promotion among the .public, of a knowledge of all branches of ancient and modern Oriental art by means of the collection of objects of such art and the exhibition of such collections by the society ; the reading of papers, holding of discussions, the purchase of books and journals relating to art, correspondence with kindred societies or collectors and connoisseurs, the publication of a journal and by such other means as the society may hereafter determine, as also the furtherance of modern Indian art by means of the holding of public loan exhibitions, the encouragement and assistance of Indian artists, art students and workers in artistic industries."

সোসাইটির কর্ম্মপথে প্রথম পদক্ষেপ হয়েছিল চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে। আর্ট স্কুলের বৃহৎ কক্ষেই প্রথম দু-তিনটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। স্যার জন উডরফের ছিল জাপানী চিত্রের প্রতিলিপির একটি সংগ্রহ। তিনি সেটি দিয়েছিলেন প্রদর্শনীর জন্য। Gesiking নাম্নী একজন মেমসাহেব দেশীয় রীতিতে সমস্ত ঋতুর ফুলের ছবি এঁকেছিলেন। তাও একবার প্রদর্শিত হয়েছিল। এই জাতীয় কাজের মধ্য দিয়ে সোসাইটি ক্রমশঃ বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের উচ্চ পর্য্যায়ের অনেকেই এসে যোগ দিলেন সোসাইটিতে। অনেকে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছিলেন। ব্যবসায়ী, সিভিলিয়ান, জজ, ব্যারিষ্টার, রাজা-মহারাজা, এমনকি লাট সাহেবরাও সেই সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তার কর্ম্মধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার জন্য।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে প্রথম প্রেসিডেন্ট হন সেনানায়ক লর্ড কিচেনার। আর যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও মিঃ নর্মান ব্লাণ্ট। লর্ড কিচেনারের ছিল চিত্রকলার প্রতি গভীর অনুরাগ। তারপর পাঁচ বছর কাল মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথ হলেন প্রেসিডেন্ট, আর ব্লান্ট সাহেব হয়েছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সি. ডবলিউ. কটনের সঙ্গে কিছুকাল যুগ্ম-সম্পাদকের কাজ করেন। তিনি পরে সহ-সভাপতির পদেও কয়েক বছর ব্রতী ছিলেন।

সোসাইটির সভাপতি পদে সর্ব্বদাই দেশী ও বিদেশী খ্যাতনামা ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা হয়েছেন অধিষ্ঠিত। লর্ড কিচেনারের পরে ক্রমান্বয়ে সভাপতি হয়েছিলেন—স্যার জন উডরফ, স্যার হার্বার্ট হোমউড (জষ্টিস্), লর্ড কার-মাইকেল, বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যার চার্লস কেস্টেভেন (গভর্ণমেণ্ট সলিসিটর), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

পর্য্যায়ক্রমে যাঁরা সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁরা ব্যতীত আরও অনেক দেশী-বিদেশী কলাপ্রেমী ব্যক্তি সোসাইটির অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন, উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছেন ও কর্ম্মধারায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে বিচারপতি মিঃ র‍্যাম্পিনী ও বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশীয় রাজা-মহারাজারাও হয়েছিলেন সোসাইটির বিশিষ্ট ও উৎসাহী সভ্য। তন্মধ্যে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় ও বর্দ্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতবের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। ব্যারিস্টার জে চৌধুরীও ছিলেন একজন বিশিষ্ট মেম্বার। এই প্রসঙ্গে দু'জন অতিমাত্রায় উৎসাহী বিদেশী কর্ম্মীর নাম উল্লেখনীয়। এঁরা হলেন সুইডেনের অধিবাসী মিঃ রুবেন্‌সন ও মিঃ মোলার।

সোসাইটির কর্ম্মধারাকে সাবলীল গতিতে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শিষ্য, সহযোগীরাও এসে যোগ দিয়েছিলেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে। অবনীন্দ্রাগ্রজ গগনেন্দ্রনাথের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে। পরবর্ত্তী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা সরকারের আর্থিক সাহায্য লাভ ও কলা-পত্রিকা প্রকাশনা ব্যাপারে গগনেন্দ্রনাথের চেষ্টা ও উৎসাহ স্মরণযোগ্য।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের শিষ্যবর্গ ব্যতীত সোসাইটির একনিষ্ঠ কর্ম্মী হিসেবে প্রারম্ভেই আর একজন শিল্পী ও সমঝদার যোগ দিয়েছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হলেন সেদিনের নবীন ও পরবর্ত্তীকালের খ্যাতনামা শিল্পবেত্তা স্বর্গত ও. সি. গাঙ্গুলী। তাঁর সহৃদয় সহযোগিতা ও শিল্পজ্ঞান ক্রমশঃ তাঁকে নানাপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সোসাইটির মুখপত্র 'রূপম্' সম্পাদনা করেও তিনি অসামান্য সাফল্যের গৌরব এনে দিয়েছিলেন। কয়েক বছর তিনি ছিলেন সোসাইটির সম্পাদক এবং পরে কিছুকাল ভাইস প্রেসিডেণ্ট। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রকলার আদর্শ ও রূপবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যান ও দেশ-বিদেশে তার প্রচার প্রসঙ্গে তাঁর অবদান অসাধারণ ও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সোসাইটির কর্ম্মসূচী ও অগ্রগতির ধারা কিছুকাল এগিয়ে চলার পরে আর একজন প্রখ্যাত বিদেশী পৃষ্ঠপোষকের সহৃদয় সহযোগিতা লাভের সুযোগ এসেছিল এর জীবনে। তিনি বাংলার তৎকালীন গভর্ণর মার্কুইস অব্ জেটল্যাণ্ড (লর্ড রোনাল্ডসে)। একই সময়ে লর্ড রোনাল্ডসে পেট্রন, আর চার্লস কেস্টেভেন ছিলেন সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট। সময় ১৯১৯-২০ সাল। সোসাইটির আবাস ছিল তখন ১২নং সমবায় ম্যানসন্স্, হগ স্ট্রীট্। বাৎসরিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানও সেখানেই হোত।

সোসাইটির কর্ম্মসূচীর ব্যাপক বিস্তার ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা অব্যাহত ছিল বরাবরই। লর্ড রোনাল্ডসের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় তা আরও ব্যাপকতরভাবে সফল হয়ে উঠলো। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে 'রূপম্' পত্রিকা প্রকাশনার কাজও শুরু হয়েছিল তাঁরই উৎসাহ, প্রস্তাব ও অর্থানুকূল্যে। 'রূপম্' পত্রিকায়ও নাতিদীর্ঘ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সোসাইটির নবকল্পিত কর্ম্মসূচীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত হয়েছিল। সোসাইটির পত্তন ও প্রথম মিটিং-এর যে রিপোর্ট 'The Statesman'-এ মুদ্রিত হয়েছিল, তার সঙ্গে 'রূপম্'-এর বিজ্ঞপ্তিতে গোড়ার দিকে বর্ণিত বিষয়ের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। 'রূপম্'-এ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আরও যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা হোল এই—

"Amongst other means, help given to them (artists) by the Society towards the disposal of their work, the holding of public exhibitions of works of modern Indian Art, the award of prizes and diplomas at such exhibitions, as also by such other means as the Society hereafter may determine...

It has now intended to augment the scope and work of the Society in various ways. It has now obtained a fine well-furnished suite of rooms and lecture hall in the Samavaya Mansions, Calcutta, which are being used for meetings and lectures. A library, specially devoted to the study of Oriental Art, is in course of formation, and it is hoped that within a short time the Society will be able to afford the best facilities for the study and understanding of Indian Art...".

সোসাইটির কর্ম্মধারা ও অবনীন্দ্র-চিত্রকলা সম্পর্কে লর্ড রোনাল্ডসের আগ্রহ এবং গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল তা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায়ও লিপিবদ্ধ করেছেন—

"The modern School of Indian painting in Bengal had attracted my attention at an early date as an example in cultural sphere of the reaction against alien domination, whatever the merits, or the demerits, the work which these modern exponents of Indian art were producing, their object, and the spirit by which it was inspired, seemed to me to be deserving of encouragement and support, and during the summer 1919, I had discussions with two charming members of the famous Tagore family, Abanindra Nath and Gogonendra Nath, nephews of Rabindra Nath."

From 'Essayez'

ঠাকুর শিল্পী ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হোল, তিনি সোসাইটির কার্য্যধারার সম্যক পরিচয় পেলেন। তারপরে ১৯১৯ সালে তিনি সোসাইটির মুখপত্র স্বরূপ একটি কলাবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা যায় কিনা তা আলোচনা করলেন। এই সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য উল্লেখনীয়—

"...My proposal was to arrange for the publication of a high class journal to be devoted to the interests of the centre and those of Indian Art generally. I told them that if they were prepared to go forward on those lines I would secure for them from the Bengal Government a capital grant to meet any initial outlay that might be found necessary and, at the start at any rate, an annual subsidy until they were firmly established."

সোসাইটির পরিচালক সমিতি আগ্রহ সহকারেই তাঁর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন যে বাংলা সরকার বছরে বিশ হাজার টাকা অর্থ মঞ্জুরী দেবেন সোসাইটির ব্যয় নির্ব্বাহ ও পত্রিকাটি পরিচালনার জন্য। পত্রিকার জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় করা চলবে।

পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার পড়লো মিঃ ও. সি. গাঙ্গুলীর উপরে। পত্রিকার নাম হোল 'রূপম্'। পত্রিকাটি সম্বন্ধেও লর্ড রোনাল্ডসের অভিমত উচ্চ প্রশংসাসূচক। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"The journal proved to be a truly sumptuous publication with beautifully executed illustrations, bearing on its title page an explanatory note in the following words—

"The object of the journal is to represent the traditions of India as expressed through art and to expound the concepts which underlie its forms'."

পত্রিকাটি বস্তুতঃই অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। লেখক ও পাঠক হিসবে সারা বিশ্বের কলারসিক, শিল্পবিদ ও শিল্পীসমাজকে তা আকৃষ্ট করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য শিল্পবিদ্ পণ্ডিতগণ 'রূপম্'-এ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। আর সকলেই উচ্চ প্রশংসা করে পত্রিকাটিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা-পত্রিকা বলে আখ্যাত করেছেন।

সরকারী অর্থমঞ্জুরী লাভ করে সোসাইটি সমবায় ম্যানসনে স্থানান্তরিত হোল। আর নানাদিকে এর কার্য্যধারাকে সুবিস্তৃত করার প্রয়াস শুরু হতে লর্ড রোনাল্ডসে একটি নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সোসাইটির পরিচালক সমিতির কাছে। তিনি বললেন যে, সমবায় ম্যানসনের নতুন কর্ম্মসূচীর একটি উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হোক্। প্রস্তাবটি সাগ্রহে গৃহীত হয়েছিল। তিনি ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট হাউসে অবনীন্দ্রনাথ ও তদীয় ছাত্র-শিষ্যদের চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী ও সান্ধ্যমিলন সভার আয়োজন করলেন। সেই অনুষ্ঠানের কথাও তিনি তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—

"All went well and on December 4, 1919, I gave the evening party at Government House at which the new centre was to be inaugurated. Some two hundred guests, the majority Indians, assembled in the Throne Room and after my introductory speech listened to an interesting address by a prominent member of the Society Mr. O. C. Gangoly."

অনুষ্ঠানের পরদিন ৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার "The Englishman" পত্রিকায়

"Indian Art' শিরোনাম দিয়ে সমগ্র কার্য্যধারার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়। শিরোনাম-এর দ্বিতীয় অংশে লেখা হয়েছিল—

Salon at Government House.

Interesting Exhibits.

Speeches by Governor and Mr. Gangoly.

গভর্ণর ও মিঃ গাঙ্গুলীর বক্তৃতা পূর্ণাঙ্গরূপে মুদ্রিত করেছিল পত্রিকাটি। তার ভূমিকায় সম্পাদকের মন্তব্য ছিল এইরূপ—

"There was a very interesting gathering at Government House on Thursday evening when His Exellency the Governor invited a large number of people to a preview of the exhibits of the Indian Society of Oriental Art. The gathering was fully representative of Eastern and Western culture. His Excellency and Lady Ronaldshay received their guests in the Throne Room, where, prior to the inspection of the pictures addresses were delivered by Lord Ronaldshay and Mr. O. C. Gangoly, one of the leading members of the Society."

গভর্ণর তাঁর বক্তৃতার প্রারম্ভে সোসাইটি ও তার কর্ণধারগণের উদ্দেশ্য, উচ্চ আদর্শ ও কর্ম্ম প্রণালীর প্রভূত প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য—

"I am a warm sympathizer with the objects of the Indian Society of Oriental Art, namely, the cultivation by its members and the promotion amongst the public, of a knowledge of all branches of ancient and modern Oriental Art, and I agree that the means by which the Society seeks to achieve its objects are admirable."

লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর বক্তৃতায় ভারতীয় সভ্যতার উপর বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "Clash of Ideals in the sphere of Art." এই উক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

"The same clash of ideals which has been the cause of so

much anxiety to Government in certain direction is to be found operating in the sphere of art. Here may be traced the same sequence of events which I have already sketched in general terms. We have the practical cessation of Indian artistic activity at the time of low national vitality when the impact of Western civilisation carried everything before it. Then we have the gradual awakening of the sleeping Indian spirit—the feeling of unrest which first pondered upon and then challenged the teaching given in the schools of Art established by Western agency in Western lines. How strong were the fetters of the western tradition is shown by the paintings of the late Raja Ravi Varma who sought to give expression to Indian ideals, but could not free himself of the European style which he had imbibed. Then came the heralds of a real renaissance when messers Abanindra Nath and Gogonendra Nath Tagore inspired by an instinct which insisted upon asserting itself, broke away from the Western tradition and gave birth to the modern School of Indian painting."

তিনি আরও বলেছিলেন—

"I take this deep personal interest in the School of Bengali painting, because apart from the particular merits of the painting itself, I see in it a perfectly legitimate field where that unrest of spirit from which India has been and still suffering, may leaven the soil with wholly commendable results."

গভর্ণমেণ্ট হাউস-এ সেদিনের প্রীতি সম্মেলনের মূল বক্তা ও. সি. গাঙ্গুলী তাঁর ভাষণে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন অতি স্পষ্ট ভাষায়। সেই বিস্তৃত ব্যাখ্যা হোল—

"It has been claimed by the new exponents, that the principles followed by them will help to purify pictorial art

from the cumbrous machinery of merely curious representation which can only realise a photographic, objective method of expression which refrains from reproducing the detailed facts and phases of physical obcjects, Indian painting confines itself to the essential elements of things. The Indian artists has thus been able to escape from the photographic vision and to secure an introspective out look on things which takes one away from the material objectives of life to a rarefied atmosphere of beauty and romance. Instead of buying themselves with recording the superficial aspects of phenomenon, they have worked with a deeper motive and a profounder suggestion, seeking to wean the human mind from the obvious and the external reality of the sense disdaining to imitate nature for its own sake and striving to find significative forms to suggest the formless infinity which is hidden behind the physical world of forms."[১]

১৯১৯-২০ সাল। সমগ্র ভারত জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। এমন একটি সময়ে বাংলার গভর্ণরের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রতি মমত্ববোধ ও সহৃদয় সহায়তার জন্য প্রসারিত হস্তকে কিভাবে এদেশের মানুষ সেদিন গ্রহণ করেছিলেন তা সুস্পষ্ট জানার কোনও অবকাশ আজ আর নেই। তবে সেদিন যদি কারোর মনে এই প্রশ্ন জেগে থাকে যে উচ্চ শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাঙ্গালী সমাজের মনকে জাতীয় আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে নেবার জন্যই তাঁর সেই ভারত-কলাপ্রীতি ও শিল্প-সংস্থাকে সহায়তা দানের চেষ্টা হয়েছিল, তা'হলেও তা অসমীচীন ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলা যায় না।

কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তা আজ অজ্ঞাত। সুতরাং তাঁর প্রত্যক্ষ কর্ম্মপ্রণালী, চিন্তাধারা ও আদর্শের যে অভিব্যক্তি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ হওয়া উচিত।

---

১. The Englishman (Deo, 5, 1919)

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ থেকেই দেখা গিয়েছিল যে কার্য্যব্যাপদেশে এখানে আগত ইংরেজ সমাজের অনেকেই ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মত এদেশীয় চারুকলার প্রতিও গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসও এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত-কলার রূপ-রহস্য ও ইতিহাস পর্য্যালোচনা তখনও আরম্ভ হয়নি, প্রাচীন কীর্ত্তিকলার আবিষ্কার ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থাও কিছু ছিল না, এমন দিনে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে ওয়ারেন হেষ্টিংসের খাজাঞ্চী রিচার্ড জনসন প্রচুর ভারতীয় মিনিয়েচার পেন্টিং সংগ্রহ করে ইংলণ্ডে নিয়ে যান। সেই সংগ্রহই পরবর্ত্তীকালে ইণ্ডিয়া হাউসের প্রখ্যাত 'জনসন সংগ্রহ' নামে সুবিদিত হয়েছে।

তারপরে ক্রমান্বয়ে ভারত-কলার বিদেশ যাত্রা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তার সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে এদেশের শিল্প সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কলা রসিকদের নানা অভিমত প্রকাশের সুযোগ এনে দিয়েছিল। স্বদেশজাত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সচেতনতার অভাব ইউরোপীয় সংগ্রাহক ও সমঝদারগণের পক্ষে হয়েছিল অপূর্ব্ব সুযোগ। তার ফলে ক্রমশঃ ভারতশিল্পের বিভিন্ন প্রকার নিদর্শন সম্ভার দ্বারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের প্রদর্শশালায় ভারতীয় কলা বিভাগ সৃষ্টি হোল।

সংগ্রহ-কর্ম্মের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের কলা-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন ভারত-কলার বিশিষ্টতা, শৈল্পিক উৎকর্ষ ও মৌল আদর্শ বিচার বিশ্লেষণ করতে। ভারতশিল্পকে প্রারম্ভে কঠোর সমালোচনা ও নিন্দার গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। ভারতীয়দের শিল্প-প্রতিভা নির্জ্জলাভাবে অস্বীকৃত ও নিন্দিত হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশীয়, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচকদের দ্বারা।

আরও উল্লেখনীয় যে, ভারতের বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ও সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারও ভারতীয় শিল্পের মর্ম্মরহস্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। পরন্তু ঘোরতর বিমুখী ভাবের প্রকাশ করেছিলেন তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের জনৈক ছাত্র উইলিয়ম নাইটকে লিখিত একটি চিঠিতে। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

"The idea of the Beautiful in Nature did not exist in the Hindu mind. It is the same with their descriptions of

human beauty. They describe what they saw, they praise certain features, they compare them with other features of Nature, but the Beautiful as such does not exist for them. They never excelled either in sculpture, or painting. • ····But it is strange nevertheless, that the people as fond of the highest abstractions as the Hindus—should never have summarized their perception of the Beautiful."

এইভাবে আরও অনেকে ভারতের শিল্পকে 'প্রকৃত শিল্প' আখ্যা দিতে নারাজ হয়েছিলেন। ইহাকে তাঁরা অদ্ভুত, বীভৎস ও কিম্ভূতকিমাকার বলতেও দ্বিধা বোধ করেন নি।

কিন্তু কালক্রমে ইউরোপের শিল্পতাত্ত্বিক ও রসিক ব্যক্তিরা এই শিল্পের মৌল আদর্শ ও রূপৈশ্বর্য্যের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই উপলব্ধি অনুভাবের যোগ্য ক্ষেত্র যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফরাসী সমালোচক মরিস মেন্দ্র, স্থাপত্যবিদ্ জেমস্ ফার্গুসন (ইংরেজ), প্রখ্যাত কলাবিদ্ রোজার ফ্রাই (ইংরেজ) ও রেনেগ্রুসে (ফরাসী)।

তবে ভারতের মাটিতে এসে প্রাচীন শিল্পের মর্ম্মোদ্ধারে যাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এবং পৃথিবীর শিল্প দরবারে ইহাকে প্রকৃত সম্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী ও ই. বি. হ্যাভেল।

লর্ড রোনাল্ডসে ভারতবর্ষের দায়িত্বভার ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে গিয়েও লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি অব আর্টসের ভারতীয় বিভাগে একটি লিখিত ভাষণ দান করেন ১৯২৩ সালের মার্চ্চ মাসে। তার শিরোনাম ছিল, "A clash of Ideals as a source of Indian unrest". এই ভাষণে তিনি ভারতীয় শিল্পের নানা শাখার মৌল আদর্শ ও তাৎপর্য্য আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে ভারত-কলা সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় বক্তৃতাকালে মুখবন্ধে তিনি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার মূল অংশ এই—

"The position of Indian art was a very different one from what most Western critics would have been disposed to assign to it not very many years ago. It was indeed only

in recent times that people in the West had acquired genius of Indian Art, and had realised its greatness."

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা গবেষণা বিগত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে রীতিমত শুরু হলেও অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক ও প্রশংসাসূচক মত ও মন্তব্য এই শতকের পূর্ব্বে কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। অবনীন্দ্র-চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয় লণ্ডনের প্রখ্যাত কলা-পত্রিকা 'স্টুডিয়ো'তে। লেখক স্বয়ং ই. বি. হ্যাভেল। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েই তিনি তাঁর চিত্রকলা সম্পর্কে লেখনী ধারণ করেন। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'স্টুডিয়ো'তে ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে। সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

"Mr. Tagore has happily been proof against the temptation to allow his artistic individuality to be cast in a common European mould. He has found in the work of the Mughal School exactly the material to help forward his artistic development. At the same time he is not a mere imitator of an extinct style of art."

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মিঃ হ্যাভেল আরও দু-তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'স্টুডিয়ো'তে। তন্মধ্যে ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে মুদ্রিত প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। ১৯০৮ সালেই মিঃ হ্যাভেলের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Indian Sculpture and Painting' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেও তিনি অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্র-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপিও মুদ্রিত করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"New India has at last found an artist, Mr. Abanindra Nath Tagore, to show us something of its real mind, and it is significant that it is revealing itself in a continuity of the old artistic thought, a new expression of former convictions."

এই গ্রন্থখানি প্রকাশের এক বছর পূর্ব্বে (১৯০৭) আরও একখানি মূল্যবান পুস্তকে অবনীন্দ্র-শিষ্যদের চিত্র স্থান পেয়েছিল। সেটি হোল ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী প্রণীত "Selected Examples of Indian Art." এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য—

"The works of the Modern School of Painters in Calcutta is a phase of the National awakening. The subjects chosen by the Calcutta painters were taken from Indian History, romance, epics and from the mythology and religious literature and legends, as well as from the life of the people around them. This significance lies in their distinctive Indianness."

ই. বি. হ্যাভেল ভারত ত্যাগ করে চলে গেলেন ; আর্ট স্কুলে তাঁর কর্মভার হস্তান্তরিত হোল, কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত নতুন কর্মসূচীর ধারা চলেছিল অবাধ-গতিতে ; তা রুদ্ধ হয়নি। আর্ট স্কুলে তাঁর নতুন সংগ্রহকে অবলম্বন করেই আজকের ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মহিমময় আর্ট গ্যালারী নির্মিত হয়েছিল। এই সংগ্রহ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথও তদীয় অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ও অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯১১ সালের ১লা এপ্রিল আর্ট স্কুলের গ্যালারী ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেখানে তিনটি বিভাগে তা বিন্যস্ত হয়েছিল : চিত্রকলা, ধাতুদ্রব্য ও বয়নশিল্পের নমুনা। আর্ট স্কুলের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী রিপোর্টে দেখা যায়—

"The fine Art Section includes the finest specimens of Hindu and Muhammedan paintings in water colours and a few paintings in ivory. The hardware section includes choice specimens of Indian Art in metal and leather works, pottery, jewellery and wood carving. The textile fabrics are divided into woven and embroidered articles. It is hoped that, when thus restocked and rearranged the gallery will be able better to fulfil its purpose of moulding the taste and directing imagination of the students in the direction of indegenous art."

এই সম্মিলিত বৃহত্তর আর্ট গ্যালারীর জন্য একটি নতুন 'পারচেজ কমিটি' গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যার জন উডরফ। মেম্বার ছিলেন—মিঃ ব্রুবেনসন, মিঃ মোলার, নর্মান ব্লাণ্ট, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ও. সি. গাঙ্গুলী। সেক্রেটারীর কাজ করতেন আর্ট স্কুলের

তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ পার্সী ব্রাউন। দেশ-বিদেশ থেকে শিল্পবস্তু বিক্রেতারা জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হতেন সংগ্রাহক কমিটির কাছে। তাঁরা তখন দেখে শুনে পছন্দসই জিনিস দরদস্তুর করে কিনতেন।

আর্ট গ্যালারীর সংগ্রাহক কমিটিতে কাজ করতে করতে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনেও তার জোরালো প্রভাব পড়েছিল। তিনি সেই কমিটিতে বসে দেশ-বিদেশের কলা সামগ্রী ও বিক্রেতাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ক্রমশঃ নিজেও একজন নিপুণ সংগ্রাহক হয়ে উঠলেন। এই বিষয়ে তাঁর অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথেরও বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। দুই ভাই একত্রে দেখে-শুনে, দরদস্তুর করে জিনিসপত্র কিনতেন। কালক্রমে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ যেমন হয়েছিল আকারে বিরাট, তেমনি হয়েছিল অমূল্য শিল্প-ভাণ্ডার। 'ঠাকুর সংগ্রহ' (Tagore Collection) নামে তা দেশে-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল। নিজেদের সংগ্রহ কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলকর আলোচনা করেছেন তিনি তাঁর স্মৃতিকথায়। তিনি বলেছেন, "ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম সবদিকে ছিল চর আমাদের। এক তিব্বতী লামা ছিল, মাঝে মাঝে আসত; দামি দামি পাথর, চাইনিজ জেড, তিব্বতী ছবি, নানা রকম ধাতুর মূর্ত্তি আনত। সে এলেই আমরা উৎসুক হয়ে থাকতুম দেখতে এবার কি এনেছে।"

তাঁর মতে আর্টিস্ট হচ্ছেন কালেক্টর, তিনি এটা-ওটা সংগ্রহ করেন সারাক্ষণ, সংগ্রহেই তাঁর আনন্দ।

হ্যাভেল সাহেব ব্যতীত আর যে সকল ইউরোপীয় সুধী সজ্জন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রতিষ্ঠা কর্ম্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখনীয় হলেন স্যার জন উড্রফ। ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য একজন ব্যারিস্টার। পরে বিচারপতি পদে উন্নীত হন। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি স্বনামধন্য একজন বিচারক। গোড়ার দিকে তিনি সাধারণ উদ্যোক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু দু'চার বছর পরেই তিনি সোসাইটির সভাপতি পদে ব্রতী হন। তিনি কেবলমাত্র একজন কলাপ্রেমী ছিলেন না। বিভিন্ন যুগের ভারতশিল্পের মর্ম্মরহস্য তিনি আলোচনা করতেন শ্রদ্ধাপ্লুত মন ও বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে।

সোসাইটির প্রথম পর্ব্বের প্রদর্শনী সমূহের ক্যাটালগ রচনার দায়িত্বভারও তিনিই গ্রহণ করতেন। তখনকার সেই ক্যাটালগকে এক একটি সাহিত্য বললেও অত্যুক্তি হোত না। কেন না, প্রতিটি ছবির নামধামের সঙ্গে তাঁর

মূলে যে আখ্যান-কাহিনী তাও হোত লিপিবদ্ধ। গোড়ার দিকে তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। ছবির বিষয়বস্তু ইত্যাদি মোটামুটিভাবে তাঁকে বলে বুঝিয়ে দিতেন।

স্যার জন উডরফ কলকাতা শহরের প্রদর্শনী ব্যাপারেই যে উৎসাহী ছিলেন তা নয়। তিনি অবনীন্দ্র-চিত্রকে বিদেশে প্রচার ও তাকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতেও যথেষ্ট আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছেন। শিল্পী-গুরু ও তাঁর প্রথম পর্য্যায়ের শিষ্যদের রচিত উৎকৃষ্ট ছবির নিখুঁত প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে দেশে-বিদেশে কলারসিক সমাজে বহুল প্রচার করার একটি পরিকল্পনা তিনি সোসাইটির ব্যাপক কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর সেই শুভ চেষ্টার প্রথম ফলশ্রুতি দেখা গিয়েছিল জাপানে মুদ্রিত কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপিতে। তন্মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের 'দীপাবলী' ও 'চন্দ্রালোকে সঙ্গীতাসর,' সুরেন গাঙ্গুলীর 'কার্ত্তিকের' এবং নন্দলালের 'সতী' উল্লেখনীয়। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র দু'খানির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছিল স্যার জন উডরফ লিখিত একটি প্রবন্ধের সঙ্গে। প্রবন্ধটি জাপানের প্রসিদ্ধ কলা-পত্রিকা 'কোক্কা'য় প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। শিরোনাম: "A Modern School of Indian Painting".

উক্ত প্রবন্ধে সর্ব্বাগ্রে তিনি সোসাইটির অবদানের কথা উল্লেখ করেন এইভাবে—

"This Society is doing good work by its endeavour to arouse in the India of to-day the beautiful spirit which inspired the artistry of her great past......Its earliest and best product is to be found in the work of Mr. A. N. Tagore, the successor of Mr. Havell in the Calcutta Art School, The beauty of his work is a sign of what may be given to the world (and is indeed now being given by some of his pupils) if the Indian people regain their artistic heritage and realise that their duty is not to borrow from others but to give of their own."

অবনীন্দ্র-চিত্রের বিশেষ অনুরাগী আর একজন বিশিষ্ট বিদেশী বন্ধুর কথাও আলোচনার যোগ্য। তিনি লর্ড কারমাইকেল। সোসাইটির প্রারম্ভ থেকেই তিনি কিছুকাল এই সংস্থার সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন। সহজাত

আবেই আর্টের একটা শখ ছিল তাঁর। তিনি ভারতবর্ষের অনেক উচ্চাঙ্গের শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। আর সোসাইটির প্রদর্শনী থেকে কিনেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের উৎকৃষ্ট সব ছবি। লর্ড রোনাল্ডসের বহু পূর্ব্বেই ইনি বাংলার গভর্ণর রূপে এই প্রকারে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পধারাকে নানাভাবে উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছিলেন। আর্ট স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলার গ্যালারী নির্ম্মাণের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সহায়ক। তিনি কিছুদিন আর্ট গ্যালারীর কমিটিতে সভাপতি রূপেও কার্য্য-ভার বহন করেন। সেই সময় তাঁর উদ্যোগেই 'আর্ট পারজেস্ কমিটি' গঠিত হয়েছিল।

লর্ড কারমাইকেলের শিল্পজ্ঞান ও চিত্র-বিচারের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অবনীন্দ্রনাথ খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি এই বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "লর্ড কারমাইকেল, তাঁর মত আর্টিষ্টিক্ নজর বড় কারো ছিল না। আমাদের নজরে নজরে মিল ছিল। আর্টেই শখ তাঁর।"

কিন্তু তিনি শখ করে যা কিছু উৎকৃষ্ট চিত্র ও জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছিলেন তা বিধির নির্ম্মম বিধানে একটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে একটি জাহাজে করে তিনি তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র স্বদেশ ইংলণ্ডে পাঠান। দুর্ভাগ্যবশতঃ জাহাজটি ভূমধ্যসাগরে জলমগ্ন হয়ে যায়। উক্ত জাহাজে অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ব্যতীত অবনীন্দ্র-রীতির চিত্রসম্ভারও ছিল। সেই দুর্ঘটনার পরে তিনি দুঃখ করে অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—

"আমার আসবাবপত্র সব যায় যাক কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু তোমাদের ছবিগুলো যে গেল এইটেই বড় দুঃখের কথা।"

শিল্পী কিন্তু সেই দুঃখজনক শোকাবহ ব্যাপারটাকে তাঁর সহজাত রহস্যবোধ দিয়ে অত্যন্ত হাল্কা করে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ও প্রিয় শিষ্য নন্দলালের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছবি সেই জাহাজে ছিল। নন্দলাল বসু ঘটনাটি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। তা দেখে স্নেহশীল গুরু তাঁকে সরস সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই বলে—

"ভালোই হয়েছে, এতে দুঃখ কি! আমি দেখছি জলদেবীরা আমাদের ছবিগুলো বরুণালয়ে টাঙিয়ে আনন্দ করছেন। গেছে যাক্, ভেবো না।"

সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বাংলার গভর্ণরগণ এবং আরও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা উহার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তা পূর্ব্বেই

আলোচিত হয়েছে। তার ফলে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সহিতও তাঁদের সকলেরই গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁদের সম্পর্কে কথা উঠলেই অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, 'লাটবন্ধু ও রাজবন্ধু'। তাঁদের বন্ধুত্ব কিন্তু নিছক মৌখিক বা ছবির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলার মধ্যেই সীমিত ছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা তাঁরা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের ছবি ক্রয় করে।

এই ধরনের সহযোগিতা আরও যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিঃ নর্ম্মান ব্লাণ্ট ও মিঃ থর্নটন। মিঃ ব্লাণ্ট ছিলেন অবনীন্দ্র-চিত্রের প্রকৃত একজন জহুরী।

মিঃ থর্নটনেরও অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের ছবি সম্বন্ধে ছিল অফুরন্ত উৎসাহ-প্রীতি। এঁরা দু'জনই সোসাইটির উন্নতি-অগ্রগতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতেন। শিল্পীদের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতেন। থর্নটন ছিলেন এঞ্জিনিয়র; মার্টিন কোম্পানীতে কাজ করতেন। তিনি স্কেচ ও ড্রইং করতেন চমৎকার! অবনীন্দ্রনাথ চিরদিন থর্নটনের প্রশংসায় ছিলেন মুখর। তাঁর অঙ্কিত ছবি ও স্কেচের তিনি খুব প্রশংসা করতেন।

সোসাইটির কাজকর্ম্মের বাইরেও এঁদের সঙ্গে ঠাকুর ভ্রাতাদের গভীর ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁরা নিয়মিত আর্ট স্কুলে যেতেন এবং অবনীন্দ্রনাথের কর্ম্মপ্রণালী লক্ষ্য করতেন। আর চিত্রকলা সম্পর্কে গভীর আলোচনা চলতো। ছবি পছন্দ করা ও ক্রয় ব্যাপারেও তাঁদের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নানা কৌতুককর ও মজাদার সব কথাবার্ত্তা ও ভাব বিনিময় হোত।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "থর্নটনের মত অমন বন্ধু হয়নি আর আমার।"

এঁদের উৎসাহ-চেষ্টাতেই সোসাইটি গঠিত হয়েছিল, আবার সোসাইটি বলতেও ছিলেন এঁরাই। সোসাইটি সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের অভিমত ও আলোচনার মধ্যে সেই পুরানো পরিবেশটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। তিনি বলেছেন—

"আমরা যে সোসাইটি করেছিলুম সে ছিল একেবারে অন্য রকমের। আমরা করেছিলুম এমন একটা সোসাইটি যেখানে দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে একত্র হয়ে আর্টের উন্নতির জন্য ভাববে, শুধু ভারতীয় নয় প্রাচ্যশিল্পের সব জিনিস দেখানো হবে লোকেদের। তাতে এমন ব্যবস্থাও ছিল যার যা ব্যক্তিগত শিল্পবস্তুর সংগ্রহ ছিল তাও দেখানো হোত। মাঝে মাঝে এক একজনের বাড়িতে পার্টি জমত। সভ্য সবাই আসত, আমোদ আহ্লাদ,

খাওয়াদাওয়া, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা, সবই হ'ত। উভয়ক পান পর্যন্ত দিতেন তাঁর বাড়িতে যখন পার্টি হ'ত। পান, ফুলের মালাও চল হয়ে গিয়েছিল সাহেব বাড়িতে সেই সময়ে। তাছাড়া যে-দেশে যা কিছু সুন্দর পাওয়া যায় এনে সাজিয়ে দিতুম একজিবিশন করে। সে সব একজিবিশন হ'ত এক বিরাট ব্যাপার। কাঁচের বাসন, কার্পেট, যেখানকার যা কিছু ভালো পুতুল, গয়না, ছবি, কিছু বাদ পড়তো না। সব বাছাই বাছাই জিনিস, যা-তা হলে আবার হবে না।" ১

এই যে প্রদর্শনীর কথা বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাই ছিল সোসাইটির কর্ম্মতালিকার মুখ্য অঙ্গ। প্রতি বছরই ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। তাতে শিল্পীগুরু ও তাঁর ছাত্রদের সারা বছরের সমস্ত সৃষ্টি নিদর্শন উপস্থিত করার অবকাশ হোত। এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে ভারতের ঐতিহ্যানুগ শিল্পকলার নানা উৎকৃষ্ট নমুনা-নিদর্শনও প্রদর্শনীতে স্থান পেত।

বাৎসরিক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করতেন তৎকালীন বাংলার গভর্নরগণ। দু-একবার দিল্লী থেকে ভাইসরয় বড়দিনে কল্‌কাতা এলে তিনিও সেই শুভ কাজটি সম্পন্ন করতেন। এঁদের দ্বারা সেই শুভ কার্য্যানুষ্ঠানের একটি বিশেষ সুফল পাওয়া যেত প্রতিবারেই। তাঁরা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করে শিল্পীদের প্রদর্শিত ছবি থেকে দু-একখানি ক্রয় না করে ফিরে যেতেন না। গভর্নরগণ ব্যতীত বিদেশী বন্ধুরাই গোড়ার দিকে বেশী ছবি কিনতেন। তারপরে কিছুকাল যেতে বাংলা দেশের ধনীসম্প্রদায়, রাজা-মহারাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও এই চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছবি কিনতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন—বর্দ্ধমানের মহারাজা, কুচবিহারের মহারাজা, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী। অবশেষে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথও ছাত্রদের ছবি কিনে তাঁদের উৎসাহ দান ও সাহায্য করতে অগ্রসর হন।

প্রদর্শনী ব্যতীত সোসাইটির কর্ম্মসূচীতে আরও যে সকল বিষয় স্থান পেয়েছিল তা হোল, প্রতিভাধর শিল্পীদের ছবির প্রতিলিপি মুদ্রণ করে সভ্যদের মধ্যে বিতরণ ও দেশে-বিদেশে তার প্রচার। আর দেশী ও বিদেশী কলা-

---

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ৯২-৯৩

বিশেষজ্ঞদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের দ্বারা প্রাচ্য শিল্পের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থাও ছিল। প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯০৮ সালে ডঃ আনন্দ কুমারস্বামীর বক্তৃতা হয়েছিল স্যার জন উডরফের আবাসে। নানা দেশের যাবতীয় কলাবিষয়ক পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করেও শিল্পীদের পঠন-পাঠনের সুযোগ প্রদান করা হোত। শিল্প সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-পুস্তক দ্বারা একটি গ্রন্থাগার গঠনের প্রচেষ্টাও হয়েছিল গোড়া থেকেই।

সোসাইটির উদ্যোগে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করে লেডি হ্যারিংহামের কাজে সাহায্য করার জন্য কলকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট-ই অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীদের অজন্তা গুহায় পাঠিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ত্যাগ করার পরে সোসাইটির কর্ম্মধারা আর একটি নতুন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রবাহিত হয়। তা হোল সোসাইটির নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্র। অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের কর্ম্মভার ত্যাগ করেন ১৯১৫ সালে।

তার শেষভাগেই সোসাইটিতে শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হয়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভে আগ্রহী ছাত্রগণ তখন সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি না হয়ে সোসাইটির শিক্ষাকেন্দ্রে আসতেন ভারতীয়-রীতিতে শিক্ষালাভের জন্য। সোসাইটির শিক্ষায়তন থেকে অনেক কৃতী শিল্পী তৈরী হয়েছিলেন। গোড়ার দিকে যাঁরা সেখানে, অথবা অবনীন্দ্রনাথের আবাসে গিয়ে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে প্রতিভাবান শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, সারদা উকিল, রণদা উকিল, মুকুল দে, বীরেশ্বর সেন, চারু রায়, সুরেন কর, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, পুলিন দত্ত, চঞ্চল ব্যানার্জী, অশ্বিনী রায়, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে। আরও একজন শিল্পীর নাম এই সূত্রে উল্লেখনীয় তিনি প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও, তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাশ্চাত্য রীতি ত্যাগ করে আধুনিক ভারতীয় পদ্ধতির সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান পরিচালক ও গুরু ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু আরও সুযোগ্য শিক্ষকের কোনও অভাব ছিল না। নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনের

কলাভবনে যোগদানের পূর্ব্বে কিছুদিন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীও কিছুকাল ওখানে শিক্ষকতা করেছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সোসাইটির ছাত্রদের মাঝে মাঝে শিক্ষাদান করতেন। তবে তিনি তাঁর স্বকীয় ধারা-পদ্ধতি কখনও ছাত্রদের উপরে আরোপ করেন নি। এই শিক্ষায়তনে ভাস্কর্য্যকলা শিক্ষা-দানেরও সুব্যবস্থা ছিল। এই বিভাগের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছিল উড়িষ্যার চিরাগত পদ্ধতির খ্যাতিমান ভাস্কর গিরিধারী মহাপাত্র-র উপরে।

ওখানে যাঁরা শিক্ষালাভ করতেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুন ছিল না। নিয়ম মাফিক পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট-ডিপ্লোমা দানেরও তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রদের সারা বছরের সৃষ্টিরাজি বৎসরান্তে প্রদর্শনীতে উপস্থিত করার প্রথা ছিল। সেখানে রসিকজনের সপ্রশংস মন্তব্য ও সমালোচকের স্তুতিবাদই ছিল তাঁদের রচনাবলীর গুণাগুণ বিচারের অন্যতম মাপকাঠি। সর্ব্বোপরি ছিল শিল্পীগুরুর আশীর্ব্বাদ ও শিক্ষা সমাপ্তির মৌখিক ছাড়পত্র। ছাত্রদের কল্যাণের জন্য, সুষ্ঠুরূপে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ করে তাঁরা যাতে যথার্থ শিল্পী হয়ে সেই শিক্ষার বিকিরণ করতে পারেন তার জন্য নানা সুবন্দোবস্ত ও আয়োজনের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। প্রতিভাবান ছাত্রদের বৃত্তি এবং প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত শিল্পীকে পদক ও পুরস্কার দানের প্রথা ছিল। কালক্রমে নর্মান ব্লাণ্টের নামেও একটি পদক দানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহ্যানুগ শিল্পকীর্ত্তি ও প্রদর্শশালা অনুশীলনের জন্য স্টাডি ট্যুরেরও ব্যবস্থা হোত।

ছাত্রদের মনে সমগ্র প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-প্রীতি সঞ্চার ও তাঁদের চোখ তৈরীর জন্য সোসাইটিতেও একটি কলা-সংগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল। তদুপরি অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহের দ্বার তো তাঁদের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল।

একদিকে সোসাইটির শিক্ষাকেন্দ্র চলছিল পুরোদমে, অন্যদিকে আবার জোড়াসাঁকোর ৫নং আবাসের দক্ষিণের বারান্দায়ও গড়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র আর একটি কলাকেন্দ্র। সেটিই ছিল অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চ্চার পুণ্য-পীঠস্থান। দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশি বসে দুই ভাই, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ—গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছবির পর ছবি এঁকে যেতেন। রঙে তুলিতে কাগজে ও পটে অপূর্ব্ব সব রূপের বাহার ফুটে উঠতো নিমেষে নিমেষে। হাতের তুলির শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। তুলি চলে কি, মুক্ত বিহঙ্গ রঙীন ডানা মেলে উড়ে চলে, তা বোঝা যেত না।

একজন জলে ধুয়ে, জলে ডুবিয়ে ছবির পটকে অবগাহন করাতেন। নেমে আসতো গভীর গহন অনবদ্য এক ভাব-প্রবাহ। আর একজন তুলিতে রঙ জড়িয়ে কাগজে-পটে রঙের খেলা করে যেতেন, মনে হোত রূপকথার পক্ষিরাজ ঘোড়া যেন ছুটিয়ে দিয়েছেন সেখানে। সুমধুর অতলান্ত ভ্রাতৃস্নেহের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ দুই শিল্পী। জ্যেষ্ঠের অতি অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কিন্তু চিত্র রচনায় তাঁরা ছিলেন দুই ভিন্ন পথের পথিক। সেখানে কেউ কারোর নন। পরস্পর চিত্রাঙ্কন রীতিতে দূরের মানুষ হলেও দু'জনাই দু'জনের সৃষ্টি গৌরবে গৌরবান্বিত। তুলির ভাষায় তাঁরা ভিন্ন কথা বলতেন, কিন্তু অন্তরের ভাব-ভাষা এক। মধ্যম ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথও ছিলেন সেই দক্ষিণের বারান্দারই একজন। তবে তিনি ছবির রাজ্যের মানুষ ছিলেন না। তিনি নিমগ্ন থাকতেন পুঁথি-পুস্তকে আবদ্ধ ভাব-রসের অনন্ত প্রবাহে। আর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ দেখে দেখে তিনি পৃথিবীর যত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতেন। তখনকার বাঙালী সমাজে এই তিন ভ্রাতার ভ্রাতৃস্নেহ ও একাত্মতা একটি মহৎ আদর্শ স্বরূপ হয়েছিল। মানুষের মুখে মুখে সে কথা ঘুরে ফিরতো।

কিন্তু এই ত্রয়ীকে নিয়েই কেবল দক্ষিণের বারান্দা নয়। ওখানে আরও এসে মিলিত হতেন সেই বিদেশী কলারসিক বন্ধুজনেরা, যাঁরা সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, যাঁরা ছবি কিনে কিনে, নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতিকে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য মাধ্যমে একটি নব আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। আরও আসতেন কত শত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশের গুণীজন, সাহিত্যসেবী, দার্শনিক, সাংবাদিক ও কলাবিদ বিদগ্ধ সুধীরগুলী। এইভাবে দক্ষিণের বারান্দা ক্রমশঃ একটি বিশিষ্ট শিক্ষাগার ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। এদেশের ছাত্র-শিষ্য ব্যতীত জাপানী শিল্পীরাও ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও বিষয়বস্তুর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন সেখানে। দক্ষিণের বারান্দাতেই হয়েছিল টাইকানের অনবদ্য সৃষ্টি রাসলীলার চিত্র-কল্পনা।

কেবল চিত্রাঙ্কনই নয়, চিত্রের ভাব-ভাষা ও গুণাগুণ আলোচনায়ও বারান্দাটি মুখর হয়ে উঠতো প্রতিদিন।

অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনাতে দক্ষিণের বারান্দার রূপটি আরও রমণীয় ও উপভোগ্য। সেও যেন একটি ছবি!

"সেই দক্ষিণের বারান্দাতেই, ঠিক তেমনি হুঁকো কলকে করসি সাজিয়ে

বসি। বাবা মশায় যেখানে বসতেন সেখানে দাদা বসে ছবি আঁকেন, একটু তফাতে আমি বসি পূবের বড় খিলানের ধারে, তারপরে বসেন সমরদা।...

আরো হাল আমলে যখন আমরা আর্টিস্ট হয়ে উঠেছি, আর্ট সোসাইটির মেম্বর হয়েছি, বড় বড় সাহেব সুবো জজ ম্যাজিস্ট্রেট লাট আসেন বাড়িতে—কমলালেবুর শরবত, পান, তামাক, বেল ফুলে ভরে যায় সেই দক্ষিণের বারান্দা।...

তোমরা ভাবো, ঘরের ভিতরে স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতুম, তা নয়। বারান্দার একদিকে আমি আর একদিকে ছাত্ররা বসে যেত। মুসলমান ছাত্র আমার শমিউজ্জমা একদিকে আসন পেতে বসে সারাদিন ছবি আঁকে, সন্ধ্যে হলে মক্কা মুখো হয়ে নমাজ পড়ে নেয় ওই বারান্দাতেই। অবারিত দ্বার দক্ষিণের বারান্দায়, সবাই আসছে, বসছে, ছবি আঁকছি, গান চলছে, গল্পও হচ্ছে। এমনি করেই ছবি এঁকে অভ্যস্ত আমি।...বারান্দা যেন একটা জীবন্ত মিউজিয়াম।"[১]

অবনীন্দ্রনাথ কোনদিন বিদেশ-ভ্রমণ করেন নি। চাল-চলন পোশাক-আসাক, ধ্যান-ধারণায় তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর চিত্রকলা তাঁকে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিসত্তার অধিকার এনে দিয়েছিল। তাঁর গৃহের দক্ষিণের বারান্দাও হয়েছিল একটি বিশিষ্ট আন্তঃসাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সেখানে দেশ-বিদেশের শিল্পরসিক গুণী ব্যক্তিরা এক আসরে বসে, চারুকলার রাখীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাব বিনিময় করতেন এবং শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা আলোচনা করতেন। সেখানে ইঙ্গ-বঙ্গ ও শাসক-শাসিতের কোন ভেদ-বিভেদ ছিল না। সকলের এক ভাব, এক চিন্তা ও এক আদর্শ। সকলেই ছিলেন অবনীন্দ্র-চিত্রের রসধারায় অবগাহন করে শুদ্ধ শিল্পকলার ঊর্দ্ধলোকে উত্তোরণ প্রয়াসী।

এত যে সুধী-সমঝদারের সমাবেশ হোত ওখানে, তারা কিন্তু কেউই নিছক স্তাবক বা সমালোচকের মন নিয়ে আসতেন না। সকলেই আসতেন শ্রদ্ধাপ্লুত খোলা মন ও সরল প্রাণ নিয়ে। চিত্রামোদী রসিকজন সখ্যতার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতেন আনন্দমুখর আলাপচারিতায়। ঠাকুর ভ্রাতারা তাঁদের প্রাণঢালা প্রীতি ও সাদর আপ্যায়নে আপ্লুত করে দিতেন সমাগত সুধীবৃন্দকে।

কে না এসেছেন সেখানে? ভগিনী নিবেদিতাও কতবার এসেছেন

১. জোড়াসাঁকোর ধারে। পৃঃ ৬০

সেখানে, কত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শিল্পীগুরু ও তাঁর ছাত্রদের। আরও যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন সাহিত্যিক ও স্বদেশপ্রেমী সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার পথিকৃৎ দীনেশচন্দ্র সেন। বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করতেন ব্লান্ট সাহেব, থর্নটন, মোলার, স্যার জন উডরফ ও বেনথল সাহেব। আরও এসেছিলেন কাউন্ট কেসারলিঙ্‌, ভারতীয় সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ফক্‌স্‌ ষ্ট্রাংওয়েজ, জাপানের কলাবেত্তা মনীষী কাকুজো ওকাকুরা ও ইংলণ্ডের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রদেন্‌স্টাইন।

দক্ষিণের বারান্দার এত খ্যাতি শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এত রাজারাজড়া ও লাটসাহেবদের সমাগম হোত যেখানে সেখানটি নিশ্চয়ই অদ্ভুত রকমের একটি সুসজ্জিত আধুনিক ড্রইংরুমের মতই কিছু ছিল; আসলে কিন্তু তা ছিল না। এই বারান্দাটির একটি জীবন্ত রূপচ্ছবি ধরে দিয়েছেন অবনীন্দ্র-শিষ্য প্রবোধেন্দু ঠাকুর তাঁর 'অবনীন্দ্র-চরিতম্‌' গ্রন্থে। তিনি আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রাঙ্কনের পাঠ নিয়েছিলেন দক্ষিণের বারান্দাতেই। তিনি লিখেছেন, "রঙ-চটা লাল সিমেণ্টের মেঝে, ফাট ধরেছে মাঝে মাঝে। অত বড় সত্তর-পঁচাত্তর ফুট লম্বা, বারো-তেরো ফুট চওড়া, ডবল্‌ ডবল্‌ গোল থাম, আকাশী ঝিলিমিলি-ওয়ালা টানা বারান্দায়—না আছে দেয়ালে একটা ছবি, না আছে একটা বর্শা, না তলোয়ার টাঙানো। একটি থামের গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল, সম্ভবতঃ, গুপ্ত পিরিয়ডের ফুট দুই উঁচু একটি প্রস্তর মূর্ত্তি, যার উপরে ক্ষত রেখে গেছে কাল প্রবাহের ক্ষতি। আর ছিল বারান্দার পুব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালগিরি এক প্রস্থ মার্বেলের উপর বসানো তিনটে চীনে মাটির টব্‌, তাতে জাপানী বৃক্ষের পত্র পুষ্পান্বিত শোভা। এমন কিছুই নয়। কিন্তু তবু বলব, ঐ বারান্দাই ছিল আধুনিক ভারতশিল্পের গোমুখী।...এই বারান্দাটি গুরুদেবের কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয়, ছিল তাঁর নিষ্ঠার নীড়, ছিল অবন পটুয়ার খেয়ালের কারখানা।"

একদিকে জোড়াসাঁকোতে দক্ষিণের বারান্দা, আর অন্যদিকে সমবায় ম্যানসনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্‌ ওরিয়েণ্টাল আর্ট—এই দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়ে অবনীন্দ্র-চিত্রকলার রসমাধুর্য্য দিক হতে দিগন্তরে পড়লো ছড়িয়ে। সেই ছড়িয়ে পড়ার মূলে ছিল মুখ্যতঃ বাৎসরিক প্রদর্শনী ও পত্র-পত্রিকায় তার রিভিউ বা সমালোচনা। কলকাতার 'দি স্টেট্‌সম্যান,' 'ইংলিশম্যান', 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসী' ছিল এ বিষয়ে অগ্রণী। অতঃপর এই

চিত্রকলার যশোগৌরব বাংলা ভূমি ছাড়িয়ে বিকীর্ণ হোল উত্তর ভারত, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে। উত্তর প্রদেশের 'পায়োনীয়র,' মাদ্রাজের 'নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকা'ও সহযোগীরূপে এগিয়ে এসেছিল সোসাইটির কর্মধারা ও চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যকে প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

সোসাইটির প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে। তার একটি রিভিউ বেরোয় 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এ ১লা ফেব্রুয়ারী। উক্ত প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছিল বহুসংখ্যক। যেমন, রাধাকৃষ্ণের লীলাচিত্র বিশখানি, তাজের নক্সা পর্য্যবেক্ষণরত শাজাহান, শিবদম্পতি, নির্ব্বাসিত যক্ষ ও শীতের রাত। রিভিউ-র একটি অংশ—

"Mr. Tagore has weaned his pupils gradually, however, and the results as a whole are quite successful from an artistic point of view.

We see, then how the enthusiasts have mastered the arts of perspective and of anatomy, until, at length, they have launched out into constructive designs which come from their own personality, from their own inner consciousness, something new, and yet emanating from something that has been done before—perfectly Oriental, although based on Western methods."

সোসাইটির প্রথম প্রদর্শনী হিসেবে এর একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য তো ছিলই, তদুপরি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল একটি বিশেষ কারণে। কেন না, সেই প্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষে স্যার জন উডরফ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দু'জন প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীকে মাসিক পনেরঃ টাকা করে দুটি বৃত্তি দান করেন। প্রথমটি পান নন্দলাল বসু, আর দ্বিতীয়টি পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এছাড়া ১,৮৪৪ টাকার একটি ফাণ্ড তৈরী করে তদ্বারা আরও নয়জন শিল্পীকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। আর বারোজন চিত্র প্রদর্শককে দেয়া হয়েছিল সোসাইটির বিশেষ একটি নক্সা অঙ্কিত সার্টিফিকেট। আর্ট স্কুলের ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের শিক্ষক ঈশ্বরীপ্রসাদকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছিল নগদ ৩০০ টাকা।

১৯০৯ সালের মধ্যে সোসাইটির কর্মধারা আরও বিস্তার লাভ করেছিল ঐ বছরের ১৮ই জুন 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এর একটি রিপোর্টে জানা যায় যে,

মিঃ জেনিংস-এর প্রস্তাবে স্যার এডওয়ার্ড বেকার, কে. সি. এস. আই. মহোদয় দু'বছরের জন্য মাসিক ১৫ টাকার একটি বৃত্তি দান করতে সম্মত হন। বৃত্তিটি লাভ করেন হিরণ্ময় রায় চৌধুরী।

সে বছরে সোসাইটির প্রদর্শনীতে ছবি বিক্রয় হয়েছিল ৩,৮০০ টাকার। তার ফলে তরুণ শিল্পীরা যেমন হয়েছিলেন উৎসাহিত, তেমনি উপকৃত। তাঁদের কলানৈপুণ্য দেখে তখন কোন কোনও Printing and Lithographic সংস্থা উত্তম বেতনে তাঁদের কাজে নিযুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে রাজী হননি।

বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন শুরু হতেই সোসাইটি সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরেজী ভাষার নানা পত্র-পত্রিকায় মতামত ও মন্তব্যাদি প্রকাশিত হতে থাকে। তার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ থেকে অবনীন্দ্র-রীতির ছবির প্রতিলিপির জন্য অনুসন্ধান ও চাহিদা আরম্ভ হয়। এই নব্য চিত্ররীতি সম্বন্ধে 'স্টুডিয়ো'তে হ্যাভেল সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ সমূহের ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শ্রেষ্ঠ কলা-পত্রিকায় রিভিউ হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীর পূর্ব্বেই ১৯০৯ সালের ২৯শে জুন 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এ একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে উক্ত চিত্র-পদ্ধতির প্রসারকে একটি 'আন্দোলন' আখ্যা দান করা হয়েছিল।

"The Calcutta School is leading the way in the field of the Fine Arts and is responsible for what has been called the 'New Indian Art Movement' under Mr. Havell this Institution has developed considerably."

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর দ্বিতীয় প্রদর্শনীর পূর্ব্বেই নব প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতির ভিন্নমুখী বিরুদ্ধ সমালোচনাও বেশ জমে উঠেছিল। নির্জ্জলা গুণগানই হয়নি সর্ব্বত্র। অবনীন্দ্র-চিত্র সম্বন্ধে যে বিরূপ সমালোচনা তখন অনেকের মুখে প্রায় একটা প্রবাদের মত হয়ে উঠেছিল তা প্রথম মুদ্রিত আকারে স্থান পেয়েছিল 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এ ১৯০৯ সালের ১১ই জুলাই। লেখক জনৈক A. P. D.

বাস্তবতা বর্জিত অস্বাভাবিক দেহরূপ, দীর্ঘায়ত হাত-পা, লতানে আঙুল, অতিমাত্রায় ছন্দায়িত ভঙ্গিমা ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পালা চলতো এই চিত্রকলার বিরোধীপক্ষের মুখে মুখে। এই ধরনের মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি হয়েছিল তাঁর লেখায়। সেখানে দেখা যায়—

—"...Now following in the foot prints of ancient Indian Artists Sj. Abanindra Nath Tagore, the chief practical exponent of the above view has drawn pictures of human beings with bodies disproportionate and non-human, with legs and hands unnatural and crude, but with a face though imperfect from an anatomical point of view yet aglow with an expression which apart from all others, is ideally beautiful and beautifully ideal."

উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের কয়েক দিন পরেই সোসাইটির সক্রিয় ও উৎসাহী সভ্য এবং অবনীন্দ্রনাথের দরদী বন্ধু এডওয়ার্ড থর্নটন, এফ্. আর. আই. বি. এ. 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এ একটি চিঠির মাধ্যমে তার জবাব দিয়েছিলেন—

"...It is hopeless to approach the study of any form of Art from the standpoint of the Mathematician or to pursue it in the atmosphere of the dissecting room. To attempt this is to court failure and disappoinment. Appreciation of earnest and spontaneous Art will ever remain the luxary of the few, unatainable of the many...

'A. P. D' would be well advised to communicate with the Joint Honarary Secretary of I. S. O. A. Mr. Blount who out of the charity of his heart will no doubt set him on the road to a fuller appreciation and understanding of the work of this little band of artists struggling in the midst of Reaction and Materialism."

এই জাতীয় সমালোচনা ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালা অবনীন্দ্রনাথও তাঁর অনুগামীদের উৎসাহ এবং সৃষ্টিরাজির বহুল প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। ক্রমশঃ দেশ-দেশান্তরে এই নব্য-চিত্ররীতি সম্বন্ধে প্রভূত কৌতূহল ও আগ্রহ সঞ্চারিত হয় এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ পেতে থাকে। তার ফলে কলকাতা শহরের সেই ক্ষুদ্র ও নবজাত শিল্প-আন্দোলন ক্রমান্বয়ে একটি বৃহত্তর ভারতীয় আবহমণ্ডল রচনায় সমর্থ হয়েছিল।

সোসাইটির দ্বিতীয় প্রদর্শনী চলেছিল ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর থেকে

পরবর্ত্তী বছরের জানুয়ারী পর্য্যন্ত। ১৯১০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, 'দি স্টেটস্‌ম্যান'-এর রিভিউ-তে মন্তব্য হয়েছিল—

"During the last two years of its existence the society has made considerable progress both in membership and in the work it has undertaken of fostering a purely national Indian Art."

বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপীয় সমাজে যেমন এই নব্য-চিত্রকলাপ্রেমী অনেক প্রকৃত সমঝদারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তেমনি পাশ্চাত্য-শিল্পের বাস্তববাদী রীতির প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী ব্যক্তিরা এই চিত্রশৈলীকে নানাভাবে বিরূপ সমালোচনায় জর্জরিত করেছিলেন। ১৯১০ সালের গোড়াতে লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটিতে জনৈক ইংরেজ চিত্রকলা-সমালোচক তাঁর বক্তৃতায় বলেন—

"Fine Art never has existed and does not exist in India or if it has, it was not worthy of consideration. The painters of the new Indian School whose works the society exhibits were, it was said, hardly entitled to the greatness thrust upon them."

উক্ত মন্তব্যটির প্রত্যুত্তরে 'দি স্টেটস্‌ম্যান' লিখেছিল—

"The paintings exhibited are thus not were slavish copies. There are many of them on the contrary of remarkable originality ; but the treatment is both traditional because of the spirit of India which has produced them, and new because the voice which speaks is that of to-day.

The present exhibition is evidence of the great progress both in respect of quality of the exhibits and the number of the exhibitors, which has been made since the first exhibition held in 1908."

প্রতি বছর শীতকালে প্রদর্শনীর মাধ্যমেই ভারতের নতুন চিত্রশৈলীর বহুল প্রচার ও প্রসারের যোগ্য বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে সোসাইটিতে ছাত্র সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি দেখা গিয়েছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা-সমালোচনায়

মধ্য দিয়েই এই চিত্র-পদ্ধতির কথা বিদেশেও প্রচারিত হয়েছিল। অবশ্য সকলেই যে অনুকূলে মত প্রকাশ করতেন তা নয়। দেশ ও বিদেশে সর্ব্বত্রই এই বিষয়ে দুটি ভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচক দেখা যেত। বাংলাদেশে প্রধান বিরোধী সমালোচক ছিলেন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। পক্ষান্তরে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র সম্পাদক ছিলেন এই চিত্রকলা ও নব-আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর প্রকৃত একজন গুণগ্রাহী বন্ধু। তিনি অনবরত এই চিত্রকে প্রতিলিপির মাধ্যমে স্থান দিতেন তাঁর প্রখ্যাত দুটি পত্রিকায়। তিনি নিজেও যেমন চিত্র-পরিচিতি লিখে তাকে প্রশংসাধন্য করেছেন, তেমনি কয়েকজন উপযুক্ত কলারসিক ও সমালোচককে পেয়েছিলেন সহযোগীরূপে। তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা, খ্যাতনামা সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত কলাবেত্তা ও. সি. গাঙ্গুলী ছিলেন প্রধান। এছাড়া বিশেষ বিশেষ বিতর্কমূলক আলোচনায় ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী এবং আরও অনেক বিদগ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও কলাবিদ পণ্ডিতগণ অংশ গ্রহণ করতেন।

বিদেশে এই চিত্র-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা-সমালোচনা হোত তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করে 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় তাঁর পত্রিকা দুটিতে নানা শিক্ষাপ্রদ মন্তব্য করতেন। কিছুকাল যেতে তিনি 'চ্যাটার্জিস্ অ্যালবাম্' প্রকাশ করে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের কলাকৃতিকে আরও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রতিটি অ্যালবামেই যে উচ্চাঙ্গের ছবি স্থান পেয়েছিল তা নয়। তাহলেও অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের দু'চারখানি শ্রেষ্ঠ রচনা স্থান পেয়েছিল। সাধারণভাবে দেশজ চিত্রকলা সম্পর্কে ঘোর অনীহার যুগে এই জাতীয় প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা বস্তুতঃই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে 'প্রবাসী' প্রকাশনার পঁচিশ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে অনেকেই আনন্দ ও শুভেচ্ছা প্রকাশ করে সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখেন। তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন একজন। তাঁর প্রবর্ত্তিত চিত্রকলার প্রচার ও প্রসারে 'প্রবাসী' পত্রিকার অবদান তিনি তাতে উল্লেখ করেছিলেন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভঙ্গীতে তিনি লিখেছিলেন—

"নতুন বাংলার আর্টিস্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর অ্যালব্যামে ও তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারেবারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে। আর আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন

পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনও। কে ছাপতো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতে ছেলেখেলার ছবি সমস্ত যদি না প্রবাসীতে বার করতেন রামানন্দবাবু?

…সবাইকে প্রবাসী বিনা খরচে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, সুতরাং তাদের সবার হয়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর আমার নিজের দিক থেকে বলছি শোভন কীর্ত্তি তোমার হউক।"

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রাবলী তো নিয়মিতই 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হোত। তাছাড়া একবার অবনীন্দ্রনাথ কার্টুন ধরনের একটি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন 'প্রবাসী'র প্রচ্ছদের জন্য। সেটি দ্বারা 'প্রবাসী' আবৃত হয়েছিল ১৩২০ সনের অগ্রহায়ণ মাসে। ছবিটির বিষয়—কেশলেশহীন একটি প্রবীণ ব্যক্তির কানের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে একটি পালকের কলম। লোকটির মুখাবয়ব কালোরঙের, পালকটি সাদা। মোটামুটি রেখাচিত্র বলা যায়।

'প্রবাসী'র সেই সংখ্যাতেই ছবিটির মূল বক্তব্য ব্যাখ্যাত হয়েছিল এইভাবে—

"প্রচ্ছদপটে শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রবাসীর পরিকল্পনা রহস্য' চিত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। হংসপুচ্ছচ্যুত লেখনী মানুষের হাতে পড়িয়া ক্রমাগত মুখে কালি মাখিতেছিল এবং কালি ছড়াইতেছিল। অকস্মাৎ একদিন আকাশ পথে হংসকে উড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহার মনে পড়িল যে তাহার প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে অমল শুভ্রতা, কালিমা প্রলেপ তাহার কলঙ্ক। তাই সে কালি ছড়ানো ও কালি মাখা ছাড়িয়া শুভ্র সুবিমল হংস শরীর লইয়া স্বীয় বাসস্থানের উদ্দেশ্যে উধাও হইয়া ছুটিয়াছে।"

সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিকী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে। 'দি স্টেট্সম্যান'-এ তার রিভিউতে দেখা যায় যে, এই চিত্র সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে আগ্রহ কৌতূহল বেড়েই চলেছিল।

"The present exhibition serves to remind us both of the continued progress of the society and of the interest in Indian Art which the society has helped to provoke. For recent years have fortunately witnessed an ever increasing interest in the study of the Art of this country, both here and abroad."

১৯১৩ সালে সোসাইটির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের কিছু

আগে, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের গোড়াতে। কারণ সেই বছরে সোসাইটি প্যারিস থেকে সাদর আমন্ত্রণ পেয়েছিল পরের বছর, ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে সেখানে একটি প্রদর্শনী প্রেরণের জন্য। প্যারিসে প্রদর্শনীর উদ্যোগ আয়োজন করেছিল, 'La societe des peintres Orientalistes Francais.'

আরও আমন্ত্রণ এসেছিল এবং ব্যবস্থাও হয়েছিল যে প্যারিসের পরে ছবিগুলি প্রদর্শনীর জন্য যাবে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের রতরদামে। মার্চ্চ মাসে উক্ত দুটি স্থানের প্রদর্শনী অন্তে চিত্রগুচ্ছ লণ্ডনে নিয়ে সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়মে প্রদর্শিত হবে। বাস্তবেও হয়েছিল তাই।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অবনীন্দ্র-শৈলীর সাধকদের রচনাবলীর প্রশংসাস্তুতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়ে ইউরোপের নানা দেশেও যে তার অনুরাগী-প্রেমীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা সুবিদিত। কিন্তু ১৯১৪ সালে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং গোড়াতে প্যারিসে প্রদর্শনীর আয়োজন ব্যবস্থার মূলে ছিলেন দু'জন অবনীন্দ্র-চিত্রানুরাগিণী ফরাসী মহিলা। এঁরা ছিলেন দুই ভগিনী। নাম : সুজান কার্পেলে ও আঁদ্রে কার্পেলে। এঁদের পিতা কার্য্যব্যাপ-দেশে কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। সেই সূত্রে এঁরাও কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে সুপরিচয় লাভের অবকাশ পান। ক্রমশঃ শিল্পীগুরুর সহিত তাঁরা গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে হন আবদ্ধ। সুজান কার্পেলে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁলেভির কাছে। তিনি অবনীন্দ্রনাথের 'ষড়ঙ্গ' বইটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আঁদ্রে ছিলেন চিত্রশিল্পী।

এঁদের উৎসাহ-চেষ্টাতেই প্যারিসে প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা হয় এবং কলকাতার সোসাইটিতে আমন্ত্রণ আসে। প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথও তাঁর অনুগামীদের ছবি প্রেরিত হয়েছিল বিশেষভাবে সুনির্ব্বাচন করে। প্যারিসে প্রদর্শনী প্রেরণের ব্যবস্থা হতে কলকাতার 'দি স্টেট্‌সম্যান' একটি রিপোর্ট ছেপেছিল এই শিরোনামাতে—

"Indian pictures to be exhibited in Paris."

১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোসাইটির কর্ম্ম সমিতির যে মিটিং হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেন লর্ড কারমাইকেল। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল মেনার্ড, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ মোলার, মিঃ ব্রাণ্ট, মিঃ এ. পিয়ার্স, জে. এন. বসু, এস্. এন. ভট্টাচার্য্য এবং ও. সি. গাঙ্গুলী।

সেই মিটিং-এই অবনীন্দ্রনাথ প্যারিসে প্রদর্শনী প্রেরণের জন্য আগত আহ্বান-লিপি পাঠ করেন। ছবি ইনসিওর করা ও পাঠানোর ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় খরচপত্র প্যারিসের কলা-সমিতি বহন করবেন। এই কথা জানিয়েছিলেন উক্ত সংস্থার সেক্রেটারী মঁসিয়ে মঁ্যাস। কলকাতার শিল্পীদের ছবি প্যারিসে প্রেরণের সিদ্ধান্ত মিটিং-এ গৃহীত হয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে।

আরও স্থির হয়েছিল যে স্যার জন উডরফ অক্টোবর মাসের ছুটিতে প্যারিসে যাবেন। তিনি তখন তথাকার কলা-সমিতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাদি করবেন।

সেদিনের মিটিং-এ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রদত্ত অর্থ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি-পুঁথি প্রকাশনার জন্য Special Fund-এ রাখা হয়েছিল। সেদিন স্থির হোল যে, ও. সি. গাঙ্গুলী সংগৃহীত শিল্পশাস্ত্রের পুঁথি সেই অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয়নি। এছাড়া ও. সি. গাঙ্গুলীর প্রস্তাবক্রমে বিলেতের কুইন মেরীর সংগ্রহস্থিত অবনীন্দ্রনাথের ছবি 'অশোক মহিষী'-র রঙীন প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের শিল্পীদের ছবির বহর চলে গেল প্যারিসে। অবনীন্দ্র-শৈলীর চিত্রকলার প্রথম বিদেশযাত্রা, বিদেশের রসিকজনদের কাছে আধুনিক মৌলিক চিত্রের প্রথম ও সুবৃহৎ সমাবেশ। অতএব, সকলের আগ্রহ দৃষ্টি এগিয়ে চললো প্যারিসের দিকে। প্রায় একশত ছবি স্থান পেয়েছিল সেই প্রদর্শনীতে। তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছিল পাঁচ-ছয়খানি, নন্দলাল বসুরও তিন চারটি। আর যে সকল শিল্পীর অঙ্কিত ছবি গিয়েছিল তাঁরা হলেন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন গাঙ্গুলী, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত, শৈলেন দে, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, ও. সি. গাঙ্গুলী, অলীন্দ্র গাঙ্গুলী, ভেঙ্কটাপ্পা, হাকিম খাঁ, শমী উজ্জমা, প্রমোদ চ্যাটার্জি, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং আরও কয়েকজন শিল্পী।

১৯১৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী প্যারিসের সুবৃহৎ হল 'পাভিয়ঁ মার্স'-এতে প্রদর্শনীর শুভ-উদ্বোধন হয়। দ্বার উন্মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ফরাসী দেশের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট মঁসিয়ে পোঁয়াকারে। প্রদর্শনী শুরু হতেই আঁদ্রে কার্পেলে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে সচিত্র একটি কার্ডে অবনীন্দ্রনাথকে সেই সুসংবাদ জানান। তিনি লিখেছিলেন—

The opening of your exhibition yesterday was a real success, dear Mr. Tagore. You would all have been pleased. Mr. Havell seemed very happy.

Andree

Dated, Monday, 9th Feb. 1914.

প্যারিসে প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হোল। আর সারা ইউরোপের শিল্পী ও রসিক সমাজে তার সাড়া পড়ে গিয়েছিল। নানা দেশের কলারসিক ও সমালোচকগণ গিয়ে ভিড় জমালেন প্যারী শহরে। উদ্দেশ্য, ভারতের নতুন কলারীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ ও তার মূল্যায়ন। প্যারিসের সমস্ত দৈনিক পত্রিকা, বিশেষ করে কলা-পত্রিকাসমূহ সেই চিত্র প্রদর্শনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল। প্রদর্শিত চিত্রসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণমূলক একটি ক্যাটালগ্ তৈরী করে পাঠানো হয়েছিল। তা তৈরী করেছিলেন স্যার জন উডরফ ও ও. সি. গাঙ্গুলী যুগ্মভাবে। প্যারিসের কলা-সমালোচকগণ এই চিত্র-পদ্ধতির জন্মস্থান কলকাতায় বলে এর নাম দিয়েছিলেন—"L' Ecole de Calcutta".

প্রদর্শনীর অসামান্য সাফল্য ও গৌরবের সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি। অতঃপর ১৯১৪ সালের ২১শে মার্চ কলকাতার 'দি স্টেট্সম্যান'-এ খবর বেরিয়েছিল এই মর্মে—

Indian Art Exhibition in Paris :

Triumph of Mr. A. N. Tagore.

"The invitation of the Societe des Peintres Orientalistes Francais to the Calcutta School of Fine Arts which was founded and for many years directed by Mr. E. B. Havell to fill a room at their annual exhibition in the grand Palais in Paris, has resulted in an exhibition pronounced by experts to be a great triumph for Indian Art."

প্যারিসের প্রদর্শনী সম্বন্ধে 'Times' পত্রিকার প্রতিনিধির প্রশংসাসূচক মন্তব্যও 'দি স্টেট্সম্যান'-এ মুদ্রিত হয়েছিল। তার উপসংহারে পাওয়া যায়—

"It is observed in conclusion that since so many and so admirable works of the Calcutta School have travelled so

far from their home, it is greatly to be hoped that England will make amends for her previous neglect, and that they may be seen in London before they return to India."

প্রদর্শনীটি লণ্ডনে যাবার পরেও কলকাতার পত্রিকাদিতে তার সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল।

বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ প্যারিসের অনেক পত্রিকায় সেই প্রদর্শনীর রিভিউ প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে মাদাম হলবেকের একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল 'L' Art Decoratif' পত্রিকায়। তার কিছুকাল পরে 'প্রবাসী'-র সম্পাদক সেটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে। শিরোনাম ছিল —'ভারতের কলাশিল্পের পুনরুদ্ধার'। তার কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য—

"আজ ভারত আমাদের কাছে উপস্থিত, বিদেশী পর্য্যটকের কল্পনায় বিকৃত রূপে নহে, তারই নিজের শিল্পীদের রচনার রথে চড়িয়া স্বরূপে। যে ভারত তার বাজার-হাট, নাচওয়ালী ও বাঁশবাজিওয়ালা লইয়া তার জবজঙ্গ উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যে জুল বোয়া ও আঁদ্রে শেভ্রিয়েঁা প্রভৃতিকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এ সে ভারত নয়। ব্যস্ত সমস্ত পর্য্যটকেরা যে ঐশ্বর্য্যের পরিচয় বহিয়া আনে, তাতে থাকে উগ্র আলোকচ্ছটা, খাপছাড়া অসামঞ্জস্যের আন্দোলন ও সস্তা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর রসবিলাস; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যবর্গের সুসঙ্গত সুন্দর ভাবব্যঞ্জক রচনার মধ্যে সেইরকম উগ্রতা বা অসঙ্গতি নাই। সমস্ত জীবন ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত করিয়া এই শিল্পীরা আমাদের সম্মুখে স্পষ্টরূপে আনিয়া ধরিয়াছেন প্রাচীন প্রথা ও প্রবাদের মর্ম্মকোষের চারিদিকে শতদলের ন্যায় বিকশিত সুসঙ্গত সভ্যতার দৃশ্য।

যে জাতিকে আমরা মনে করিতাম চিরকালের মত বন্ধ্যা হইয়া অভিশপ্ত হইয়া আছে, তাদের যে পুনরুত্থান তার নাম দেওয়া হইয়াছে পুনর্জন্ম। ইহা সত্য ও যথার্থ নামই হইয়াছে—যুগযুগান্তের নিষ্ক্রিয় জড়তা ও মরণাপন্ন অবস্থার পরে যে নূতন সৃষ্টির বিকাশ তাহা পুনর্জন্ম নয়ত কি?

* * *

কলিকাতার সেই শিল্পী গোষ্ঠী কোনও নূতন কিছু হঠাৎ সৃষ্টি করে নাই, অথবা পুরাতন ভাঙ্গিয়া ধ্বংস করিয়াও বসে নাই। ভারতের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ নবীনতার দিকে বহাইয়া দিবারও প্রয়াস ইহাদের নয়। বহু যুগের তপঃসঞ্চিত ইতিহাস ইহাদের নিয়ামক এবং অতীত-বর্ত্তমানে কোথাও ভেদ

ঘটে নাই। যে শৃঙ্খল গ্রন্থির পর গ্রন্থি করিয়া কালে-কালে দীর্ঘতর হইয়া আসিতে আসিতে মাঝখানে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, ইহারা তাহাকেই আবার জোড়া দিয়া দিয়াছে মাত্র।

* * *

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না করিয়া মোটামুটি বলিতে গেলে কলিকাতার শিল্পী গোষ্ঠীর সাধারণ ও সমান বিশেষত্ব তাঁদের রঙ করার সমতা। যে সূর্য্যোকরোজ্জ্বল ভারত বাহ্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় তাকে চিত্র করিবার চেষ্টাও তাঁদের মধ্যে কেহই করেন নাই। তাঁরা সেই ভারতের ছবি আমাদের দেখান যাহা ছায়াশীতল, চিন্তাগভীর, ধ্যানস্তব্ধ, যে ভাব তার চরম উন্নত দার্শনিকতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক তাঁদের বাহ্য প্রকৃতির ছবি তাঁদের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার আশ্লেষণ।

* * *

কলিকাতার চিত্রকরদের রচনা এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যের বিশেষত্বময় ও ভাবের আধার। ইহা ইউরোপের সম্মুখে এই প্রথম উপস্থিত হইয়া এই প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছে যে, একটি বিশেষ অনুপ্রেরণার চারিদিকে সঙ্গত চেষ্টার সমষ্টি কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, এই সব শক্তিমান ও অকপট শিল্পী তাঁদের নিজস্ব রুচি ও ঝোঁক দমন করিয়া ভারতের বিশেষ আদর্শ ও শিল্পরীতিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। এর জন্য যদি তাঁরা রঙের প্রাচুর্য্য ও উজ্জ্বলতা এবং আকারের স্বাধীন লীলায়িত গতি নষ্ট করিয়া থাকেন, তবু তাঁরা এর দ্বারা জীবন্ত হইবার ইচ্ছাকে ও উদ্দেশ্যের স্থিরতাকে জোর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* * *

আমাদের বিদেশীদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য ভারতের এই শিল্পজাগরণকে দরদ দিয়া দেখা। দরদ শব্দের মধ্যে যত অর্থের জোর আছে আমরা তাই বুঝাইতে চাহিতেছি—দরদ মানে পরিচয়ের জ্ঞানের সমতা। আমরা বিদেশীরা প্রস্তুত হইয়া এই সব চিত্রের সম্মুখীন হইব এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিব। তাঁদের নকল বা অনুকরণ করিব না।

* * *

হিন্দু আর্ট আমাদের বিদেশীর কাছে মানস ক্রীড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কিছু হওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যরা আমাদের বুদ্ধি-বিদ্যা দিয়া

তাদের বুঝিবার সকল রকম চেষ্টার উপযুক্ত পাত্র এবং তাঁদের মধ্য দিয়াই আমরা ভারতের মহা মূল্যবান সভ্যতার পরিচয়ের নাগাল পাইব।"

প্যারিস, লণ্ডন এবং আরও দুই একটি দেশে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়ে বাংলার নতুন চিত্রশিল্পীর যশোসৌরভ ইউরোপের সর্বত্র ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে কয়েক বছর পরেই আমন্ত্রণ এল জার্মানী থেকে। ঘটনাটি ১৯২৩ সালের। কলকাতার প্রাচ্যকলার ভারতীয় পরিষদের ব্যবস্থাপনায়ই বার্লিন শহরে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের ছবি সেখানে প্রেরিত হয়েছিল। জার্মানীর ক্রাউন প্রিন্সের একটি পুরোনো প্রাসাদে ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়। ওদেশে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল তথাকার ন্যাশনাল গ্যালারী। প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে একটি আলোচনা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার সোসাইটির মুখপত্র 'রূপম্'-এ ১৯২৩ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সংখ্যায়। লেখক জার্মান কলাবিদ ডঃ ম্যাক্স্ ওসবর্ণ। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

"To the European it is exceedingly instructive and enjoyable to pursue how the conscious endeavours of the Indian Artists for a revival of their national art-forms have to struggle against many an-outside influence. ···We felt how everything in these works is directed towards the aim of interpreting the peculiar mind and the essential characteristics of the Indian people and to bring them nearer and nearer to the consciousness of the people."

ক্রমান্বয়ে আরও আহ্বান এসেছিল ইংলেণ্ড ও আমেরিকা থেকে। ১৯২৪ সালে লণ্ডনের উপকণ্ঠে ওয়েম্বলীতে একটি 'বৃটিশ এম্পায়ার' একজিবিশন হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ভারতের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দুই রীতির শিল্পীদেরই আহ্বান করেছিলেন ছবি পাঠানোর জন্য। তদুদ্দেশ্যে ভারতে একটি কমিটি গঠন করে ছবি নির্ব্বাচন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে নব্য-রীতির ছবি গিয়েছিল অধিক সংখ্যক। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গ। পাশ্চাত্য-পন্থী বাঙালী শিল্পী যাঁরা ছবি দিয়েছিলেন—তাঁরা হলেন ভবানীচরণ লাহা, যামিনী রায় ও হেমেন মজুমদার। পাশ্চাত্য-রীতির চিত্র বেশী সংখ্যক পাঠিয়েছিলেন বোম্বাই শহরের শিল্পীরা। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতকলার কিছু নিদর্শনও স্থান

পেয়েছিল। দু'জন ভারতকলাবিদ ইংরেজ সমালোচক ভারতীয় চিত্রকলার সম্বন্ধে আলোচনা ও রিভিউ লিখেছিলেন, 'রূপম্' পত্রিকায় (১৯২৫, জানুয়ারী)। তাঁদের একজন ই. বি. হ্যাভেল। তিনি তখন লণ্ডনে বাস করছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পীদের রচনা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের একটি অংশ—

"· A few of the exhibits of the Bengali Artists stand out from the rest and dominate the whole Gallery as the work of artists who have something to tell which is worth telling, who are sure of themselves and of their art."

ইংলণ্ড-প্রবাসী একজন ভারতীয় সমালোচকও 'রূপম্'-এ তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন একটি নিবন্ধ মাধ্যমে। নাম তাঁর বাসুদেব বি. মেটা।

"The Bengal School of Painters was well represented in the Palace of Arts at the Wembley Exhibition. Most of the prominent artists of the School, such as Mr. Abanindra Nath Tagore, Mr. Nandalal Bose, Mr. K. N. Majumder and Mr. A. K. Haldar had sent their works. This school of painters is in some respects unique among the other schools of painting in India today ··. These Indian artists like the pre-Raphaelite artists have not to waste their time in finding 'original' subjects for their pictures. What they have to do is to give their sincere, individual interpretation of characters and scenes already well known to all their countrymen. Art thus makes an appeal to all classes of people in the country—not to a select few as in the modern West."

আমেরিকায় বাংলার নব্যকলার প্রদর্শনীটি ছিল ভ্রাম্যমাণ। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য সকলের ছবি মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পঁয়ষট্টি। ১৯২৭ সালের মে মাসে প্রদর্শনী আমেরিকায় পৌঁছে কানাডায় টোরোণ্টো শহরসুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের বাহান্নটি শহর পরিভ্রমণ করেছিল।

পাশ্চাত্য ভূমিতে অবনীন্দ্র-চিত্রকলার বিজয়-অভিযান শুরু হবার কিছু পূর্বেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর ব্যবস্থাপনায় যাভাতে দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল ১৯১৩ সালে। তার উদ্যোক্তা ছিলেন

মার্টিন টনেট নাম্নী একজন বিদুষী ডাচ্ মহিলা। 'Nedarlandch Indiasch Kunstring Ti Batavia'-র মাধ্যমে তিনি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

আমেরিকার প্রদর্শনী অন্তে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে রেঙ্গুনে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী প্রেরিত হয়েছিল। কলম্বোতেও অবনীন্দ্র-চিত্ররীতির মহিমা প্রচারিত হয়েছিল প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

১৯১৪ সালে ফ্রান্সে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং তৎপূর্ব্বে প্রতি বছর কলকাতায় ও একবার এলাহাবাদে বাংলার শিল্পীদের চিত্রকলা প্রদর্শিত হলে এ বিষয়ে সর্ব্বত্র আগ্রহ-অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে ভারতভূমিতে এই চিত্রের আর একজন গুণগ্রাহী সহৃদয় বিদেশী বন্ধুর আগমন হয়। তিনি মিঃ জেমস্ হেনরী কাজিন্স্। তিনি ছিলেন আয়র্ল্যাণ্ডের অধিবাসী। ইংরেজী সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। মূলতঃ তিনি ছিলেন একজন কবি, অধ্যাপক ও সাংবাদিক।

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সক্রিয় সদস্যরূপে তিনি স্থায়ীভাবে মাদ্রাজে বসবাস করেন। অ্যানি বেশান্তের সহকর্ম্মীরূপে তিনি কিছুকাল মাদ্রাজের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন। এদেশে আগমনের পরেই তাঁর ভারতীয় শিল্পের সামগ্রিক রূপ প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। কিছুকালের মধ্যেই তিনি ভারতশিল্পের বিভিন্ন ধারা অনুশীলন করে এই বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন।

১৯১৬ সালে তিনি 'আর্ট অব্ দি ইস্ট্' নামক একটি নিবন্ধে কলকাতার প্রাচ্য কলা-পরিষদের আদর্শ ও কর্ম্মধারা আলোচনা করেন বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে। অতঃপর ভারতকলা সম্বন্ধে তাঁর লিখিত আরও প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি পড়ে স্যার জন উডরফ তাঁকে কলকাতায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন সোসাইটির অষ্টম বার্ষিকী প্রদর্শনীর (১৯১৫) রিভিউ করার জন্য। সেই আলোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার 'দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় (জানুঃ ১৯, ১৯১৬)। তাতে তিনি লিখেছিলেন—

"It appears to us however, that the painters of the modern Indian School, on certain sides of their work, have succeeded in fulfilling the ideals of both realism and

impressionism by a clear recognition of the necessary interplay of the visual faculty and interpretive faculty."

সেই রিভিউ-তে তিনি অবনীন্দ্রনাথের পুরী থেকে কোনারক যাত্রায় তুলিতে-কালিতে অঙ্কিত বারোখানি চিত্রের প্রভূত প্রশংসা করেন। শিল্পী-গুরুর আরও অনেক চিত্র, বিশেষতঃ পশু-প্রাণীর ছবিগুলিকেও তিনি উচ্চ প্রশংসার যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন।

কলকাতার প্রদর্শনীর রিভিউ লিখে তিনি মাদ্রাজে ফিরে গিয়েই সেখানে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন যাতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রদের ছবিও প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছিল ১৯১৭ সালের ১৭শে ফেব্রুয়ারী। কলকাতার অষ্টম বার্ষিকী প্রদর্শনীর সমুদয় ছবি এবং তৎসহ বিগত বছরের চল্লিশখানি নিদর্শন সংগ্রহ করে মাদ্রাজে পাঠানো হয়। মাদ্রাজের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় সেদিনের সংবাদ শিরোনামায় দেখা গেল:

"Exhibition in Madras: Tegore School Pictures at Y. M. C. A."

প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের ভার পড়েছিল মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেটল্যাণ্ডের উপরে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—অ্যানি বেশান্ত, স্যার রামস্বামী আয়ার এবং স্থানীয় সমস্ত উচ্চ পর্য্যায়ের সম্ভ্রান্ত দেশী ও বিদেশী সুধী সজ্জনবৃন্দ ও থিয়সফিস্টরা সকলে। প্রদর্শনীর দ্বার দুই সপ্তাহ উন্মুক্ত থেকে মাদ্রাজ অঞ্চলের সমগ্র শিল্প-সমালোচক ও রসিক সমাজের মধ্যে অদ্ভুত এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তদুপলক্ষে কলাশিল্প বিষয়ে কিছু আলোচনা-বক্তৃতারও ব্যবস্থা হয়েছিল। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় হোল অ্যানি বেশান্তের বক্তৃতা। বিষয় ছিল: "Speciality of Indian Art."

'New India' পত্রিকা প্রদর্শনীর সংবাদ পরিবেশন করে মুখপত্রেই লিখেছিল—

"This afternoon something like an epoch in the history of the real India—the India of spiritual vision and beautiful expression—was marked by the opening in Madras to-day of the first Southern Exhibition of the new and now world famous paintings of the Bengal School of Artists."

স্থানের সমালোচকরা ভারতের এই নব্য-চিত্রকলাকে আখ্যাত করেছিলেন 'ক্যালকাটা স্কুল' নামে। আর মাদ্রাজ থেকে নাম দেওয়া হোল 'বেঙ্গল স্কুল'।

'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এই ছবি সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল তা সমগ্রভাবেই প্রশংসাসূচক। সামান্য একটি নমুনা অন্ততঃ উদ্ধৃতির যোগ্য—

"These painters do not set things down, 'as they are seen'. They regard themselves as artists, creators not copyists.··· Their work may, therefore appear to eyes accustomed to accuracy to be not quite true to nature, but it will be found that it is artistically true to idea and em ɔtion, and that is the 'nature' that art has to deal with."

মিসেস বেশান্ত তার বক্তৃতায় অবনীন্দ্র-চিত্র সম্বন্ধে এক জায়গায় যা বলেছিলেন, তা প্রকাশিত হয়েছিল 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯ ৬)।

"I notice in these Indian paintings that the artist is continually expressing more than the outer surface indicates, and he sees by intuition sometimes what a clairvoyant sees. That ruɿs through Indian history and drama as much through painting···. As I study a picture, larger life comes out of it than the life which at first reveals through forms."

২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৬) 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে বাংলার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে একটি বিশেষ কৌতুহলকর শিরোনাম যুক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

"Why I bought certain pictures." এই শিরোনামাতে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন T. L. Crombie নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রমহোদয়। তিনি ছিলেন থিয়সফিস্ট। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশজাত চিত্ররীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত impression ও reaction বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে—

"I went to the Indian Art Exhibition last Saturday, for the first time saw the pictures born of this new Art Movement and was conquered. I had hopes to secure a picture I liked in order to send it home to my people, to show them a specimen of Indian paintings, and so I came prepared to buy one or at most two. But I secured six, and were it not for lack of rupees, would like to have a great many more."

এই কথার পরে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিল্পীদের ছবির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে প্রশংসাপ্লুত করেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রথম পর্য্যায়ের শিষ্যদের অনেক বাধা বিঘ্ন ও বিরূপ সমালোচনার বেড়া ডিঙিয়ে এগোতে হয়েছিল। সমকালীন পাশ্চাত্যপন্থী ভারতীয় শিল্পীদের মুখে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং 'এ ছবি ছবি পদবাচ্য নয়'—একথাও শোনা যেত অনবরত। সেই বিরোধীভাবের পাশে পাশে আবার গুণমুগ্ধদের অনুরাগ-প্রীতির স্পর্শেও এই চিত্রকলা সঞ্জীবিত হয়েছে বারবার। প্রকৃত সমঝদার ও পেট্রনের অভাব হয়নি কখনও। বরং এইভাবে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল।

এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়—

"কত সুখ দুঃখের মান অপমানের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আর্টিস্টের মন তৈরী হয়। আমরা সব সৃষ্টি ছাড়া; প্রকৃতি মায়ের আদুরে, কোলের কাছাকাছি ছেলে, একটা বুনো ভাব আছে।"

তিনি ছিলেন শিল্পী ও স্রষ্টা। সৃষ্টি করেই তাঁর আনন্দ। তবে তিনি মনে করতেন যে স্রষ্টার রসসৃষ্টির সঙ্গে রসিকের রস-গ্রহণের ব্যাপারটা মিলিত হলে তবে সেই সৃষ্টির সার্থকতা। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন—

"শিল্পী কর্ম্মীর দেখা এবং শিল্প-রসিকের দেখা—এই দুই দেখার ফলে পায় শিল্পরচনা পরিপূর্ণতা।" (রূপ : বা. শি. প্র.)

১৯১৬ সালে মাদ্রাজে প্রদর্শনীকালে অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর চিত্রসাধনা সম্বন্ধে নতুনতর এক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্রষ্টা ও রসিকের মিলন তিনি কামনা করতেন। কিন্তু তা যে সর্ব্বদা প্রীতিকর হয় না তাও আর অজানা রইল না। ইতিপূর্ব্বে এই চিত্রশৈলীকে নানা দিক থেকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছিল। যেমন: Calcutta school of Painting, Bengal school of Painting, Modern Indian Painting ইত্যাদি। কিন্তু অনেকে আবার একে 'school' বা 'শৈলী' বলতে ছিলেন সম্পূর্ণ নারাজ। তাঁদের সেই বিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল মাদ্রাজ একজিবিশনের সময়। রবিবর্ম্মার প্রকৃতিবাদী আঁকানো সৃষ্টিসমূহের প্রধান কেন্দ্র মাদ্রাজ অঞ্চলে বাংলার সেই বাস্তবতাবর্জিত অপার্থিব প্রকৃতির নবীন চিত্ররীতির প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক লোকের মনে বিরাগ ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার করেছিল। সেই বিমুখীভাবের প্রথম প্রতিফলন হয়েছিল

মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ হ্যাভাওয়ে-র রিভিউ-তে। তিনি এই চিত্র-পদ্ধতিকে একটি 'school' বলতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য ছিল এই—

"The best work in painting and drawing which India has produced in modern times is undoubtedly the work of this group of Bengali artists, but to dignify the movement as the work of a school of painting is most inaccurate. 'School' as applied to movements in painting, has a very definite and well-understood meaning."

সমগ্র রিভিউ-টিই ছিল সহানুভূতিহীন ও সমঝদারিত্বের অভাবযুক্ত। আর তিনি এই চিত্রের মৌল আদর্শ উপলব্ধি ও শুদ্ধ রস গ্রহণেও সক্ষম হননি মনে হয়। ওটি প্রকাশের একমাস পরে কলকাতা থেকে মিঃ ও, সি. গাঙ্গুলী একটি দীর্ঘাকার প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করেন 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতেই (২১শে মার্চ্চ, ১৯১৬)।

মিঃ হ্যাভাওয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, অবনীন্দ্র-রীতির সাধকদের ছবির বিষয়বস্তু ভারতীয়; আর এই একটি বিষয়েই তাঁরা সমভাবাপন্ন। বাকী অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা নানা ভিন্ন ভাব অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছেন। সুতরাং এঁদের দ্বারা কোন আন্দোলন-ধারা পুষ্ট হতে পারে না বা কোনও ঘরানাও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। মিঃ গাঙ্গুলী বলেছিলেন যে, বিভিন্ন শিল্পীর কাজে বাহ্যতঃ ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকট হলেও, মৌল ভাবাদর্শে তাঁরা এক ও অভিন্ন হলেই একটি 'স্কুল' বা আন্দোলনের স্রষ্টা হতে পারেন। তিনি লিখেছিলেন—

"Many of the members of the pre-Raphaelite school displayed qualities most divergent and reconcilable, and yet they were agreed upon certain fundamental principles upon which the Brotherhood was founded. Rossetti's archaic romanticism, Hunt's didactic religiosity and Millais' narrative and dramatic modernity were greatly imcompatible with each other, and made them very incongruous in their distinct qualities when labelled under one group. Again Henri Matisse is as much apart from Cezanne, as Cezanne from Pissaro—yet they are all classed under one school."

মিঃ গাঙ্গুলীর চিঠি প্রকাশিত হতে মিঃ হ্যাভেল তার জবাব দিলেন ২৪শে মার্চ। তাতে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন। তাঁর চিঠির একটি অংশে এই কথা ছিল—

"When I read Mr. Gangoly's letter in New India of the 21st. instant, I agreed with him that I had perhaps obscured the real significance of the Indian Pictures Exhibition by questioning the artist's right to be classified as a 'School'.

The significance of the work seemed so very clear to me, that I fear I jumped to the conclusion that it would appear the same to others."

অবনীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু তাঁর চিত্ররীতিকে 'School' বা শৈলী আখ্যা দানে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি তা কখনও চিন্তা করেন নি। ছাত্র-শিষ্যদের মাধ্যমে একে একটি আন্দোলনে পরিণত করেন এমন পরিকল্পনা তাঁর আদৌ ছিল না। 'School' কথাটি নিয়ে মিঃ হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁরও পত্র বিনিময় হয়েছিল। একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন—

"School is a thing which I hate, so far the very begining I have tried my best not to mar the individualism of my pupils by forming them into a school……I wanted from my pupils the best that they would give me and could give and nothing more. They are not to follow any art, Eastern or Western, but they are to give us their own art after carefully studying all the arts of the world—that is the teaching I give them."

মিঃ হ্যাভেলের সুরে সুর মিলিয়ে আরও একজন বিদেশী কলাবিদ অবনীন্দ্র-চিত্রধারাকে 'School' আখ্যাদানের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি জোহান ভান্ মানেন। মধ্যযুগীয় প্রাচ্যশিল্প সম্বন্ধে তাঁর কিছু উৎসাহ, অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা ছিল বটে, কিন্তু তিনি অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চিত্র-পদ্ধতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ প্রদর্শনীর একটি সমালোচনা লিখেছিলেন তখনকার 'Commonweal' নামক পত্রিকায় (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬)। উক্ত প্রবন্ধে তিনি এই চিত্রের প্রতি তাঁর [illegible]

পরিচয় দান করেন নি। পরন্তু মিঃ হ্যাভেল ও ডঃ কুমারস্বামীর প্রশংসাকে সমর্থন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

ভান্ মানেনের প্রতিধ্বনি করে আরও একজন বিদেশী সমালোচক এগিয়ে এসেছিলেন বাংলার চিত্র প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করার জন্য। তিনি হলেন W. D. S. Brown. ইনিও লিখেছিলেন 'Commonweal' পত্রিকায় (৩রা মার্চ, ১৯১৬)। ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি কিন্তু ওখানেই হয়নি।

উপর্যুক্ত তিনটি বিরোধী মতবাদের প্রতিবাদ করতে লেখনী ধারণ করেছিলেন ডঃ কাজিনস্। তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া'-তে একটি জোরালো পত্র মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদমূলক বক্তব্য পেশ করেন শিল্পী ও রসিক সমাজের সম্মুখে (মার্চ, ১৯১৬)।

এই চিত্রশৈলীর বিরোধীদলভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আর একজন ছিলেন বোম্বাই আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ সলোমন। তিনি অনবরত এই চিত্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার ফলে বোম্বাই ও কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে একটা উগ্র প্রতিযোগিতা ও দ্বেষ-বিদ্বেষের সঞ্চার হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্র-অনুগামীদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে আর একটি বিরূপ সমালোচনা হোত। তা হোল, চলমান জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁদের কোন আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল না। ধর্মীয় এবং পৌরাণিক আখ্যান কাহিনীর দিকেই তাঁদের ঝোঁক বেশী। বিশ্ব-প্রকৃতিকে তাঁরা উপেক্ষা করেই চলতেন। এই ধারণায় বাংলার শিল্পীদের রচনাবলী তখন 'অবাস্তব, অদ্ভুত ও উদ্ভট' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হোত। প্রকৃতির লীলাখেলা তাঁদের চিত্রপটে স্থান পায়না বলে যে অভিযোগ ছিল, তার উত্তর দিয়েছিলেন ডঃ জেমস্ কাজিন্স্। ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় সোসাইটির প্রদর্শনী অন্তে তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় "The Bengal Painters" শিরোনামাতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। তার একটি অনুচ্ছেদে দেখা যায়—

"A few years ago the Bengal artists were charged with giving too much attention to the India of mythology and religion, and little or none to the natural India under their eyes. They replied in a crowd of nature pictures that, as I wrote in New India, when they were exhibited, appeared to be rather veils through which the soul of the scene was observed than superficial transcript of nature."

১৯১৮ সালের প্রদর্শনীর রিভিউ-তে এই চিত্রকলা সম্পর্কিত অনেক সমস্যাই আলোচিত হয়েছিল। তা হোল, ভারতে বৃটিশ শাসন দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার পরে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী আর্ট স্কুল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মাধ্যমে ভারতের কলা-শিক্ষার্থীদের একমাত্র পাশ্চাত্য প্রথায়ই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। দেশীয় শিল্প ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অর্জনের কোন ব্যবস্থা ও আয়োজন আদৌ ছিল না।

উক্ত প্রদর্শনীর আর একটি সুবিস্তৃত রিভিউ প্রকাশিত হয় 'The Empire' নামক পত্রিকায় (৩রা জানুয়ারী, ১৯১৯)। লেখক: ও. সি. গাঙ্গুলী। 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট' সম্বন্ধে অনেক বিদেশী শিল্প রসিক ও পৃষ্ঠপোষকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত যে সহৃদয় ছিল তা সেখানে আলোচিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন—

"The impetus that the members of the Society, mostly Europeans have furnished to this new movement in Indian art by nursing and educating its best tendencies, affords a complete answer to the charges often brought forward that Englishmen in India do not take sufficient interest in the arts and crafts of the country. Indeed, movements such as these offer a very interesting demonstration of the useful works in which Indians and Europeans can operate in a common meeting ground where many seeds of co-operation and sympathy can be sown the growth of which cannot but be fruitful in bringing about a better understanding which the events in recent years have so unhappily prevented."

সেবারের (১৯১৮) প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে সকলের কৌতুহল ও আগ্রহ অধিকতর হওয়ার মূলে আরও কারণ ছিল। ভারতের ভাইসরয়ের পত্নী লেডি চেমস্‌ফোর্ড প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন। দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে। লেডি চেমস্‌ফোর্ড দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত 'পলাশ ফুল' ছবিটি ক্রয় করেন। গভর্ণর কিনেছিলেন দু'খানি ছবি—বিপিন দে-কৃত 'Exiled' আর ও. সি. গাঙ্গুলী রচিত 'Origin of the Image of Buddha'.

এই চিত্ররীতির রেখাঙ্কন ব্যাপারেও গোড়ার দিকে নানা আপত্তি উঠেছিল। কোন কোনও ইংরেজ সমালোচক বলেছিলেন যে মিঃ টেগোর তাঁর অনেক ছাত্রদের মতই রেখা রচনায় দুর্ব্বলতার ছাপ রেখে চলেছেন। আর চিত্রায়িত বিষয়ের outline অস্পষ্ট হওয়াতে চিত্র-চিন্তা অনিশ্চয়তার ভাব প্রকাশ করছে। ফলে জিনিসগুলির রূপ দুর্ব্বল।

. এই অভিযোগেরও উত্তর দিয়েছিলেন খ্যাতনামা কলাবেত্তা ও, সি. গাঙ্গুলী 'Journal of Indian Art and Industry-তে (London) একটি প্রবন্ধ লিখে (জানুঃ ১৯১৬)।

অবাস্তব ও অদ্ভুত রূপায়ণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্য দেশেও পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনায় এবং অলৌকিক রূপ সৃষ্টিতে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত নয়। স্যার এডওয়ার্ড বার্ন জোন্‌স্-এর চিত্রেও স্বাভাবিকতার ঊর্দ্ধে গিয়ে বা ব্যতিক্রম করে রূপসৃষ্টির ধারা প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর অনেক ছবিতে মানুষের আকৃতি অতি দীর্ঘাকার ও অস্বাভাবিক ধরনের।

অবনীন্দ্র-রীতির রেখাঙ্কন সম্বন্ধেও তিনি তাঁর মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, প্রারম্ভে হয়ত তেমন রেখার বলিষ্ঠতা পুরোপুরি আসেনি, যে রকমটি অজন্তা চিত্রের সাবলীল ছন্দায়িত রেখায় এবং পাহাড়ী চিত্রের সুদৃঢ় অথচ হিল্লোল-মধুর রেখার মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু কিছুকাল যেতেই শিল্পাচার্য্য ও তদীয় শিষ্য নন্দলাল বসু এবং আরও অনেকে রেখা কল্পনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেবল সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য্যে নয়, যেখানে যেমন প্রয়োজন, বলিষ্ঠতায় ও ছন্দমাধুর্য্যে—সব দিকে তা চরম উন্নতির পরিচায়ক হয়েছিল।

গোড়ার দিকে যে আঙ্গিক-পদ্ধতিতে দ্রুত পূর্ণ সাফল্য আসেনি, সে কথা মিঃ হ্যাভেলও বলেছেন। ১৯০৮ সালে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Indian Sculpture and Painting'-এ তিনি লিখেছেন—

"Mr. Tagore has probably not yet arrived at full development of all his powers, either in technique or in artistic expression, but his influence on the future of Indian painting is likely to be far reaching."

কিন্তু ১৯১৬-১৮ সালে এবিষয়ে অভিযোগ ও বিরূপ সমালোচনায় কোন কারণ ছিল না। তখন শিল্পাচার্য্য নিজস্ব পথ ও পন্থা নির্ণয় করে বহুবিধ রকমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন অনবরত। প্রতিদিন, প্রতিটি রচনায়

মধ্যে তার ছাপ রেখে এগিয়ে চলেছিলেন। ১৯০৮ সালে তাঁর প্রথম ছাত্রগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থা। তখন সেই চিত্রকলার ভবিষ্যৎ ছিল সম্পূর্ণ অজানা ও অনিশ্চিত।

তবে ১৯১৫ সাল মধ্যে তা সুনির্দিষ্ট পথ কেটে দ্রুত এগিয়ে চলার শক্তি অর্জন করেছিল সন্দেহাতীতভাবে। তাঁর বাস্তব প্রমাণ হোল ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে ইহার সাফল্যমণ্ডিত প্রদর্শনী ও তার সপ্রশংস আলোচনা সমালোচনা।

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্প আন্দোলনের ভাগ্যে মহামনীষী ও সাধক-প্রবর শ্রীঅরবিন্দের লেখনী মুখেও অভিনন্দিত হওয়ার সুযোগ এসেছিল। তিনি পণ্ডিচেরীতে থেকে সর্ব্বদা বাংলার এই চিত্রকলার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতেন সাগ্রহে। ১৯২০ সালে তিনি তাঁর 'The Renaissance in India'-তে লিখেছিলেন—

"The art of Bengal painters is very significant . . Now the whole power of the Bengal artists springs from their deliberate choice of the spirit and hidden meaning as in the object to be expressed.…

This art is a true new creation, and we may expect that the artistic mind of the rest of India will follow through the gate thus opened."

নানা দিকে এই ধরনের মত ও মন্তব্যের পালা যেমন চলছিল তেমনি 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট'-এর গতিও ছিল অপ্রতিহত। ১৯২২ সালে সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রতিটি বাৎসরিক প্রদর্শনীতেই সোসাইটির ছাত্র ও শিল্পীদের সারা বছরের সৃষ্টিরাজি উপস্থিত করা হোত। ছাত্র-অনুগামীদের কাজের পাশে পাশে গুরুর সৃষ্টিও থাকতো দীপ্যমান। ১৯১২ সালের প্রদর্শনীর বিশিষ্টতা ছিল এই যে, তাঁর অন্যান্য ছবির সঙ্গে দু'খানি এমন নিদর্শন ছিল যার মধ্যে আকারগত ও আদর্শের দিকে ছিল দুস্তর ব্যবধান। তার ফলে দর্শকদের মধ্যে প্রকৃত কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছিল। একটি ছবি আকারে ছোট। বিষয়: জটাজুটধারিণী, সর্পালঙ্কার ভূষিতা তপস্বিনী উমা। ভাবগাম্ভীর্য্য ও অভিনব কল্পনায় তা তুলনাহীন। আর দ্বিতীয়টি সুবিশাল পটে দণ্ডায়মান আলমগীর বাদশার পূর্ণাবয়ব চিত্র।

দু'খানি চিত্রই সমালোচক ও রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশংসার্হ হয়েছিল।

উক্ত প্রদর্শনীর কিছুকাল পরে ফরাসী শিল্পী ও অবনীন্দ্র-চিত্রানুরাগিণী আন্দ্রে কার্পেলের একটি প্রবন্ধ—'The Calcutta School of Painting' প্রকাশিত হয় 'রূপম্' পত্রিকায় (১৯২৩ জানু-জুন)। তার মধ্যে বাংলার শিল্প-আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে লেখিকার মন্তব্য অতি অকপট ও সহৃদয়তাপূর্ণ। প্রবন্ধটির এক অংশে তাঁর মন্তব্য হোল—

"If the artists of Bengal are privileged persons and we have a right to expect from them great things in a sense both abstract and concrete—it is not merely because the material conditions are very favourable but it is above all on account of the master who has entirely consecrated to them his life and energies not only by his paintings but also by his lectures and literary contributions and is himself a constant example before them."

দিন চললো এগিয়ে। শিল্পাচার্য্যের চিত্র-সাধনার ধারা আরও কত নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে, কত বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ-পটুত্বের চিহ্ন রেখে রেখে পৌঁছে গেল এই শতকের তৃতীয় দশকে। তখনও সোসাইটি কর্ম্মমুখর। ছাত্রদের শিক্ষাদানের আসর সরগরম। অবনীন্দ্র-প্রতিভা ভানু তখন মধ্যাহ্ন গগনে দীপ্যমান। প্রতি বছর যথারীতি প্রদর্শনীর ব্যবস্থায়ও বিরতি নেই। এমনি একটি সময়ে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ১০ই তারিখে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে সেখানে ভারতকলার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সেই প্রদর্শনীতে বাংলার শিল্পীদের ছবিও স্থান পেয়েছিল। লর্ড রোনাল্ডসে তখনও কলকাতার শিল্পীদের কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর স্বদেশে প্রদর্শিত অবনীন্দ্র-চিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার সেই অপূর্ব্ব সুযোগ হারাতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পরদিনই তিনি স্থানীয় 'Times' পত্রিকায় তাঁর মন্তব্য পেশ করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—

"It was the same spirit of revolt against the Westernisation of India which had played so large a part in the National Movement that inspired the little circle of men

who brought into being the new school of painting in Bengal."

ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রদর্শনী সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল দৈনিক 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান', 'সান্‌ডে টাইম্‌স্', 'বার্লিংটন ম্যাগাজিন' ও 'মর্নিং পোষ্ট' পত্রিকায়।

লণ্ডনের রয়াল একাডেমির প্রেসিডেন্ট স্যার উইলিয়ম লিউয়েলিনও লেখনী ধারণ করেছিলেন প্রদর্শনীতে উপস্থিত বাংলার নব্য-চিত্র সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মত প্রকাশের জন্য। উপসংহারে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন—

"We were glad to see the work that indicated that India had developed on its own lines and not on Western-lines."

'বার্লিংটন ম্যাগাজিন-এর সম্পাদক মিঃ ট্যাট্‌লক 'Daily Telegraph'-এ লিখেছিলেন—

"This exhibition gives the impression very distinctly that, so far as art is concerned, India is much more closely knit than Europe.

The best pictures are undoubtedly the most Indian."

প্রদর্শনীতে বাংলার চিত্রকলা দেখে 'Sunday Times'- এ Mr. Frank Rutter লিখেছিলেন—

"The great lesson taught by the current exhibition at the New Burlington Galleries is that Indian Artists are far more fruitfully inspired when following the noble traditions of their own country, than when they seek to imitate the superficial realism of Western academic art. ..

While much from elsewhere also who commands our admiration, it is most instructive to compare the work of the two principal schools, that of Calcutta and of Bombay. For of these two the latter has been far more influenced by European art; and its products have far less charm and distinction than those of the former."

ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কলকাতার চিত্র-সাধকদের সঙ্গে তৎকালীন বোম্বাই আর্ট স্কুলের শিল্পীদের একটা তীব্র প্রতিযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আর তাতে ইন্ধন যোগাতেন শেষোক্ত স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ সলোমন। তিনি নানাভাবে বোম্বাইয়ের বাস্তববাদী চিত্ররীতিকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেও, দেশে-বিদেশে অবনীন্দ্র-শৈলীর প্রখর দ্যুতির বিকিরণকে এবং সাদর সম্বর্দ্ধনাকে প্রতিরোধ করতে পারেন নি।

সেই সূত্রে আরও একটি আকর্ষণীয় ঘটনা বিবৃতির যোগ্য।

স্যার মারে হ্যামিক নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রমহোদয় এক সময় ভারতে কর্ম্মরত ছিলেন। তিনি আলোচ্য প্রদর্শনীটি (লণ্ডনে) দেখে লণ্ডন থেকে ব্যক্তিগতভাবে অবনীন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লেখেন। তাতে দেখা যায়—

"We thoroughly enjoyed our visit to the opening and seeing your work and the pictures from your students. It is a beautiful exhibition and much appreciated by many visitors. For myself, I think you in Bengal are working on better lines than Bombay—though I dare to say for those who have not been to India the Bombay pictures have the greater appeal."

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে দেশের সর্ব্বত্র ও বিদেশের নানা অংশে বাংলার শিল্পীদের চিত্রাবলীর যেমন প্রদর্শনী হোত, তেমনি আর একটি প্রচেষ্টা ছিল যাতে বিদেশের শিল্পীদের সৃষ্ট-সম্ভার এনে কলকাতায় প্রদর্শনী করা যায়। এই ধরনের প্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় হোল বার্লিন থেকে ক্যান্‌ডিন্‌স্কি ও জার্ম্মান কিউবিষ্টদের চিত্রসমূহ এনে সোসাইটিতে প্রদর্শন। ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৯২০ সালের। এর পরে আরও একটি প্রদর্শনী বিশেষ কৌতূহলের বিষয় হয়েছিল।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চে কলকাতার সোসাইটির সাদর আমন্ত্রণে চীন দেশের একজন শিল্পী তাঁর একক প্রদর্শনী এখানে নিয়ে আসেন। ছবিগুলি ছিল 'কাকেমোনো' ধরনের। শিল্পীর নাম মিঃ জান্ স্থ কাউ। তিনি ছিলেন ক্যাণ্টনের ফাইন আর্টস সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট। প্রদর্শনীর একটি বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ্চ মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'-তে। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটনের সময় সেই চৈনিক শিল্পী তাঁর ভাষণে বলেন—

"India and China being neighbours we should establish

some means by which we may cultivate a relationship for our mental benefit, and with this purpose in view, I suggest that such work may be initiated with the assistance of the Indian Society of Oriental Art."

অনুষ্ঠান অন্তে অবনীন্দ্রনাথ নিজের হাতের দু'খানি ছবি চীন দেশীয় সেই শিল্পীকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন একটি প্রাচীন চৈনিক চিত্রপট। অবনীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ছবির মধ্যে একটি ময়ূরের স্টাডি ছিল। তৎসঙ্গে তিনি বাংলাতে একটি কবিতা রচনা করে দিয়েছিলেন। শিল্পাচার্য্য রচিত কবিতা। তদুপরি আজকের ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর সম্বন্ধে; অতএব এর আকর্ষণ অমলিন।

কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ রূপ—

কি দিন কি রাত্রি আকাশ আর এই পৃথিবী
আলো অন্ধকারের স্বপ্ন দেখে
স্বপ্ন-সূত্রে এরা দুয়ে বাঁধা পড়ল
আমার মনের বাসর ঘরে।
বনের ময়ূর হ'ল মেঘের প্রিয়
ইন্দ্রধনুর সকল রঙ তার পাখায়-পাখায়
ব্যাধ তাকে ধরলে, শিকারী তাকে মারলে,
কেউ তাকে বাঁধলে, আর কেউ বা
তাকে পুষে রাখলে উপবনে।
আমার মন চাইলে তাকে ছেড়ে দিতে
গহনবনের কিনারাতে।

স্বহস্ত অঙ্কিত ছবি বা নক্সা চিত্রের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের লিখিত কিছু উক্তি ও একটি ক্ষুদ্র কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বারাণসীস্থিত ভারত-কলাভবনের সংগ্রহে।

কাগজের ছোট একটি পট। শিল্পাচার্য্য প্রথমে লিখেছেন—"ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।"

তারপরে একটি বর্ত্তুলাকার নক্সা এঁকেছেন। তার মধ্যে লিখেছেন—"Work No Work': নাম সহি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতঃপর স্বরচিত কবিতা লিখে দিয়েছেন স্বহস্তে—

তুমি বসিয়া কি লেখ
ছবির মাথামুণ্ড কিছু
বোঝা যায়না কেন ?
আমায় যেমন লেখাও
তেমনি লিখি, আমায়
দোষ দিলে চলিবে কেন।

এবম্বিধ ও বহুতর সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও নিন্দা-স্তুতির বৃহত্তর পালা পর্য্যায় ও সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্রশৈলীর ধারা এগিয়ে এল বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে। শিল্পাচার্য্য তখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। হাতের যাদুকরী তুলি মন্থর, অদ্ভুত রূপদৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে চলেছে। তথাপি সৃষ্টির বিরাম নেই। কলালক্ষ্মীর সস্নেহ আহ্বান তখনও তাঁর হৃদয়কন্দরে আলোড়ন সঞ্চার করছে। তিনি তখন যেন তাঁর সব্যসাচীর রূপটিকে আরও প্রতিভাত করে তুললেন এক হাতে তুলি-কলম, অন্য হাতে ছেনি-বাটালি নিয়ে। এক দিকে নবতর আঙ্গিক-এ বলিষ্ঠ তুলির টানে চিত্রাঙ্কন, অন্য দিকে চলেছিল জীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাকৃতিক বস্তুভারকে বাস্তবের ঊর্দ্ধে তুলে নতুন নতুন অভিনব রূপসৃষ্টির সমারোহ।

আর সমালোচক ? তিনি দরদী ও প্রকৃত সমঝদার, কি বিরোধী, বিদ্বেষী—যিনিই হোন না কেন, তিনিও রইলেন জাগরূক। মিঃ হ্যাভেল, স্যার জন উডরফ, ভগিনী নিবেদিতা, মাদাম হলবেক, ডঃ কুমারস্বামী ও ডঃ কাজিনস্-এর মত বিদেশী বিদগ্ধ সমালোচকদের শ্রদ্ধাপ্লুত মন্তব্য ও মন্তব্যের পরে এ-যুগে এগিয়ে এলেন আর একজন ইংরেজ সমালোচক। তিনি মনে হয় চরম আঘাত দানের জন্যই প্রস্তুত রেখেছিলেন নিজেকে। Mr. W. G. Archer তাঁর 'India and Modern Art'-এ (1959) শিল্পাচার্য্যের সমস্ত সৃজনী-প্রতিভা ও আদর্শকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন দ্বিধাহীনভাবে। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য—

"His first handicap was technical. As a young artist, he had suffered from the absence of a vitalizing tradition."

...The second limiting factor sprang from his general upbringing as a Bengalee. We have seen that a national movement was slowly growing up. In Calcutta, however,

this movement was by Bengalees for Bengalees. Led by the Tagore family, it had vindicated the Bengali language as a medium of expression and revival of traditional Bengalee culture. But it was provincial rather than national—perhaps we should rather say, it was national but in a provincial manner."

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রকৃতির সাধারণ পরিবেশ বর্ণনা করে এবং তাঁর তুলিকার মুঘল বিষয়ক চিত্রাবলীর অপকর্ষ ব্যাখ্যানের পরে লেখক আরও এগিয়ে গেলেন শিল্পীগুরুর আঙ্গিক-পদ্ধতির বিশ্লেষণে। সেই সমালোচনার ভাষা ও ভঙ্গী দেখে অবনীন্দ্র-চিত্রের যথার্থ সমঝদারের হতবাক্ হওয়া ব্যতীত আর কি করণীয় আছে? তিনি লিখেছেন—

"As it developed over a period of thirty years, it became identified with certain qualities—hesitant indecisive line, misty vagueness of form, sombre murkiness of colour, likings for wistful girlish stances, dainty wanness, anaemic sentimentality. Some of these qualities spring directly from technical weakness—his inadequate training in the British Technique, an imperfect mastery of Mughal idiom, the force of Japanese example. They are also due, in part, to a mystical nature of Havell's Teaching."

আর্চার সাহেব এই চিত্রকে যেভাবে নানাদিকে দুর্বলতা ও অসারতার প্রতীকরূপে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, তার প্রতিবাদ ধ্বনি পাওয়া যায় ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী ও অন্যান্য লেখকদের বহু পূর্ব্বে প্রদত্ত মন্তব্যের মধ্যে। ডঃ কুমারস্বামী ১৯০৭ সালেই বলেছেন—

"The tenderness, grace and unapproachable Indianness of these delicate water colours is overwhelming; they are the perfect expression of Indian conceptions in an universal language, they reveal the soul of a people not crudely or superficially but utterly to those that have eyes to see and ears to hear.

—Such work, a true expression of the spirit of Indian

nationality, is the perfect flowering of the old tradition; a flower that speaks not only a past loveliness but is strong and vigorous with promise of abundant fruit."

শিল্পচার্য্যের দেহান্তরের কয়েক বছর পরে প্রকাশিত মিঃ আর্চারের মতবাদ এবং আরও কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশীয় সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গে, তাঁর জীবনসন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি খেদোক্তি করে রহস্যসিক্ত ভাবে যা বলেছিলেন, তা বিশেষভাবে প্রয়োজ্য ও অর্থবহ বলে মনে হয়। কবি জসীমউদ্দীন একদিন অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—

"আপনাকে যেমন দেখছি সমস্ত আমি বড় করে লিখব।"

শিল্পীগুরু তাঁর স্বাভাবিক রসিকতার ভঙ্গীতে হেসে বললেন, "তোমার যা খুশী লিখে দিও। লিখে দিও, অবন ঠাকুরকে আমি ছবি আঁকা শিখিয়েছি। কাগজে বার করে দাও। আমি বলব, সব সত্যি।"[১]

কথাগুলি রহস্যসিক্ত বটে, কিন্তু হতাশায় আচ্ছন্ন ও বেদনামথিত নিশ্চয়ই। তাঁর জীবনের শেষ সন্ধ্যালগ্নে এই জাতীয় খেদোক্তি কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। জীবনভর তিনি দিয়েছেন। শিল্পী, ছাত্র-শিষ্য, বন্ধুস্বজন সকলকেই প্রাণঢেলে ভালবেসেছেন, মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন। দিয়ে দিয়ে সব দিকে হয়েছিলেন দুর্ব্বল। দেহে শক্তি নেই, হাতের তুলি স্তব্ধ, হৃদয়ের অনুভাব-অনুভূতি জমাটবদ্ধ, অর্থ সম্পদের ভাণ্ডার নিঃশেষিত প্রায়— তখনও কি তিনি হতাশায় আচ্ছন্ন হবেন না, খেদোক্তি করবেন না?

আধুনিক ভারতশিল্পের ইতিহাসে তাঁর স্থান কোথায় তা আজও নির্ণীত হয়নি। কিন্তু তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে জগতের শিল্প-দরবারে একটি গৌরবের ও মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন জীবনের মধ্যাহ্নলগ্নের মুখেই। সারা ভারতের মাটিতে তিনি তাঁর চিত্র-রসধারাকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সহায়তায়। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সকল ছাত্রই অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে তাঁর চিত্রশৈলীর মহিমাদ্যুতিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করে। অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্রশৈলী কলকাতা থেকে ক্রমশঃ দেশের সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত হওয়ার যোগ্য বাতাবরণ পেয়েছিল তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের মাধ্যমেই। অতএব এই প্রবাহকে 'আন্দোলন' আখ্যাদান

১. ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়ঃ জসীমউদ্দীন। পৃঃ ১১৫

করা কিছু অমূলক ও অসার কল্পনা মাত্র নয়। প্রাক্-অবনীন্দ্র যুগে ভারতের চিত্রকলারীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ও প্রান্তীয় ধারায় বিভক্ত। কিন্তু তিনি এমন একটি চিত্রশৈলীর সৃষ্টি করলেন, যা হয়ে উঠলো সর্ব্বভারতীয়। এর আগে এ রকমটি আর কখনও হয়নি।

নন্দলাল বসু গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে (১৯১৯)। তাঁর পূর্ব্বে অসিতকুমার হালদার কিছুদিন কলাভবনের কর্ণধার পদে ব্রতী ছিলেন; আর তা প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন থেকে। নন্দলাল বসু কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে আসীন হয়ে তাকে নব্য-চিত্ররীতির একটি শ্রেষ্ঠ ও আকর্ষণীয় কেন্দ্ররূপে পরিচিত করে তুললেন দেশ-বিদেশের সর্ব্বত্র।

কালক্রমে অসিতকুমার হালদার ব্রতী হলেন লক্ষ্মৌর সরকারী কলা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষপদে। সেখানে তাঁর সহকারীরূপে যোগ দিলেন ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী, চিত্রশিল্পী ললিতমোহন সেন ও বীরেশ্বর সেন। সেই শিক্ষায়তনটি হয়েছিল যেন অবনীন্দ্র-চিত্রালয়ের দ্বিতীয় আর একটি শাখা। সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত দায়িত্বভার নিলেন লাহোর মেয়ো স্কুল অব্ আর্ট-এর।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্য্যায়ের বিশিষ্ট ছাত্র শৈলেন্দ্রনাথ দে কর্ম্মভার নিয়ে যান জয়পুর আর্ট স্কুলে। তিনি জীবনভর সেখানেই কর্ম্মব্যাপৃত ছিলেন। ভেঙ্কটাপ্পা এসেছিলেন মহীশূর থেকে। অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি নিপুণ শিল্পীরূপে দেশে ফিরে যান। তাঁর চেষ্টা ও শিক্ষায় মহীশূর অঞ্চলে বাংলার চিত্র-পদ্ধতি প্রসারের যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন রূপকৃষ্ণ। মহীশূর ও পাঞ্জাবের এই দুটি ছাত্রের জন্য অবনীন্দ্র-হৃদয়ে বিশেষ একটি স্নেহ-মমতার স্থান ছিল নির্দিষ্ট। কিন্তু রূপকৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত গুরুর সেই অকৃত্রিম প্রাণঢালা স্নেহ-দরদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি। পরন্তু তিনি কিছুদিন বিলেতে শিক্ষালাভের পরে ফিরে এসে অবনীন্দ্র-চিত্ররীতির স্পষ্ট বিরোধিতা করেন। ইংরেজ পত্নী মেরীর সঙ্গে যুগ্মভাবে ১৯৪০ সালে তিনি একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন "Art and Life" নামে। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

"My master A. N. Tagore represents a movement which was born, attained its youth, grew old and died during his life time."

তিনি এমন সময়ে এই দুরন্ত ভিত্তিহীন উক্তিটি করেছিলেন, যখন স্বয়ং শিল্পীগুরুর তুলিকা চলছিল অতি বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে ও সাবলীল গতিতে। তিনি

তখনও নতুন জোয়ালো রূপের কৃষ্ণমঙ্গলের চিত্রাবলী অঙ্কনে শ্রান্তিহীন। আর তাঁর প্রথম পর্য্যায়ের প্রতিটি ছাত্র তখন ভারতের বিভিন্ন আর্ট স্কুলের কর্ণধার পদে অধিষ্ঠিত।

রূপকৃষ্ণ 'Bengal School'—নামটি সম্বন্ধেও আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর মতে এই চিত্রের উৎসভূমি বাংলার বাইরে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে অজন্তার চিত্র, রাজস্থানী ও মুঘল চিত্রই অবনীন্দ্র-চিত্রের মূল প্রেরণা। অতএব ইহাকে 'বাংলার শৈলী' বলা চলে না। এই প্রকার আরও অনেক অযৌক্তিক ও অসার মন্তব্য করে রূপকৃষ্ণ তাঁর গুরুদক্ষিণার বিরূপ সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন আর কি!

যাই হোক্—ব্যতিক্রম আছে জগতের সর্ব্বক্ষেত্রে। বহুবিধ প্রশংসা-স্তুতির পাশে পাশে রূপকৃষ্ণের অভিমতের ন্যায় আরও কত বিরুদ্ধ মত ও মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান সম্বন্ধে তাঁর সত্য অনুভূতির কথা তিনি পূর্ব্বেই বলেছেন। তবে তা যে আবার শিল্পী মনে অধিক আলোড়ন সৃষ্টি করে তাও উল্লেখ করেছেন স্মৃতিচারণকালে।

"সুখ দুঃখ আমাদের বেশী করে বাজে, জীবন উপভোগ করবার ক্ষমতাও আমাদের বেশী। প্রকৃতি আমাদের বেশী করে দিয়েছেন সবই।"

বেশী করে বাজলেও তিনি আঘাত পেয়ে থামেন নি কখনও। তাঁর রসোল্লাস ও রূপোল্লাসের ধারাকে ক্ষীণস্রোতা হতে দেননি। ছাত্র-শিষ্যদের চালিয়ে নিয়েছেন অবাধ ছন্দে।

সুতরাং আরও অনেক ছাত্র তাঁর কর্ম্মভার নিয়ে চলে গেলেন অন্যান্য স্থানে। তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর কর্ম্মকেন্দ্র হয়েছিল মাদ্রাজের গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের পদে ব্রতী থেকে শিক্ষাদান ও শিল্পসাধনা দুয়েতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে অবনীন্দ্র-চিত্র পদ্ধতির প্রসারে তাঁর অবদান কৃতিত্বপূর্ণ ও বহুধা বিস্তৃত।

দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার (মসলীপট্টম) অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেছিলেন বাংলাশৈলীর আর একজন শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনিও অনেক সুযোগ্য ছাত্র তৈরী করে ঐ অঞ্চলে এই চিত্ররীতির প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আরও যাঁরা শিক্ষাব্রতীর জীবন-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, মুকুলচন্দ্র দে, পুলিনবিহারী দত্ত, বীরেশ্বর সেন ও চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও চৈতন্যদেব দীর্ঘদিন

সোসাইটির শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ক্ষিতীন্দ্রনাথের কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট বিভাগে। মুকুল দে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষের পদে ছিলেন অধিষ্ঠিত। পুলিন-বিহারী দত্ত তাঁর কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করেছেন আমেদাবাদ ও বোম্বাই শহরে। তিনিও শিক্ষাব্রতীরূপেই, বিশেষতঃ শিশু ও কিশোরদের মধ্যে নব্য-চিত্ররীতিকে প্রসারিত করতেই সমস্ত শক্তি-প্রতিভাকে ব্যয় করেছেন অদম্য উৎসাহভরে। বীরেশ্বর সেন তাঁর কর্ম্মজীবন কাটিয়েছেন লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলে। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র সারদা উকিল ও রণদা উকিল দুই ভাই শিল্পী ও শিক্ষাব্রতীর জীবন অবলম্বন করে বাংলার বাইরে জাতীয় শিল্পের প্রসারে সহায়তা করেছেন। সারদাচরণ স্বচেষ্টায় দিল্লীতে একটি কলাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে এই শিল্পধারার প্রচার করেন। রণদাচরণের কর্ম্মধারা পরিব্যাপ্ত ছিল বারাণসীর পুণ্যক্ষেত্রে। সুরেন কর আজীবন শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষকতা করেই জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর পরবর্ত্তী অবনীন্দ্র-শিষ্যরূপে শিল্পী ও শিক্ষক ছিলেন প্রশান্ত রায়।

কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ না হয়েও নব্য-চিত্রকলাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং রসিকের হৃদয়ে তাকে আনন্দের উৎস করে তুলেছেন এমন অবনীন্দ্র-শিষ্যের সংখ্যাও সুপ্রতুল। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন চারু রায়, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধাংশু চৌধুরী, সুধাংশু রায়, সুধাংশু বসু রায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। এঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করলেও, মৌল আদর্শ ছিল আধুনিক চিত্রধারাকে পরিপুষ্ট করা ও প্রবহমান রাখা। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের আদিযুগে এঁদের মধ্যে দু-একজন বিশেষতঃ চারু রায় ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন চিত্রকলার ধারাকে উক্ত শিল্পের অঙ্গীভূত করতে প্রয়াসী হন। অবনীন্দ্র-চিত্র পদ্ধতির আর একজন সাধক মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সুদূর সিংহল দেশে গিয়ে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শিল্পাচার্য্যের প্রশিষ্য মাধ্যমেও সেই শিল্প- আন্দোলন সুবিস্তৃত হয়েছে অতি সাবলীল গতিতে। প্রশিষ্যদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান হয়ে শিল্প সাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা এগিয়ে চলেছিলেন তাঁদের পুরোভাগে স্থান লাভের যোগ্য হলেন—ধীরেন দেববর্ম্মা, রমেন চক্রবর্ত্তী, অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ ব্যানার্জি, সুধীর খাস্তগীর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বৈজ, চিন্তামণি কর, ইন্দ্র দুগার, বিষ্ণুপদরায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা।

তথাপি একটি প্রশ্ন ওঠে এবং তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। এই শিল্পরীতির প্রবর্ত্তক যিনি তাঁর তুলি ও কল্পনা কখনও বিরতি-বিশ্রাম লাভ করেনি। তাঁর সুযোগ্য ছাত্রগণও ছিলেন উৎসাহী, নিষ্ঠাবান ও কর্ম্মকুশল। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে তাঁরা এই শিল্পাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও এই চিত্রকলার রসধারা যেন দেশের আপামর জনসাধারণের অন্তরে প্রবেশের সহজ অধিকার পায়নি। আর ইহা কি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হয়েছিল ?—না, ইহাকে স্বতন্ত্র একটি শিল্প আন্দোলন বলা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চ্চার শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা, জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি ও তাঁর শিল্পসাধনা প্রায় একই সময়ে ও সমতালে এগিয়ে চলেছিল। যখন তিনি তাঁর পাশ্চাত্যপন্থী শিক্ষার ফলশ্রুতিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে নিজস্ব পথ ও পন্থা নির্ণয় করলেন, তখন দেশে স্বাদেশিকতার হাওয়া প্রবল বেগে প্রবহমান। ১৯০৫ সালে তিনি আর্ট স্কুলে যোগদান করেন। তখন পুরো স্বদেশী যুগ। সেই সময় তাঁর প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতি দেশীয় ভাবধারা, প্রাচীন কাব্য-কাহিনী ও ধর্ম্মাদর্শকে বহুলরূপে প্রকাশ করার ফলে মানুষের মনে তা সাজাত্যবোধ জাগ্রত করতে কিছু পরিমাণে যে সহায়ক হয়েছিল বললে তা বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

অবনীন্দ্রনাথের কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর বাড়ীর পরিবেশে যে জাতীয়তার প্রভাব পড়েছিল এবং তৎসংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপে তিনি যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন তা পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে তাঁর সমুদয় চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম্মকুশলতা অবশ্য চিত্রকলাকে আশ্রয় করেই স্ফূর্ত্তি লাভ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ আর ছিল না। কিন্তু তাঁকে শিল্পী, স্বদেশপ্রেমিক, রসজ্ঞ ও সাজাত্যাভিমানী—যে ভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক্ না কেন, তাঁর চিত্রকলার মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অনেক সমালোচক তাঁকে জাতীয়শিল্পের আধুনিক ধারার 'জনক' আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর চিত্রের দরদী ব্যাখ্যাতা স্বর্গত ও. সি. গাঙ্গুলী বলেছিলেন—

"His paintings were designed as organised protest against foreign influences and as a passionate plea for artistic expression through indegenous forms, a plea for the use of the old vernacular art of India as the medium of a

truly National Art. He came as a rebel against the domination of the Western standards of Art and as an able demonstrator and interpreter of the finest elements of indegenous Indian painting."

লর্ড রোনাল্ডসেও কয়েকবার তাঁর শিল্পধারাকে—'large a part in the National Movement'; 'revolt against the Westernisation' প্রভৃতি মন্তব্য করেছেন।

লর্ড রোনাল্ডসের দ্বিতীয় মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য এই অর্থে যে তা ছিল পাশ্চাত্য শিল্পরীতির বিপরীত ভাবাপন্ন দেশজরীতির চর্চ্চা। 'দেশী মতে' চিত্র-সাধনাই ছিল শিল্পাচার্য্যের মুখ্য জীবন-সাধনা। কিন্তু তাঁর প্রথম মন্তব্যটি—কিছু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ভাবনা ও আদর্শ দেশীয় ভাবধারা ও স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও, তিনি যে স্বদেশী আন্দোলনকে পুষ্ট ও সাহায্য করার জন্য শিল্পসাধনা করতেন বা ছাত্রগোষ্ঠীকে সেই আন্দোলনের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন এমন কোন নজির নেই। তবে তিনি এবং তাঁর পরিবারের সকলেই যে দেশমাতৃকার বন্ধন-মুক্তির জন্য ব্যগ্র ও সেই প্রচেষ্টায় উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন তা সুবিদিত। তাঁকে যে 'revivalist' বলা হয়, তারও কিছু কারণ সমালোচকগণ সম্ভবতঃ সেই স্বদেশী ভাবপ্রবণতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কোন শিল্পী বা স্রষ্টা যদি স্বদেশের ঐতিহ্যানুগ কোন নতুন সৃষ্টির প্রয়াস করেন, তা'হলে তাঁর দেশ ও জাতির চিরাগত প্রথা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে অন্ততঃ গ্রহণ-বর্জনের পালা-পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও হয়েছিল তদনুরূপ। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, তিনি তার স্বরূপ ও মর্ম্মরহস্য উদ্ধার করে নতুন সৃষ্টিপথে এগিয়েছিলেন। অতএব, তাঁর আদর্শকে ভারতীয় আদর্শরূপেই গ্রহণ করতে হবে। তবে তাকে নির্জলা 'revival' বলে তাঁর প্রতিভাকে ম্লান করার চেষ্টা সমীচীন নয়।

প্রখ্যাত শিল্প-ইতিহাসবেত্তা শ্রীঅশোক মিত্রও বাংলার এই শিল্পধারার গতিকে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও তার অঙ্গীভূত বলে বর্ণনা করেছেন এবং স্বদেশপ্রেম সঞ্জাত একটা 'revival' বলতে চেয়েছেন।

তাঁর মন্তব্যের একটি অংশ হোল—

"The modern movement in painting received its most powerful stimulus not from the urge to see differently and

there from to draw differently but from the urge to feel and act patriotically and bring painting to the service of Swadeshi and Nationalism. The path was laid not through a reconstruction of the contemporary way of seeing but through a patriotic revivalist drill."[১]

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি প্রসঙ্গে 'revival' কথাটি নিয়ে ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।[২]

এখানে আরও একটি কথা বলা যেতে পারে যে, জাতীয় আন্দোলন যে ভাবে দেশের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্তরে বিস্তার লাভ করেছিল, এই শিল্পরীতি ও চিত্রকলা তেমন বহুলরূপে প্রচারিত ও বিস্তৃত হতে পারেনি। সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী এক নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর স্থান ছিল সীমাবদ্ধ। এই ঘটনার পশ্চাতেও যুক্তিসঙ্গত কিছু কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রথমতঃ, এ দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন একটি ধর্ম্মবোধ প্রসূত কারুকলার সুদৃঢ় ছন্দসূত্রে গ্রথিত ছিল সভ্যতার অরুণোদয়ের শুভক্ষণ থেকে। প্রতিটি হিন্দু পরিবারে যে আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-উৎসবের পালা চলতো এবং আজও কিছু কিছু চলে, সেখানে চারু ও কারুকলার স্থান সুনির্দিষ্ট। মূর্ত্তি-প্রতিমা থেকে শুরু করে সুগঠিত ও সুচারু তৈজসপত্র ও মণ্ডন শিল্প সবই তার অঙ্গীভূত। সেই সূত্রে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও আবেগসিক্ত একটি লৌকিক ও গ্রামীণ চারু ও কারুকলার চর্চ্চা হয়েছে অবারিত ছন্দে।

পুঁথি-পুস্তকে নিহিত ধর্ম্মীয় এবং ঐতিহাসিক আখ্যান চিত্রায়ণের প্রথাও ছিল সর্ব্বত্র। একদা বাংলার গ্রামাঞ্চলে পটুয়াদের দীর্ঘাকার পটচিত্র ছিল সারল্য সুষমা, গভীর ধর্ম্মবোধ ও আবেগ অনুভূতির চূড়ান্ত নিদর্শন। এই চিত্রশিল্পটির ক্ষীণ ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্তও ছিল প্রবহমান। সমকালীন কালীঘাটের পটচিত্রও কলাসম্পদরূপে প্রথম শ্রেণীর। ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরেও কিছুকাল এর সৃষ্টি-প্রবাহ রুদ্ধ হয়নি। পরন্তু বিদেশী শিল্পরসিকদের দৃষ্টিপথে গিয়ে তা একটি স্বতন্ত্র মর্য্যাদা লাভের অবকাশ পেয়েছিল।

---

১. Lalit Kala Contemporary. p. 16

২. এই গ্রন্থের ১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তবে কি বলতে হবে যে এই শতকের প্রারম্ভ থেকে এদেশের মানুষের মন হতে শিল্পবোধ ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল? না, তা হয়নি। বিকল্প সৌন্দর্য্য নিদর্শন এদেশের মানুষের মন ও মননকে অন্যভাবে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। পূর্ব্বযুগে অনেক শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে হাতে লেখা দেব-দেবীর সুন্দর ছবি সস্তা দামে মন্দির দ্বারে বিক্রী করার প্রথা ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রথায় চিত্র মুদ্রণের কাজ বহুলরূপে প্রসারিত হতে শিল্পীর তুলিতে আঁকা মৌলিক চিত্রপটের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে লাগলো। এছাড়া রুচি পরিবর্ত্তনেরও একটা প্রশ্ন আছে। ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরে দেশের সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের আদর্শে ঘোর পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। সামগ্রিকভাবেই জীবনচেতনা ও শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এসে যায় বিপুল পরিবর্ত্তন। অচিরে দেশের নানা অংশে সরকারী উদ্যোগে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা হতে এখানকার চারুকলা শিক্ষার্থীদের সামনে নতুনতর ও আকর্ষণীয় একটি রূপরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে তেল রঙ-এর আঙ্গিকে পাশ্চাত্য প্রথায় চিত্রাঙ্কন কর্ম্মে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চললেন। তৎসঙ্গে পাশ্চাত্য চিত্রের প্রতিলিপি বহুল পরিমাণে আমদানী হতে হতে এদেশের মানুষের দৃষ্টি ও রুচিতে এল বিরাট পরিবর্ত্তন। এমন একটি সময়ে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত চিত্ররীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সহজ কাজ ছিল না। তদুপরি তার ব্যাপক বিস্তারের পথে বাধা-বিঘ্নও ছিল যথেষ্ট। আপাতঃ-দৃষ্টিতেই তার দুটি মুখ্য কারণ দেখা যায়।

প্রথমতঃ,- অবনীন্দ্ররীতির শিক্ষা বিভাগে মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষার্থীর সমাবেশ। দ্বিতীয়তঃ, এদেশে তখন উন্নতমানের প্রতিলিপি মুদ্রণের ব্যবস্থা ও নৈপুণ্যের অভাব।

ক্রমশঃ ছাত্র-শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাঁরা সকলে সমান প্রতিভাশালী ছিলেন না। অনেকের নিজত্ব ও মৌলিকত্ব প্রকাশের উপযুক্ত শক্তি ছিল না। তাঁরা শিল্পাচার্য্যের অঙ্কন-পদ্ধতির ব্যর্থ অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁকে একটা 'mannerism'-এ পরিণত করেছিলেন। তার ফলে গোড়ার দিকে অবনীন্দ্র-চিত্ররীতি যেভাবে রসিকজন ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল, পরবর্ত্তীকালে তা আর হয়নি।

অবনীন্দ্র-চিত্র প্রতিলিপির মাধ্যমে প্রচারের আর একটি সমস্যাও এই শিল্প-আন্দোলনকে কিছু পরিমাণে বিঘ্নিত করেছে। কেন না, অবনীন্দ্রনাথ ভক্ত পূজারীর পূজার্চ্চনার যোগ্য মূর্ত্তি চিত্রায়ণ করেন নি। তিনি প্রাচীন

মূর্ত্তিতত্ত্ব অনুশীলন করেছিলেন বটে, কিন্তু রূপায়ণ কর্ম্মে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা নতুনতর ভাব ও অভিনবত্ব আনয়নেরই চেষ্টা করেছেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের রূপাদানেও তাঁর রীতি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি কোনও স্থুল উত্তেজনা, চমকপ্রদ ভাব ও অতি রমণীয়তাকে প্রশ্রয় দেননি, বরং সূক্ষ্ম জীবনছন্দে তাদের গ্রথিত করার চেষ্টা করেছেন। গীতি-কবিতা সুলভ কোমল মাধুর্য্যের ধারায় অনেক চিত্রসৃষ্টি হয়েছে অভিসিঞ্চিত। তাঁর অধিকাংশ রচনা কাব্যগুণান্বিত। একাধারে তা ছন্দমধুর, আবেগ-সিক্ত, আবার বুদ্ধিদীপ্ত ও সূক্ষ্ম ভাবরসাশ্রিত। এই সকল কারণেই সম্ভবতঃ তা সর্ব্বস্তরের মানুষের চিত্রকলা সম্বন্ধীয় আগ্রহ ও রূপতৃষ্ণা মেটাতে পারেনি।

অবনীন্দ্র-রীতির আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যও হয়ত এই সাধারণ অস্বীকৃতির অন্যতম কারণ। কেন না, তাঁর প্রবর্ত্তিত ওয়াশ পদ্ধতিতে বর্ণের মৌল দীপ্তি ও চমৎকারিত্বের পরিবর্ত্তে অন্তর্গূঢ় গভীরভাবের দিকেই লক্ষ্য ছিল বেশী। সাধারণ চিত্র-প্রভাব সমতল রূপের। পটে অপ্রয়োজনীয় বা অনধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্তিমিত ও কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট রেখে রহস্যঘন পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় অনেক চিত্রে। দেশের পূর্ব্বসূরী চিত্রকারদের অর্থাৎ মুঘল, রাজস্থানী ও পাহাড়ী শিল্পীদের রচনার সহিত ইহার প্রভেদ সুস্পষ্ট। রঙের গাঢ়তা, বস্তু ব্যাখ্যানের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি দ্বারা তাঁদের রচনারাজি যত সহজে দর্শকের চোখ ও মনকে আকৃষ্ট করে, অবনীন্দ্র-চিত্রের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

চিত্রকর্ম্মের মৌল আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজ অনুভূতি-উপলব্ধি দ্বারাই তিনি সর্ব্বদা চালিত হয়েছেন। দেশজ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তাঁর শিল্প-সাধনার আসন-পীঠ স্থাপিত হলেও, রূপায়ণ কর্ম্মে স্বীয় সত্তা ও ভাববুদ্ধির আরোপ হয়েছে প্রতিক্ষণে। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য যেমন প্রণিধানযোগ্য, তেমনি স্পষ্ট ধারণার সহায়ক।

তিনি বলেছেন—

"সকল প্রদীপের দীপ্তি সমান হয় না। তেমনি সকল মানুষের অন্তঃকরণে রুচি সমভাবে উজ্জ্বল নহে। এইজন্য তোমার লেখায় এবং আমার লেখায়, আমার চিত্রিতে ও তোমার চিত্রিতে, রূপের প্রভেদ ঘটে ও উভয়-সমস্যা তফাতে থাকে। এই মনের রুচি বা দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলাই হইতেছে রূপ-সাধনা।"—ষড়ঙ্গ

বিভিন্ন শিল্পীর রুচির ভিন্নতা এবং তার ফলে সৃষ্টি সমূহে পার্থক্য সম্বন্ধে যেমন বলেছেন, তেমনি সেই সৃষ্টি মানুষের মনে স্থান করে নিতে পারলে, রসিকের কাছে তা আদরণীয় হলে, শিল্পীর মনে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি রকম হয় তাও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তারপরেও শিল্পীর যথার্থ আনন্দের উৎস সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আরও অধিক অর্থবহ। তা হোল—

"শিল্পীর সজীব আত্মা সমঝদার পেলে আর একটুখানি আনন্দ বেশী পায় সত্য, কিন্তু সেটা তার উপরি পাওনা হলেও হয়, না হলেও চলে। শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে।" (শিল্পে অনধিকার : বা. শি. প্র.)

এই 'ফোটার গৌরব' দিয়েই অবনীন্দ্র-চিত্রকে বিচার-বিশ্লেষণ করা সমীচীন। কেবল 'আধুনিক' বলে ব্যাখ্যাত করলেও সবটা বলা হয় না। আরও বিশদ করে বলতে হলে বলা যায় যে, তিনি সমকালীন শিল্পের ধারাকে সমকালীনতার উর্দ্ধে নতুন এক স্তরে তুলে দিয়েছিলেন। অন্য কোন স্বতন্ত্র প্রবণতা, ভাবুকতা ও প্রেরণা ছিল না। দেশ-বিদেশের কারোর সঙ্গে মিলিয়ে চলার চেষ্টা তিনি করেন নি। আহরণ ও সংগ্রহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাকে স্বকীয়তামণ্ডিত ও দেশজ করে তোলাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

তিনি ছিলেন অন্তরে বাইরে সত্য-শিল্পী। সৃষ্টি বিভোরতায় আত্মমগ্ন। সেই মগ্নতা ও বিভোরতার সময়কে তিনি বলেছেন রোমান্সের যুগ, সংগ্রহের কাল, খোঁজাখুঁজির পালা। যা খুঁজেছেন, যা পেয়েছেন সব সঞ্চয় করে আবার উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করেন নি।

জীবনের সায়াহ্নকালে তিনি তাঁর খুল্লতাত কবিগুরুর লেখনীতে যে স্বীকৃতি-সম্মান পেয়েছিলেন তাই তাঁর জীবনে পরম গৌরব ও শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা এনে দিয়েছিল। কবি বলেছিলেন—

"আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহঙ্কারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ

দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মাবসান স্বীকার করে নেয় তবে এই যুগের চরম কর্ত্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্ব্বাগ্রে আহ্বান করি।"

—শান্তিনিকেতন
১৩ জুলাই, ১৯৪১

এই জাতীয় প্রশস্তি ও অঢেল প্রশংসার পাশে কঠোর সমালোচনা ও নিন্দার উজান-ভাটি ঠেলেই তিনি এগিয়ে চলেছিলেন সারা জীবন। যৌবন-জোয়ারে সংগ্রহ করেছিলেন, পথ চলতে চলতে ভাটির সময় তা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন কত রূপে, রঙে ও রেখায়। তাঁর মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত যাবতীয় ভাব-ভাবনাময় শিল্প-কুসুমরাজি তিনি উপহার দিয়েছেন দেশ-বিদেশের রসিকজনদের। বিনিময়ে আত্মোপলব্ধিতে যা পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—

"জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথ চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কি বক্‌শিশ পেয়ে গেছি।

এতকাল চলার পরে বক্‌শিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু!"

মধু! মধু!! মধু!!!